জীবনসঙ্গীত

জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বজ্ঞান
১/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯



প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগস্ট ১৯৫৯

প্রকাশক : দেবকুমার বসু। ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : হরিপদ পাত্র। সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিঃ-৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : চারু খান

উৎসর্গ

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ, আমি উৎসর্গ করলাম শ্রীযুক্ত দেবকুমার বসুকে। তাঁর মত কর্তব্যনিষ্ঠ, মেরুদণ্ড বিশিষ্ট, নির্ভরযোগ্য, কর্মকুশল, সু-সমালোচক, নাটক-পাগল ব্যক্তিত্ব আমি আর দ্বিতীয় খুঁজে পেলাম না। একজন ইংরাজ একদা বলেছিলেন : England yet shall live—আমিও বলছি Bengal yet shall live—

২৫এ বাগবাজার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৩

জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আলাপ

আগে আলাপ, তারপরে গৎ। জীবন-সঙ্গীতের বেলাতেও তাই। জীবনই শিল্প। জীবনই ইতিহাস। জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা। শিল্প জীবনেরই অভিব্যক্তি। আমি সেই জীবনান্বেষণেই বেরিয়েছিলাম। মহৎ জীবন। জীবনের উত্থানেই। মানুষকে বিশেষভাবে জানবার যে স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা, তা আমার ছিল। তাই আমার জগতে আসা-যাওয়া কেবল আনাগোনা মাত্র নয়। কিছু উপলব্ধিও। যুগ-সন্ধিক্ষণে জন্মিয়েছি। পরাধীনতা এবং স্বাধীনতা দুই-ই দেখেছি।

অতীত ছাড়া বর্তমান নেই। ভবিষ্যৎও গড়ে উঠতে পারে না। আমার অতীত কি? আমার দেশ কোথায়? বাড়ী কোথায়? ভিত্তি কি? দেশ ও সমাজ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন। আমার আত্মস্মৃতি শুধু আমারই আত্মস্মৃতি নয়। একটা বিশেষ সমাজ ও সময়ের খণ্ড খতিয়ান। সাতষট্টি বৎসরের এক অখণ্ড ধারাবাহিক ইতিহাস। ১৯১১ থেকে ১৯৭৮।

আমার পিতামহ হরিহর মুখোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০২) বাঁকুড়ার প্রথম মনোনীত ভারতীয় পৌর সভাপতি। সরকারী উকিলও। তার পূর্বে ইংরেজ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরাই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হতেন। ১৯৭২ সালে মিউনিসিপ্যালিটির শতবর্ষ পূর্তী হল। তখনই শহরের একটা প্রধান রাস্তা তাঁর নামে নামাঙ্কিত হল 'হরিহর সরণী'। পৌর প্রতিষ্ঠানে তাঁর চিত্রও হল শোভিত। জনতা তাঁকে 'হিরো' উপাধি দিয়েছিল। আরও দুজনও উপাধি পেয়েছিলেন। হিরো হরিহর, ব্রেভ বিনোদ, জেন্টল্ কুলদা।

তাঁর তৈরী বাড়ী আজ 'বৈপ্লবিক বাড়ী' নামে পরিচিত। অগ্নিযুগের বহু স্মৃতি বিজড়িত এই গৃহ। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ইংরেজ মিলিটারী একদিন এসে এই বাড়ী খানাতল্লাসী করেছিল। আমার কাকা উমেশচন্দ্র ও বাড়ীর পালোয়ান রামদাস চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। দুটো রিভলভার তখনো বাড়ীতে। কিন্তু ধরণী ঘোষ নামে একটি ছেলে ঝি সেজে, এঁটো বাসন নিয়ে যাচ্ছে চলে, এক পাঁজা এঁটো বাসন কোমরে নিয়ে, ইংরেজ পাহারাদারদের চক্ষে ধুলি দিয়ে কালীতলার পুকুরে আপত্তিকর জিনিস দুটো ফেলে এসেছিল। সুরেন বাঁড়ুজ্যেকে একদিন শোভাযাত্রা করে এই বাড়ীতেই নিয়ে আসা হয়েছিল। কেশব সেনের (১৮৩৮—১৮৮৪) শ্রমিক বিদ্যালয়ের আদর্শে, বাঁকুড়ার প্রথম শ্রমিক বিদ্যালয়,

১৮৯৩ সালে পিতামহরই প্রতিষ্ঠিত। আজও স্লেটে গান ও লেখা, বৈপ্লবিক বাড়ীর দেওয়ালে গাঁথা আছে। রবীন্দ্রনাথের গানও পিতামহ স্লেটে উদ্ধৃত করেছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বত্রিশ বছরের মাত্র। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসীর প্রতি অভিমান অযৌক্তিক। গজদন্ত মিনারে বাস হেতু অজ্ঞতা প্রসূত। রবীন্দ্রনাথের গান "চঞ্চল মানস, বিনাশ আশাপাশ, বিষয় বিলাস বাসনারে। বিষয় বিভবে মত্ত কি হইলে, ভুলিলে ভুলিলে আপনারে।" ষোল লাইনের পুরো গান। নীচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখা। তারিখও লেখা আছে। ১৮১৫ শকাব্দের ১২ই অগ্রহায়ণ। অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। পিতামহ সঙ্গীতপ্রিয়, যাত্রাপ্রিয়, সাহিত্যপ্রিয় এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত, ইংরাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হয়েও, দেশের ঠাকুরকে ফেলে দেননি। পঁচাশী বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি দেওয়া, কম-বিচার ক্ষমতা ছিল না। কংগ্রেস রাজত্বে এই জেলার প্রথম নির্বাচিত এম, এল, এ আমার পিসতুতো ভাই ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। গঙ্গাজল মাটি 'অমর কানন' আশ্রম তারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমরেন্দ্রের স্মৃতি গৌরবে উজ্জ্বল। রাজপুরুষ পিতা কর্তৃক গৃহ বিতাড়িত তরুণ নন্‌কো-অপারেটর অবশেষে জীবন দিয়ে মাতৃভূমির পূজা সমাধা করলেন। সুদূর গ্রামাঞ্চলে। পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টির অন্তরালে। বিনা চিকিৎসায়। এ আঘাতের তীব্রতা যারা সহ্য করেছে তারাই শুধু জানে। আজও পোলিটিকাল সাফারারস্ পেনসন্ আমার খুড়তুতো ভাই ধরণীধর পেয়ে চলেছে। এই বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে অনেক ইংরেজী উক্তি। অনেক বাংলা গান। পিতামহ কর্তৃক স্লেটে নরুণ দিয়ে লিখিয়ে দেওয়ালে গেঁথে দেওয়া। লিপিকার পাঠকপাড়ার কেদার নায়েক ও প্রাণবল্লভ গোস্বামী। 'জাল ফেলে ছেলে রয়েছে বসে, মা আমার কি হবে শেষে?' একদিন লোকে বাঁকুড়ার তিনটি জিনিস উল্লেখ করত। সরকারী উকিলের বাড়ী, কুলদাবাবুর গাড়ী, আলি জামিনের দাড়ী।' আজ সে রামও নেই। সে অযোধ্যাও নেই। আছে স্মৃতি মাত্র।

আমার পিতামহী নবদ্বীপের খ্যাতনামা পণ্ডিত কালীকমল ভট্টাচার্য ন্যায়রত্নের কন্যা। আমার প্রপিতামহ সে যুগের বিখ্যাত কনট্রাক্টার। ব্যারাকপুরের অনেক রাস্তা মধুসূদনের তৈরী। মস্ত দোতালা চক মেলানো বাড়ী। বারো মাসে তেরো পার্বণ। পণ্ডিত কালীকমল একদিন তাঁকে এসে বললেন—আমার কন্যা মুক্তকেশীর সঙ্গে তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র হরিহরের অমুক দিনে বিবাহের দিন ধার্য করলাম। ধনী মধুসূদনের সাহস হল না টুঁ শব্দটি করবার। নির্দিষ্ট দিনে নাপিত

পুরোহিত, বর ও বরযাত্রী নিয়ে পানসী করে রওনা হলেন নবদ্বীপ। গিয়ে দেখেন সেখানে নান্দীমুখের সমস্ত সরঞ্জামই প্রস্তুত। বিবাহ হয়ে গেল। আজকের দিনে এ জিনিস ভাবা যায় কি? কালীকমলের এমনিই ছিল প্রতাপ। ব্যক্তিত্বের অনমনীয় তেজ। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ কমলাকান্ত। অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রাণকৃষ্ণ। তস্য পিতা শম্ভুনাথ। আমরা দেবকীনন্দনের সন্তান। ফুলিয়া মেল। রাঢ়ী শ্রেণী। ভরদ্বাজ গোত্র। এই আমার ভিত্তি। এই আমার পারিবারিক ঐতিহ্য। এই আমার অতীত।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলায় এই অস্ত্রোপচার লর্ড কার্জন করেছিলেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জোড়াসাঁকোর প্রাসাদ ছেড়ে চিৎপুরের পথের ধুলায় নেমে এসেছিলেন। "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান" "ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ঘুচবে" ইত্যাদি গান লিখেছিলেন। ১৯০৬ সালের ৭ই আগস্ট ইংরেজী দৈনিক "বন্দেমাতরম্" প্রকাশিত হল। সুবোধ মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ ও রজত রায়ের অর্থানুকূল্যে। সম্পাদকীয় লিখতেন অরবিন্দ। সহকারী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। গান্ধীজীর অনেক আগে এই বছরেই এই পত্রিকায় অরবিন্দ passing resistance নাম দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯০৭ সালের ২৭শে জুন এই পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতায় অভিযোগ আনা হয়। Kings ford বিপিন পালকে ও সুভাসচন্দ্রের জ্ঞাতি অপূর্ব বসুকে ছ' মাস কারাদণ্ডের শাস্তি দেন। কাব্য বিশারদ গান লিখলেন—'আমায় বেত মেরে কি মা ভোলাবি, আমি কি মায়ের সেই ছেলে? দেখে রক্তারক্তি, বাড়বে শক্তি। ১৯০৭ সালের ৩০শে আশ্বিন উভয়বঙ্গের মিলন দিন হিসেবে স্মরণীয় করবার জন্যে "রাখীবন্ধন" উৎসব পালিত হয়। গোপালকৃষ্ণ গোখলে ষাট হাজার নাগরিকের সই সংগ্রহ করে ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু বিয়াল্লিশ বছর পরে ৩১শে মার্চ ১৯৪৭ সালে ভারতের অবিসম্বাদী নেতা মৌলানা আজাদকে মুখে আশ্বাস দিলেন বটে—আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে ছাড়া কংগ্রেস ভারতে দুটো বিভিন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কিন্তু মাত্র আড়াই মাস পরে ১৪ই জুন ১৯৪৭ সালে, সেই মহান নেতার উপস্থিতিতেই এ, আই, সি, সির মিটিংএ সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। মহামানব ও লৌহমানবকে সমর্থন করলেন। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, উল্লাস, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, বিনয়, বাদল, দীনেশের কথা কারও মনেও পড়ল না।

বাংলায় একটা প্রবাদবাক্য আছে নেপোয় মারে দই। সেটা মনে পড়তে লাগল। মহামানব দিল্লীর ভঙ্গীকলোনী ছেড়ে পূর্ব্বাহ্নে ১৯৪৬ সালেই পূর্ব-পাকিস্তানীদের দুয়োরে দুয়োরে "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম" বলতে বলতে ব্যাঘ্রকে তিলক তুলসী ধারণ করতে অনুরোধ করে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর অভিমান ভাঙাতে জওহরলাল ও কৃপালনী, পূর্ব্ব পাকিস্তান পর্য্যন্ত ব্যোমবিহার করতে কাতর হলেন না। রাজশক্তি পেছনে না রেখে, এক অশীতিপর বৃদ্ধের লাঠি মাত্র ভর করে, দুটি কিশোরী-স্কন্ধ মাত্র আশ্রয় করে "একলা চলরে" গান করতে করতে সাঁকো পার হওয়া হাস্যকর শুধু নয়, বিভ্রান্তিকর। দেশকে পথ ভুলিয়েছে। দেশকে ভুল বুঝিয়েছে। পঁচিশ বছর পরে ইন্দিরা গান্ধী যা করলেন, তাই যদি তখন বা পরে করা হত, ভারতবর্ষের ইতিহাস আজ অন্য হত। রাজনৈতিক প্রশ্ন রাজনৈতিক উপায় সমাধান করতে হবে। নৈতিক উপায় নয়। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালির ভ্রাম্যমান যাদুকর, ১৯৪৭ সালে দিল্লীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যাদুকরে পরিণত হলেন। ছিলেন নেতা। হয়ে গেলেন নীত। মূল্যও দিতে হল। চরম মূল্য। অনিবার্যভাবেই। একলা আর চললেন না। পালের সঙ্গেই রইলেন। সিংহের পাল হয় না। শৃগালেরই হয়। নীলবর্ণ ধারণ করেও আত্মরক্ষা করতে পারলেন না। পালের সঙ্গে গলা মিলিয়ে "হুকা হুয়া" করেই ফেললেন। ওয়াটারলু শেষ হলই। মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হয়না। মৌলানার কাছে দেওয়া কথা মিথ্যা হলনা! তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়েই দেশে দুটো স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলার শার্দুলের মার্জার-পুত্র বুক-ফুলিয়ে বললেন—কংগ্রেস ভারত বিভাগ করেছে। আমি পাকিস্তান বিভাগ করেছি। কার্য্যকালে দেখা গেল, তিনি বিভক্ত ভারতের সর্ব্বোচ্চ গদীতে দিব্যি গ্যাঁট্ হয়ে বসলেন। কিন্তু টিঁকতে পারলেন না। বাঙালী চিরকাল যা করে থাকে, অতঃপর বাংলার অপূর্ব্ব শল্য-চিকিৎসক তাই করলেন। "আচ্ছা, দেখে নেবো" বলে নতুন একটা দল গড়লেন। মহাসভা আর নয়। এবার মহা-সংঘ। চালাকীর দ্বারা মহৎ কার্য্য হয় না। প্রায়শ্চিত্ত করতেই হল। অকালমৃত্যু। যবনের দেশে।

থাকি বিহারে। এক অখ্যাত সহরে। ছাপরা। কলকাতার চোখে যা দরওয়ানের দেশ। করি ওকালতী। স্বাধীন ব্যবসা। জীবন-যুদ্ধে স্থির হয়ে দাঁড়াবার খুঁটি। অবসর সময়ে সাহিত্য। সাহিত্য আমার সখ নয়। সাহিত্য আমার জীবন। সাহিত্য আমার সাধনা। সাহিত্যের মধ্যেই আমার জীবন-

ধারা প্রবাহিত।

আজ ১৯৭৮ সাল প্রায় শেষ। সাত-আট মাস হ'ল বাহাত্তরে পড়েছি।

কাটিহারে আছে এক অতি প্রসিদ্ধ কালীবাড়ী। বিহারে কালীপুজোর চলন নেই। ওটা বাঙ্গালীদেরই পুজো। কিন্তু বিহারের এই ছোট সহরে দেখছি এক কালীমন্দির। পুজোও চলেছে। সাত সকালেই অগণিত অবাঙ্গালী ভক্তের দল। কেউ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। কেউ মুহু র্মুহু ঠোঁট নেড়ে চলেছে। কেউ মাটিতে মাথা ঠেকিয়েই আছে। কেউ টিপ টিপ করেই প্রণাম করেই চলেছে। কেউ প্রদক্ষিণ করছে। বিহার রামভক্ত। এখানে তুলসীদাসের "রামচরিত-মানস" ও "হনুমান-চালিশা"রই প্রভাব।

অতীতের মৈথিলী-বাঙ্গালীতে অতিরিক্ত মাথামাখি ছিল। বর্তমানেও বাঙ্গালীর কালীপুজা এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ পরিবারের পারিবারিক পূজাই। রাত এগারোটার পরে পরিবারের লোকেরা আসেন পূজা করতে। তখন জনসাধারণের আগমন নিষিদ্ধ। বাঙ্গালী বিহারী কথাগুলোর মানে কি? চৈতন্যদেব, বিজয়কৃষ্ণ, কি আসেন নি গয়ায় একদিন? ঈশ্বরপুরী ও মানস সরোবরের পরমহংসজী কি বাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথ কি ব্রজবুলি ব্যবহার করেন নি? সংস্কৃতই ছিল জাতীয় ঐক্যের মূল। সর্ব্বভারতের ভাষা। কেরালার শঙ্কর কি মিথিলার মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী সারসবাণীর কাছে কামশাস্ত্রের আলোচনায় পরাজয় স্বীকার করেননি? যদিও পরে সারসবাণী শঙ্করের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের ভাষাটা কোন ভাষা ছিল?

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী ৩১শে মে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তৈরী। এই মন্দির তার চেয়ে অনেক পুরানো। একায়োটা মোষবলির গল্প এখনও লোকে করে থাকে। দেখলাম সামনেই রয়েছে যূপকাষ্ঠ। নিয়মিত ব্যবহৃতও হয়। সিঁদুর-মাখানো। সকালবেলা বেড়াতে বেড়িয়েছি। মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিতও হয়েছি। দেবীকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। চলে এসেছি। পেছন হাটকাতে হাটকাতে। হঠাৎ যূপকাষ্ঠের ওপরই পড়ে গেছি। একেবারে চিৎ হয়ে। হাত পা ভাঙ্গল না। কিন্তু রক্তপাত হল। আর চলে আসতে পারলাম না। এর নিহিতার্থ আমায় জানতেই হবে। জুতো খুলে মন্দিরের বারান্দায় উঠতেই হল। এবার দেবীকে দেখতে পেলাম। কালো পাথরের মূর্তি। সোনার চোখদুটো। জ্বলছে ধ্বক্ ধ্বক্ করে। বলছে—কেমন? পারলে চলে যেতে? আমি শুধু ঐতিহাসিক কৌতুহল মেটাবার দ্রব্য মাত্র নই। সাংস্কৃতিক গবেষণার বস্তু মাত্র

নই। সাংস্কৃতিক গবেষণার বস্তু মাত্র নই। আমি শক্তি। আমি চৈতন্য। বিশ্বচৈতন্যের এক কণা। ইংরিজীতে বললে ভাল বুঝবে। Cosmic consciousness! Primordial Force! Supreme Being-এর অধিষ্ঠান আমারও ভেতরে। বুঝলে?

একদিন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবেদিতাকে বলেছিলেন—মূর্তিপূজা করতেই যদি হয়, এই বীভৎস কালীমূর্তির পূজা করা কেন? নিবেদিতা বলেছিলেন আমি ত মূর্তির পূজা করি না। মহাকালের গতিতে আর একটা ছবি ভেসে ওঠে। তারই পূজা করি। ঠিক মহাকাল। এই মূর্তি হ'ল মহাকাল। বিজ্ঞান যাকে বলে four dimensional curved space-time continuum। বিবেকানন্দ যাকে বলেন—Perfect manifestation of divine power। কলয়তি ইতিকালঃ। তাই এর নাম কালী।

জ্যেষ্ঠ পুত্র কলকাতা থেকে এসেছিল। কনিষ্ঠা কন্যা পাটনা থেকে। যূপকাষ্ঠের ওপর পড়ে যাওয়ার কথা কাউকেই বললাম না। তবু দেখি, সকলের হঠাৎ মত হয়ে গেল আমায় কলকাতায় যেতেই হবে। আমি নাট্যকার। জীবন-নাট্যের দর্শককে আমি দেখেছি। অতএব আমি সতত নাট্যাভিনয়ই দেখে থাকি। এখনও দেখছি।

দার্জিলিং মেলে স্লিপারে ঘুমোচ্ছি। ছেলে বললে-ওঠো। এখানে নামতে হবে। দেখি সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু একি! সামনেই যে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী। শেয়ালদা কোথায়? বলছে এসো। কালীবাড়ীর যূপকাষ্ঠে যা দিয়েছো, এখানকার হাসপাতালে তাই কিছু দিয়ে যাও। বললাম কেন? বললে-প্রারব্ধ। বললাম—বেশ। দেব। বাগবাজারে এসে ছেলের তেতালার ফ্ল্যাটে উঠলাম। তখনো তমসাচ্ছন্ন চারদিক। ভোরের পাখীরা ডাকতে আরম্ভ করেছে।

চলল স্পেশালিষ্ট আর স্পেশালিষ্ট। হাসপাতালের আউট-ডোর আর ইন্-ডোর। সকাল। দুপুর। লাইনে দাঁড়ানো। চুপ করে বসে থাকা। হাঁ করে গলা দেখানো। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলা। ই ই শব্দ করা। ঝকমারী। অবশেষে সাব্যস্ত হল, অপারেশন করাতেই হবে।

দেখছি আমি ছাড়া একটা বিরাট শক্তি আমার অজ্ঞাতসারে অনবরত কাজ করে চলেছে। হাসপাতাল আমার চোখে আঙুল দিয়ে এই সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিল। মহাশক্তি ব্যষ্টি রূপে শরীরী। আমি ব্যষ্টি হলেও সেই মহাশক্তিরই

অংশ। উত্তম। ভাল কথা। সেই শক্তির ওপরই নির্ভর করলাম। আমি ছাড়া আর একটা যে বৃহত্তর শক্তি।

তখনো হাসপাতলে ভর্তি হইনি। কনিষ্ঠা কন্যা কলকাতা এলো। দক্ষিণেশ্বরে যেতে চাইলো। দেখি আমিও সহযাত্রী হয়ে পড়েছি। বিরাট মন্দির। পাশেই গঙ্গা। রাণী রাসমণির তৈরী। রাণীর জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিন্দু স্কুলের সহপাঠী। রামকৃষ্ণ খালি গায়ে খেতে আসবেন শুনে নেমন্তন্ন নাকচ করে দিয়েছিলেন যিনি। নিজে যদিও ছিলেন একদিনকার দেউলিয়া। আজ তাঁর বসতবাটী ঋণের দায়ে নিলাম হয়ে গেছে। আজ বিধর্মী বিদেশী রোমাঁ রোলাঁ রামকৃষ্ণের কি মূল্যায়ন করলেন ? আজ দেবেন্দ্রের বিশাল জমিদারী কোথায় ? পূর্ববঙ্গে ও উড়িষ্যায় ! সবশেষে। তাঁর বোলপুর ? দিল্লীর পদানত। একদিনকার অহঙ্কারের এই মূল্য। দেহটা ঢাকা অথবা অঢাকা, তার ওপর কি নির্ভর করে ?

মন্দিরে বিশেষ কিছুই পেলাম না। দ্বাদশ শিবের পর বিশেষত্ব বড় আর কিছু নেই ত। বেলুড়েও তাই। পূজার ব্যবসা। সেই ভিড়। সেই ফুল আর নৈবেদ্যের হিড়িক। রামকৃষ্ণের পূর্বে যেমন ছিল প্রাণহীন অনুষ্ঠান। রামকৃষ্ণের পরেও তাই। সেই পূজারী। সেই তকমা আঁটা পাহারাদার। সেই মিষ্টির দোকান। চায়ের দোকান। মনোহারী দোকান। মেলা চলছে। অহোরাত্রব্যাপী। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মন বলছে এই মূর্তি পূজা করেই ত একটা লোক বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেল। হুগলী জেলার অতি ক্ষুদ্র একটা গ্রাম। কলকাতা থেকে নিরানব্বই কিলোমিটার। কামারপুকুর। তার এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ। ক্ষুদিরাম চাটুজ্যের ছেলে। গদাধর। চন্দ্রাদেবীর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসের সন্তান। গদাধরের স্ত্রী সারদা। জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুকুজ্যে ও শ্যামাসুন্দরীর নিরক্ষর মেয়ে। পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। উনিশ বছরের বড় স্বামী। বাঁকুড়া জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামের এই মেয়েটি। আজ অমর। এই ত সেই মূর্তি। এ মূর্তিতে কি ছিল ? বা আছে এখনও ? কিন্তু একে অবলম্বন করেই ত একজনের হৃদ্‌পদ্ম ফুটে উঠল। জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। সমস্ত কিছু সেই ব্যক্তির নিজের ভেতরেই ছিল। বিকাশ পেল। কঠিন সাধনায়। তোতাপুরীর স্পর্শে। ভৈরবীর প্রেরণায়। পঞ্চবটির মূলে। পঞ্চমুণ্ডির আসনে। গঙ্গার নির্জন তটে। এই ত সেই গঙ্গা। এই ত সেই পঞ্চবটি। এই ত সেই মন্দির। কিন্তু প্রাণ কই ? সাধনা কই ? তপস্যা কই ?

মহাপুরুষ যে ঘরে শয়ন করতেন, সে ঘরেও গেলাম। সেখানেও বিশেষত্ব কিছুই পেলাম না। খাট বিছানাতে কি আছে? কিন্তু জীবনী শক্তি আছে কথায়। তার পরিচয় পেলাম। দেওয়ালে টাঙানো কিছু উক্তিতে। হাঁ করে চেয়ে রইলাম সেইদিকে। লেখা রয়েছে 'প্রকৃত জীব কি? আত্মস্মৃতি।" ব্যাস। হয়ে গেল। এখানে আসা সার্থক হল। লিখেছি জীবন সঙ্গীত। আত্মস্মৃতি। কিন্তু তাকে প্রকৃত জীবন বলে কখন মনে হয়নি। শব্দ শক্তি এক অপূর্ব শক্তি। তাই শব্দ ব্রহ্ম বলা হয় তাকে। আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। শব্দ শক্তির অপপ্রয়োগ করতে পারি না। তাকে আরও তীক্ষ্ণ মুখ করতে পারি শুধু।

১৩ই ফেব্রুয়ারী। বাগবাজার স্ট্রীটের ওপর তেতালায় দাঁড়িয়ে নীচের জনস্রোত দেখছি। সরস্বতী মূর্তি ভাসানের শোভাযাত্রা চলেছে। চলেছে হাজার হাজারে। মূর্তির পর মূর্তি। সত্যিই শোভাযাত্রার দেশ বটে কলকাতা। জয়ধ্বনিরও দেশ বটে।

অবশেষে একদিন অপারেশন হয়ে গেল। সিস্টার ওষুধের গ্লাস এগিয়ে দিলেন। পাশের ঘরে গলা ধুতে গেলাম। দেখি বেসিনে এক ফোঁটা রক্ত। কাটিহারে একদিন যেমন দেখেছিলাম। এক ফোঁটা মাত্র। দিতেই হল। প্রারব্ধ যে। ডাক্তার কি একটা প্রশ্ন করলেন। জবাব দিতে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখি আওয়াজ আগের মতই হয়ে গেছে। ডাঃ সত্যব্রত সরকার সত্যিই যাদুকর।

জীবন-সঙ্গীত যখন লিখি, তখন ভাবিনি তা বই হয়ে বেরুবে কোনদিন। কিন্তু বেরুচ্ছে। যাঁরা কষ্ট করে পাণ্ডুলিপি শুনেছেন, নানাবিধ মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, তাঁদের এ সময় ভুলতে পারি না। তাঁরা হলেন রামপরায়ণ রায়, রমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার গোস্বামী, অমিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল মুখোপাধ্যায়, কালু মিত্র, ফণী সাহা, বিহারী অ্যাডভোকেট বন্ধু জিতেন্দ্রনারায়ণ শর্মা। প্রতিদিন বার-লাইব্রেরীর নীরস মুহূর্ত, যাঁর সঙ্গে সাহিত্যালোচনায় সরস মুহূর্ত হয়ে উঠত। দেবকুমার বসুকে অজস্র ধন্যবাদ। সম্পাদনার কঠিন কার্য তাঁরই। প্রুফ দেখার ক্লান্তিকর কার্যও। তাঁর বন্ধুরাও ধন্যবাদের যোগ্য। নিঃস্বার্থ পরোপকার করবার মত লোক বাংলাদেশে এখনও শেষ হয়ে যায়নি। পাঠকের প্রাণকে মনকে যদি জাগাতে পারি, শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। আপাততঃ তিন পর্ব প্রকাশিত হচ্ছে। জাগরণের লক্ষণ যদি দেখতে পাই, আরও দু'পর্ব প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জীবন-সঙ্গীত

[প্রথম পর্ব]

আমাদের শাস্ত্রে আছে, শিল্পকলার দ্বারা শিল্পী নিজেকে ছন্দোময় করে তোলে। "ছন্দোময়াত্মানং কুরুতে"। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)। আমিও সারাজীবন শিল্পচর্চা করেই প্রায় কাটিয়েছি। জীবন আজ আমার কাছে সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। অথচ একদিন ছিল প্রশ্ন।

প্রশ্ন ছিল, মানুষ কি চায়? সদা-সর্বদা পেছনে পেছনে তাড়া করে করে বেড়াচ্ছে এই যে দুঃখ-রূপ বিকট তাড়কা-রাক্ষসী, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? কি ভাবে? কেমন করে? জীবনযাপনের মধুর রহস্য কোথায় লুকানো আছে? আমার আত্ম-জিজ্ঞাসার ফল, সত্যিকারের জীবন-জিজ্ঞাসুকে জানিয়ে দিতে চাই। আমার অজ্ঞানতার পর্বত-প্রমাণ "পিচব্লেণ্ডের" ভেতর লুকিয়েছিল আমার একটুখানি "রেডিয়াম"। আজ ধন্যবাদ দিই আমার আবিষ্কারক সত্তাকে। আমার রেডিয়ামকে আমি আবিষ্কার করেছি। আমার আত্মাই আমার রেডিয়াম। সাহিত্য আমার চেতনার স্রোতস্বতী। অসংখ্য বাধা-বিপত্তি ঠেলে সে এগিয়ে চলেছে। সেই চলার কাহিনীই আমার জীবন-সঙ্গীতে। আত্মাকর্তৃক নির্ধারিত। মস্তিষ্ক দ্বারা নয়। বুদ্ধির অতীত। যুক্তির অতীত। অনুভব দ্বারা উপলব্ধ। শব্দের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

আমার ছিল অনুসন্ধিৎসু মন। দেখবার চোখ। শোনবার কান। জানবার উৎসাহ। আমার এই আমি জিনিসটা হঠাৎ একদিন আকাশ থেকে টুপ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়েনি। এমন কি মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসার মুহূর্তই তার আসল জন্মমুহূর্ত নয়। পেছনে অতীতের অনন্ত পিতৃবংশ রয়েছে। অসংখ্য পূর্বপুরুষ।

শরীরের বার বার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শরীর আর একটা শরীর সৃষ্টি করে, তবেই শেষ হয়েছে। পতাকা নিয়ে ছুটছে যেন দৌড়-প্রতিযোগিতায় অসংখ্য প্রতিযোগী। (রিলে রেস)। ছুটছে অসংখ্য chromo-some (বংশাণু)। Gen DNA। প্রাণ-মন্দাকিনীর ধারা। বংশ-পরম্পরা। protoplasm hormone enzyme। দেখতে পাচ্ছি, ভবিষ্যতের অনন্ত সন্তান-বংশ। সন্তানের পর সন্তান। তারও সন্তান। যারা এখনও জন্মায়নি। তারাও।

আমার একটা ধারাবাহিকতা আছে। একটা অবিভক্ত জীবনস্রোত। দীর্ঘ ইতিহাস। দীর্ঘ ভবিষ্যৎ। এই বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে, সামান্য একটু অহমিকা বিশিষ্ট, আমার এই আমি। এই আমার অস্তিত্ব। আমার বর্তমান। একে নিয়েই আমার সুখ ও দুঃখ। আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমি আনন্দও পাচ্ছি। কষ্ট পাচ্ছে কে ? আনন্দ পাচ্ছে কে ? আমার অনুভূতি। কিন্তু আমার অনুভূতিটাই ত আমার সবকিছু নয়। আমার অনুভূতির পরপারেও আর এক আমি আছি। এক শান্ত, সমাহিত, নিস্তব্ধ, নির্লিপ্ত, আমি।

একদিন ভেবেছিলাম জীবন-নদীর প্রতিটি কূলই বুঝি প্রতিকূল। আজ দেখছি কিছুই প্রতিকূল নয়। সবই ছিল আমার দেখার ভুল। আজকের এই দৃষ্টি আমি পেলাম কি করে ? সত্তর বছর সময় লাগল। এই দৃষ্টি পেতে। এই দৃষ্টি আমার জীবনকে আজ সঙ্গীতের মত সুন্দর করে তুলেছে। ছন্দোময় করে তুলেছে। আনন্দময় করে তুলেছে। নিরানন্দের বাষ্পও আর কোথাও নেই। আমার আত্মার এই হল অবদান। শ্রেষ্ঠ অবদান। তৃপ্তি। আনন্দ। শান্তি।

কিছু বাল্য ইতিহাস দিয়েই সুরু করি। আমার বংশধরগণ, উত্তরাধিকার-সূত্রে আমার প্রভাব পান অথবা না পান, একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে আমার প্রভাব তাদের ওপর যে পড়ছে, তাতে সন্দেহ নেই। আমার ওপর পারিপার্শ্বিকের কোন প্রভাব

সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে? নিশ্চয়ই এক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব। এক বুর্জোয়া মানস। হ্যাঁ আমি এক অননুতপ্ত বুর্জোয়া। ফরাসী বুর্জোয়া কথাটার মানে মধ্যবিত্ত। আমি তাই। আমার পূর্ব-পুরুষরাও তাই।

আমার পিতা বি, এ, ; বি-এল। পিতামহ বি, এ, ; বি-এল। সে যুগের প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়ানো হত। একশো বছর আগেকার তাঁর আইনের বই (Macpherson-এর লেখা The procedure of the civil courts) এখনও আমার কাছে আছে। তিনি ছিলেন বাঁকুড়ার গবর্নমেন্ট প্লীডার। দীর্ঘকাল মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানও। আমার মাতুলও ছিলেন এম, এ, বি-এল। শিক্ষার অভিমান আমার উভয়-কুলেই। জন্মও আমার ভরদ্বাজ গোত্রে। ব্রাহ্মণ কুলে। এই হল আমার ওপরে আমার পারিপার্শ্বিকের প্রভাব। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের স্বর্ণযুগের এক প্রত্যক্ষদর্শী আমি। বোধ হয় তার শেষ সাক্ষী। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মাইকেল, দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলালের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন এসেছে বিক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট এক মধ্যবিত্তের যুগ। অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে গেছে। প্রত্যেকেই আজ যেন অসুস্থ। অপ্রকৃতিস্থ। অস্বাভাবিক। ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ ছিল বাংলার যুগসন্ধি। ১৮৫০ থেকে ১৯২৫ ছিল বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের স্বর্ণযুগ। বাঙ্গালী ইতিহাস চেতনাহীন, আত্মবিস্মৃত এক জাতি। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের সেই স্বর্ণযুগের পর অর্ধ শতাব্দী কেটে গেছে। আজ ১৯২৫ সালে দেখছি, রক্তহীন, নিষ্প্রাণ, মৃতপ্রায় একটা বাঙ্গালী জাতি। সর্বতোভাবে নিঃশেষিত।

আমি বাঙ্গালী। কিন্তু বিহারেই আছি। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা করতে আসেন নি? আমিও তাই এসেছি। আমার জ্ঞানদৃষ্টি যখন প্রথম খুলছে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়েছে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত যুদ্ধ হল।

বস্তুতান্ত্রিক পাগলামির এক জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস। ইউরোপ পাগল হয়ে গেছে। এক দাম্ভিক কাইজার তাকে পাগল করে তুলেছে। এক pocket battleship "Emden" সারা পৃথিবীর শান্তি বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আমি তখন ছাপরায়। তারপর পাটনা। এক বৎসর পরে পুরী। আমার পিতা তখন রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন পাটনার প্রথম সাবজজ। বাকী জীবনটা পুরীতে কাটাবেন বলে স্থির করেছেন। এক নিশ্চিন্ত অবসরভোগী, পেনসন্‌প্রাপ্ত, রাজপুরুষ। আমার মাতুল তখন পুরীতে মুনসেফ। মুনসেফ কোয়ার্টারেই থাকেন। কাছেই একটা দ্বিতল বাসগৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। আমরা সেখানেই উঠেছিলাম।

মাতুল মহাশয় লেখক ডাঃ ভবানী ভট্টাচার্যের পিতা। তাঁর বাড়ীর পাশে আমার পিতাও গৃহ নির্মাণ করালেন। অদূরে গান্ধী সহচর নির্মলকুমার বসুর পিতাও গৃহ নির্মাণ করলেন। নাম দিলেন 'সুধাসিন্ধু' তিনি ছিলেন অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন। তাঁর ও আমাদের বাড়ীর মধ্যে গৃহ নির্মাণ করালেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতা। কটকের সরকারী উকিল রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু। নাম দিলেন 'জগন্নাথ ধাম'। পর পর চারখানা দোতলা বাড়ী। কোর্টের কাছেই। সুন্দর পরিবেশ। কাছেই নীল সমুদ্র। সদা সর্বদা মুক্ত হাওয়া বইছে। নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখী জীবন। সেই মধ্যবিত্তের যুগ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু অতীত বড় গোলাপী। অতীত কখন মরে না। সময় যাকে অপহরণ করে, স্মৃতি তাকেই ফিরিয়ে দেয়—দিচ্ছেও। স্মৃতি রোমন্থনই করছি।

যদি আমায় জিজ্ঞেস করা হয় আমার ওপর সে সময় সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছিল কার, আমি বলব ৺নির্মলকুমার বসুর। পুরী জিলাস্কুলের ছাত্র। ম্যাট্রিকে সেকেণ্ড হয়েছিলেন। পুরী জিলাস্কুল তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্তর্গত। নির্মলদার যেমন সুগঠিত দেহ, তেমনি ছিলেন তুলনাহীন ক্রিকেট খেলোয়াড়। তাঁর বোলিং

আমি হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখেছি। নির্মলকুমার এক নিমেষেই আমার আদর্শ হয়ে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর পিতার মৃত্যু হল। তিনি ছিলেন একমাত্র পুত্র। চলে গেলেন কলকাতায় পড়তে। মাঝে মাঝে আসেন পুরীতে। বয়সে আমাদের চেয়ে বড়। গম্ভীর, রাশভারী মানুষ। কথাবার্তা কম বলেন। আমরা তাঁকে দুর থেকেই শ্রদ্ধা করি। কাছে ঘেঁসতে সাহস হয় না। তাঁর প্রশস্ত ললাট। দৃঢ়নিবদ্ধ অধর। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। নেতৃত্বের রাজমুকুট পরেই যেন জন্মেছেন। জন্ম-মুহূর্তেই ব্রহ্মা ললাটে লিখে দিলেন শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষত্ব।

এলো ১৯২০। হঠাৎ দেশ কাঁপিয়ে অসহযোগের আন্দোলন গর্জে উঠল। এক গান্ধীর নাম সকলের মুখে মুখে। আমাদের সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা গান্ধীকে ব্যঙ্গ করতেই লাগলেন। বললেন, গান্ধী মানে কি ? গন্ধ পোকা। দুর্গন্ধ ছড়ায় শুধু। সেই গান্ধী সমুদ্রের তীরে একটা বাড়ীতে এসে উঠলেন। সঙ্গে স্ত্রী কস্তুরবাঈ। জনসাধারণের কি উৎসাহ। চারদিক থেকে সম্মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনি উঠছে—মহাত্মা গান্ধীর জয়। আমরা বিস্মিত হচ্ছি। ভাবছি স্কুলের শিক্ষকরা যাঁর এত নিন্দা করছেন, জনসাধারণ তাঁর এত প্রশংসা করছে কেন ?
মহাত্মা গান্ধী আমাদের বাড়ীর কাছেই উঠলেন। গেটের সামনে লোকের পর লোক। আমি স্কুলের ছাত্র। ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক। ধীরে ধীরে জেম কটেজের দোতালায় উঠে গেলাম। একটা বৃহৎ ঘরের মেঝেতে ঘরজোড়া সতরঞ্চি। গান্ধীজি মাঝখানে বসে আছেন। আশেপাশে অনেক লোক বসে আছে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। গান্ধীজি ঘাড় নীচু করে লিখে যাচ্ছেন। তখনও কটিবাস পরিহিত, নগ্নদেহ, ফকির হননি। গান্ধীজি লিখেই যাচ্ছেন। কারো সঙ্গে কোন কথা বলছেন না। তিনি লিখেই চলেছেন। আমি চেয়েই রয়েছি। তিনি ঘাড়

তুলছেন না পর্যন্ত। রোগা গড়ন। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং। সাধারণ এক মধ্যবয়সী পুরুষ। স্বাস্থ্য গর্ব করবার মত কিছু নয়। গায়ে একটা ফতুয়া। মাথায় ছোট টুপী। পরণে সাদা ধুতি। নীরব, নিস্তব্ধ, স্থির। লেখা শেষ হচ্ছে আর প্যাডের কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে পাশে রাখছেন। একটার পর একটা। একজন সেটা গুছিয়ে রাখছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। হৈ-চৈ নেই। উত্তেজনা নেই। হট্টগোল নেই। এ কি রকম নেতা? দেশনেতা কথা বলবে অনবরত। গরম গরম বুলি ছিটকোবে মুখ থেকে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মত। তবেই তো নেতা। এ কি রকম নেতা? শুধু মুখ বুজে খচ্ খচ্ করে লিখেই চলেছেন? এ রকম মানুষ তো দেখিনি। সাধু-সন্ন্যাসীরা এ রকম হয় শুনেছি। দেশনেতা এত মৌন কেন? এই মৌন ব্যক্তি এত উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে কি করে?

সেই আমার প্রথম বিস্ময়। আজ বুঝছি সেদিনকার সেই মৌন পুরুষটি কি প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী! দেশে একটা ভূমিকম্প এনেই ছাড়লেন। তখন কিন্তু বিরক্তিই লাগল। চলে এলাম। কিন্তু মনে মনে বলতে লাগলাম ইনি সকলের থেকে স্বতন্ত্র। কথা বলেন না। শুধু কাজ করে যান। কি কাজ? লেখা। তাহলে লেখাও একটা কাজ লেখা দিয়ে দেশে ঝড় বইয়ে দিতে পারা যায়? একটা মিনিটও সময় নষ্ট করেন না। এঁর প্রভাব আমার ওপর পড়তে বাধ্য। তারপর ছাপান্ন বৎসর কেটে গেছে। এই ব্যক্তিই অবশেষে অনেকের সাহায্যেই স্বরাজ এনে ছেড়েছেন। দেশের নেতা ইনিই। ব্রহ্মচর্যব্রতধারী, কটিবাসপরিহিত, নিরামিষাশী, অত্যুৎকৃষ্ট ইংরাজীর লেখক, এক বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিস্টার। জন্মে গুজরাতী বেনিয়া। কর্মে ব্রাহ্মণের চেয়ে এক তিল কম তপস্বী নন। ইংরিজীতে বলে, roaring clouds seldom rain! barking dogs seldom bite। যে গভীর, সে নীরব। এই প্রথম নীরবতার শক্তি দেখলাম। একটা ঘড়ি সর্বদা তাঁর কাছে।

ইংরেজের কাছে শিখেছেন সময়ানুবর্তিতা। টলস্টয়ের সঙ্গে আফ্রিকা থেকেই পত্রালাপ চালিয়েছিলেন। টলস্টয় এঁকে চিঠির উত্তরও দিয়েছিলেন। মৃত্যুর দুই মাস আগে। অর্থাৎ সাতই সেপ্টেম্বর ১৯১০ সালে। সেই চিঠি ২৪শে মে ১৯৭৬ সালে লণ্ডনে আটাশ হাজার স্টার্লিং-এ বিক্রী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এঁকে মহাত্মা বলে সম্বোধন করেছেন। গীতার উপদেশ ইনি নিজের জীবনে জীবন্ত করে তুলেছেন। এক কথায় ভাল লাগল এই শীর্ণ দেহ, ক্ষীণকায়, সংকল্পে অটল, নির্বাক মানুষটিকে।

এঁর স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধীকেও দেখলাম। জেম কটেজের গেটের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতিপয় মহিলার সঙ্গে আলাপ করছেন। অতি সাধারণ মহিলা। গৌরবর্ণা। বেঁটে। কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া। সাড়ীটা সিল্কের নয়। রঙীন নয়। সাদা। অতিরিক্ত মোটা সুতো। এই নাকি খদ্দর। সাড়ী পরাটা একটু অন্য ধরনের। মহিলাদের সম্বোধন করে বলছেন সংক্ষেপেই,—উস্‌কা বাত শুনো। উস্‌কা বাত শুনো। বলে ওপরের দিকে হাত দেখাচ্ছেন। আমি চেয়ে চেয়ে তাঁকে দেখতে লাগলাম। ইনি স্বামীর জীবন পথের সহচরী। স্বামীর মনোবৃত্তি অনুসারিণী। এঁরা অর্থ পাচ্ছেন কোথা থেকে? এতদূরে এলেন কিসের প্রেরণায়? কি এঁদের শক্তি দিচ্ছে? উত্তর পেলাম আদর্শ। পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে হবে। জীবনের একটা নতুন দিক দেখলাম। চাকরী নয়। অর্থ নয়। জীবনে একটা আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বলিষ্ঠ আদর্শ। তার জন্যে কিছু ত্যাগ স্বীকারও করতে হবে। কিছু স্বার্থত্যাগও।

কিছুদিন পরে নির্মলদা কলকাতা থেকে এলেন। কিন্তু আর পড়তে গেলেন না। বললেন, নন্‌-কো অপারেশন করেছি। কলেজ ছেড়ে দিয়েছি। গান্ধীজির চেলা হয়েছি।

বললাম—কি করবে এর পর?

বললেন—চরকা কাটব। তাঁত বুনবো। 'চরকা-সংঘ খুলবো।

গান্ধীজির বাণী প্রচার করব।

চেয়ে দেখলাম তাঁর পোষাকের পরিবর্তন। আগে সাদা একটা টুইলের সার্ট পরতেন। মিলের ধুতি। পায়ে একটা টেনিস জুতো। তাইতেই ওঁর কাজ চলে যেত। এখন দেখলাম পরনে খদ্দরের ধুতি। মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবী। পায়ে চপ্পল।

একদিন ওঁর বাড়ী গিয়ে দেখি, চরকা কাটছেন। নতুন জিনিস দেখে আশ্চর্য হলাম। পাশে এসে বসলাম। উনি চরকা কেটেই চলেছেন। কি সুন্দর সুতো তৈরী হচ্ছে। এর থেকে ধুতি হবে? পাঞ্জাবী হবে? প্রায়ই দেখি নির্মলদা বাড়ীতে বসে চরকা কাটছেন। বাড়ীতে ওঁর বিধবা মা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি নেই। উনি ভীষণ বিরক্ত। বলছেন – কি লাভ হবে এতে ভগবান জানেন। পড়াশুনো ছেড়ে দিল। গান্ধীর চেলা হয়েছেন। ছাই হয়েছেন। জাতির জীবনে সেই এক যুগসন্ধিক্ষণ। একটা যুগ শেষ হল। ইংরাজ-সেবার যুগ। আর একটা যুগ সুরু হচ্ছে। ইংরাজ বিরুদ্ধতার যুগ। তার প্রধান অস্ত্র চরকা। একটা পরস্পরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখতে পেলাম সে শুধু একটা পারিবারিক দ্বন্দ্ব ছিল না। দুই কালের মানসিকতার দ্বন্দ্ব ছিল। দুই যুগের সংঘর্ষের চিত্র ছিল। "সুধাসিন্ধু"তেও ক্ষণে ক্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগল। সুধা নয়, গরল উথলে উঠতে লাগল।

তারপর সুদীর্ঘ ছাপান্ন বছর কেটে গেছে। সেদিনের ভাবাদর্শের ছোট চারা গাছটি আজ বিরাট এক বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আমরা বাঁচছি। আজ আমরা স্বাধীন। কি সুন্দর। নির্মলকুমার আসলে ছিলেন জ্ঞান-পিপাসু। শুধু চরকা কেটে তাঁর কি কখন দিন কাটে? পড়ছেন বসে বসে বার্টাণ্ড রাসেল। গান্ধী আর বার্টাণ্ড রাসেল। একদিন দেখি পড়ছেন ফ্রয়েড। সাইকো অ্যানালিসিস। নির্মলদা করছেন কি? চরকার সঙ্গে বার্টাণ্ড রাসেল? ফ্রয়েড?

একদিন সমুদ্রের ধারে আমাদের নিয়ে গেলেন। হাতে থলি। জলের নীচ থেকে জীবন্ত জোড়া জোড়া ঝিনুক তুলছেন। নানা প্রকারের কাঁকড়া। সব থলিতে ভরে নিয়ে আসছেন বাড়ী। গড়ে তুলছেন ছোটখাটো একটা ল্যাবরেটরি। বোঝাচ্ছেন আমাদের—এটা পুরুষ কাঁকড়া। ওটা স্ত্রী কাঁকড়া। এই এদের নাম। এই এদের লাইফ-হিস্ট্রি। তিনি বোঝাচ্ছেন, আর দুর থেকে তার জননী গজ্ গজ্ করছেন। এইবার সুরু হল কাঁকড়া। চরকা ছেড়ে কাঁকড়া। বলিহারি!

একদিন আমাদের ছোট একটি দলকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে গিয়ে ধাবমান হরিণ দেখালেন। সাত মাইল যেতে হল। বাইনোকুলার ছিল তাঁর সঙ্গে। আমরা অবাক হয়ে তার ভেতর দিয়ে দেখছি। কি সুন্দর পাল পাল রঙীন হরিণ তীরের মত ছুটছে। হলদে হলদে হরিণ। চার মাইল দূরে একদিন ঝাউবনে নিয়ে গিয়ে ঝাউগাছও দেখালেন। কি সুন্দর তার পাতা। ঠিক যেন কাঠির মত। দূর থেকে ঝাউগাছকে সবুজই দেখায়। তাহলেও তার পাতা সরু সরু কাঠির মত। সমস্ত বিষয়েই আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করতে লাগলেন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডী পার হয়ে কোথায় যেন চলে যেতাম। বিস্ময়ই জ্ঞানলাভের প্রথম সিঁড়ি। আমরা বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকতাম।

একদিন একলা পদব্রজে কোণারক চলে গেলেন। আমরা অতদূর যেতে সাহস করলাম না। বাইশ মাইল যেতে। বাইশ মাইল আসতে। বাস ছিল না। বসতিও ছিল না তখন। একদিনেই যাওয়া-আসা সারতে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কি করে যাবে একলা? বললেন, সুভাষদা গিয়েছিলেন। সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্য বুদ্ধি সুভাষদার। আমাদের বুঝতে যেটা পাঁচ মিনিট লাগে। ওঁর সেটা বুঝতে লাগে এক মিনিট। কি sharp intellect! কি quick grasp! তখন সুভাষবাবু

আই-সি-এস হননি। বিলেতও যাননি। কিন্তু তখন থেকেই মনে মনে ভীষণ দেশভক্ত। যদিও তাঁর পিতা প্রবল রাজভক্ত। সুভাষবাবু তখন দেশের পুরাতন ঐতিহ্যে ঘোর বিশ্বাসী।

বীণা দাসের পিতা কটক স্কুলের শিক্ষক বেণীমাধব দাস, তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েই দিয়েছেন। দেশভক্তির বীজ অন্তরে বপন করেই দিয়েছেন। তিনি মন্দিরের স্থাপত্য সম্বন্ধে ভীষণ কৌতূহলী। দেশের শিল্পের পুনরুদ্ধারের প্রবল প্রয়াসী। সুভাষচন্দ্রের এই রূপ বেশী লোক জানে না। মাঝে মাঝে পুরীতে আসতেন। নির্মলকুমারের মতই তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য। রং আরো ফর্সা। নির্মলকুমারের অগ্রজ-তুল্য ছিলেন। নির্মলদাও সুভাষদা বলতে অজ্ঞান। আমার আদর্শ এখন দুজনেই। নির্মলদা এবং সুভাষদা।

একদিন নির্মলদা ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়ে বেড়িয়ে এলেন। কাঁধে একটা হ্যাভারস্যাক্। পরনে খাকী হাফ প্যান্ট। সাদা টেনিস্ জুতো। মাথায় সোলার হ্যাট। নিয়ে এলো থলিতে ভরে নানারকমের ছোট ছোট পাথরের টুকরো। নিজে পাহাড় থেকে হাতুড়ী দিয়ে ভেঙ্গেছেন। কোনটা Granite। কোনটা Sedimentary rock। আমাদের বোঝাতে লাগলেন। পৃথিবীর গড়ে ওঠার ইতিহাস। তাঁর Geology ছিল বি-এস-সি-তে। আমরা অবাক হয়ে Zoology, geology, archeology, psychology, শিখতে লাগলাম। জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যিকারের কৌতূহলী হয়ে উঠতে লাগলাম। পৃথিবী আমাদের কাছে এক পরমাশ্চর্য স্থান বলে মনে হতে লাগল। এত বিস্ময় এই পৃথিবীতে? এত সুন্দর এই পৃথিবী? একে জানতে হবে।

একদিন বললেন, চল, গোপবন্ধু চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে আসি। গোপবন্ধু চৌধুরী তখন উড়িষ্যার নেতা। গান্ধীভক্ত। সাক্ষী গোপালে গান্ধী-আশ্রম করেছেন। নিজেও সেখানে থাকেন। গান্ধীজির আহ্বানে সমস্তই ত্যাগ করেছেন। ওকালতী পেশাও। পুরী থেকে

তেরো মাইল দূরে যেতে হবে। সাইকেলে। আমার সাইকেল ছিল। কিন্তু ছাব্বিশ মাইল এক সঙ্গে কখনও চালাইনি। ভয় পেতে লাগলাম। নির্মলদা সাহস দিয়ে বললেন, চল। না পারলে আমি টেনে নিয়ে আসব। রাজী হতেই হল। কেবল বলেন মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। চেষ্টা কর। পারবে।

অতএব একদিন প্রভাতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সামনে নির্মলদা। পেছনে আমি। দু'জনে চলেছি সুমুখের পানে। দেখতে দেখতে তেরো মাইল অতিক্রম করলাম। সে অভিজ্ঞতা ভোলা যায় না। সামনে নির্মলদার খদ্দর-শোভিত পৃষ্ঠদেশ। মাংসবহুল পশ্চাৎদেশ। তিনি ঋজু হয়ে বসে। দুই হাতে হ্যাণ্ডেল। পা চালিয়েই যাচ্ছেন। থামবার নাম নেই। পেছনে ফিরে দেখবার প্রয়োজন নেই। নিশ্চিত জানেন, তাঁর অনুচর তাঁরই প্রেরণায় প্রদীপ্ত।

অবশেষে গান্ধী আশ্রমে এলাম। মাটির বাড়ী। খড়ের চাল। গোপবন্ধুবাবুকে দেখলাম। সরল, সাদাসিদে, ওড়িয়া ভদ্রলোক। মাঝ-বয়সী। পরণে খদ্দর। চারদিকে চরকা। নির্মলকুমারের সঙ্গে তাঁর কথা হল। আমার কোন আকর্ষণ ছিল না শোনবার। চারদিক শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। এই আশ্রম? কয়েকজন ভদ্রলোক আছেন। ভাবছি এঁরা চাকরি না করে এখানে কি সুখে আছেন? পিতাকে চাকরি করতে দেখেছি। মাতুলকে চাকরি করতে দেখেছি। চাকরি ছাড়া মানুষ যে আর কি করতে পারে, ভেবে পাই না। মন বলছে, হয়ত কোন রকম সুখ পাচ্ছেন নিশ্চয়। নতুবা আছেন কেন? চাকরিই যে একমাত্র সুখের জিনিস, তা নাও হতে পারে। আদর্শ বলেও একটা কথা হয়ত আছে। আদর্শের দিকে আমারও মন ঝুঁকতে লাগল। চাকরি? অথবা আদর্শ? কোনটা বরণ করব জীবনে? হঠাৎ গোপবন্ধুবাবু সহযোগীদের ডেকে বললেন, দেখ! এই দুটি বাঙ্গালী ছেলে পুরী থেকে এসেছে আমাকে দেখতে। সারা পথ সাইকেলে এসেছে। দেখতে এসেছে শুধু। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

আমার দেশের ছেলেরা আমায় দেখতে কেউ আসছে কি? বাঙ্গালী ছেলেদের হিংসে করলে কি হবে? বাঙ্গালীদের মত হতে হবে আগে। শ্রোতারা মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো। আমাদের নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমি খুশী হলাম। আমরাও তাহলে দর্শনীয় ব্যক্তি হয়ে গেছি। কৌতূহল উদ্রেক করছি? সাইকেল চালিয়েই শুধু?

কিন্তু এই সব কাজ করে কি নির্মলকুমারের জীবন কাটে? পুরীতে এলেন স্যার আশুতোষ। নির্মলকুমার পড়ে গেলেন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। স্যার আশুতোষ বললেন, এ তুমি কি করছ? তোমার মত ভাল ছেলে। এম-এস-সি পড়। খদ্দর খদ্দর কর। ভালই। চরকা টরকা কাটো। কিন্তু পড়াশুনো ছেড়ো না। উচ্চশিক্ষায় আগে শিক্ষিত হও। তারপর যা ইচ্ছে কোরো। এ বিষয়ে আমি গান্ধীজির সঙ্গে এক মত নই। তাঁর ছাত্রদের কলেজ ছাড়তে বলা আমি সমর্থন করি না। এর প্রায়শ্চিত্ত দেশকে একদিন করতেই হবে। ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত। দেখে নিও। বিদ্যা একটা শক্তি। তার বিনিময়ে রাজনীতি? সে কেমন রাজনীতি? সে বেনিয়ার রাজনীতি! ব্রেনের নয়।

আমি স্যার আশুতোষকে দেখে অবাক হয়ে যেতাম। বিশাল দেহ; বিশাল গুম্ফ। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং। অতি সাধারণ এক বাঙ্গালী। সমুদ্রের ধারে বসে আছেন একলা। বালির ওপরে। কত লোক পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ চিনতেই পারছে না। কে বলবে ইনি স্যার আশুতোষ। এঁর কত ব্যঙ্গচিত্র মাসিক পত্রিকায় দেখেছি। গুঁফো সরস্বতী বলে ইনি কত উপহসিত হয়েছেন। "নায়কের" সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গোক্তির স্থায়ী বিষয়বস্তুই ছিলেন। কিন্তু এঁর মানুষ চেনবার কি অসাধারণ ক্ষমতা। কাকে দিয়ে কোন কাজটি সর্বোৎকৃষ্টভাবে করানো যেতে পারে, তা যেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পান। ইনি যেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব যেন পরিষ্কার এর কাছে। নির্মলকুমারকে আবার কলেজে

ঢুকতে বললেন। অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাহুড়ীকে কলেজ ছেড়ে শিল্পের চর্চা করতে বললেন। সি, ভি, রমণকে অ্যাকাউটেন্ট-জেনেরালের অফিসের চাকরি ছাড়তে বললেন। তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তৈরী করলেন। ছাপরায় শরৎচন্দ্র রায়কে ওকালতী থেকে ছাড়িয়ে এনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের anthropologyর অধ্যাপক বানিয়ে দিলেন। জাতিগঠন কথাটার মানে কি? এ ছাড়া আর অন্য কি! আশুতোষ নব্য-বাংলার স্রষ্টা। শুধু বাংলা কেন নব্যভারতের কারু-শিল্পী। দুঃখ হয় যে তাঁকেও চাকরির শেষে ওকালতী করতে হল। ১৯২৪ সালে পাটনায় এসে দেহরক্ষা করতে হল। মাত্র ষাট বৎসর বয়সে। বিহারের বাঙ্গালীদের এ দুঃখ রাখবার জায়গা নেই।

নির্মলকুমার কলকাতায় গিয়ে আবার কলেজে ভর্তি হলেন। anthropology পড়তে লাগলেন! সুভাষবাবু আই-সি-এস হলেন। আই-সি-এস ছাড়লেনও। তিনি আই-সি-এস হয়েছেন। টেলিগ্রাম পেয়ে জানকীবাবু এত জোরে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে, যে তাঁর পেছনের চেয়ারটাই নাকি উলটিয়ে পড়েছিল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ওটেন্-পর্ব-খ্যাত বিদ্রোহী পুত্র. শেষে রাজার সমান শাসনাধিকার পেলো। একি বিশ্বাস হয় কখন? সুভাষ চীফ্ এক্জিকিউটিভ্ অফিসার হলেন। চিত্তরঞ্জন দাস কর্পোরেশনের মেয়র হলেন। সুভাষ ক্রমশঃ দেশবিখ্যাত ব্যক্তি হতে লাগলেন। তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্রও বিখ্যাত হতে লাগলেন। আমাদের কি আনন্দ! আমাদের প্রতিবেশী জানকীবাবুর দুই পুত্র, দেশের এত নামকরা লোক হয়ে পড়ছেন। আর কি চাই? তাঁদের গর্বে আমরাও যেন গর্বিত।

এই দুই দেশবিখ্যাত ব্যক্তির পিতা বৃদ্ধ জানকীনাথ খদ্দরের ফুলপ্যান্ট, খদ্দরের সার্ট পরে, ছাতা মাথায়, প্রতিদিন সকালে সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেরুতেন। আমি তাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। ধুতি পরে কখন বেড়াতে দেখিনি। ভাবতাম এত উগ্র সাহেবী-মনোভাব-পূর্ণ এই

ব্যক্তি ? খদ্দর পরবেন। কিন্তু প্যাণ্ট ছাড়বেন না। জানকীবাবু ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির, রাশভারী লোক। তাঁকে লোকে সম্ভ্রমও করত। ভয়ও করত। তাঁর স্ত্রী ছিলেন গৌরবর্ণা, স্থূলকায়া, বেঁটে সেঁটে মানুষ। মুখখানা অবিকল সুভাষবাবুর মুখের মত।

আজ ১৩৮৩ সালের ২০শে বৈশাখ। আমার জন্মদিন। জন্মেছি ১৩১৪ সালে। আজ আমি সত্তরে পড়েছি। সত্তর বৎসর আগে এক কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীতে রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় আমার জন্ম। দিনটা ছিল শুক্রবার। স্থানটা ছিল মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা। পিতা তখন সেখানে মুনসেফ। আমার মকর রাশি। ধনু লগ্ন। বৃহস্পতির দশা।

অনেক দীর্ঘকাল রইলাম এই পৃথিবীতে। আজ কৌতূহলী হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করছি আমার সত্য পরিচয় আমি কি পেয়েছি ? মন বলছে, পেয়েছি। তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন জাগে—কি আমার সত্য পরিচয় ? উত্তর পাই, এক সাহিত্যিক আমি। সত্তর বৎসরে আজ আমি একটি জিনিসই হয়ে উঠেছি। সাহিত্যিক। বাকী সবই আমার আংশিক পরিচয়। সাহিত্য রচনাই আমার নিজস্ব কাজ। আমার তৃপ্তি এইখানেই। আমার শান্তি এইখানেই। আমার সার্থকতা এইখানেই।

মানবমনের অতৃপ্তিই সৃষ্টি করেছে তার সাহিত্য। আমার মনের সব অতৃপ্তিই আমার লেখার ভেতর তৃপ্তি পেয়েছে।

আমার লেখার মধ্যে আমার জীবন-সত্য ফুটে ওঠে। যে সত্য আমার জীবনের অনুভবের সত্য। যা অব্যক্ত থাকে, তাই ব্যক্ত হয়। কোন কিছু নতুন করে তৈরী হয় না। যা আগে থেকে থাকে, তাই দেখা দেয় পরে। যা কোনদিন ছিল না, তা কোনদিন হয়ও না। যা আছে তার ধ্বংসও হয় না। এই হল বিজ্ঞান। শক্তি নষ্ট হয় না। রূপান্তরিত হয় শুধু। এমনকি মৃত্যুও শক্তির রূপান্তর মাত্র। মৃত্যুও সুন্দর। যস্য ছায়ামৃতং, যস্য মৃত্যুঃ। যার ছায়া অমৃত। যার মৃত্যু

অমৃত সেই আত্মজ্ঞাবরদা শক্তিকে কোন মন্ত্র দিয়ে পূজা করব ?

বুদ্ধ বলছেন—All things in nature, are unabiding

Birth, decay, their law is this,
They come together, they are formed,
Let them cease, there is bliss.

এই জগতের নিয়ম। সৃষ্টির লীলা। আমি তার থেকে স্বতন্ত্র নই। মানুষ বড় আশ্চর্য জীব। মানুষের চেয়েও আশ্চর্যজনক জীব আর কিছুই নেই। আকাশের গ্রহ তারা রবি শশীও নয়। electron, proton, newtron-ও নয়। সেই মানুষকে আমি বর্ণনা করতে বসেছি। আমার আমিকে। আমি-রূপ এই মানুষটাকে। আমারই জীবন-সঙ্গীত গাইতে বসেছি আমি। সঙ্গে সঙ্গে যত বিভিন্নপ্রকার মানুষকে দেখেছি, তাদেরও। মানুষই আমার সাধনার বস্তু। মানুষের মধ্যেই রয়েছে ঐশ্বরিক শক্তি। নিরন্তর কাজ করে চলেছে এই শক্তি। প্রত্যেক জীবনেরই কিছু মূল্য আছে। আমার জীবনে একটা জিনিসই অনুসন্ধান করছি। আমার আমিকে—।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—কার জন্যে লিখছি ? কাকে শোনাতে চাই এই লেখা ? তাকেই শোনাতে চাই, যে শুনতে চায়। যে একটু চিন্তা করতে চায়। যে নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। জানতে চায় কোথায় তার শক্তি। কোন পথ দিয়ে সে আত্মানুসন্ধান করবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আনন্দ হল আত্মবিকাশের আনন্দ। শিল্পী শিল্পরচনা করে আনন্দ পাবে। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করে আনন্দ পাবে। কৌতূহলী পাঠকও অপরের অভিজ্ঞতা দিয়ে, নিজের অভিজ্ঞতা যাচাই করে আনন্দ পাবে। আত্মদীপ্তির আলোতেই যথার্থ সুখকে চিনে নিতে পারবে। আনন্দ অনুসন্ধানের যাত্রা শুরু করবে। আনন্দলোকে সকলেই উত্তীর্ণ হতে পারে। আনন্দলোকে যাবার রাস্তা সকলের জানা নেই। তাই জানাতে বসেছি। অতএব আমি লিখতে বসেছি সেই পাঠকদের জন্যে যারা জীবনকে একটু তলিয়ে দেখতে চায়। যারা সামনেও দেখতে

চায়, পেছনেও দেখতে চায়, আশেপাশেও চেয়ে দেখতে চায়। জীবন সম্বন্ধে সত্যিকারের কৌতূহল মেটাতে চায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমি বলি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সব শেষ হয়ে যায় না, তাহলে তাকে একটা অসম্ভব উক্তি বলে উড়িয়ে দিলে, ঠিক হবে না। আজ radiant energy, electromagnetic radiation, alpha particle, beta particle neutron emission-এর যুগে কোন জিনিসকেই অসম্ভব বলে মনে করা চলে না।

কিন্তু এসব হল স্থূল জিনিস। এছাড়া একটা সূক্ষ্ম জিনিসও আছে। মানুষের একটা আত্মা আছে। সেটা দেখবার জিনিস নয়। সেটা দেহাতিরিক্ত জিনিস। সেই অনুভবের জিনিস। উপলব্ধির জিনিস। এই উপলব্ধির ওপর নির্ভর করেই হিন্দুর জন্মান্তরবাদ। কর্মফল পরিকল্পনা। দেখা যাক হিন্দুর এই মতবাদ বিজ্ঞান সম্মত কিনা। বিজ্ঞান আজ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে কোন কিছুকেই আর জোর করে অস্বীকার করবার সাহস তার নেই। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক Einstein বলছেন—Religion without science is lame. Science without religion is blind। কেন? অন্ধ কেন? কারণ বিদ্যুৎ-জিহ্ব ভোলতেয়ারের সেই বাণী—Religion started when the first kneve met the first fool, আজ অর্থহীন হয়ে গেছে। বিজ্ঞান আত্মা সম্বন্ধে নিরুত্তর থাকাই পছন্দ করে। হতেও পারে। নাও হতে পারে। বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে, এসব জিনিস। তবু আজকের অতি আধুনিক বিজ্ঞান আত্মার পরিকল্পনাকে সরাসরি গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে পারছে না।

তাহলে এবার নিজের জীবন দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করব, আত্মা, পূর্বজন্ম ইত্যাদি সত্যিই আছে কিনা। এ সম্বন্ধে আমার নিজস্ব উপলব্ধি কি? নিজের হাতে খড়ির কথা মনে পড়ে। আমার তখন চার বছর বয়স। পিতা তখন বর্ধমানে। মুনসেফ্। বাংলা ও বিহার পৃথক হয় নি। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। জ্যেষ্ঠ পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু, তাঁর

জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছিল। এক সিদ্ধপুরুষের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছিলেন। গোস্বামী মহাশয় (১৮৪১—১৮৯৯) প্রথম জীবনে ছিলেন ডাক্তার। পরে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারক। তারও পরে তিলক-তুলসীধারী এক পরম বৈষ্ণব। মানস সরোবর নিবাসী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের শিষ্য। পিতা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ঠাকুর ঘরে ইষ্ট মন্ত্র জপ করতেন। প্রাণায়াম করতেন। সামনে গুরুদেবের ফটো। শান্ত, আত্মস্থ, গম্ভীর। নিরামিষভোজী। মৌনব্রতী। মাতা ঠাকুরাণীও গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা। ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত-প্রাণা। সর্বদা ধর্মানুশীলনে নিযুক্তা। এই পিতামাতার প্রভাব কি আমার ওপর পড়ে নি? নিশ্চয় পড়েছে। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অস্বীকার করতে পারি না।

ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে পিতা আমার হাতে খড়ি দিলেন। নিজে আমার হাত ধরে মাটিতে খড়ি দিয়ে "অ-আ, ক, খ" লেখাবার চেষ্টা করলেন। অ লেখানো হয়েছে কি না হয়েছে, আমি সজোরে "ছাড়ো ছাড়ো" বলে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। নিজেই খচ্ খচ্ করে "অ, আ, ক, খ" লিখতে লাগলাম। পিতা বিস্মিত। মাতা চমৎকৃতা। তারপর থেকে পিতা আর কখন আমার পড়ার দিকে নজর দেওয়া দরকার মনে করেন নি। বলতেন—ওর সবই ঠিক করা আছে। হবেই। গৃহ শিক্ষকের দ্বারাই আমার কাজ চলে গেল। পিতার দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন কোন দিনই হল না। আমি অনেক সময় ভাবি এ কি রকম করে সম্ভব হল? আমার সন্দেহবাদী মন বলে হয়ত আমি হাতে খড়ি হবার আগে অগ্রজের বই দেখে অক্ষরগুলো চিনে নিয়েছিলাম। হতেও পারে। তবু আমার বিস্ময় কাটে না। যদি তা না হয়ে থাকে? আজকের radio-activity-র যুগে কোন জিনিসকেই অসম্ভব বলি কি করে? আজ বিজ্ঞান তারস্বরে বলছে অসম্ভব কিছুই নয়। চারদিকেই অলৌকিক জিনিস ঘটছে। কাল যাকে অসম্ভব বলেছি, আজ তাকে সম্ভব বলছি। শেষ কথাটা কি তা এখনও বলা হয় নি। অতএব

আত্মার অস্তিত্বটা সরাসরি অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্বজন্মে লেখাপড়া আমি নিশ্চয় কিছু করেছিলাম। জাতিস্মরের মত কিছু স্মৃতি নিশ্চয় অবশিষ্ট ছিল। নতুবা এর কোন জবাবই আমি দিতে পারি না। সেই আমার জীবনের প্রথম বিস্ময়। চার বৎসরের বালকের মনের সেই প্রশ্নের উত্তর আজ যেন পেয়েছি বলেই মনে হচ্ছে।

তিনটে জিনিসের প্রতি আমার ছিল বিশেষ কৌতূহল। সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং ধর্ম। প্রথমে বলি বিজ্ঞানের কথা। আমার পিতা তখন বর্ধমান থেকে ছাপরা বদলী হয়েছেন। বিহার আলাদা হয়েছে। সন ১৯১২। পিতা বিহারই পছন্দ করলেন। কারণ, পাটনা কলেজ থেকেই তিনি গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে আইন পাশ করেন। মজঃফরপুরে ওকালতি স্বুরু করেন। আমার মাতামহ ছিলেন ইনস্পেক্টর অব পুলিশ। তিনি মজঃফরপুরে বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন। সেইখান থেকেই পিতা আদালতে যাতায়াত করতেন। আমাদের দেশ বাঁকুড়ায়। তার পূর্বে ছিল ব্যারাকপুরে। যখন তার নাম ছিল চাণক। আমরা চাণকের মুখুজ্যে বলেই পরিচিত। কিন্তু বাংলার চেয়ে বিহারই পিতার অধিক পছন্দ হল। সেই থেকে আমরা বিহারের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তবে এ বন্ধন প্রীতির বন্ধনই। আজ এই পুস্তক ছাপাচ্ছি বিহারের সাহায্যে।

এক বৎসর পূর্বে আমার হাতে-খড়ি হয়েছে। সেজদার সঙ্গে স্থানীয় "সারন একাডেমী" স্কুলে যাতায়াত আরম্ভ করেছি। ভর্তি হই নি স্কুলে। তবু স্কুলে যাই। চঞ্চল বালকটিকে বাড়ীতে আটকিয়ে রাখা যায় না। স্কুলে ম্যাজিক দেখানো হবে। একটা বড় কাচের পাত্রে জল রাখা হয়েছে। নীচে একটা পয়সা। যাদুকর বলছে—যে পারো, পয়সা তুলে নাও। কিন্তু যেই ছেলেরা তুলতে যাচ্ছে, অমনি তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ছুঁতে পারছে না পয়সা। হাত অবশ হয়ে যাচ্ছে। আমিও গেলাম তুলতে। জলে হাত ডোবালাম।

হাতের কনুই পর্যন্ত ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। পয়সা তুলতে পারলাম না। সকলে হেসে উঠল। পরে শুনলাম—বিদ্যুৎ লাগানো হয়েছিল। বিদ্যুৎ কি? বিদ্যুৎ কি? এই প্রশ্ন সকলকে করতে লাগলাম। জানতেই হবে বিদ্যুৎ কি। সকলে একরকম করে উত্তর দিতে লাগল। কিন্তু মন সন্তুষ্ট হতে পারছে না। কেউ বোঝাতে পারছে না। আমিও বুঝতে পারছি না। এই পিপাসা আমায় সারাজীবন তাড়া করে চলেছে। আজও এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

এত জানবার পিপাসা আমার কেন? জ্ঞান নিয়ে আমি কি করব? মনে মনে বলছি, চাই না জ্ঞান। রাক্ষসী, আমায় ছেড়ে দে। কিন্তু ছাড়ছে না রাক্ষসী। রক্ত পান করেই চলেছে। আমাকে পড়তেই হবে। এত আনন্দ আর কিছুতেই আমি পাই না। আমি অসহায়। আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে এই দাসত্ব। যাকে জন্মজন্মান্তরের দাসত্ব বলেই মনে হয়। নইলে এর স্বপক্ষে কোন যুক্তিই আমি খুঁজে পাই না। এই হল আমার বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম কৌতূহল। ঠিক করলাম বিদ্যুৎ কি আমায় জানতেই হবে। ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলেজে আমি বিজ্ঞানই নিলাম। সেই থেকে বিজ্ঞানের ছাত্র আমি। অতি আগ্রহ সহকারে পড়ে থাকি। বিজ্ঞানের রস আর সাহিত্যের রস আমার কাছে সমান বলেই মনে হয়।

তারপর সাহিত্য! সাহিত্যের বিশেষ বিভাগ নাটকই আমায় বেশী আকৃষ্ট করল। কারণও ছিল। ছাপরার পর গেলাম পাটনা। সেখানে অ্যাংলো-স্যান্‌স্ক্রিট স্কুলে এক বৎসর পড়লাম। সিক্‌স্‌থ ক্লাসে। প্রথমও হলাম। সেই আমার ক্লাসে প্রথম হওয়া। তারপর পিতার পেনসন্ হয়ে গেল। আমার বিদ্যাভ্যাসে নিদারুণ বাধা পড়ল। আমার মনোজগতে এর বিপুল প্রতিক্রিয়া হল। কিন্তু আমি নিরুপায়। নীরব দর্শক মাত্র। পিতা এলেন পুরীতে। পুরীতেই স্থায়ীভাবে বাস করতে মনস্থ করলেন। সেখানেই তাঁর গুরুদেবের আশ্রম। সেখানেই জগন্নাথ দেবের অভ্রভেদী মন্দির। দিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্রের তীর।

আর কি চাই। আমি পুরী জিলা স্কুলে ভর্তি হলাম।

কিন্তু একি বিপদ? পড়ানো যে হচ্ছে ওড়িয়া ভাষায়। এক বর্ণও বুঝতে পারছি না। যে পড়ছিল বিহারের স্কুলে, সে হঠাৎ এসে পড়ল উড়িষ্যায়। কোথায় পাটনা। কোথায় পুরী! পড়াশোনায় কোন রস পাই না। অতএব অঙ্কে শূন্য পেলাম। যে পাটনার স্কুলে প্রথম হয়েছিল, সে উড়িষ্যার স্কুলে এসে দেখল পরীক্ষার খাতায় গোলাকার শূন্য। কি বিশ্রী যে লেগেছিল এই শূন্যটা, তা বোঝাতে পারি না। যেন শূন্যটা অট্টহাস্য করে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বলছে— তোমার দ্বারা জীবনে কিছুই হবে না। তুমি শূন্য পাওয়া ছেলে। তুমি শূন্য পাবেই শুধু। তোমার ললাটলিপি হল অকৃতকার্যতা। কিন্তু শূন্য পেয়েছিলাম কেন? সে কি আমার দোষে? অকস্মাৎ স্থান পরিবর্তন এর জন্যে দায়ী।

প্রতিকূল। জীবন নদীর প্রতিটি কূলই প্রতিকূল। অসহায় শিশু ভীষণ লজ্জায় আরক্ত হয়ে শূন্যের পানে চেয়ে রইল। কি বীভৎস দৃশ্য। পিতার ওপর অভিমান হতে লাগল। তিনি কিছুই দেখলেন না। তিনি ত জানেন কিছুই দেখবার দরকার নেই। আমার সবই ঠিক করা আছে। বাড়ীতে কেউ জানল না এই শূন্য পাওয়ার কথা। কেউ জানতে চাইলও না। আমিও আমার লজ্জার কথা কাউকে বলতে চাইলাম না। কান্নায় ভরে উঠতে লাগল অন্তর। ক্লাসের ছেলেরা উপেক্ষার দৃষ্টিতে আমাকে দেখে। কাকে বলব দুঃখের কথা? শোনবার লোক কোথাও নেই। জীবনে সেই প্রথম পারিপার্শ্বিকের অসহানুভূতির পীড়া অনুভব করলাম। কিন্তু উপায় কি? কোন প্রতিকারই আমার হাতে নেই। মনে মনে শুধু নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে মরতে লাগলাম। বিফলতার কি নিদারুণ গ্লানি! পড়তে যাই অন্য ভাষায় লেখা বই। কিছুই বুঝতে পারি না। গৃহশিক্ষক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়েই ব্যস্ত। আমার দিকে তাকাবার তাঁর সময় কোথায়? অবহেলায় এক কোণে চুপ করে মনমরা হয়ে বসে থাকতাম। রাত্রে বিছানায়

শুয়ে চোখের জলে বক্ষ ভাসাতাম। এছাড়া আর কি করবার ছিল? ওড়িয়া ছেলেদের কাছে সাহায্য চাইতাম। তারা বাঙ্গালী ছেলেটির দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। বলতে থাকত কেমন জব্দ? আরো এসো উড়িষ্যায়!

পুরী জিলা স্কুলের সেই শ্রীহীন ঘরটি আজও মনে পড়ছে। এখন সেখানে সংস্কৃত কলেজ হয়েছে। জিলা স্কুল অন্য জায়গায় চলে গেছে! সবই হয়েছে। কেবল সেই অসহায় শিশুর অসহায়ত্ব সেদিনও কেউ বোঝে নি। আজও কেউ বোঝে না! আজও আমার সেই দিনগুলির কথা মনে পড়লে ভয়ে কেঁপে উঠি। পিতা তাঁর ঠাকুর ঘর, জগন্নাথ দর্শন, সমুদ্রতীরে সান্ধ্যভ্রমণ নিয়েই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে গুরুদেবের আশ্রমে গমন। প্রতিদিন স্বহস্তে অগণিত ভিখারীকে ভিক্ষাদান। কেউ কেউ পুনর্বার প্রার্থী হলেও তাকে বঞ্চিত না করা। আমরা আপত্তি করলে বলতেন কে জানে নারায়ণ ভিখারীর বেশে পরীক্ষা করতে এসেছেন কি না। তাঁর সকলের প্রতিই দয়া। কেবল পুত্রের প্রতিই দয়া নেই। পুত্রের ভবিষ্যৎ ত আগে থেকেই স্থির করা আছে। দেখবার দরকার কি!

গৃহে সাধু-সন্ন্যাসীর আসা যাওয়ার বিরাম নেই। একদিন এক দীর্ঘকায়, ভস্মাচ্ছাদিত, জটাধারী, পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসী এসেছিলেন আমাদের বাড়ী। আমাকে দেখে বলেছিলেন আপ্‌কা লড়কা হ্যায়! পিতা বলেছিলেন জী হাঁ। সন্ন্যাসী স্মিতহাস্য করে বলেছিলেন বড়ি ভাগ্যবান হ্যায়। হয়ত বাঁধা বুলি। কিন্তু পিতা আরো নিশ্চিন্ত হলেন। আর আমি আজও বুঝতে পারি না ভাগ্যটা আমার কোথায় লুকোনো আছে।

কিন্তু সাহিত্য? অদ্ভুত ভাল লাগত সাহিত্য। যেখানে বাংলা বই পেতাম গোগ্রাসে গিলতাম। আর একটা জিনিসও খুব ভাল লাগত। থিয়েটার দেখা। বাঙ্গালী বাঙ্গলার বাইরে যেখানে গেছে, দুটি জিনিস সঙ্গে নিয়ে গেছে। তার দুর্গাপূজা। তার থিয়েটার। পুরীও তার

ব্যতিক্রম ছিল না। সেখানেও বাঙ্গালীদের ছিল ক্লাব। "সঙ্গীত-সম্মিলনী" ক্লাব। পোস্ট অফিসের পাশে টাউন হলেই ছিল তার স্থান। এখানেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী ১৯৩১ সালে আবৃত্তি করে গেছেন। বন্দীবীর। হ্যামলেটের একটা সলিলকি। এখানে নিয়মিত নাট্যাভিনয়ও হত। আমার বিশেষভাবে মনে আছে দু'টি অভিনয়। 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'বিল্বমঙ্গল'। চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় অভিনয় করতেন ত্র্যম্বক বাবু। আজও তাঁর নাম মনে আছে। সংক্ষেপ করে বলা হত টমবাবু। বিশাল দীর্ঘকায় শরীর। অতিরিক্ত ভারী কণ্ঠস্বর। করতেন পি-ডবলু-ডি তে চাকরী। তিনি যখন চন্দ্রগুপ্ত সেজে জননীর পদপ্রান্তে বসে আবেগ গদ গদ কণ্ঠস্বরে বলতেন, তোমার অপরাধ মা? জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি। বলে আভূমিপ্রণত হয়ে প্রণাম করতেন, তখন হাততালির চোটে ছাদ ভেঙ্গে পড়বার মত হতো। বিল্বমঙ্গলের পার্ট করতেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। জমিদার মানুষ। অতি সুশ্রী চেহারা। লম্বা। বড় বড় চোখ। 'বিল্বমঙ্গল' সেজে যখন তিনি একটু হেলে গিয়ে "দেখে নেবো" বলতে বলতে সক্রোধে স্টেজে প্রবেশ করতেন, সেকালের গৈরিশী অভিনয়ের ধারা বজায় রেখে, সকলে অমনি তটস্থ হয়ে উঠত। থিয়েটার এমনিই অপূর্ব জিনিস। তিনি যখন স্টেজের নেপথ্যের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে অনুপস্থিত এক চিন্তামণির উদ্দেশে 'দেখে নেবো' 'দেখে নেবো' বলে তর্জন করতেন, আমরা এক মুহূর্তে নাটকের ভেতর প্রবেশ করে যেতাম। হ্যাঁ, সুরু হয়েছে বটে নাটক। জীবনের নাটক। জীবন্ত নাটক। যখন তিনি দুই চক্ষু আলপিন দিয়ে বিদ্ধ করে স্বেচ্ছায় অন্ধ হতেন, মুখে বলতেন—"চল পদ যেথা ইচ্ছা হয়," বলেই দুদিকে টলোমলো করে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে বেরিয়ে যেতেন, আমরা যেন আতঙ্কিত হয়ে যেতাম। আমরা জানতাম তাঁর হাতে আলতা মাখানো কাপড়ের টুকরো লুকোনো আছে। টেপা মাত্র চোখে মুখে বুকে মাথায় রক্ত বয়ে যাবে। জানি, সবই মিথ্যা। তবু অভিভূত হতে কোন অসুবিধা

হত না। যখন বলতেন—"মন! এখনো কি আঁখির গরব কর? শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ। দিব আমি উত্তমনয়ন। সেই আঁখি, ব্রজের গোপালে, আমার বলিয়ে, তুলে নেবে কোলে"—আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। যখন বলতেন 'চিন্তামণি! তুমি অতি সুন্দর।' তখন কদাকার এক পুরুষ নারী সেজে থাকলেও তাকে সুন্দরীই মনে হত। হয়ত ভালো করে দাড়ী কামানো হয় নি। চোয়ালের হাড় অতিশয় চওড়া। তবু তাঁকে সৌন্দর্যের প্রতিমা বলেই ভ্রম হত। তিনবার বলতেন—অতি সুন্দর। অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! তিনভাবে। আমরা শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এই ত নাটক। এই ত অভিনয়। এই ত জীবন!

সেই শ্রীশবাবু যখন 'ধর্ম বিপ্লব' নাটকে কালাপাহাড় সেজে গর্জন করতেন ক্ষিপ্ত হয়ে "হিন্দুর আরাধ্য দেবতা বিশ্বেশ্বরের মূর্তি চাই," তখন তাঁর বড় বড় লাল চোখ দেখে আমরা ভয়ে এতটুকু হয়ে যেতাম। তিনি যেন রক্ত পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে যেতেন। নৃত্য করতেন। স্টেজ কাটিয়ে দিতেন। আর পাগলিনী সেজে বিমলাবাবুর সেই গান আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা, আমি তাঁদের পাগল মেয়ে—তখন অবাক হয়ে সেই গান শুনতাম। পেছন থেকে তালে তালে হারমোনিয়াম বাজত। ক্লারিওনেট বাজত। আমরা সুরের রাজ্যে চলে যেতাম। বিমলাবাবু পুরুষ। কি একটা চাকরীও করতেন। কিন্তু একবারও মনে হত না ইনি স্ত্রীলোক নন। গেরুয়া-পরা, কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা দেওয়া যথার্থ এক পাগলিনী যেন। অভিনয়ের এমনিই ক্ষমতা। সেই বিমলাবাবুকে দিনের বেলায় যখন ধুতি পাঞ্জাবী পরে রাস্তায় চলতে দেখতাম তখন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতাম না। স্বপ্নরাজ্য কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো? ইনি যখন নাগকন্যা সাজলেন 'উলুপী' নাটকে, তখন সে আর একদৃশ্য। বাঙ্গালী ভাবুক জাত। বাঙ্গালী আর্টিস্ট জাত। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। অতি সাধারণ বেতনভুক্ প্রাণী। কিন্তু কি নিদারুণ শিল্প-শক্তিসম্পন্ন অলৌকিক

পুরুষ এঁরা এক এক জন। বাঙ্গালীর আর্ট কালচার বাংলার বাইরে নিয়ে গেছে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তরাই। মধ্যবিত্তরাই জাতির মেরুদণ্ড। জাতির আশাভরসা। সবই। মধ্যবিত্তের জয়গান করতে আমার কলম কেঁপেছে, স্তব্ধ হয় নি।

থিয়েটারের প্রভাব অতি বাল্যকালেই আমার কিশোর মনে অতিরিক্ত মাত্রায় এসে পড়েছিল। উকিল দেবেনবাবু ও উকিল বিধু বাবুর অভিনয়, ভোলবার মত নয়। দেবেনবাবু সিরিও কমিক ভূমিকায় অদ্বিতীয় ছিলেন। বিধুবাবুর সেকেন্দার সাজ আজও ভুলতে পারি না। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বেকার সেই দৃশ্য, সেই কথা, সেই গান, সেই অভিনয় আজও আমার মনে আছে। যদি আমি ভবিষ্যতে থিয়েটারের দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকি, তাহলে তার গোড়াপত্তন হয়েছিল এই খানেই। যা কিছু ভবিষ্যৎ, তাই বর্তমানকে আন্দোলিত করে। তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমার ভবিষ্যৎ ছিল নাট্যকার হওয়া। সেই অজ্ঞাত ভবিষ্যতই আমার কিশোর মনকে অত আগ্রহান্বিত হয়ে নাটক দেখতে বাধ্য করেছিল। কারণ আমাকে ভবিষ্যতে নাট্যকার হতে হতই। সবই পূর্ব-পরিকল্পিত। সবই পূর্ব-নির্দিষ্ট। পৃথিবীতে কিছুই আকস্মিক নয়। কার্য-কারণ সূত্রে সবই বাঁধা। হতেই হবে।

তৃতীয় কৌতূহল ছিল ধর্ম। যথার্থ ধর্ম কি তা আমায় জানতেই হবে। যা মানুষকে ধারণ করে তাই তার ধর্ম। প্রত্যেকেরই প্রকৃতি অনুযায়ী একটা ধর্ম থাকে। সেই তার স্বধর্ম। আমার স্বধর্ম কি তা আমায় খুঁজে বার করতেই হবে। আমার পিতামহ ছিলেন হার্বাট স্পেন্সরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। নিরীশ্বরবাদী। Atheist। বলেছিলেন, মরবার সময়, দৃপ্তকণ্ঠে, ইংরেজীতে—What is god? I donot know what is God : I know I have done my duty. অথচ বাড়ীতে এক প্রান্তে ঠাকুরবাড়ী ছিল। এখনো আছে। এখনো সেখানে নিত্য নারায়ণ শিলা পূজা হয়। চারশো বছরের পুরানো চাণকের মুকুজ্যে বাড়ীর শালগ্রাম শিলা। আমার নিরক্ষরা

ঠাকুমা ছিলেন ঘোরতরা ঈশ্বর বিশ্বাসী। বৃদ্ধা। গৈরিকাচ্ছাদিতা। ভক্তিমতী। পুজারিণী। আমার পিতামাতা গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য। শিষ্যা। সকাল সন্ধ্যে, প্রত্যহ, দীর্ঘ সময় তাঁদের ঠাকুর ঘরে ব্যয় করতে দেখেছি। মাতাঠাকুরাণী কথায় কথায় "জয়গুরু" "জয়গুরু" বলে পরম ভক্তিভরে গুরুকে স্মরণ করেছেন। একটু বিপদের আভাস পেলেই "গুরু রক্ষা করবেন" বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। এত বড় নির্ভর স্থল পৃথিবীতে যে আছে, সেটা জানাই যথেষ্ট।

আমি কিশোর বয়সেই বুঝতে পারলাম ধর্ম মানুষের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় জিনিস। ধর্ম ছাড়া মানুষ চলতেই পারে না। কিন্তু যথার্থ ধর্ম কি তা মানুষকে নিজেই খুঁজে বের করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন করেছিলেন। তিনি বলছেন "আমাদের পরিবারে যে ধর্ম সাধনা ছিল, আমার সঙ্গে তার কোন সংস্রব ছিল না। আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। যে অভ্যাস বাইরের থেকে চাপানো, তা গ্রহণ করতে আমি অক্ষম। কিন্তু পিতৃদেব সেজন্য কখনও ভংর্সনা করতেন না। তিনি বেদনা পেয়েছেন কিন্তু কিছু বলেন নি।"

দেবেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮১৭ সালে। মৃত্যু ১৯০৫ সালে। দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথের জন্ম ১৭৯৪ সালে। মৃত্যু ১৮৪৬ সালে। রবীন্দ্রনাথেরও জন্ম ১৮৬১ সালে। মৃত্যু ১৯৪১ সালে। দ্বারকানাথের ছিল ইসলামীয় সভ্যতা ও ইংরাজী সভ্যতার প্রভাব। দেবেন্দ্রনাথের ছিল বৈদিক ও ঔপনিষদিক প্রভাব। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩) ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। এই কয়টি চরিত্র আমার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করত। তাঁদের কথা পড়তে পড়তে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। তখন বিলাত ছিল আমাদের মক্কা। সেখানে গিয়ে দ্বারকানাথ হয়ে গিয়েছিলেন Prince Tarragona. Queen Victoria তাঁকে নিমন্ত্রণ করতেন। Duchess of Cleveland, Duchess of Inverness তাঁকে অসুখের সময় দেখতে আসতেন। মৃত্যু হল ব্রিস্টল শহরে। ঋণ

রেখে গেলেন প্রচুর। পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে ত্রিশ বছর বয়সেই এই পর্বত প্রমাণ ঋণ মাথায় তুলে নিতে হল। দেউলিয়া হতে হল। এর ফলে তাঁর চরিত্র গঠিত হল। কিন্তু তিনি সংস্কার পূর্ণ মাত্রায় ছাড়তে পারলেন না। ব্রাহ্ম হলেন, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যকে উপবীতধারী ব্রাহ্মণ হতে হবে, এই অদ্ভুত যুক্তি ছাড়তে পারলেন না। ফলে তাঁর শিষ্য কেশবচন্দ্র তাঁকে ছাড়তে বাধ্য হলেন। কেশবচন্দ্রও তাঁর দুই কন্যার রাজার ঘরে বিবাহ দিলেন। দেখলাম হিন্দুদের চেয়ে ব্রাহ্মদের মেরুদণ্ড শিথিল।

রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ব্রাহ্ম। অথচ প্রবন্ধ লিখলেন "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব"। তাহলে ব্রাহ্ম হবার দরকার কি ছিল? তাঁর দৌহিত্র শ্রীঅরবিন্দ এর মীমাংসা করলেন। তিনি কি হিন্দু না ব্রাহ্ম? অথবা নাস্তিক? Aurovilliancকে সব ধর্ম ছাড়তে হবে। ancient, modern, new or future. বাংলাদেশে ধর্ম সাধনার এই এক শতাব্দীর ইতিহাস। জোড়াসাঁকো থেকে পণ্ডিচেরী, রামমোহন থেকে অরবিন্দ। এই ব্রাহ্মসমাজেরও ইতিহাস। আমার মনে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। পড়েও ছিল।

ব্রাহ্মধর্ম আমার মনে যথেষ্ট কৌতূহল জাগ্রত করত। আমার সহপাঠী ছিল অমলানন্দ দাস। সে ছিল ব্রাহ্ম। তার পিতা প্রেমানন্দ দাস ছিলেন পুরীর সিবিল সার্জন। সে মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করত না। আমরা পুতুল পূজো করি বলে আমাদের উপহাস করত। তার ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল "অসত্যো মা সদগময়" অর্থাৎ অসত্য হইতে আমাদের সত্যেতে লইয়া যাও। "তমসো মা জ্যোতির্গময়"। অর্থাৎ অন্ধকার হইতে আমাদের আলোকে লইয়া যাও। "মৃর্ত্যোমামৃতংগময়" অর্থাৎ মৃত্যু হইতে আমাদের অমরত্বে লইয়া যাও। "আবিআর্বিম এধিঃ"। অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার ভেতরে প্রকাশিত হও। "রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" হে রুদ্র। তোমার দাক্ষিণ্য দ্বারা আমায় সর্বদা রক্ষা কর। অমল শ্লোক বলত। সুর

করে করে প্রার্থনার ঢঙে বাংলাও বলত। এসব কথার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ ছিল না। কথাগুলোত ভালই।

কিন্তু যে স্তরে উঠলে কথাগুলো জীবন্ত হয়, সে স্তরে ব্রাহ্মসমাজের জনসাধারণ উঠতে পেরেছিল কি? রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, হয়ত পেরেছিলেন। কিন্তু অমলানন্দ পেরেছিল কি? অমলানন্দ ওই শ্লোকগুলো যখন বলত, আমার মনে হত সিম্পাঞ্জীর হাতে বেহালা দিলে, সে কি বিঠোফেনের সোনাটার মাধুর্য্য বুঝবে? সে শুধু বুঝবে, ঘোড়ার ল্যাজ দিয়ে, ভেড়ার নাড়ী ঘসা হচ্ছে মাত্র। উপনিষদ বিবেকানন্দের মুখে শোভা পায়। অমলানন্দের মুখে নয়। এসব ত সনাতন হিন্দু ধর্মেরই কথা। এই কথাগুলিকে অবলম্বন করে আলাদা সমাজ ধর্ম গড়ার সার্থকতা কোথায়?

আমি মূর্তিকে ভালবাসি। বীণাবাদিনী সরস্বতীকে ভক্তি করি। তিনি বিদ্যা দিতে পারেন বলে বিশ্বাস করি। এই সরস্বতী পুজো সিটি কলেজের হোস্টেলে হিন্দু ছাত্ররা করতে চেয়েছিল বলে ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় "প্রবাসীতে" গরম গরম বাণী ছাপতে লাগলেন। আশ্চর্য হয়ে যাই, যখন দেখি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলখাল্লা, টুপী, পায়জামা ছেড়ে, বিশ্বভারতীর বিশ্বভ্রাতৃত্ব ভুলে গিয়ে, যত্রবিশ্ব ভবেৎ এক নীড়ং মন্ত্র বিস্মৃত হয়ে, ব্রাহ্মসমাজের স্বপক্ষে প্রবাসীতে প্রবন্ধ লিখলেন। ইনি তখন বিশ্ব কবি নন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের বেদী থেকে সানাইয়ের পোঁ ধরেছেন মাত্র। তাঁর চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যেন তাতা থৈ থৈ করে নাচতে পারে। কিন্তু দিবারাত্র নাচে মুক্তি—তাঁর মুখে মানায় না। তিনি সে তরঙ্গে পাছে পাছে নানা রঙ্গে ছুটতে পারেন, এই পর্যন্ত। আনন্দও পেতে পারেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাঁর মুখে 'জয় হোক মানুষের, জয় হোক নবজাতকের জয় হোক চিরঞ্জীবিতের" মানায় না। কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন। সে কবির বাণী লাগি, শুধু তিনি নয়, আমরা এখনও, কান পেতে আছি।

সরস্বতী বিদ্যাদেবী। বাক্‌দেবী। শব্দ শক্তির অধিশ্বরী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। শব্দশক্তি, বাকশক্তি ও তা প্রকাশের উপাদান, বর্ণমালার অধিশ্বরী। মন্ত্র থেকেই তাঁর দেহ উদ্ভূত। পরিকল্পিত। মন্ত্রও তো কল্পনা। দেবতাদের অপর নাম 'গীর্বাণ'। গীঃ অর্থাৎ মন্ত্রবাক্য হইয়াছে বাণ অর্থাৎ দেহ যাহাদের। মন্ত্র হল বাক্যের সমষ্টি। আর কিছুই নয়। অতএব বিরোধ কোথায়, তা বুঝতে পারতাম না।

পিতামাতার গুরু ছিলেন প্রথমে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক। কিন্তু শুধু উপনিষদের শ্লোক উচ্চারণ করেই তিনি আত্মার তৃপ্তি পেলেন না। মাটিতে এক রাশ শিউলি ফুল পড়ে আছে দেখেও তিনি মুগ্ধ হতে লাগলেন। ঈশ্বরকে আরও নিবিড়রূপে উপলব্ধি করতে চাইলেন। পাহাড়ে পর্বতে বনে-জঙ্গলে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে, মানসসরোবরের অধিবাসী পরমহংসজী তাঁকে সূক্ষ্মদেহে এসে দীক্ষা দিলেন। বললেন—লোক কল্যাণের জন্যে লোকালয়ে ফিরে যাও। যোগী মুনি ঋষিব বহু কষ্টার্জিত তপস্যার ফল, প্রাণায়াম, যোগসাধনা, সাধারণের ভেতর ছড়িয়ে দাও। লোকালয়ে ফিরে তিনি এলেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, মন্ত্রজপ, প্রাণায়াম করতে করতে শেষে বৃন্দাবনবাসী তিলক-চন্দন-তুলসীধারী বৈষ্ণবে পরিণত হয়ে গেলেন। শেস জীবনে শ্রীক্ষেত্রে এসে "জটিয়া বাবা" হয়েও গেলেন। এক সিদ্ধপুরুষ। ডাক্তার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, এক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকের এই "জটিয়া বাবাজীত্ব" লাভে কি প্রমাণিত হয়? জীবনীশক্তি চর্বিত-চর্বনকারী ব্রাহ্মধর্মে অথবা সনাতন ধর্মে? যা হিন্দুধর্ম বলেই সাধারণে প্রচারিত।

এর উত্তর পেতে আমার দেরী হল না। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি ভক্তি কমে গেল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়ের জ্ঞানের পরিধি দেখে বিস্মিত হতাম। তাঁর বৈষ্ণব পিতা। শাক্ত মাতা। তিনি বাড়ীতে ফার্সী শিখলেন। পাটনায় আরবী শিখলেন। সঙ্গে

সঙ্গে ইউক্লিড, অ্যারিস্টটল ও কোরাণ পড়লেন। বেনারসে সংস্কৃত শিখলেন। তিব্বতে লামাদের কাছ থেকে পালি ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র শিখলেন। বাইবেল ভাল করে বুঝবার জন্যে হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখলেন। সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে লেখবার জন্যে পিতা কর্তৃক গৃহ থেকে বিতাড়িত হলেন। রংপুরে সেরেস্তাদার ছিলেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে পাটনায় থাকতে থাকতেই ফার্সীতে "তুহ্‌ফাল-আল-মুয়াহিদ্দীন্" নামে বই লিখলেন। যার ভূমিকা লিখলেন আরবীতে। ইংরিজী মানে A gift to monotheists. হিন্দুর ছিল Pantheism. সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। Pantheism থেকে মুসলিম প্রভাবে Monotheism-এ আকৃষ্ট হলেন। বাইশ বছর বয়সে রংপুরে Digby সাহেবের কাছে ইংরিজী শিখলেন। ঈশ, কেন, কঠ, মাণ্ডুক্য উপনিষদ ইংরিজী ও বাংলায় তর্জমা করলেন। ভাটপাড়া নবদ্বীপে তখন স্মৃতিশাস্ত্রেরই আদর ছিল। বেদ, উপনিষদ, অনাদৃত ছিল। রামমোহন বেদান্ত প্রচারে ব্রতী হলেন। বেদান্তেই তিনি স্বদেশের বিশিষ্টতা খুঁজে পেলেন। সে বিশিষ্টতা আধ্যাত্মিকতা। এই বিশিষ্টতার ভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি বিশ্বকে গ্রহণ করেছিলেন। বুঝে ছিলেন এই বিশিষ্টতা রক্ষা করেই ভারতকে নব-যুগে সগৌরবে জেগে উঠতে হবে। আমি এই যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ে অনুভব করলাম। আধ্যাত্মিক কথাটা শুনে ভয় পাবার কিছু নেই। আত্মাকে যা অধিকার করে তাই আধ্যাত্মিক। যেমন মনকে যা অধিকার করে তা মানসিক।

এ রকম এক অসাধারণ মস্তিস্ক আমার কৌতূহল জাগ্রত করতে বাধ্য। তিনিও ত হিন্দুর শাস্ত্রকেই প্রামাণ্য বলে মেনে নিলেন। অবশ্য কুসংস্কারকে কুসংস্কারই বললেন। ব্রাহ্ম সমাজের কাছে তবুও দেশ ঋণী। ব্রাহ্ম সমাজই জাতির আত্ম-বিস্মৃতি দূর করে আত্মজ্ঞানের প্রথম উদ্রেক করল। রামমোহনই এর সূত্রপাত করেন। তিনি অদ্বৈত মতালম্বী ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি যুক্তিবাদী ছিলেন। রাজা শাস্ত্রবাক্য প্রামাণ্য

বলে স্বীকার করতেন। মহর্ষি এই প্রামাণ্য বর্জন করেন। তিনি আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে যাকে "intuition" বলে, তাকেই গ্রহণ করেন; আমাদের মধ্যে জ্ঞাতা যে আত্মা আছে, তাতে জ্ঞানের কতকগুলি নিত্য সিদ্ধ ছাঁচ আছে। মহর্ষি জ্ঞানের এই নিত্য সিদ্ধ ছাঁচগুলিকে আত্মপ্রত্যয় বলেছেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথই আমার চোখ খুলে দিলেন। তিনি ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্ম ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রইলেন না। Religion of man লিখলেন। উদার মানব ধর্ম প্রচার করলেন। মহাভারতকার, ভীষ্মের মুখ দিয়ে এই কথাই বলিয়েছিলেন। "ন হি মনুষ্যাৎ পরতরং কিঞ্চিৎ।" গ্রীক দার্শনিক Pythagoras বলেছিলেন—Man is the measure of all things. তফাৎ কতটুকু?

ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও একশো বছরের মধ্যে গড়ে উঠল। ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম একে গড়ে তুললেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ একে গতি দিলেন। বাইশ বছর বয়সেই কালীপ্রসন্ন সিংহ "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" লিখলেন। প্রমথ চৌধুরী বলছেন "এরকম চতুর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই।" কিন্তু এই চতুর শ্রেষ্ঠ লেখক মাত্র ত্রিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন। ১৮৪০ থেকে ১৮৭০। কি দুর্ভাগ্য! ইনি মহানুভবও ছিলেন। পাদরী লং-এর এক হাজার টাকা জরিমানা, দিয়ে দিয়েছিলেন। সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করালেন। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মাতৃভাষায় ধর্মের সত্যতত্ত্ব পৌঁছিয়ে দিলেন। বাংলা সাহিত্য অবশ্য বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করল রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ লাভে। ১৯১৩ সালে। এ গৌরব প্রত্যেক ভারতবাসীর। হতে পারে গীতাঞ্জলি উপনিষদ প্রভাবান্বিত। কিন্তু তাতে কবির মর্যাদা কমে না। বাইবেল অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা ও চিত্রের উৎস। তাতে কবি ও চিত্রকরের মর্যাদা কমে না।

ধর্মেরও আসল কথা অর্ধ শতাব্দীর ভেতরেই আবিষ্কৃত হয়ে গেল।

আবিষ্কার করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যত মত, তত পথ। সব পথের গন্তব্য এক। এই ত ধর্মের সত্যতত্ত্ব। বিরোধ কোথায়? আমার মন আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে লাগল। এমন একটি বিশ্বব্যাপী সত্তার অস্তিত্ব মানতে হবে. যা মনে সান্ত্বনা দিতে পারে। ভারতীয় বেদান্ত দর্শন একেই বলেছেন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দের মৌলিক অর্থ মন্ত্র। প্রাচীন চীনে তাওয়ে এবং ইসলামের সুফী সম্প্রদায়ে এইরূপ একটি সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরোত্তর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইরকম একটি ধারণা আমার বৈজ্ঞানিক মনেও শেকড় গাড়তে লাগল। বিবেকানন্দও আমার মনে কম দাগ কাটেনি। বিবেকানন্দ একটা বিরল প্রতিভা। বহু শতাব্দীর পর এইরকম একটা প্রতিভা এদেশে জন্ম নিয়েছে। অসাধারণ আত্মসংযমী পুরুষ। কিছুতেই নিবেদিতার বাহু বন্ধনে ধরা পড়লেন না। এই দার্ঢ্য বাংলায় নতুন। এই ব্রহ্মচর্য বাংলায় অপরিচিত। তাঁর "বাঙ্গালীকে নির্ভয় কর।" এই প্রার্থনাও বাংলায় নতুন। তাঁর ভাষাও বাঙ্গালীর কানে নতুন শোনালো। তিনি বাংলা গদ্যে বেগ আনলেন। বলিষ্ঠতা আনলেন। তাঁর ছিল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। দ্বিধাহীন বিশ্বাস। বীতশ্রদ্ধ বাঙ্গালীকে তিনিই শেখালেন স্বাজাত্যবোধ। পরানুকরণকারী আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীকে তিনি স্বধর্ম শেখালেন। ৩১শে মে ১৮৯২ সালে তিনি বোম্বাই হয়ে জাপানে যান। আমেরিকাও। বিশ্ব বিজয় সমাপ্ত করেন। তিনি আধুনিক শঙ্করাচার্য। বিশ্ববিজয়ী হিন্দু। মাইকেল মধুসূদন ও কৃষ্ণমোহন উনিশ বছরেই ধর্ম ত্যাগ করলেন। উনিশ বছরে ধর্মত্যাগ কখন চিন্তাপ্রসূত হতে পারে না। আবেগপ্রসূত মাত্র।

ক্রীশ্চান মধুসূদন বিবেকানন্দের ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিলাত যাত্রা করেছিলেন। ৯ই জুন ১৮৬২ সালে। যখন হুতোম প্যাঁচার নকসা লিখছেন কালীপ্রসন্ন। কোথায় রইল মাইকেলের খ্রীষ্টধর্ম? পড়ে রয়েছে তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য মাত্র। সেখানে আছে শুধু তাঁর মেঘ-গর্জনের মত কণ্ঠ-নিনাদ। শব্দের যাদুতে তিনি বন্দী হলেন। ভাব প্রকাশে মন

দিলেন না। একটা বলিষ্ঠ চরিত্র খুঁজে পেলেন না। তিনি যদি বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কাব্য লিখতেন, আধুনিক মহাভারত হয়ে থাকত তা। কিন্তু তিনি বস্তুনিষ্ঠ হতে পারলেন না। জীবন্ত চরিত্র খুঁজে পেলেন না। অতীত বিলাসী হয়ে পড়েন। রামায়ণকে ব্যঙ্গ করলেন। রামমোহন রায় ১৮ই জানুয়ারী ১৮৩১ কেপে পৌছান। বারোই এপ্রিল লিভারপুলে পৌছান। তিনি তাঁর মিশন সম্পূর্ণ করতে পারলেন না। দিল্লীর বাদশাহের জন্য ওকালতীও সম্পূর্ণ করতে পারলেন না। দিল্লী দরবার থেকে তিনি সত্তর হাজার টাকা পেয়েছিলেন। কিন্তু সফল হতে পারলেন না। তবে তিনি একটা কাজ করে গিয়েছিলেন। ১৮২১—১৮২২ সালের সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় বাংলা দেশের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের কথা লিখে গিয়েছিলেন। সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেড়শো বছরেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন মধ্যবিত্তের বিত্ত আর মধ্য নয়। একেবারে নিম্ন। মানুষ কি করে সমস্ত দুঃখের অতীত হতে পারে, সে রহস্য আমায় জানতেই হবে। এখনো শিখেছি বলে অহঙ্কার করতে পারি না। কিন্তু সত্যকে কখন কখন যেন দেখতে পাই। আভাসে আভাসে।

সত্তর বৎসরের দ্বারদেশে এসে আজ আমি জীবন উপভোগ করতে সমর্থ হয়েছি। এর জন্যে আমার আমির কাছে আমি ঋণী। আমার আমিই আমায় দুঃখের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। জগতের সমস্ত তামাসা দুই চোখ মেলে দেখছি। তাই আমি শিল্পী। স্রষ্টা। সৃষ্টি করাতেই আমার আনন্দ। লেখাতেই আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দ। সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাই বিজ্ঞান পড়ে। তারপর দার্শনিক তত্ত্ব। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বে কোন বিরোধ দেখতে পাই না। আট মাসেই জন্মেছি। অতএব স্বাস্থ্যও প্রতিকূল। তবু বেঁচে আছি। দীর্ঘ দিনই বেঁচে রইলাম। আজ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সন্ধ্যাকাশের মতই পশ্চিম আকাশ রাঙ্গা। জীবন-সূর্য অস্তোন্মুখ। কিন্তু আজ দেখছি প্রতিকূলতার বাষ্পও কোথাও নেই। সবই অনুকূল।

কি করে মনের এই পরিবর্তন হল? আত্মসত্তা আবিষ্কার করেই। এই পরিবর্তন আনল কে? মন-ই। মন একদিন সব জিনিস প্রতিকূল ভাবছিল। মনই আজ বলছে প্রতিকূল কোন জিনিসই নয়। মন-ই গড়ে। মনই ভাঙ্গে। এই মনকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয়। মন নানারকম মরীচিকা দেখায়। যা চায় তার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে বের করে। আমিই আসামী, আমিই বিচারক। সুবিচার হবে কি করে?

ছেলেবেলা থেকে আমাকে পেয়ে বসেছিল একটা প্রবল অনুসন্ধিৎসা। কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু পাচ্ছি না। মন কোথাও সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তবু খুঁজেই চলেছি। আমার প্রথম স্কুল পাটনার অ্যাংলো সংস্কৃত স্কুল। সিকস্থ ক্লাসে পড়তাম। পরীক্ষার পর স্কুলের প্রশংসাপত্রে দেখলাম ইংরেজিতে লেখা stood first কি আনন্দ। ফার্ষ্ট হয়েছি। সেই যে অতি-কিশোর বয়সে প্রথম হবার আনন্দ পেলাম, সে যেন আমায় নেশার মত আচ্ছন্ন করে রাখল। প্রথম হতেই হবে। সব বিষয়েই প্রথম। দ্বিতীয় হলে চলবে না।

সেই আমি যখন পুরীতে এসে অঙ্কতে শূন্য পেলাম, ভাবলাম একি হল? জীবনের পথ ত শুধু গোলাপ-বিছানোই নয়। এখানে বাস্তবের কাঁটাও যে আছে। পায়ে ফোটে। অতি তীব্র তার বেদনা। পরাজয়ের গ্লানিতে সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেল। তবে কি আমার মধ্যে কোন সম্পদই নেই? ভারবাহী গর্দভ মাত্র আমি? হাড়মাসের একটা বোঝা শুধু? কোন শক্তিই নেই? আত্মানুসন্ধান করতে লাগলাম। যা পাই তাই পড়ি। মনের ক্ষুধা অসীম। জ্ঞানের তৃষ্ণা ভয়ঙ্কর।

কখন কখন মনে হত লেখার কিছু শক্তি হয়ত জন্ম থেকেই আমার আছে। কেমন করে সর্বপ্রথম বুঝতে পারলাম একথা? তখন বয়স দশ বৎসর। পুরী জিলা স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। বাংলা পরীক্ষা

দিচ্ছি। রচনা লিখছি। দুর্ভিক্ষের ওপর রচনা। লিখছি ত লিখছিই। গল্ গল্ করে আপনা থেকেই ভাষা বেরুচ্ছে। যেন একটা অশান্ত ঝর্ণা পাহাড় থেকে নামছে। এত কথা যে আমি জানতাম, তা আমি নিজেই জানতাম না। বড় বড় চিন্তাও যেন কোথা থেকে আসতে লাগল। শেষকালে প্রবন্ধের শেষে ইংরেজকেই দুর্ভিক্ষের জন্যে দায়ী করলাম। তারা এদেশ থেকে সব সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। এদেশটাকে শুক্‌নো ছিবড়ে বানিয়ে দিচ্ছে। দুর্ভিক্ষ হবে না ত কি? অবশেষে উপসংহারে দেশবাসীকে সম্বোধন করে লিখলাম—"ওঠো বাঙ্গালীগণ! জাগো! দুর্ভিক্ষ যারা সৃষ্টি করেছে তাদের তাড়াও।"

রচনা শেষ করে পরমানন্দে বাড়ী ফিরেছি। দু'দিন পরে স্কুলের বাংলার টিচার ভোলা পণ্ডিত এসে বললেন—চল। হেডমাষ্টার ডাকছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—আমাকে? কেন! ভোলা পণ্ডিত মুখ অসম্ভব গম্ভীর করে বললেন—সেটা গেলেই বুঝতে পারবে।

দোতালায় হেডমাষ্টারের ঘর। হেডমাষ্টার মানেই ভয়ের জিনিস। শাস্তির প্রশ্ন। বিশেষ হেডমাষ্টার উপেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত। ব্যাঘ্র বিশেষ। সদা রক্তবর্ণ চক্ষু। অসম্ভব রাশভারী। গম্ভীর। ভ্রূজোড়া সর্বদা কুঞ্চিত। হেডমাষ্টারকে ভয় করে না, এমন ছাত্রই ছিল না। হঠাৎ পা টিপে-টিপে সমস্ত স্কুল একবার রাউণ্ড দিতেন। অমনি চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যেতো। মাষ্টারমশায়রাও তটস্থ হয়ে উঠতেন। আমরা ভাবতাম, হেডমাষ্টার বুঝি একটি অলৌকিক পদার্থ। অসীম শক্তিধর। তাঁর ভয়ে শুধু কাঁপতেই হয় যেন। প্রত্যেককে। প্রত্যেক টিচারকেও। আজ এই জিনিস ভাবাও যায় না। এই রকম ভীতিপ্রদ ব্যক্তিটির কাছে আমার মত ক্ষুদ্র এক ফোর্থ ক্লাসের ছাত্রের ডাক পড়ল কেন?

বসে আছেন নিজের অফিসে গম্ভীর মুখে হেডমাষ্টার। টেবিলের ওপর আমারই বাংলা রচনা খাতা। আমাকে আর পণ্ডিতমশায়কে দেখে আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমার দিকে কটমট করে চেয়ে দেখে

বললেন—এসব কি লেখা হয়েছে? আমি নীরব। বুঝতেই পারছি না কিছু। হেডমাষ্টার দাঁত কিড়মিড় করে বললেন—বাপের পেনসনটাও খাবার ইচ্ছে হয়েছে? না? ইংরেজকে তাড়াও! বাপকে যে পেনসন দিচ্ছে তাকেই তাড়াও? ফের যদি এ রকম লেখা দেখি, দূর করে দেবো ইস্কুল থেকে। রাসটিকেট করে দেবো। রিপোর্ট করব গভর্ণমেণ্টের কাছে। হতভাগা। বাঁদর! দূর হও। দূর হও সামনে থেকে।

চলে এলাম মাথা নীচু করে। ভোলা মাষ্টার পেছন পেছন আসছিলেন। বললেন—বাপের পেনসন্ নিয়ে টানাটানি না হয় শেষে। সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। ক'দিন খুব ভয়ে ভয়েই কাটালাম। এই বুঝি বকুনি খেলাম বাড়ীতে। মার খাওয়াও আশ্চর্য নয়। মার কখন খাইনি বলে কি এর পরও খাবো না? জীবনে কখন কানমলাও খাইনি। এবার বুঝি রক্ষে নেই।

শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। কিন্তু সেই মুহূর্তে বুঝলাম, এমন একটা কাজ করে ফেলেছি, যা সকলে পারে না।

কে এর জন্যে দায়ী? পূর্বজন্ম? কর্মফল? আমার মস্তিষ্ক? আমার কল্পনা? আমার বাংলা ভাষায় ভাব-প্রকাশের শক্তি? এসব আমি পেলাম কোথা থেকে? কেউ ত শেখায় নি! বুঝলাম, এই একটা শক্তি নিয়ে আমি জন্মেছি। এ শক্তি সমস্তই ম্লান করে দিতে পারে। বাংলা টিচারের ভ্রুকুটি। হেড্মাস্টারের দাঁত-খিচুনি। পিতার পেন্সন্ যাবার ভয়। সব। সব। এ শক্তি কি আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি? হতেও পারে। আমার জননী ছিলেন কবি। অতি সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন তিনি। ছাপানো হয়নি। কিন্তু আমরা পড়ে প্রচুর আনন্দ পেতাম। পিতাও কম আনন্দ পেতেন না। খুশী হয়ে জননীকে সোনার হাতঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। কিম্বা এ হয়ত আমার পূর্ব-জন্মার্জিত শক্তি। এ জন্মে বিকাশ না পেয়ে যায় না। পাবেই। তা সে দুর্ভিক্ষের ওপর রচনাই হোক। অথবা অন্য কিছুই

হোক। শুধু আমি যদি এ শক্তিকে নষ্ট করে না ফেলি।

এই ঘটনা যাট বছর পূর্বেকার। আজ ভাবছি, যাট বছর পূর্বে আমার লেখার শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়ার কি প্রচণ্ড চেষ্টাই হয়েছিল। দেড় হাজার বছরের দাস-মনোভাব জাতি বিসর্জন দেবে কি করে? শিক্ষক, অভিভাবক, এই দাসমনোভাব অকারণে বাড়িয়েই চলেন। পরাধীন জাতির এই ছিল দুর্ভাগ্য। এই অন্তরায় দূর করবার জন্যেই আমরা স্বাধীনতা চাই। পরাধীন দেশের প্রজার মস্তিষ্ক কখন স্বাধীন চিন্তা করতে পারে না। আমি যৎসামান্য প্রয়াস করেছিলাম। অজ্ঞাতসারে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার টিচার এবং হেড্‌মাস্টার শাসন করেছিলেন। কিন্তু আঘাত ত্বক পর্যন্তই পৌঁছতে পেরেছিল। epidermis ভেদ করে tissueতে পৌঁছতে পারে নি। রক্ত কলুষিত করতে পারেনি। মস্তিষ্ক বিষ বাষ্পে পরিপূর্ণ করে দিতে পারে নি। মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে দিতে পারে নি। মস্তিষ্ক শরীরের শীর্ষদেশেই থাকে। সর্বোচ্চ স্থানে। আজও সে সেখানেই আছে। কোন মূল্যেই আমি আত্মার অবমাননা ঘটতে দিইনি। কোন মূল্যেই আমি আমার মস্তিষ্ককে পরের তাঁবেদার করিনি। পরের তল্পী কখনই মাথায় নিয়ে বইনি। নিজের তল্পীই বয়েছি শুধু।

কি প্রচণ্ড দাসমনোভাব জাতির অন্তরে ছিল সেদিন, তাই ভাবি। কিই বা হয়েছিল? পণ্ডিত মশায় স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারতেন। হেডমাস্টার যৎসামান্য হাসি হেসেই কর্তব্য সাঙ্গ করতে পারতেন। দশবৎসরের বালকের উচ্চশির ধরার ধূলিতে লুটিয়ে দেবার চেষ্টা না করলেও পারতেন। পিতার পেন্‌সন্ বন্ধ-রূপ জুজুর ভয় না দেখালেও পারতেন। ইংরেজরা কি এতদূর নেমে যেতে বলেছিল? তবু এই ছিল সেদিনের দেশের মনোভাব। প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে হবে। প্রভুকে তুষ্ট করতে হবে যে কোন উপায়েই। আমার মনে হয় হেডমাস্টারের 'রায়সাহেব' উপাধি বোধহয় ভাগ্যে জুটেছিল। যদি নাও জুটে থাকে, তিনি তার যোগ্য ছিলেন, সন্দেহ নেই।

মাতৃভাষা পড়তে অত্যন্ত ভাল লাগে। বাংলা ত কেউ আমাকে শেখায় নি। বাংলা টিচার ভোলা পণ্ডিত মশায় ত কদাপি নয়। তাহলে বাংলা আমি শিখলাম কবে? কোথায়? কিই বা তখন বয়স! সবে মাত্র দশ বৎসর। চারবছর পরে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা পাশ করলাম। তখন চোদ্দবছর সাত মাস মাত্র বয়স! কটকের র‍্যাভেন্‌সা কলেজে পড়তে গেলাম। নিলাম সায়েন্স। অঙ্ক সঙ্গে রইল। ভুতের ভয় গিয়েও যায় না। উপায় কি! বিজ্ঞান পড়ব। বিদ্যুৎ কি শিখব। অথচ অঙ্ক নেব না? তা কি করে হয়?

সেই থেকে পিতামাতার আশ্রয়চ্যুত হয়ে স্বাধীনভাবে মেসে কাটাতে লাগলাম। আমার চেয়ে দু' বৎসরের বড় অগ্রজ ছিলেন সঙ্গে। কিন্তু সে কতটুকু পরাধীনতা? কলেজের বাঙ্গালী ছেলেরা তখন হাতে-লেখা একটা মাসিক পত্রিকা বের করত। তাতে একটা গল্প লিখলাম। নামটা আজও মনে আছে। "পাথেয়"। কি করে লিখলাম? জানি না। প্লট কোথা থেকে পেলাম? জানি না। কে শেখালো গল্প লিখতে? কেউ না। ষোল বছরের বালকের কি অভিজ্ঞতা জীবনের? কিছুই না। তবু লিখলাম গল্প! ভেতর থেকে যেন টগবগ করে গল্প বেরিয়ে এল। ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে। এর গতিরোধ করব এমন সাধ্য আমার নেই। কারণ, এ হল আমার অন্তর্নিহিত শক্তি।

গল্প পড়ে ভাল বলল সকলে। বুঝলাম, কলেজের অত বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে আমি এমন একজন ব্যক্তি যে বাংলায় গল্প লিখতে পারে। নিজের এই শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। এটা আমার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। ভাল কথা। কিন্তু এই ক্ষমতা নিয়ে আমি অতঃপর কি করব? আমাকে তো রোজগার করেই খেতে হবে। পিতার পেনসন্ তো চিরকাল আসবে না। তখন কি হবে? অতএব পড়তেই লাগলাম। অঙ্ক ভাল লাগে না। আই-এস-সি পাশ করার পর ছেড়ে দিলাম। বি-এস-সিতে বোটানী নিলাম। বোটানী ভাল

লাগে। বোটানী নিয়ে বি-এস-সি পাশ করলাম। ১৯২৬ সালে। অর্ধ শতাব্দী হয়ে গেল গ্র্যাজুয়েট হয়েছি। তারপর এই পঞ্চাশ বছর ধরে আমি নিজেকে কি গড়ে তুলেছি? ভাবছি তাই বসে বসে। এক পক্ককেশ বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়ে তাই ভাবছে। হ্যাঁ, গড়েছি বৈকি নিজেকে। সাহিত্যিক তৈরী করেছি। আমার যা সুপ্ত শক্তি ছিল তাকে জাগ্রত করেছি। বিকশিত হয়ে উঠেছি। আর কি চাই? স্বীকৃতি? দূর অস্তু! তাতে কি? তিন বছর আগে ১৯২৩ সালের জুন মাসে কলকাতায় পিতার মৃত্যু হয়েছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দেখে বলেছিলেন—what's the use of whipping a tired horse! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ডাক্তার। বুঝলেন সবই। রণক্লান্ত। যুদ্ধের অশ্ব। ঠিক কথা। বিশ্রাম চায় সে এখন। চির বিশ্রাম। চির শান্তি।

তিনদিন পরে পিতার মৃত্যু হল। পিতার মৃত্যু আমাকে খুব বেশি দুঃখিত করল না। পিতার সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। পিতার মৃত্যু আমাকে কৌতূহলী করল শুধু। এমনি করে মানব-জীবন শেষ হয়? এই মৃত্যু? সকলে কাঁদছে। জননী শুধু স্থির হয়ে বসে আছেন।

বয়স কম। ষোল। তবু শ্মশানে আমিও গেলাম। আমায় যে সব কিছু দু' চোখ মেলে দেখতেই হবে। আমার যে অভিজ্ঞতা চাই। অভিজ্ঞতা। পিতার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। পূর্বাহ্ণেই হয়ত সকলে অবগত ছিলেন। নইলে অতরাত্রে অতলোক গামছা-কাঁধে উপস্থিত হয়ে গেল কেমন করে? কলকাতা শহরে? রাত্রি এগারোটায়? ভোর চারটেয় তাঁর দেহ খাটে শুইয়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে "হরি বোল" ধ্বনি দিতে দিতে নিমতলার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। আমিও চলেছি। সর্বকনিষ্ঠ যাত্রী। চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখছি শুধু। তখনো কলকাতা ঘুমোচ্ছে। চারদিক অন্ধকার। রাস্তায় তখনো আলো জ্বলছে। আমরা ছোট একটি দল চলেছি। গঙ্গার তীরে।

আমি কি সেই দলে বেমানান্ ছিলাম ? সম্ভবতঃ ছিলাম। নইলে সকলে আমার দিকে বার বার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল কেন ? এত শীঘ্র পিতৃহীন হল ? আমি কি কখন ভুলতে পারি নিমতলার ঘাটে বসে গঙ্গার তীরের সেই দৃশ্য ? আমি কি কখন ভুলতে পারি শ্মশান-কর্তৃপক্ষের শবদেহের মুখের ঢাকনা খুলে মুখ দেখা ? আমি চমকে উঠলাম। একি দেখছি ? এত শীঘ্র এত বিবর্ণ ! অবাক হয়ে গেলাম। মৃত্যু হলে এত শীঘ্র এত পরিবর্তন হয় ? তারপর দেখলাম প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে তাঁর মৃতদেহ একটু একটু করে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটু একটু করে তাঁর দেহ জ্বলে যেতে দেখছি। তখনো রয়েছে চক্ষুর বিবর। নাসিকার গহ্বর। মাথার খুলি থেকে মস্তিষ্ক গলে পড়ছে জলের ধারার মত। সবই দেখছি। এই মনুষ্যদেহের অন্তিম পরিণাম !

অতি অল্প বয়সে, অতি বীভৎস দৃশ্য অতি আগ্রহ-সহকারে দেখলাম। আমাকে যে দেখতে হবে। জগতের সব দৃশ্যই। সুন্দরও। কুৎসিতও। আমাকে যে প্রকাশ করতে হবে। যা কিছু দেখছি। সবই। সুন্দরও। কুৎসিতও। রাবণ বিনা রাম কোথায় ? স্নানান্তে ১৩২ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে ফিরে এলাম। সেই গৃহ এখনও আছে। আজও যতবার রাস্তা দিয়ে যাই ওপরের দিকে চেয়ে থাকি। দোতালার ওই ঘরেই পিতার মৃত্যু হয়েছিল। তিপান্ন বছর আগে। তবু ঘাড় তুলে না দেখে থাকতে পারি না। কেন ? জানি না। স্মৃতি ! হবে। অতীত বড় রঙীন। অতীত বড় মধুর। বর্তমান নিয়েই যত মাথা ব্যথা। যত দায়-দায়িত্ব।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে মাতাঠাকুরাণীকে দেখে বিস্মিত হলাম। কিন্তু গোঁসাই-শিষ্যা তিনি। এত সহজে ভেঙ্গে পড়তে পারেন কখন ? আমাকে গ্রহণ করলেন অতি শান্তভাবে। যেন কিছুই হয় নি। সব অলঙ্কার খুলে ফেলেছেন। কানের, হাতের, গলার, সব। সাদা থান পরেছেন। ক্রমাগত মাথায় জলের ঝাপ্টা দিচ্ছেন। মাতার এই বৈধব্যরূপ দেখে চিত্ত বিগলিত হয়ে গেল। কিন্তু উপায় কি ? সমস্তই

অবিচলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। জননীকে দেখে মন অনেকটা সবল হয়ে উঠল। কোন সান্ত্বনার মামুলীবাক্য উচ্চারণ করেন নি জননী। কিন্তু তাঁর আচরণে প্রকাশ পেয়েছে অন্তরের বলিষ্ঠতা। ধর্ম তাঁকে ধারণ করতে শিখিয়েছে। বিপদে তিনি বিচলিত নন।

মাতৃদেবীর শক্তি দেখেই সেদিন পিতৃশোক সহ্য করতে পেরেছিলাম। অনেক সময় ভেবেছি মাতৃদেবী এই শক্তি পেলেন কোথা থেকে? তাঁর গুরুদেবই তাঁকে এই নির্ভর করার শক্তি দিয়েছিলেন। ধর্মকে শুধু আমি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই দেখিনি। চরম দুর্দিনেও মাতার মুখে নৈরাশ্য দেখিনি। অসহায়ত্বের চিহ্ন দেখিনি। বিশ্বাসের মৃত্যু মানেই ঈশ্বরের মৃত্যু। জননীর চিত্তে ঈশ্বর-বিশ্বাস দৃঢ়মূল ছিল। তাই তাঁর চিত্ত কোন কারণেই বিক্ষিপ্ত হয়নি। এসব জিনিস তর্ক দ্বারা উপলব্ধ হয় না। সাধনার দ্বারা অর্জিত হয়। গড়ে ওঠে একটা ব্যক্তিত্ব।

দু'দিন পরে পুরীতে ফিরে এলাম। ভোলামাস্টার এলেন। এইবার তাঁর আর এক মূর্তি দেখলাম। তিনি পৌরোহিত্যও করতেন। যে কোন উপায়ে অর্থ রোজগার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। শিক্ষকের বেতন অতি কম। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক। অতিরিক্ত দুঃসাহসী। তার চেয়েও বেশী পরিশ্রমী। আলস্য কাকে বলে জানেন না। সর্ববিধ বিলাসের সঙ্গে অপরিচিত। প্রাইভেট টিউশন যতগুলি পেতেন, ততগুলি করতেন। ছাড়তেন না একটিও। কোথাকার লোক কোথায় এসেছেন। অর্থ রোজগার করতেই ত? অতএব পণ্ডিত মশাই দান-সামগ্রীর যা ফিরিস্তি দিলেন তা দেখে আমাদের মাথা ঘুরে গেল। মাতার সঙ্গে নানা তর্ক-বিতর্ক হতে লাগল। মাতা বললেন—অত খরচ করতে পারব না। ছেলেরা কেউ রোজগার করছে না!

ভোলামাস্টার বলছেন—পারতেই হবে। আত্মার কল্যাণই যদি না হল, তাহলে অর্থ রেখে গিয়ে লাভ হল কি? মাতা যতই বলছেন—যা আপনারা ভাবছেন তা ঠিক নয়। বিশেষ-কিছুই রেখে যেতে পারেননি। ভোলামাস্টার ততই অবিশ্বাসের হাসি হাসছেন। কারণ, অবিশ্বাসের

হাসি হেসেই তাঁর লাভ।
ভোলামাস্টার উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সচ্চরিত্র। আচারনিষ্ঠ। মস্তকে শিখা। পরনে খাটো ধুতি। নগ্ন দেহে শুধু উত্তরীয়। শুভ্র উপবীত। ব্রাহ্মণদের সে পোষাক পরতে আর দেখতে পাওয়া যায় না। এই পরিচ্ছদ পরেই তিনি সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পুরীর বাঙ্গালী-সমাজে ভোলাপণ্ডিত এক আদর্শ ব্রাহ্মণ। সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধা পেতেন। পরিবারের সকলের খুব প্রিয়। তাঁর এই মূর্তি দেখে আমি আশ্চর্য্য হলাম। বিন্দুমাত্র সমবেদনা নেই। কেবল ব্যয় করাবার দিকেই চেষ্টা। জানেন প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে দেওয়া সব জিনিসই অবশেষে তাঁরই ঘর আলো করবে।
পিতার পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন হল। এইবার কি হবে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বললেন—তোমার যা ইচ্ছে করতে পারো। কিন্তু এম এস সি পাশ করে তারপর যা ইচ্ছে কোরো। নইলে লোকে বলবে, বড় ভাই কিছুই দেখল না। বললাম—তাই হবে। এম এস সি পাশ করে তারপর অন্য কথা।
পিতাকে স্বচক্ষে ভস্মে পরিণত হতে দেখেছিলাম কেন? একটি মাত্র কারণে। জানবার ইচ্ছা। জ্ঞাতুং ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাই আমাকে আজীবন পেছনে পেছনে তাড়া করেছে। আজও করছে। বিচিত্র আমার কৌতূহল। জানবার ইচ্ছা। সবকিছুই। সমস্ত কিছুই। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, কষ্ট, সবই। অভিজ্ঞ হতে হবে। সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। কেন অভিজ্ঞতা চাই? বোধহয় একদিন প্রকাশ করতে হবে বলেই। যে আমার হাতে ভাষা দিয়েছিল সে-ই বিষয় খুঁজে নিতেও বলেছিল।
লেখার শক্তি আমার সর্বদেহের সর্বকোষের gene নামক লাইব্রেরীতে সঞ্চিত ছিল। প্রত্যেক কোষে ছেচল্লিশটা করে chromosome। প্রত্যেক chromosome-এ 40,000 ইউনিট করে gene। gene-এ থাকে একটা রাসায়নিক অ্যাসিড। নাম সংক্ষেপে ডি, এন, এ।

অর্থাৎ dioxyribonucleic acid। খোরানা genetic code এর রহস্য উন্মুক্ত করলেন। মানব-সত্তার সমস্ত রহস্য তার gene-এর মধ্যে। মাথায় কত উঁচু হবে। গায়ের রং কেমন হবে। মনের গতি আকাঙ্ক্ষা কেমন হবে—এই সমস্ত জিনিসের নির্দেশক gene। পূর্বপুরুষের গুণ ইত্যাদি সন্তান-বংশে কে নিয়ে আসে? এই gene। প্রত্যেক কোষের কেন্দ্রে থাকে যে chromosome, সে পূর্বপুরুষের ধারাবাহিকতা প্রত্যেক কোষের cytoplosm-এ পৌছিয়ে দেয়। সে বার্তা বহন করে চলে ribonucleic acid দুই ভাইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কেন? পিতা-পুত্রে সাদৃশ্য কেন? gene-এর জন্যে। আমি সজ্ঞানে না হোক, অজ্ঞানে তারই নির্দেশ পালন করে চলেছি আজীবন। প্রকাশ করতে হবে একটা কিছু। যা মানুষ আজও জানতে চায়। কালও জানতে চাইবে। চিরকাল জানতে চাইবে। সে বস্তু কি? জীবন-সত্য। আমার জীবন-সত্য কি? এই প্রশ্নই আমাকে চিরকাল বিব্রত রেখেছে। আমার জীবন-দর্শন কি? জীবন-জিজ্ঞাসা কি?

বি-এস-সি পাশ করেছি। এম-এস-সি পড়তে হবে। কলকাতায় পড়ার ভয়ঙ্কর ইচ্ছে। কিন্তু কলকাতায় সীট পেলাম না। বয়স কম। কলকাতায় সে সময় ষোলো বৎসর না হলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হত না। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে নিয়ম ছিল না। এই জঘন্য প্রথার শিকার হলাম আমি। অল্প বয়স? সে কি একটা বাধা? রামানুজম্ কয় বৎসর বয়সে এফ-আর-এস হয়েছিল? শঙ্কর কয় বছর বয়সে বিশ্ববিজয় সমাপ্ত করেছিলেন? যীশু কয় বছর জীবিত ছিলেন? জোয়ান অব আর্ক কয় বছর বেঁচে ছিলেন? রাফায়েলের কত বছর বয়স হয়েছিল? নীট্সে কয় বছর বয়সে অধ্যাপক হয়েছিলেন? বয়স। বয়স শেষে হল কিনা বাধা?

গেলাম লক্ষ্ণৌ। সেখানকার অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের শ্যালক ময়ুখ টেনে নিয়ে গেল। সে ছিল আমার বাল্যবন্ধু। বোটানীর head of the department ডাঃ সাহনীর সঙ্গে দেখা করলাম। সুন্দর

চেহারা। ঠিক সাহেবদের মত দেখতে। নিখুঁত বিলাতী পোষাক। ঠিক যেন ইতালীয়ান। তেমনি বাদামী রং। হেজেল চক্ষু। টিকোলো নাক। ব্যাকব্রাস করা চুল। বিলেতে তের বছর ছিলেন। লণ্ডনের ডি এস সি। রুচিরাম সাহনীর ছেলে। পাঞ্জাবী। আমাকে গ্রহণ করলেন সৌজন্যের সঙ্গেই। কিন্তু ভর্তি করার ব্যাপারে নিজের অক্ষমতা জানালেন। সব নাকি Dean of the Faculty of science, ডাঃ ওয়ালী মহম্মদ-এর হাতে। তিনিও অক্ষমতা জানালেন। সব সীট ভর্তি হয়ে গেছে। ডাঃ সাহনী বললেন—তুমি পরিজার ছাত্র। আসছ উড়িষ্যা থেকে। আমাকে তোমার প্রফেসর এক লাইন লিখে জানালেন না কেন? সীট রাখতাম।

বললাম—কলকাতায় পড়বার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেখানে রয়েছে বয়সের বাধা। এখানে আসতে তাই বাধ্য হয়েছি।

রোজ একবার ডাঃ সাহনী। একবার ডাঃ ওয়ালী মহম্মদ। এই করছি। সাতদিন পরে বুঝলাম হবে না। ডাঃ সাহনীর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি দুঃখিত হলেন। কিন্তু কি করবেন! তাঁর হাতে কিছুই নেই। বললাম—আসছে বছর যেন আমার জন্যে একটা সীট রাখা হয়।

ডাঃ সাহনী বললেন—আসছে বছর? মানে—মানে—একটা বছর কেন lose করবে? অন্য কোথাও যাও না। আগ্রা, এলাহাবাদ।

বললাম—পড়ি যদি, আপনার কাছেই পড়ব। নতুবা পড়বই না।

বললেন—কেন?

বললাম—এমনিই।

ডাঃ সাহনী কি যেন ভাবলেন। বাঙ্গালীরা ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। একথা তিনি জানতেন। কিন্তু তাই বলে এতো? কথাবার্তা ক'দিন ধরে চলছিলই। আমার পরনে অতিশয় সাদাসিদে পোষাক। ধুতি পাঞ্জাবী আর চপ্পল। লক্ষ্ণৌ তখন ছিল, যাকে বলে, স্যুট-বুটের দেশ। ঠাট-ঠমক আর জাঁকজমকের জায়গা। ডাঃ সাহনীও দস্তুরমত স্যুট-

বুটধারী। ষোল আনা সাহেব। তবু তিনি কি যেন ভাবলেন। উজ্জ্বল চোখ দুটো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন—আচ্ছা দশ মিনিট অপেক্ষা কর। আমি আসছি।

হ্যাট-র‍্যাকে রাখা ছিল তাঁর সাদা ফেল্ট-হ্যাট। রং আজও মনে আছে। তুলে নিয়ে গট্ গট্ করে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। রাস্তায় রাখা ছিল তাঁর citroen গাড়ী। নিজেই self-starter মেরে কোথায় যেন চলে গেলেন উর্ধ্বশ্বাসে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এলেন। বললেন - come with me। সঙ্গে সঙ্গে চললাম।

একটা বড় ঘরে ঢুকলেন। লম্বা টেবিলে সারি সারি মাইক্রোস্‌কোপ্। একটা আলাদা টেবিলে একটি স্থূলকায়া মহিলা। মাইক্রোস্‌কোপের সামনে বসে কাজ করছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। ডাঃ সাহনী বললেন—মিস্ বক্‌স্! Have you any objection if Mr Mukerjee becomes your laboratory partner?

মিস্ বকস্ প্রথমটা ভাল বুঝতে পারলেন না। ডাঃ সাহনী পুনরুক্তি করলেন। মিস্ বক্‌স্ বললেন—No sir! I have no objection. ডাঃ সাহনী আমার দিকে তখন ফিরে বললেন—Go and deposit your fees।

আমি অফিসে গিয়ে ফি জমা করে দিলাম! পরে শুনলাম, ডাঃ সাহনী ভাইস-চানসেলার ডাঃ জি, এন, চক্রবর্তীর কাছে গিয়ে special seat-এর অনুমতি নিয়ে এসেছিলেন। এই নিয়ে ডাঃ ওয়ালী মহম্মদের সঙ্গে অনেক মনোমালিন্য নাকি হয়েছিল। কেন তিনি Dean-কে টপকিয়ে ভাইস-চানসেলার-এর কাছে গিয়েছিলেন। ভাইস-চানসেলার, Dean-কে জিজ্ঞেস না করে কেন অনুমতি দিয়েছিলেন? ইত্যাদি। হায় ডাঃ ওয়ালী মহম্মদ! তোমাকে আজ কে মনে রেখেছে? কিন্তু সাহনী আর চক্রবর্তী অমর। কারণ তাঁরা ছিলেন মানবপ্রেমিক। মানবিকতার পূজারী।

ডাঃ সাহনী আমার ভেতরে পেয়েছিলেন হয়ত একটা ঐকান্তিকতা। হৃদয়-সর্বস্বতা। emotion। emotion-এরও মূল্য আছে। হৃদয়ই হৃদয়কে স্পর্শ করে। ডাঃ বীরবল সাহনী ছিলেন যৎপরোনাস্তি হৃদয়বান পুরুষ। বিলিতী সভ্যতার একটা মুখোস পরে থাকতেন বটে। কিন্তু মুখোস খসে পড়তে দেরী হত না। তিনি সাহেব ছিলেন না। মনে-প্রাণে ভারতীয় ছিলেন। দেশভক্ত। ভারতের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। এমন-কি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রদ্ধাশীল। বিদেশী কাগজের ফুল নয়। স্বদেশী রজনীগন্ধা।

একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল। ক্লাসে যেতে দেরী হয়েছিল। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কারণ বলেছিলাম। তিনি শুনে অবাক হয়ে বলেছিলেন—বৃষ্টির জন্যে তুমি ক্লাসে আসতে পারোনি? জানো, লণ্ডনে সব সময় বৃষ্টি হচ্ছে? আমি কখন বৃষ্টির জন্যে ক্লাসে যেতে দেরী করেছি, এমন কথা মনে পড়ে না ত।

লজ্জিত হয়ে বলেছিলাম—আর কখন হবে না স্যার।

সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন—অল রাইট! আমি নত মস্তকে চলে এলাম। একদিন একটা পাহাড়ী গাছ এনে আমায় বললেন—classify কর। পাহাড় থেকে এনেছি।

বুঝলাম আমায় পরীক্ষা করছেন। ছুরি কাঁটা নিয়ে বসলাম। lens লাগালাম। dissect করতে লাগলাম। Morphologyর বই সামনে রেখে। লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে এগোচ্ছি। অবশেষে তাকে classify করতে পারলাম। Saxifragaceal familyর specimen ছিল। ডাঃ সাহনীকে গিয়ে বললাম। তিনি বললেন—yes! you are right। I was also thinking like that!

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম বলেই মনে হল। জীবনে পরীক্ষার আর শেষ নেই।

বোটানী পড়ছি। কিন্তু বোটানীতেই সমস্ত মন সমর্পণ করতে পারছি না। লাইব্রেরীটাই যেন টানতে থাকে বেশী। ওখানে লাইব্রেরীর

ভেতরে গিয়ে বই ঘাঁটবার অধিকার ছিল। যা র‍্যাভেনসা কলেজে ছিল না। কার্ড ছিল। লাইব্রেরীয়ানকে দিয়ে লেখাতে হত কি কি বই নিলাম। সেই কার্ড এবং বই দেখাতে হত, দরজার সামনে বসে থাকা দরওয়ানকে। দরওয়ান দিল্লীর লালকেল্লারই দরওয়ান যেন। মাথায় বিরাট পাগড়ী। কোমরে খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার। নাকের নীচে বিরাট গোঁফ। হোমড়া-চোমড়া পোষাক। দশাসই চেহারা। পায়ে জুতো। কোমরে ব্রিচেস্‌। সে কার্ড দেখে বই মিলিয়ে নিয়ে কার্ড ফেরৎ দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। আমার কার্ডে আমার নাম ও ক্লাস লেখা ছিল। যতবার লাইব্রেরী যেতাম ততবারই এই বিরাট দেহ ভারিক্কী চেহারার, সুশোভন, দরওয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করত। খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম। অস্বীকার করতে পারি না। প্রত্যেক পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ষ্টুডেন্টকেই এই সম্মান দেখাত।

লক্ষ্মৌ ছিল নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ-র দেশ। অযোধ্যায় শেষ নবাব। ইউনিভার্সিটি ছিল residential। বাদশাবাগে। নবাবের খোদ প্রাসাদে। এখনো বেগমদের স্নানাগার বর্তমান। এখানকার সমস্ত জিনিসই অতিরিক্ততা দোষে দুষ্ট। কথাবার্তা অলঙ্কৃত। বাহুল্য। আচার-ব্যবহার পোষাক-পরিচ্ছদ সবই চাকচিক্যে পরিপুর্ণ। সামান্য টাঙ্গাওয়ালাও যেন নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ-র ক্ষুদ্র সংস্করণ।

লাইব্রেরীতে বসে বসে পড়তাম সাহিত্যের বই। বিশেষ করে নাটক। কেন নাটক এতো ভাল লাগত জানি না। হঠাৎ একদিন অসুখে পড়লাম। ময়ুখ প্রায়ই আসত দেখতে। মাথায় অসহ্য ব্যথা। মাথা টিপে দিত। কিন্তু রাত্রে তাকে চলে যেতেই হত। অবাঙ্গালী ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। বাঙ্গালী ছাত্র বিদেশী ছাত্র হয়েই এখানে থাকে। Meston Hostel-এর বিরাট দুটো দোতলা বাড়ী। অজস্র ছেলে থাকে। গেট নেই। পাহারা নেই। প্রত্যেক রুম single seated। কিন্তু বাঙ্গালী ছেলেদের সংস্কৃতি যেন আলাদা। উত্তর-প্রদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামীয় প্রভাব। মিল খায় না। ময়ুখ একদিন

বললে—যাবি হাসপাতালে ? আমি আঁৎকে উঠে বললাম—কেন ভয়ঙ্কর কিছু হয়েছে নাকি রে ? সে বললে—না না সেজন্যে নয়। আরামে থাকবি student ward-এ। খুব ভাল ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক ষ্টুডেন্টই ইউরোপীয়ান। বুঝলি ? ডাক্তার-নার্স ওষুধপত্র সবই আছে। এখানে মিছিমিছি একলা পড়ে আছিস। কষ্ট পাচ্ছিস।

হাসপাতাল ! একে ত উড়িষ্যার ছেলে, এসেছি উত্তরপ্রদেশে। বিদেশ বিভূঁই জায়গা। অজানা অচেনা সবই। জলের মাছ যেন ডাঙ্গায় উঠেছে। তার ওপর হাসপাতাল। এক মিনিট ভাবলাম। কিন্তু অভিজ্ঞতার জন্যে আমি লালায়িত। রাজী হলাম যেতে।

বন্ধু টাঙ্গায় করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। King Georges Hospital। ডাক্তার হোষ্টেলের ডাক্তারের কার্ড দেখে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। বন্ধু বিদায় নিল। ওপরে যাবার হুকুম নেই। বিরাট হাসপাতাল। গম গম করছে। ফিনাইলের গন্ধ। চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দোতলায় একটা বড় ঘর। ছটি বিছানা। পাঁচটিই ভর্তি। রুগীরা লম্বা হয়ে শুয়ে আছে আমাকে একটা শূন্য খাট দেখিয়ে দিয়ে হাসপাতালের বেয়ারা চলে গেল। লোহার সাদা এনামেল করা খাট। দুগ্ধফেননিভ শয্যা। বিছানায় উঠে বসলাম। সঙ্গে একটি ছোট সুটকেস। রেখে দিলাম এক পাশে।

রুগীরা সকলেই আমাকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। সকলেই ষ্টুডেন্ট। মেডিকেল কলেজের ছাত্র। সকলেরই দাড়ি। বুঝলাম সকলেই মুসলমান। হঠাৎ এক হিন্দুকে মুসলমানের পাশের বিছানায় স্থান নিতে হল। কে যেন আমাকে মুসলমানদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দিতে চায়। এর পূর্বে মুসলমানদের সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না আমার। খাটে বসে চুপ করে ভাবছি। কোথাকার ছেলে—কোথায় এলাম। কোথায় সেই পরিচিত পরিবেশ ? এ যে লক্ষ্ণৌ। হাসপাতাল ! দুই পাশে দুই বিধর্মী। ওষুধের গন্ধ। হঠাৎ অতি মৃদু কণ্ঠে পাশের মুসলমান ছেলেটি বললে লেট যাইয়ে ! লেট যাইয়ে না।

এদেশে নতুন এসেছি। উর্দু জানি না। কিছুই বুঝতে পারলাম না। জবাব কি দেবো? তিনি আবার বললেন—লেট যাইয়ে না। কেঁও তক্‌লিফ্‌ কর রহে হেঁ? লেট যাইয়ে। ইতমিনানসে।

এবার ইংরিজীতে বললাম What is লেট যাইয়ে। I do not understand।

প্রশ্নকর্তা অবাক হয়ে বললেন you do not understand urdu?

বললাম No।

সে বললো you come from Bengal?

বললাম Orissa to be more correct।

সে জিজ্ঞেস করল your name please! বললাম। ঘরের আর চারটি রুগীই তখন আমাকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। একি রকম চিজ? এসেছে লক্ষ্ণৌয়ে। উর্দু জানে না। কি করে থাকবে এখানে?

ভদ্রলোক কোমল কণ্ঠে বললেন লেট যানা means to lie down, why are you sitting like this? lie down, take rest! thank you! বলে—আমিও পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। সাদা ফ্রক পরা, সাদা জুতো মোজা পরা, সাদা হুড্‌ মাথায়, তরুণী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স এসে হাজির হল। সাদা চকচকে দাঁতে উজ্জ্বল হাসি। লাল পরিপুষ্ট ঠোঁট। হাতে থার্মোমিটার। সেটা মুখের কাছে এনে বললে open! please! আমি বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলাম। এ আবার কি উপদ্রব? নার্স বললে I will take your temperature! open your mouth। খুললাম মুখ। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে। একই থার্মোমিটার সকলের মুখে ঢোকানো হচ্ছে। একবার লোসনে ডুবিয়ে নিয়ে। হিন্দু মন চঞ্চল হয়ে উঠল। এঁটো, উচ্ছিষ্ট, ইত্যাদি কথাগুলোর সঙ্গে জন্মাবধি পরিচিত। সংস্কারে আঘাত লাগল। কিন্তু এ সংস্কার আমায় ছাড়তেই হবে। তাই হয়ত আমায় বিদেশে এই হাসপাতালে আসতে হয়েছে। আমার বিধাতা আমার জন্য যে কর্মপন্থা নির্দিষ্ট রেখেছেন, সেখানে গোঁড়ামীর স্থান নেই।

রাত্রের হালকা ভোজন শেষ হয়ে গেছে। দুধ আর পাঁউরুটি। আটটার সময়েই ঘরের বিজলীবাতি মাটি পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘর প্রায় অন্ধকার। মেজেতে একটা গোলাকার আলো শুধু। রাত্রে পাহারা থাকেন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সিস্টার। তিনি বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বই পড়তে থাকেন। গল্প করবার হুকুম নেই। তবু আমরা ফিস ফিস করে গল্প করছি। আটটার সময় কখন ঘুম আসে? ষ্টুডেণ্ট বলে সিস্টার বিশেষ কিছুই বলে না। তবে নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। মুসলমান রুগী জিজ্ঞেস করল যোগের কথা। বললাম।

জ্বর দুদিনেই ছেড়ে গেল। কিন্তু হাসপাতালের রেসিডেণ্টল সার্জন কিছুতেই ছাড়ে না। বাঙ্গালী ছেলেটিকে তার ভাল লাগতে লাগল। বললে you are coming from such a far off place. We should treat you well. ডাক্তারটি উত্তরপ্রদেশের লোক। সভ্য, ভব্য, বিনয়ী, কেতাদুরস্ত। জিজ্ঞেস্ করলে what would you like to eat? Fish? বললাম not so keen about it. তখন বললে chicken? বললাম lovely! সঙ্গে সঙ্গে chicken diet এর ব্যবস্থা হয়ে গেল। স্টুডেণ্ট সকলেই ইউরোপীয়ান। কাজেই দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ পরমানন্দে কেটে গেল। ডিম, টোস্ট, মুর্গী, মাখন, দুধ খাচ্ছি। আর সকলের সঙ্গে গল্প করছি। ডাক্তার, নার্স, রুগী।

হাসপাতালে বাঙ্গালী নেই। ঘরের সকলেই মুসলমান। বারান্দায় ক্রীশ্চিয়ান সিস্টার। আমি উড়িষ্যার ছেলে। কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি। উত্তরপ্রদেশের নামী সহরে। নামী হাসপাতালে। সেখানে সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শুয়ে আছি ঐতিহ্য গর্বিত মুসলমানদের মধ্যে। ব্যবহারে যারা ত্রুটিহীন। একেই বলা হয় কালচার।

মানুষের ভেতরের ও বাইরের সুসঙ্গতিই হল প্রকৃত কালচার। লক্ষ্ণৌয়ে

এই জিনিসটি পেয়েছিলাম। শিখেছিলামও। প্রাচীন গ্রীকো-রোমান কালচার ছিল বুদ্ধি ও মনের সৃষ্টি নিয়ে। ইউরোপীয় কালচার—দেহবাদী। জড়বাদী। materialistic। ভারতের কালচার আধ্যাত্মিক। spiritualistic।

অদ্যাপিও তাই। স্থায়ী কালচার। নইলে মুসলমান যুবক যোগ সম্বন্ধে জানতে চায় কেন? ভারতীয় কালচারের কেন্দ্রগত জিনিস, অন্তরের পরিকল্পনা। শাশ্বত আত্মার পরিকল্পনা। ইসলামের সুফী সম্প্রদায়ে এই জিনিষ আছে। দারা সিকোহ (১৬১৫ –১৬৫৯) দুই সাগরের মিলন (মেজমা-উল বাহ্‌রায়েন) এই নামে উচ্চাঙ্গের দার্শনিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। সংস্কৃত উপনিষদ থেকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। নাম দেন "শিরি আশরার"। তারই প্রতিধ্বনি তো শুনতে পেলাম ওই মুসলমান রুগীর মুখে। সে এক বিপজ্জনক অস্ত্রোপ্রচারের প্রতীক্ষা করছিল। ভেতরে ভেতরে হয়ত ভয়ে কাঁপছিল। ধর্মের সব চেয়ে প্রয়োজন কখন? বিপদের মুখে। তখন তাকে ধারণ করবে কি? ধর্ম। সুফী সাধকদের আদর্শ—ফাণাফিল্লাহ অর্থাৎ আল্লার মধ্যে সম্পুর্ণভাবে আত্মসমর্পণ! এই আদর্শ বৌদ্ধ নির্বাণ আদর্শের অনুরূপ। আরবের সাধক মনসুর আবেগের বশবর্তী হয়ে বলে ওঠেন—আনাল-হক অর্থাৎ আমিই খোদা। বেদান্তের সোঽহং এই কথাই বলে। কিন্তু কাজীর বিচারে, তাকে এই কথা বলার জন্যে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। একজন আরব কবি হজরৎ মহম্মদের জন্মের দেড়হাজার বছর পূর্বে ভারতের চতুর্বেদের প্রশংসা করে পাঁচটি কবিতা লিখেছিলেন। তার প্রভাব আরব থেকে কর্পুরের মত উড়ে যেতে পারে কখন? আছে, এখনো আছে।

লক্ষ্মৌ হাসপাতালে আমি ভারতবর্ষকে যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেরেছিলাম। রোগের বিরুদ্ধে সবাই এক। এক হয়ে সকলেই লড়ছে। হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান, অ্যাংলোইণ্ডিয়ান, উত্তরপ্রদেশীয়, বাঙ্গালী, সব এক। রুগীদের কোন জাত নেই। ধর্ম নেই। স্টুডেন্ট ওয়ার্ডে হিন্দু

মুসলমানের পার্থক্য ছিল না! কিন্তু ত্রিশ বছর পরে ধর্মের পার্থক্যের জন্যে দেশকে পৃথক করা হল। আজও কারণ ভেবে পাই না। ইংরেজ, স্কট ও আইরিশ মিলে গ্রেট ব্রিটেন করেছিল। আমাদের মহাত্মা, পণ্ডিত, সর্দার, মৌলানা, দেশগৌরব, ভারত রত্নরা মিলে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তিন টুকরো করে দিলেন। এরা আবার পণ্ডিত? এরা আবার দেশগৌরব! দেশকলঙ্ক তাহলে কারা? মূর্খ তাহলে কারা? ক্ষুদ্রাত্মা তাহলে কারা? দুরাত্মা?

লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে এসে দেখলাম বন্ধু সর্বত্রই আছে। মানুষ কোথাও নির্বান্ধব নয়। কেবল মনের ক্ষুদ্রতা বর্জন করতে হবে। সমস্ত প্রতিকূলতাই শেষ হবে। মন! মন! চাবিকাঠি হল মন। মনের বন্ধ তালাটি খুলতে পারলেই হল। মানুষ সর্বত্র সেই মানুষই। যেমন উড়িষ্যা, তেমনি উত্তরপ্রদেশ। যেমন বাঙ্গালী, তেমনি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। ক্রীশ্চিয়ান। যেমন হিন্দু, তেমনি মুসলমান। সকলের ভেতরই একই নরদেবতা বর্তমান!

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিত্যালয়ে সে সময় বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকরাই অধ্যাপনা করতেন। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ইত্যাদি। বিশ্ববিত্যালয়ের বাইরেও তাই। গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অসিতকুমার হালদার। তিনি নাট্যকারও ছিলেন। লিখেছিলেন দুটো নাটক। "বাঁশীর ডাক" এবং "আপদ বিদায়"। শুধু লিখেই তাঁর তৃপ্তি নেই। অভিনয় করাতেও হবে। রবীন্দ্রনাথ যে তাই করতেন। অতএব রবীন্দ্র শিষ্যকেও তাই করতে হবে। বাঙ্গালী ছেলে চাই। ময়ূখ সহায় হল। অভিনেতা জোগাড়ের ভার তার ওপর। সে আমাদের জোগাড় করল। আমরা অসিতকুমারের সুদৃশ্য বাংলোয় গেলাম। রিহার্সাল শুরু হল। পাহাড়ী সান্যাল তখন লক্ষ্ণৌয়ে। গান জানেন। তাঁকে দেওয়া হল প্রধান ভূমিকা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রিহার্সাল চলতে লাগল।

অসিত হালদার এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মূর্তিমান শান্তিনিকেতন যেন। শান্তিনিকেতনের বিশেষত্ব কি জানতে হলে অসিতকুমারকে জানতে হয়। অসিতদাকে দেখেই আমি শান্তিনিকতেনের ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। যদিও তখনও শান্তিনিকেতন চোখে দেখিনি। কিন্তু ভাবতাম যদি এই শান্তিনিকেতনের আর্টিষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে জয় হোক শান্তিনিকেতনের। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি সুন্দর মার্জিত আচরণ। তেমনি সুমিষ্ট ব্যবহার। অতি সুন্দর বাগানে ঘেরা কোয়ার্টার তাঁর। সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। ইংরেজী ফার্নিচার। কিন্তু দেশী চিত্র টাঙ্গানো দেওয়ালে। টেরাকোটা ও পেতলের নানা মূর্তি। নানা আর্টসম্পদ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন শিল্পী প্রকৃতির। অপূর্ব কোমলতা ও স্নেহ-মমতায় ভরা। আমরা জনকয়েক বাঙ্গালী ছাত্র বাদশাবাগ থেকে আসতাম। এক সেকেণ্ডের জন্যে মনে হত না, আমরা এখানে শুধু প্রয়োজনের খাতিরেই এসেছি। এমন সুন্দর ব্যবহার ছিল অসিতবাবু ও তাঁর স্ত্রীর। প্রতিদিন চায়ের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলযোগের আয়োজন থাকত। আমরা সোল্লাসে, সশব্দে, সোচ্চারে খেতাম। অসিতবাবু বলতেন—জলযোগ হাজির, তবে গোলযোগের হেতু? আমরা সমস্বরে বলতাম—অহেতুক! অহেতুক! শিল্পীর বাড়ীতে যদি হেতুই থাকবে তাহলে শিল্পীর বাড়ী কি? তাহলে ত প্রিন্সিপ্যালের বাড়ী হয়ে যাবে। দু'জনের মুখেই যেন হাসি ছাড়া অন্য কোন চিহ্নই নেই।

অসিতদা মাথায় যেমন লম্বা, তেমনি অপূর্ব গৌর বর্ণ রং তাঁর। তেমনি সদাপ্রসন্ন চিত্ত। আমাদের সঙ্গে সব বিষয়ে কত তফাৎ। কিন্তু মনে হত আমরা যেন সমবয়সী। যখন তিনি নিজে অভিনয় করে দেখাতেন কারুর কারুর ভূমিকায় তখন প্রাণ ঐশ্বর্যে এতো পরিপূর্ণ হয়ে যেতেন, যে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। সে কথা একটু উল্লেখ করলেই বলতেন আমাকে কি দেখছ? গুরুদেবকে যদি দেখতে। অভিনয় শেখাতে গিয়ে ক্ষেপে যেতেন একেবারে। জ্ঞানকাণ্ড থাকত না।

আমার সব শিক্ষা দীক্ষা ত তাঁর কাছ থেকেই। অভিনয় বল, শেখানো বল, সব সব। এমন কি নাচ পর্যন্ত। অসিতবাবুর রিহার্স্যাল দিতে দিতে একদিন এমন ভাব এসে গেল, যে নাচতেই শুরু করে দিলেন। ড্রয়িংরুমের কার্পেটেই। ঘুরে ঘুরে। হাত তুলে। মুখে গাইছেন—আমারে কে নিবি ভাই, আমি সঁপিতে চাই, আপনারে। আর নাচছেন ছন্দে ছন্দে। অতি সুন্দর ভাবে। আমরা নির্ণিমেষ নেত্রে দেখছি। পুরুষের নাচ যে এত সুন্দর হতে পারে, সেই প্রথম অনুভব করলাম। অসিতদা আর মানুষ রইলেন না। দেবতা হয়ে গেলেন।

একদিন এক অতিরিক্ত গৌরবর্ণা বৃদ্ধা রিহার্স্যাল দেখছিলেন। শুনলাম ইনি স্বর্ণকুমারী দেবী। রবীন্দ্রনাথের ছোট দিদি। তিন বৎসরের বড়। আমরা অবাক হয়ে তাঁকে দেখতে লাগলাম। কি আশ্চর্য সুন্দর দেখতে। কি হাতীর দাঁতের মত গায়ের রং। বয়স হয়েছে। কিন্তু কি সুশ্রী। কি শান্ত, সংযত, প্রশান্ত, আত্মস্থ মহিলা। বুঝলাম যথার্থ কালচারের অধিকারিনী ইনি। ঠাকুরবাড়ীর কালচার। এক দিনের কালচার নয়। হঠাৎ বাবুর কালচার নয়। প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতনী তিনি। বংশানুক্রমিক কালচার।

অসিতদা ছিলেন প্রেমিকও। শিল্পী প্রেমিক না হয়ে যায় না। তাঁর প্রথমা স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। অসুস্থা ভগিনীর সেবা করতে বিধবা শ্যালিকা এসেছিলেন। তিনি আর ফিরে গেলেন না। অসিতদার গৃহের অধিশ্বরী হয়েই রইলেন। তাঁরও সন্তান ছিল। দিদিরও ছিল। কিন্তু সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমরা ছাত্রের দল এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রচুর হাসাহাসি করতাম। নকল মেয়েলী সুরে বলতাম—এটি আমার ছেলে, এটি তোমার ছেলে, আর এটি আমাদের ছেলে। অসিতদা জানতেন আমরা এই নিয়ে রঙ্গ রসিকতা করি। কিন্তু তিনি কিছুই মনে করতেন না। তিনি শুধু ফুলের মত ফুটে থাকতে ভালবাসতেন। ফুলের মত দেখতে। ফুলের মত সুগন্ধী।

রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় তিনি। রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া শিল্পী। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের শিষ্য। তিনি কি সাধারণ মানুষের মত হতে পারেন কখন? তিনি ছিলেন ভারতীয় শিল্পীর এক জীবন্ত নিদর্শন। অন্তর্মুখী। আত্মস্থ। বলতেন অজন্তার কাজ, লিওনার্দোর কাজের চেয়েও সূক্ষ্মতর। গভীরতর। ভারতের শিল্পের তুলনা নেই। অনবদ্য।

বাউল সেজে একটা গেরুয়া আলখাল্লা পরে তিনি মঞ্চে নেমেছিলেন অভিনয়ের সময়। হাতে একটা একতারা। হাত তুলে নেচে নেচে গান গাইছেন—'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবী নিয়ে যাবি কে আমারে।" লক্ষ্ণৌয়ের নাক তোলা ইসলামী কাল্‌চারে অভিভূত, চুড়িদার পায়জামা, সেরওয়ানী, দোপাল্লা টুপী পরা দর্শক যেন বিশ্বাস করতে পারছে না চোখকে। সদা স্যুট পরিহিত প্রিন্সিপ্যাল সাহেব একি করছেন? ভিখিরী সেজে স্টেজে নাচছেন? ছি ছি ছি! তারা ভুরু তুলে তুলে পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল গজব হ্যায়। ওয়াকেই গজব হ্যয়! প্রিন্সিপ্যাল সাহেব নাচ রহে হেঁ? তওবা! তওবা! আর একজন আরো বিস্ময় দেখিয়ে বলছেন বাঙ্গালীয়োঁকা কেয়া পুছ না হ্যয়? অজীব খপ্ত উল হাওয়াস জাত হ্যয় বাঙ্গালী! শুনে আমরা হাসতাম। বাঙ্গালী পাগলা জাত বটেই। বাস্তব বুদ্ধি একেবারে নেই। নইলে রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জনের বসতবাড়ী দেনার দায়ে বিকিয়ে যায়?

আর ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়? আমি জানতাম তিনি সাহিত্যিক। কিন্তু তিনি শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্যঙ্গ প্রিয়, অতি তীক্ষ্ণধী, মানুষ একটি। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, ধুতি পাঞ্জাবী পরা, কলেজের বাইরে। তখন এক আদর্শ বাঙ্গালী। এমন কি চলনে, বলনে, কথায়, বার্তায়, পর্যন্ত। পায়ের জুতো থেকে মাথার টাক পর্যন্ত। কিন্তু কলেজে? অন্য মানুষ একেবারে। টিপ্ টপ্ সাহেব। দামী স্যুট পরণে। পড়াচ্ছেন যখন, চোখদুটো জ্ঞানের আগুনে গনগন

করে জ্বলছে যেন। আমি কলেজের বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে খোলা দরজা দিয়ে, তাঁকে একবার পড়াতে দেখেছিলাম, পড়াচ্ছেন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে। অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্ররা অবাক হয়ে শুনছে তাঁর কথা। গল্ গল্ করে বেরুচ্ছে ইংরিজীর স্রোত। সমস্ত অন্তর দিয়ে শুনছে। সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভক্ত হয়ে উঠছে। হ্যাঁ পণ্ডিত ব্যক্তি বটেন। সোসিওলজি কাকে বলে জানেন বটে। সাধে জওহরলাল এঁকে বানডুং কনফারেন্সে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এক পণ্ডিতের নমুনা দেখাতেই।

ঠিক এমনিভাবে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে, পড়াতেন ডাঃ সাহনীও। খট্‌খট্‌ করে জুতোর শব্দ তুলতে তুলতে ক্লাসে ঢুকতেন। নাম ডেকে নিয়েই বোর্ডের দিকে ফিরতেন। ভূমিকা হিসেবে দু'চার কথা বলে নিয়েই আঁকতে শুরু করতেন স্কেচ্। দু'হাতে ব্ল্যাকবোর্ডে নানা specimen-এর sketch এঁকে যাচ্ছেন। লাল, সবুজ, হলদে খড়ি দিয়ে। পড়াচ্ছেন না তো যেন অন্য জগতে চলে গেছেন। লক্ষ লক্ষ বৎসরের পূর্বেকার পৃথিবীতে। সে সময়কার উদ্ভিত জগতে। তিনি ছিলেন palaeo-botanist, International reputation-এর scholar. Scientist! Discoverer! আমাদের Gymnosperm পড়াতেন। Scott-এর ভক্ত। তাঁরও Scott-এর লেখা বোটানীর বই কলেজের text-book। Prof. Seward-এর ছাত্র। লণ্ডনের ডক্টর অব্ সায়েন্স্। তেরো বছর বিলাত-প্রবাস তাঁর বৃথা হয় নি। তাঁর পদতলে বসে শিক্ষা লাভ আমার ভাগ্যে হয়েছিল। ধন্য আমি। তিনি আমায় মনোনীত করেছিলেন। এই অনুগ্রহ আজকের দিনে দুষ্প্রাপ্য।

প্রফেসর নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক। বাঙ্গলার nightingale চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের স্বামী। তাঁর দুই শ্যালক দীনু ও বিনু। আমাদের বন্ধু। অতি সুন্দর গান গাইতে পারত তারাও। তাদের বড় ভাই ভানু ছিলেন ফিল্মের অ্যাক্টর। অতি সুন্দর চেহারা তাঁর। দীনু বিনুর চেহারাও অতি সুন্দর। বিনু পরে নামী Journalist

হয়েছিল। তারা ছিল ব্রাহ্ম। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বাড়ীতে অতিথি হতেন। ধূর্জটিবাবুর শ্বশুর বাড়ী ছিল এলাহাবাদে। তাঁর শালা লক্ষ্ণৌয়ে পড়ত। আমাদের বন্ধু। তার সঙ্গে তাদের বাড়ীতে এলাহাবাদে গিয়েছিলাম। আদর-যত্নের সীমা ছিল না। ধূর্জটিবাবুর স্ত্রী ছিলেন সেকেলে। ধূর্জটিবাবুর আক্ষেপের অন্ত নেই এই জন্যে। তাঁর শালা হাসত। আমরাও যোগ দিতাম। এত আধুনিক স্বামীর এত সেকেলে স্ত্রী।

রাধাকুমুদবাবুর শালা ময়ূখ ছিলই। সে রাধাকুমুদবাবুর নানা কাহিনী শোনাতো। তিনি ছিলেন খুব বিষয়ী। ধনীও। তিনি নাকি প্রায়ই গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতেন—"গেল না, গেল না। বিষয় বাসনা।" আমরা হাসতাম। তাঁর উপযুক্ত গানই বটে। শালাও ভগ্নিপতির সুখ্যাতি করতে ছাড়ত না। আমরা প্রচুর উপভোগ করতাম। মহা-মহা পণ্ডিতরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বলতা দ্বারা আক্রান্ত হতেও পারেন।

সঙ্গীত-স্রষ্টা অতুলপ্রসাদ সেন তখন লক্ষ্ণৌয়ের নামজাদা ব্যারিষ্টার। তাঁর ওখানে দিলীপ রায় প্রায়ই আসতেন। একদিন কলেজের হলে দিলীপকুমারের গান হল। "চাকর রাখোজী"। সকলে প্রাণ খুলে বাহবা দিল। দিলীপকুমারের যেমন সুন্দর চেহারা। তেমনি সরল অনাড়ম্বর ব্যবহার। বাঙ্গালী ছেলেদের বুক গর্বে ফুলে উঠল। একটি মাত্র গান গাওয়ার কল্যাণেই।

এক কথায় কলা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও বিদ্যার স্রোত বইছিল সে সময়ে লক্ষ্ণৌয়ে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই সলিলে অবগাহন করে ধন্য হয়েছি। আজও লক্ষ্ণৌ-প্রবাসের প্রচণ্ড প্রভাব আমার মনে। আমি লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির রচিত। সৃজিত। প্রেরণা প্রদীপ্ত। Alma mater-এর গর্বে আজও আমার বুক ফুলে ওঠে। ভাবি এই সৌভাগ্য আমার হল কেন? বাঙ্গালীর সামনে ভারতবর্ষকে মেলে ধরবার জন্যেই কি? আমি বাঙ্গালী। কিন্তু আমি ভারতীয়ও। আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন দুই মানসিকতার সামঞ্জস্য।

প্রফেসর পিণ্টো এক অদ্ভুত অধ্যাপক ছিলেন। আমার ব্যক্তি-মানসের অন্যতম স্রষ্টা। আমার আত্মার কারিগর। ক্রীশ্চান। অবিবাহিত। ঠিক কোন প্রদেশের, তা আজও জানি না। কেউ বলত—কোঙ্কানিজ। কেউ বলত—গোয়ানিজ। কেউ বলত—মহারাষ্ট্রীয়। তিনি আরম্ভ করেছিলেন ছাত্রদের নিয়ে গবেষণা। গবেষণা! awakening of their souls! mere educating them, is not enough! Inspire them! rouse them! বলতেন প্রায়ই। তৈরী করেছিলেন একটি ক্লাব। নাম দিয়েছিলেন—"Devil's den"। ইউনিভার্সিটির প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্ট থেকে একজন করে প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক সপ্তাহেই কোথাও না কোথাও সিটিং হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিণ্টো সাহেবের কোয়ার্টারেই। প্রত্যেককেই কিছু কিছু বলতে হত। বাধ্যতামূলকভাবেই। বিষয় তখনই নির্বাচিত হত। তর্কে যোগ দিতে হত সকলকেই। দীর্ঘকাল ধরে তর্কবিতর্ক হত। চুপ করে বসে থাকলে কিছুতেই চলবে না। মুখ খুলতেই হত সকলকে। সমাপ্তি হত মধুরেণ নিশ্চয়ই। মূককে বাচাল করা যায়। পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করানো যায়। ভগবৎ কৃপা হলে। আমাদের ভগবান ছিলেন প্রফেসর পিণ্টো।

মাঝে মাঝে বেড়াতেও বেরুনো হত। সদলবলে। এক হাস্যমুখর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুরসিক, সুপণ্ডিত অধ্যাপকের নেতৃত্বে। যাঁর অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। বিলেত, কন্টিনেন্ট, সবই যাঁর ঘোরা হয়েছে। ছাত্রের দল লক্ষ্ণৌ শহর পরিক্রমা করত। মুখে ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা। ছাত্র-শিক্ষকের ভেতরে তিলমাত্র ব্যবধান নেই। কখন কখন নৈশ রাত্রের গভীর স্তব্ধতার মধ্যেও পরিক্রমা চলত। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, আলোচনা, টীপ্পনী, অজস্রধারায় ঝরে পড়ত। পিণ্টো বলতেন—Boys! See midnight Lucknow! Study it. It needs to be studied! এক একজনকে ঠাট্টা করে বলতেন—Oh! you are thriving in Lucknow! good! very good! ছাত্রের দল ইঙ্গিত বুঝতে

পেরে সজোরে হেসে উঠত।

আজ পঞ্চাশ বছর পরেও সেই প্রফেসরকে ভুলিনি। সেই পথ পরিক্রমাও ভুলিনি। এরা আমার মন অদ্ভুতভাবে কৌতূহলী করে তুলেছিল। আমাদের শেখানো হত শুধু একটি জিনিস। কৌতূহলী হও। জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী। সব বিষয়ে কৌতূহলী। পৃথিবীতে কোন কিছুই নগণ্য নয়। কোন কিছুই বর্জনীয় নয়। সবকিছুই জানতে হবে। জ্ঞান যে একটা end in itself, সেই কথাটাই শিখলাম। শুধু means to an end নয়। প্রতি পুষ্প থেকে যেমন মধু আহরণ করে মধুকর, তেমনি প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। আয়েঙ্গার বলে একটি মাদ্রাজী ছেলে খুব উৎসাহী সভ্য ছিল। নাম নিয়েছিল Mephintopheles। আমারও কিছু একটা নাম ছিল। সেটা আর মনে নেই। কিন্তু মাদ্রাজীর ছেলেটির সঙ্গে গভীরভাবে মিশবার ফলে, মাদ্রাজীদের সম্বন্ধে আর বিকৃত ধারণা থাকতে পারল না। এরা কি চায়, কি ভাবে, এদের আদর্শ কি, জানতে পারলাম। আমি ছিলাম Botany-র প্রতিনিধি। আমাকে eastern zone-এরও প্রতিনিধিত্ব করতে হত। কারণ বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার আর কোন সভ্য ছিল না। এই প্রদেশগুলির সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে, আমাকেই জবাব দিতে হত। আচার, ব্যবহার, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, পোষাক-পরিচ্ছদ, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সমস্তই আলোচনা করতে হত। কাজেই পড়াশুনো করতে হত প্রচুর। Devil-দের কোন বিষয়েই অজ্ঞ থাকলে চলবে না। তাদের হতে হবে সর্বজ্ঞ। আমার মন তৈরী হয়ে গেল। বোটানী ছাড়াও অন্য জিনিস আছে শেখবার। আজও আমি মনে মনে একটি Devil। Social iconoclast। এর গোড়াপত্তন ওখানেই। আজও আমার কৌতূহলের সীমা পরিসীমা নেই। এর মূলও ওখানেই।

ডাঃ বীরবল সাহনী ছিলেন এক জ্ঞান-তপস্বী। প্রতিদিন চোদ্দ ঘণ্টা করে পরিশ্রম করতেন। লক্ষ বৎসর পূর্বেকার পৃথিবীর ইতিহাস

সংগ্রহে ব্যস্ত। যে বৃক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিল, আজ যা প্রস্তরীভূত ভগ্নাবশেষ মাত্র, তাই নিয়ে তিনি উন্মত্ত। প্রায়ই সন্ধ্যের পর তাঁর ল্যাবরেটরীতে আলো জ্বলতে দেখতাম! বিলম্ব হলে তাঁর স্ত্রী এসে জোর করে ধরে নিয়ে যেতেন। নিঃসন্তান ছিলেন তিনি। পরমা সুন্দরী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু তিনি সামাজিক, পারিবারিক সব আকর্ষণ ছেড়ে কলেজের Botany department-এ বসে পড়ছেন অথবা লিখছেন। কি সুখ পাচ্ছেন তিনি এতে? আমরা তখন তরুণ। জীবনের সব কিছুই তখন ঘটতে বাকী। আমাদের এ রহস্য বোধগম্য হত না। বুঝতাম জ্ঞানসাধনা এমনই একটা জিনিস। যার কাছে পৃথিবীর সবকিছুই মলিন হয়ে যেতে পারে। রূপসী স্ত্রী, সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সব। সব।

কি তাঁকে এমন তন্ময় করে রাখত? দেশবিদেশ থেকে তাঁর কাছে আসত নানারকম ফসিল। Newzealand এবং Australia থেকে বেশী। একজন বেয়ারা দিবারাত্র বারান্দায় বসে বসে সেই ফসিল-এর ওপর ইস্পাতের তার ঘসত। সদাসর্বদা ঘস্ ঘস্ করে ঘসার শব্দ হচ্ছেই। পাতলা পাতলা শ্লাইড তৈরী হত। মাইক্রোসকোপ্-এ পরীক্ষা করতেন ডাক্তার সাহনী। ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত। এই বিদ্যায় পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ বেশী ছিল না। Article লিখতেন পাণ্ডিত্যপূর্ণ। গুরু গম্ভীর। বিলেতের বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তিনি লণ্ডনের ডি-এস্-সি ছিলেনই। আমি চলে আসার পর Cambridge-এর Sc. d হলেন। পরে F R S O হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে। এইরকম অসাধারণ ব্যক্তির সাহচর্য কি আমার জীবনে কোন রেখাপাত করবে না? অবশ্যই করবে। করেও ছিল।

আমাদের Post graduate student-দের নিয়ে তিনি scientific excursion-এও গিয়েছিলেন। বিহারের রাজমহল পাহাড়ে। অনেক ফসিল সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সে মূর্তি আমি ভুলতে পারি না। পরণে খাকী হাফ প্যান্ট। মোটা সোলের জুতো। গরম ফুল মোজা।

সাদা সার্ট। হাতে লোহার হাতুড়ী। মাথায় সোলার হ্যাট। পাহাড়ে উঠছেন তরতর করে। পাথরের পর পাথর হাতুড়ী দিয়ে ভেঙ্গে চলেছেন। ফার্ণ-এর নানারকম ফসিল সংগ্রহ করছেন। আসানসোল-এ উচ্চক্লাসের ওয়েটিং রুম-এ আমরা আস্তানা গেড়েছিলাম। তিন দিন হয়ে গেছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্টেশন মাষ্টার এসে কর্কশ কণ্ঠে স্থান ত্যাগ করতে বলছেন। আমরা মজা দেখছি। এইবার ডাক্তার সাহেবের কি গতি হয় দেখি। ইংরিজী বলছেন দুজনেই। নিখুঁত উচ্চারণ দুজনেরই। স্টেশনমাষ্টার প্রথমটা উদ্ধত। কথা বলতে বলতে ক্রমশঃ তাঁর পারা নামছে। তারপর একেবারে বিনয়ে অবনত। প্রফেসরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। শেষকালে হেসে বিদায় নিলেন। ডাঃ সাহনীকে তাঁর পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। সাফল্য কামনা করলেন। আমরা ছাত্রের দল দেখছি। ডাঃ সাহনীর কি ম্যাজিক ছিল? যার প্রভাবে এই উদ্যত ফণা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, নীলকোট পরা, সাদা চামড়া, সাহেবদের চেয়েও বেশী সাহেব সর্প-বশ্যতা স্বীকার করল? অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের অপূর্ব ম্যাজিক। যার কাছে সব লজিক হার মানে।

এই বিজ্ঞানী শুধু বিজ্ঞান-সাধনাই করেন নি। ব্যক্তিত্ব অর্জনও করেছেন। আসানসোল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে-এ তার প্রমাণ পেলাম। যে এসেছিল তাড়াতে, সে বলে গেল আরো থাকতে। আমরা গর্বে ফুলে উঠে, পোষাক-পরিচ্ছদে সুশোভিত হয়ে, পাহাড়ের দিকে যাত্রা করলাম। সেখানে আমরা লোক-দেখানো পরিশ্রম করছি। ডাক্তার সাহনীকে খুসী করবার মিথ্যা চেষ্টা করছি। তিনি ফসিল আবিষ্কারের সত্যিকারের চেষ্টা করছেন। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। তিনি ক্লান্তি কাকে বলে জানেন না। যুবকদের সঙ্গে সমানে টেক্কা দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের পরাস্ত করছেন। আমরা মাঝে মাঝে তাঁর আড়ালে গিয়ে, লুকিয়ে বিশ্রাম করছি। তিনি বিশ্রাম কাকে বলে জানেন না। কে যেন তাঁর স্কন্ধে এক অতি গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছে। তার হাত

থেকে নিস্তার নেই। সিসিফাসের মত ক্রমাগত পাহাড়ে চড়ছেন আর নাবছেন। তবে সিসিফাসের মত নিষ্ফল নয়। তাঁর থলি ভরে উঠছে। ফসিলের পর ফসিলে। তিনি তাদের ছবি তুলবেন। তাদের নিয়ে আর্টিকেল্স লিখবেন। বিশ্ববিখ্যাত হবেন। ভুবনবরেণ্য হবেন। যশ পাবেন। খ্যাতি পাবেন। অমরত্ব পাবেন। তিনি অমর। তিনি অসাধারণ।

আজও আমার কলম অর্ধ শতাব্দী পরেও তাঁর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে সীমারেখা টানতে পারছে না। কেন? তিনি আমার কে ছিলেন? স্বজাতি? স্বপ্রদেশীয়? একই ভাষাভাষী? মোটেই নয়। তবে কেন তাঁর কথা এত করে লিখছি? তাঁর জ্ঞানার্জনের চেষ্টা, তাঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতা, তাঁর ধৈর্য, তাঁর হৃদয়বত্তা, তাঁর সরলতা, আমাদের মুগ্ধ করেছিল। লক্ষ্ণৌয়ে ত অনেক প্রফেসর ছিলেন। বাঙ্গালী ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। তাঁদের কথা লিখছি না কেন? তাঁদের এত পরিশ্রম করতে দেখিনি। তাঁদের এত চিন্তা করতে দেখিনি।

এখনো মনে পড়ছে আসানসোল স্টেশনের লম্বা প্ল্যাটফরমের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত হন্‌হন্‌ করে পায়চারী করছেন ডাঃ সাহনী। একহারা গড়ন। পরণে ড্রেসিং গাউন। স্লিপিং স্যুট। রিফ্রেসমেণ্ট রুমে-এ গিয়ে ডিনার খেয়ে এসেছেন। এখন শুতে যাবার আগে কিছুক্ষণ পায়চারী করছেন। আমরা কখন কখন সঙ্গ নিচ্ছি। তাঁর চিন্তায় ব্যাঘাত হচ্ছে। অথচ তিনি কিছু বলছেন না। তাঁর স্ত্রী বাড়ীতে তৈরী পাঞ্জাবী মিষ্টান্ন দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিচ্ছেন। বলছেন—খাও। অনেক দিয়েছে। খাও। আমরা গুরুপত্নীর স্বহস্তে তৈরী মিষ্টান্ন খেয়ে জীবন সার্থক করতাম। পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষিদে পেয়েছে। হাফ প্যাণ্টের পকেট থেকে কাঁচা মুর্গীর ডিম বের করে পাহাড়ের গায়ে ভেঙ্গে নিয়ে ঢক্ করে মুখে দিচ্ছেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। বলছেন—nothing like raw eggs! But you have to get accustomed to

it. Splendid! while doing outdoor work!
আমরা ভাবতাম ইনি ভারতীয় অথবা ইংরেজ? মদ্যপান করছেন না। ধূমপান করছেন না। কি রকম ইংরেজ? অথচ তাঁর ইংরেজী শুনে এক ব্যক্তি সসম্ভ্রমে বিদায় নিচ্ছে। যার মাতৃভাষা ইংরেজী। তিনি কি লণ্ডনের Eastend-এর cockney dialect ছাড়ছিলেন informal non-standard vocabulary? Swearing কণ্টকিত? হবে। আমরা বুঝতে পারছিলাম না। শুধু উত্তরোত্তর বিস্মিত হয়েই চলেছিলাম। বুঝেছিলাম বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। Botany-র ক্লাসরুমেও। আসানসোলের waiting room-এও। লণ্ডনেও। কেম্ব্রিজেও। নিউজিল্যাণ্ডেও। অস্ট্রেলিয়াতেও। সর্বত্র। সর্বস্থানে। সর্ব অবস্থায়। convocation-এ গাউন-পরা অবস্থায়। রাজমহল পাহাড়ে যাবার আগে খাকী হাফপ্যান্ট পরা অবস্থাতেও। সর্বত্র। সর্বত্র পূজ্যতে।
যদি Vice-chanceller G.N Chakravarti-র কথা কিছু না বলি তাহলে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করা আমার বৃথা হয়ে যায়। অসাধারণ গৌরবর্ণ। দীর্ঘকায়। বৃদ্ধ। থাকতেন বাদশাবাগে ঢোকবার মুখেই vice chanceller-এর quarter-এ। monkey bridge পার হলেই বাদশাবাগ। বাদশাবাগের প্রথম বাড়ীই vice chanceller-এর। অতএব নিত্য দেখা জিনিসই আমাদের। তাঁর বাড়ীতে থাকতেন একজন ইংরেজ, বোধহয় আইরিশম্যান, Ronald Nixon। আর একজন আমেরিকান-Kitley। মিসেস চক্রবর্তীও আছেন। মিস চক্রবর্তীও আছেন। এঁদের বাড়ীতে স্বদেশী বিদেশীর এরকম জগাখিচুড়ী কেন? আমার ভীষণ কৌতূহল হত।
পরে শুনলাম তাঁরা সকলেই Theosophist। Annie Besant-এর ভক্ত। যে Annie Basant নাট্যকার Bernard shawকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মানুষ্ঠান বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছিলেন। শ্লেষবিশারদ বার্ণাড শ বিবাহ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে

ধর্মকে যুক্ত করতে চাননি। কাজেই তাঁদের প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হতে পারল না। আমি ভাবতাম আশ্চর্য মানুষ এঁরা। এঁদের প্রণয় কি রকম ধারা ঠুনকো প্রণয়? এত তুচ্ছ কারণে ভেঙ্গে যায়? কিন্তু যা আমার কাছে তুচ্ছ তা তাঁদের কাছে তুচ্ছ নয়। আমি সাধারণ। ওঁরা অসাধারণ। অসাধারণ লোকদের, সাধারণের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না! চেষ্টা করতে গেলে ভুলই হয়। এই ভুলই আমরা করে থাকি। নিজেদের অতিক্ষুদ্র বিচার-শক্তি দিয়ে মহামানবদের বিচার করতে বসি। এক মিনিট দেরী হয় না। উপসংহারও মনে করি নির্ভুল হয়েছে। হায় আমরা!

Kitley ওখানে আছেন কেন? Theosophist বলে। তিনি ভারতে এসেছেন কেন? একটি উপভোগ্য কাহিনী এর পেছনে আছে। বিশ্বাস করা না-করা শ্রোতার ওপর নির্ভর করে। ইনি লক্ষপতি মানুষ। বিবাহ করেন নি। মিসেস্ চক্রবর্তীকে মা বলেছেন। তিনি নাকি পূর্বজন্মে তাঁর মা ছিলেন। কেমন করে জানলেন? একদিন আমেরিকায় ধ্যানস্থ আছেন। থিয়োসফিষ্টরা ধ্যান করে থাকেন। বলেন, meditation। একদিন এমনি ধারা অবস্থায় হঠাৎ যেন শুনলেন তাঁর গতজন্মের মা এজন্মে ইণ্ডিয়ায় আছেন। উত্তর প্রদেশের একটা শহরের নাম সাহারাণপুর। সেখানে তাঁর স্বামী ইন্সপেক্টার অব স্কুলস্। নাম জি, এন, চক্রবর্তী। খোঁজ খবর নিতে ভারতে এলেন। সব অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। আর যায় কোথা? মায়ের শ্রীচরণে নিপতিত হলেন। মা আদর করে একে গৃহে স্থান দিলেন। আমেরিকান ডলার কাজ করতে লাগল। মায়ের স্বামী ক্রমশঃ ভাইস্-চ্যান্সেলার হলেন। কারণ অর্থ এদেশে অসাধ্য সাধন করতে পারে। আমরা তখন এ কাহিনী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম না। কল্পিত কাহিনী বলেই মনে করতাম।

কিন্তু আজ এ-কাহিনী আর অবিশ্বাস্য মনে হয় না। কয়েক বৎসর পরে Kitley পুরীতে এসেছিলেন। খুব সম্ভব ১৯৩১ সালে। মিস্

চক্রবর্তীও এসেছিলেন। সেই স্থূলাঙ্গী মেয়েটি। তাকে আমি অঙ্ক শেখাতে নিযুক্ত হয়েছিলাম। এক মাসের জন্যে। Kitley দিবারাত্র ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। সিগারেট টানছেন। চার-পাঁচ জন বেয়ারা খানসামা তাঁর সেবায় নিযুক্ত। মাথায় সাদা পাগড়ী, গায়ে খাকী গলাবন্ধ কোট। ধনের প্রাচুর্য ফেটে পড়ছে। বেনারসে সুন্দর বাড়ী করে দিয়েছেন। জি, এন চক্রবর্তী অবসর গ্রহণ করে সেখানেই বসবাস করছেন।

অনেক সময়ে ভেবেছি একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে এ ব্যক্তি সারাজীবন তার পেছনে ব্যয় করে দিল কেন? এই ধারণাটায় সত্য কিছুই নেই, এত বড় কথা বলার শক্তি আমার নেই। অনেকদিন পরে দিলীপকুমার রায়ের লেখায় পড়লাম Ronald Nixon 'কৃষ্ণপ্রেমী' হয়েছেন। রাধাকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ করে পহলগাঁও-এ আছেন। সঙ্গে আছেন চক্রবর্তীর ওই স্থূলকায়া কন্যা। এসবের পেছনে কোন সত্য নেই এমন কথা বলি কি করে? যারা জীবন সমর্পণ করে দেয় একটা জিনিসের পেছনে, তাদের সেই সমর্পণ কথাটা আমি না বুঝতে পারি, কিন্তু সেটা কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। থিয়োসফির সূত্রপাত এদেশে হল কি করে?

প্রায় একশো বছর আগে ১৮৭৮ সালে কর্ণেল ওলকট ও মাদাম হেলেনা পেট্রভ্না ব্লাভাটস্কি (১৮৩১—১৮৯১) ভারতে এলেন। অ্যাডেয়ারে থিওসফিকাল সোসাইটি সুরু করলেন। Col-Olcott বৌদ্ধ ছিলেন। মাদাম ব্লাভাটস্কি তিব্বতেও ছিলেন। আশ্চর্য এই যে তিনি সেখানে নাকি এক তিব্বতী সাধুর কাছেই "থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি" খোলার ইঙ্গিত পান। কর্ণেল ওলকটের গুরু ছিলেন কৌথুম ঋষি।

অত্যধিক পরিশ্রমে ডঃ সাহনীর অকাল-মৃত্যু হল। আমায় ক্রমাগত বলতেন—Specialisé in something Mukerjee! These are days of specialisation Dilletantism will no longer pay.

আর একজন অধ্যাপক ছিলেন ডাঃ সুশীল মুখার্জি। বোটানীর reader। লণ্ডনের ডি. এস. সি.। কি একটা কাজে একদিন সকালে তাঁর বাড়ী গিয়েছিলাম। রবিবার। কাজ হয়ে গেল এক মিনিটেই। তারপর গল্প হতে লাগল। এগারোটা বাজল। তিনি না খাইয়ে ছাড়লেন না। সেখানেই স্নান করতে হল। তাঁর সুসজ্জিত বাথরুমে। খেতে হল তাঁর সঙ্গে। তাঁর সুসজ্জিত টেবিলে। অবশ্য ভাত, ডাল, মাছ তরকারী, চাটনী, পাঁপড় ভাজাই। কিন্তু কেন করেছিলেন তিনি এই রকম ব্যবহার? শুধু শিক্ষা নয়। চরিত্র গঠনও।

আমি কেন লিখছি এইসব কথা? আত্মকথা বলতে নয়। আমার মনটা গড়ে তুলল যাঁরা, তাঁদের কথা জানাতে। লক্ষ্ণৌয়ে আমি শুধু বোটানী শিখিনি। দেখেছি কতিপয় অতি-মানুষের আচরণ। পেয়েছি তাঁদের প্রকৃতির পরিচয়। তাঁরাই আমার মনটা সত্য-সন্ধানী করে তুলেছে। ডাঃ সাহনীর বাড়ীতেও একদিন গিয়েছিলাম। আমাকে সিগারেট দিলেন। নিজে ধরিয়ে দিলেন দেশলাই। তখন আর আমরা ছাত্র-শিক্ষক নই। একজন গৃহস্বামী। আর একজন তাঁর অতিথি। কেন করেছিলেন তিনি এই রকম ব্যবহার? ইংরেজী-পণা সন্দেহ নেই। কিন্তু কপট ভদ্রতা নয়। সবই আন্তরিকতাপূর্ণ। আমি সিগারেট টানছি আর দেখছি ভুবন-বিখ্যাত অধ্যাপকের মুখ। মনে হচ্ছে তিনি ইংরেজ। ইংরেজ ছাড়া আর কিছু নন। দেখতেও ইংরেজের মত। ব্যবহারেও তাই। মানুষ সব ভোলে, আন্তরিকতা ভোলে না। এইসব দৃষ্টান্তই আমার মনকে আস্তে আস্তে গড়ে তুলছিল। মানুষ বড় হয় কিসে? ব্যবহারে। উপযুক্ত লোকের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহারে। এই শুধু আমায় শিখতে হবে। এই যুগটা শ্রদ্ধা করবার যুগ নয়। কিন্তু আমাকে করতে হবে শ্রদ্ধা। যে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁকে। কি উপায়ে সে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে তাও জানতে হবে। জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষণীয় বস্তু প্রকৃতপক্ষে হল এই। বিনয়। ঔদ্ধত্য নয়। শ্রদ্ধা। অশ্রদ্ধা নয়। আগ্রহ। কৌতূহল। উপেক্ষা ঔদাসীন্য নয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ

শিক্ষালাভ হল—বিনয়।

জওহরলাল তখন আজকের জওহরলাল ছিলেন না। তিনি এসেছিলেন আমাদের হোস্টেলে বক্তৃতা দিতে। সদ্য রাশিয়া থেকে ফিরেছেন। ১৯২৮ সালের কথা বলছি। Meston Hostel-এর Common room-এ বক্তৃতার স্থান হয়েছে। রাশিয়া সম্বন্ধে আমাদেরও প্রচণ্ড কৌতূহল। জওহরলালের শ্যালক কৈলাসনাথ কওলা ছিল আমাদের সহপাঠী। এখন Vice-chancellor, Kanpur Agricultural Research University-র। আমাদের হোস্টেলেই থাকত। তার ওখানে চা খাবেন জওহরলাল। একবার তার ঘরে উঁকি মেরে দেখতে গেলাম। কি ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করছে। দেখলাম টেবিলের ওপর দামী-দামী চীনেমাটির বাসন, চামচ ইত্যাদি নামী হোটেল থেকে আনিয়েছে। সব ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। রাজসিক ব্যাপার একেবারে। Cake biscuit ইত্যাদি দামী প্লেটে সুসজ্জিত। বললাম—একি করেছো কওলা? খদ্দরধারী, চরকা-কাটা, গান্ধীভক্ত জওহরলালের জন্যে একি এলাহী কাণ্ড?

কৈলাস হেসে বলল—হ্যাঁ, চরকা-কাটা খদ্দরধারী, গান্ধীভক্ত, জওহরলাল ত বটেনই। কিন্তু দোস্ত! ভুলে যাচ্ছো কেন যে তিনি মোতিলালের ছেলে। এরকম ব্যবস্থা না দেখলে হয়ত চা-ই খাবেন না।

হাসলাম। বুঝলাম। এদের বাইরেটা এক রকম। ভেতরটা আর এক রকম। কৈলাসও খদ্দরধারী। কিন্তু ভেতরে ভেতরে পুরোমাত্রায় অ্যারিস্টোক্রাট।

জওহরলাল বক্তৃতা দিতে এসে প্রথমেই বললেন—I don't think anybody present here can tell me what is meant by U. S. S R.

ধূর্জটিবাবু বসেই ছিলেন। তিনিও এসেছিলেন বক্তৃতা শুনতে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন—Union of Socialist Soviet Russia জওহরলাল ঢোঁক গিলে বললেন—I see! you know

it then. Thats very good.

বক্তা হিসেবে ভাল ছিলেন না জওহরলাল। কুঁতিয়ে কুঁতিয়েই ভাষণ দিচ্ছিলেন। ব্যক্তিত্বেও যে কিছু লক্ষণীয় ছিল তাও নয়। বলে গেলেন এক রকম করে নিজের অভিজ্ঞতা। মাথায় সাদা টুপি। পরনে কালো আচকান। চুস্ত পায়জামা। কাবুলী জুতো। গৌরবর্ণ রং। মাথায় একটু খাটোই বলা যেতে পারে। সবশেষে প্রশ্ন করলেন —কেউ কিছু প্রশ্ন করতে চান কিনা? আমি চিরকেলে কৌতূহলী ত। Anna Louis Strong-এর লেখা Marriage & morals in Russia পড়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম—May I know some thing about the recent divorce laws promulgated in Russia?

জওহরলাল মৃদু হাস্য করলেন। ভুরু তুলে বললেন—Divorce laws? afraid cannot tell you any thing about that. I am no longer interested in it. বলে ইংরেজী কায়দায় কাঁধ তুললেন। নিজেও হাসলেন। আমরাও হাসলাম। বুঝলাম জওহরলাল যোল আনা ইংরেজ। দিশী পোষাক পরে থাকলে কি হয়। মনে মনে

লক্ষ্ণৌয়ের প্রবাস ক্রমশ শেষ হয়ে আসতে লাগল। আরো দুজনের কথা বলে নিই। পাহাড়ী সান্যাল ও অতুলপ্রসাদ সেন। একজন গায়ক। আর একজন গান-স্রষ্টা। কিন্তু দুজনের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল তফাৎ। একজন জনসাধারণের একজন। আর একজন উচ্চমহলের অধিবাসী। ব্যারিস্টার। পাহাড়ী সান্যাল পরে বাংলা ফিল্মের হিরো হয়েছিলেন। আজও বাংলা ফিল্ম-জগতে অবিস্মরণীয় আসন অধিকার করে আছেন। তাঁর অভিনয়-প্রতিভা তখনই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তাঁর ছিল গানের গলা। তিনি ছিলেন ভাতখণ্ডে স্থাপিত Music College-এর ছাত্র। ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন না। আমাদের দলে গায়ক কেউ ছিলেন না। অথচ অসিতবাবুর নাটকে গায়ক চাই।

তাই তাঁকে আনানো হয়েছিল। তিনি ছিলেন এক কথায় লক্ষ্ণৌয়ের সহুরে ছেলে। কিন্তু অসিতবাবুর তাঁকে নিতে কোন আপত্তিই হল না। তিনি ছিলেন স্বভাব-শিল্পী। জন্ম অভিজাত। কোনরকম নোংরামি আমি অসিতবাবুর ভেতরে কখন দেখতে পাইনি। পাহাড়ীবাবুও ছিলেন খাঁটি আর্টিস্ট। সদা হাসি খুশী। খুব পান খেতেন। মুখ দিয়ে বেরুতো চোস্ত উর্দু। খাস লক্ষ্ণৌয়ের উচ্চারণে উচ্চারিত। টানের মধ্যে "মুরগ-মোসল্লমে"র খুসবু পুরোপুরি বর্তমান। তাঁর ওপর পড়েছিল ইসলামী কালচারের বিলক্ষণ প্রভাব। তাঁর বাংলা উচ্চারণেও কিছু অবাঙ্গালী টান এসে গিয়েছিল। তিনি যে বাংলার বাঙ্গালী নন, তা দেখলেই বোঝা যেত। বড় বড় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মাথায়। পরিধানে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী। পায়জামা। পায়ে নাগরা। অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির মানুষ। ঠাট্টা, তামাসা, হাসি, পরিহাস নিয়েই থাকতেন। সকলেরই প্রিয়। আর কি সুন্দর গাইতেন। আমরা আশা করেছিলাম ভবিষ্যতে তিনি উচ্চাঙ্গের কণ্ঠশিল্পীই হবেন। কিন্তু হলেন তিনি অভিনয়-শিল্পী। বেঁটে, মোটা সোটা মানুষই। বড় বড় চোখ। ফরসা রং। লক্ষ্ণৌয়ের সব ভুলতে পারি—পাহাড়ী সান্যালকে নয়। তাঁর সঙ্গে পরে নিউ থিয়েটরস ষ্টুডিওতে দেখাও হয়েছিল। তিনি চিনতেও পেরেছিলেন।

অতুলপ্রসাদ সেন হৃষ্টপুষ্ট গম্ভীর প্রকৃতি। দীর্ঘকায়। মাথায় টাক। তাঁকে একদিন লক্ষ্ণৌ কোর্টে ইংরেজ-জজদের সামনে argue করতে শুনেছিলাম। পরণে কালো গাউন, কালো কোট, সাদা কলার, সাদা ব্যাণ্ড। সব কড়া ইস্ত্রি করা। টিপ্‌টপ্ ব্যারিস্টার। Grays Inn, Inner Temple-এর ছাপ সর্বাঙ্গে পূর্ণমাত্রায়। নিখুঁত ইংরিজী উচ্চারণ। আইনের চুলচেরা তর্ক করে চলেছেন। তখন কে বলবে ইনি সঙ্গীত স্রষ্টা? সাহিত্য-প্রেমিক! রবীন্দ্র প্রীতি-ধন্য। বাংলা ভাষার অসাধারণ কারুশিল্পী। অসংখ্য ঠুংরী গানের জনক। নিজেই একটা স্কুলের স্রষ্টা। অতুলপ্রসাদী গান বলে এক শ্রেণীর গানই চালু

হয়ে গেছে। বাংলার বাইরে জীবিকা-নির্বাহ করে মাতৃভাষার মহিমা গান করে গেছেন। তাঁর অবিস্মরণীয় গান—মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা। তাঁর কোট-প্যান্টের অন্তরালে বাঙ্গালী মনটি চির-সবুজ ছিল। তাঁর সর্বভারতীয় পোষাকে সজ্জিত ছবিও দেখেছি। তখন কে বলবে তিনি বাঙ্গালী। মাথায় পাগড়ী, আচকানে চকচকে পেতলের বোতামও। অযোধ্যার নবাব-তালুকদারদেরই পোষাক। তিনি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে—বলেছিলেন একটা কথা। বাঙ্গালী বাংলার বাইরে থেকে সেখানকার অবাঙ্গালীদের সঙ্গে যেন হৃদ্যতা স্থাপন করে। নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও, যেন সকলের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যায়। কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। তাঁকে এক শ্রাদ্ধ-বাসরে পৌরোহিত্য করতেও দেখলাম। তাঁর এক ব্রাহ্ম-বন্ধুর মৃত্যুর উপলক্ষ্যে। তিনি তখন তাঁদের অতিথি। পুরীর civil surgeon P, N, Das F,R,C,S, (Edin)-এর মৃত্যু হয়েছিল। তিনি স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনায় বাংলায় টেনে টেনে সুর করে করে ব্রাহ্ম-নেতাদের মত ভাষণ দিয়েছিলেন। তখন তিনি নিমীলিত-চক্ষু। উর্ধ্ব-মুখ। পরণে ধুতি পাঞ্জাবী। তখন বুঝেছিলাম তিনিও ব্রাহ্ম-সমাজের একজন। আমার বাল্যবন্ধু ছিল প্রেমানন্দ দাসের পুত্র ডাঃ অমলানন্দ দাস। অতুলবাবুর স্ত্রী হেমনলিনী দেবীকেও দেখেছিলাম। প্রায়ই আসতেন পুরীতে বেড়াতে। অমলদের বাড়ীতেই উঠতেন। কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, নাতিদীর্ঘা মহিলা। একটি সুশ্রী যুবক সর্বদা ছাতা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন। শুনলাম সম্পর্কে নাকি ওঁর দেওর। এমন বৌদি-ভক্ত দেওর দেখা যায় না। রোদ্দুর লাগলেই ভ্রাতৃজায়াকে রোদ্দুর থেকে বাঁচাতেন। ছাতা খুলে ধরতেন মাথায়। ওঁদের পুত্র দিলীপ সেন। অমলের বন্ধু। সেও মায়ের সঙ্গে আসত পুরীতে। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত যখন শুনতাম দিলীপের পিতা লক্ষ্ণৌয়ে থেকেও আলাদা বাড়ীতে থাকতেন। আমরা এ পরিস্থিতি কল্পনা করতেও পারতাম না। I will take my lunch

with my mother. I will dine with my father. বলত দিলীপ।

অতুলপ্রসাদ ও হেমনলিনী মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোন। বিলেতে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন। প্রণয় বিবাহ। কিন্তু বনিবনা ছিল না। মুসুরীতে আমি মিসেস সেনকে দেখেছিলাম। একলা ছিলেন। সুন্দর কথাবার্তা। সুন্দর আচরণ। লক্ষ্ণৌয়ে ছাত্রমহলে একটা প্রচলিত গল্প ছিল। মিসেস সেন আসছেন লক্ষ্ণৌয়ে। অতুলপ্রসাদ সেন গেছেন স্টেশনে। খবর পেয়েছেন স্ত্রী অসুস্থ। invalid chair-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। মিসেস সেন দেখে জ্বলে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—ঠিক হয়েছে। এইবার শ্মশানেই নিয়ে চল। রাধাকুমুদ বাবুর শ্যালকের অনুগ্রহে অনেকরকম মুখরোচক কাহিনী শোনবার সৌভাগ্য হত। আমরা প্রাণভরে হাসাহাসি করতাম। প্রচুর উপভোগও করতাম।

লক্ষ্ণৌ থেকে বোটানীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হলাম। স্বাভাবিক ভাবেই গবেষণা করবার জন্যে একটা স্কলারসিপ পাবার অধিকারীও হলাম।

লক্ষ্ণৌ থেকে চলে এলাম। মনে একটা জ্বলন্ত আদর্শ নিয়ে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন: "বাঙ্গালী মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার।" চাকরি করেই নাকি এই অপব্যবহার হয়ে থাকে। বাঙ্গালী চাকরী ছাড়া আর কিছুই জানে না। চাকরী আর চাকরী। চাকরী করতে করতে বাঙ্গালী শেষে ভিখিরী হয়ে গেল। সারা বাংলাদেশের মানুষদের মনে যেন একটি মাত্র কামনা। মাস গেলে মাইনে পাওয়া। ওপরওয়ালাদের খোসামোদ করা। হাত দুটি জোড় করে থাকা। উনত্রিশ দিন। তিরিশদিনের দিন হাত পাতা। হাতের আর সমস্ত কাজই আমরা ভুলে গেছি। স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবে কি করে?

স্বাধীন না থাকলে, শিল্পী নিজের মনের মত শিল্প রচনা করবে কি করে?

ঠিক করলাম জীবনে চাকরী কখনই করব না। যদি কিছুই না করতে পারি, সেও ভাল। চাকরী কখনই করব না। অথচ আমাদের পরিবারই হল চাকুরীজীবী। আমার এই বাসনা অনেকের কাছে হাস্যকর মনে হল। কিন্তু আমি স্থির-সংকল্প। চাকরী কখনও করব না। বাঙ্গালীর অতুলনীয় মস্তিষ্কের অপব্যবহার কখন করব না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন অভিভাবক। তিনি বললেন, এম-এস-সি পাশ করেছো। আর আমার বলবার কিছু নেই। চাকরী করতে যদি তোমার এতই অনিচ্ছে, আমি জোর করব না। ব্যস্ হয়ে গেল। ছাড়পত্র পেয়ে গেলাম। মাতাঠাকুরানীও কিছু বললেন না। করুকগে যা ইচ্ছে তাই। এম-এস্-সি পাশ ত করেছে! অতএব শুরু হল আমার জীবনের নতুন এক পর্ব।

বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ মনে আদর্শ ও বাস্তবের সার্থক সমন্বয় কোনদিন গড়ে ওঠেনি। আমারও গড়ে উঠল না। আমি আমার আদর্শের কাছে নিজেকে বলি দিলাম! প্রথম প্রয়াস সফল হল না। কারই বা হয়ে থাকে? চাকরী যদি না করি, তাহলে করব কি, সেখানেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশ পেলাম। ব্যবসা। তিনি বেঙ্গল ক্যামিক্যাল গড়ে তুলেছেন। তিনি স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁর নির্দেশ অনুসারে চললে আমি ঠকব না নিশ্চয়। তাঁকে স্বচক্ষে দেখেও ছিলাম। সেকথাটাও বলি। ১৯২৩ সালে। আমি তখন কটকে আই-এস্-সি পড়ছি। র‍্যাভেনসা কলেজ-হোস্টেলে থাকি ইস্টার্ণ ব্লকে। একদিন বেলা দশটার সময় কুয়োতলায় ছাত্রের দল স্নান করছি, হঠাৎ হুড়মুড় করে একদল বাঙ্গালী মোটর থেকে নামলেন। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিও নামলেন। রোগা। রং ময়লা। মুখে গোঁফ-দাড়ী। বেঁটে। নেমেই অন্য কোথাও না গিয়ে সোজা কুয়োতলায় এসে হাজির। থমকে দাঁড়িয়েছেন। দেখছেন। খুব কাছে এসে আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। নাম জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। বাঙ্গালী এবং ওড়িয়া, দু' রকম ছাত্রই ছিল। ওড়িয়া ছেলেদের কাছে

এসে তাদের মাথার চুল ধরে নাড়তে নাড়তে বলতে লাগলেন—কৈ? মাথায় ঝুঁটি কোথায়?

আমরা অবাক হয়ে গেলাম। একি প্রশ্ন? কে ইনি, শুনলাম ইনিই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত গৌরবর্ণ, সুশ্রী একজন পুরুষ। মোটা চশমার কাচের আড়ালে অতি উজ্জ্বল দুটি চোখ। ঠোঁট টিপে মিটিমিটি হাসছেন শুধু। অতিরিক্ত লাল ঠোঁট।

পরনে মোটা খদ্দর। পাঞ্জাবীর জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। সেদিকে যেন খেয়ালই নেই। চরম উদাসীন ব্যক্তি। শুনলাম ইনি দিলীপকুমার রায়। কলকাতা থেকে ইনিও এসেছেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ছেলে। উনিও কি ব্রাহ্ম? না। তবে দু পুরুষে বিলেত ফেরৎ। ওঁদের একটা সমাজ আছে।

এই দুজনকে দেখে আমরা বাঙ্গালী ছাত্রেরা অবাক হয়ে গেলাম। ইনিই সার পি-সি রায়? ইনিই ডি, এল, রায়ের ছেলে? দিলীপকুমার রায়? কাগজে যাঁদের কথা পড়ি মাঝে মাঝে, তাঁরাই সশরীরে উপস্থিত!

র‍্যাভেনসা কলেজ বিরাট কলেজ। একদিকে দোতলায় পদার্থ গবেষণাগার। আর একদিকে ঠিক সেই রকমই দোতালায় রসায়ন গবেষণাগার। মাঝখানে একতালা বিরাট বৃত্তাকার লাইব্রেরী। এসব হল দক্ষিণ দিকে। উত্তরদিকের সমস্তটাই দোতালায় কলেজ। ওঁরা ঘুরে ঘুরে দেখছেন। আমরা ছাত্রের দল ওঁদের দেখছি। পেছনে পেছনে চলেছি। পরিজা সাহেব প্যাণ্ট-কোট পরিহিত সাহেব। টাই ঝোলানো গলায়। দীর্ঘকায়। গোঁফ-দাড়ি কামানো। মাঝখানে সিঁথি। দুদিকে চুল তুলে দেওয়া। ক্রীম দিয়েই চেপে বসানো। স্কলারসিপ পেয়ে বিলেত গিয়েছিলেন। সাত বছর সেখানে ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েও ছিলেন। ইডেন হোটেলে থেকেও ছিলেন। গরীবের ছেলে। আগাগোড়া বৃত্তি পেয়ে পেয়েই পড়েছিলেন।

এখন সুশিক্ষিত। স্বপ্রতিষ্ঠিত। ছাত্রদের আদর্শস্বরূপ।

আচার্য এই সাহেবের পাশে অত্যন্ত বেমানান। ধুতি পরিহিত, খদ্দর-শোভিত, এক মুখ গোঁফ-দাড়ি। মাথায় চুলে তেলও নেই, সিঁথিও নেই, পালিসও নেই। কিন্তু বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। পরিজা সাহেব তাঁর প্রতি ভক্তিতে গদগদ। যেন শিশু একেবারে। কথা বলবার সময় মাথাটি ভক্তিতে একেবারে আনত। যেন স্কুলের অতি বিনীত নিম্নশ্রেণীর ছাত্র একটি। আচার্য কথায় কথায় কেবল বলছেন, ওহে প্রাণকেষ্ট, শুনছো প্রাণকেষ্ট। প্রাণকেষ্ট আমাদের সামনে একটু বিব্রত। কিন্তু ভক্তি বিনতকণ্ঠে বলছেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। দুজনে বাংলাতেই বাক্যালাপ করছেন। আমরা তখন বুঝলাম পরিজা সাহেবের আসল নাম প্রাণকৃষ্ণ পরিজা। ওড়িয়া ভাষায় যার উচ্চারণ প্রাণকৃষ্ণ পরিজা। হয়ত প্রফুল্লচন্দ্রের সুপারিশেই বিলেত যেতে পেরেছিলেন।

দিলীপ রায় সঙ্গে আছেন, সব চেয়ে চেয়ে দেখছেন, কিন্তু কথা একটিও বলছেন না। আমাদের মনে হল তিনশো মাইল পূর্বে অবস্থিত, বাঙ্গলা ঐতিহ্যের পীঠস্থান কলকাতা, যেন র‍্যাভেনস কলেজের চতুষ্কোণ-এর ভেতর হঠাৎ পদ্মের মত হেসে উঠেছে। এসব ফুল ত কলকাতাতেই ফুটেছে। কটকেও সুবাস ছড়াচ্ছে। সেই মুহূর্তে কলকাতায় পড়বার বাসনা, ভূতের মত আমায় পেয়ে বসল। যে তীর্থভূমি এইসব সাধু-সন্তদের চরণরেণুতে পবিত্র, সেইখানে যেন আমার স্থান। সেই রাস্তার ধুলোতেই আমি গড়াগড়ি খেয়ে বাঁচব। পবিত্র রজঃ সারা অঙ্গে মেখে পবিত্র হব। ফুলের মত আমিও ফুটে উঠব। কিন্তু হল না। মনোবাঞ্ছা কোনদিনই পূর্ণ হল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে অর্ধচন্দ্র দিল। প্রত্যাখ্যান করল। আমি তখনও শিশু বলে। নাবালক বলে। ষোড়শ বর্ষ প্রাপ্ত না হলে ওখানকার মহা-বিদ্যালয়ে নাকি প্রবেশ করা যায় না। অন্ততঃ তখন যেতো না। বিদ্যার মন্দিরের সামনে প্রকাণ্ড চীনা

প্রাচীর দাঁড়িয়ে।

একটু পরে ওঁরা চলে গেলেন। ওড়িয়া ছেলেরা তখন আমাদের নিয়ে পড়ল। জিজ্ঞেস করতে লাগল—স্যার পি-সি রায় আমাদের চুল ধরে ধরে নাড়ছিলেন কেন?

বললাম—এমনিই। বিশেষ কোন কারণে নয়। তোমরা আধুনিক কলেজের ছেলেরা কি রকম করে চুল ছাঁটো, তাই নিজের চোখে দেখছিলেন, আর কি! পুরানো সংস্কার কতটা ছাড়তে পেরেছো, তাই পরীক্ষা করছিলেন, আর কি! বৈজ্ঞানিক মানুষ ত? নিজের চোখে দেখতে চান সবই। শোনা কথায় চলতে চান না এক পাও।

তারা খুসী হল। আমরা বাঙ্গালী ছেলেরা কিন্তু খুসী হলাম না। কলকাতার এই উন্নাসিকতা অসহ্য। সত্যিই ত! কৌতূহলটার অন্যভাবে নিবৃত্তি হতেও ত পারত। আমরা যেন মানুষ নই। উড়িষ্যায় বাঙ্গালীরাও যেন মানুষ নয়। এ তাচ্ছিল্য প্রত্যেক বাংলার বাইরে বাস করা বাঙ্গালীকে ভুগতে হয়।

আচার্যদেবের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯২৮ সালে। সায়েন্স কলেজে। কলকাতায়। আগে যা ছিল আপার সারকুলার রোড। এখন তা হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। এই নাম বক্ষে ধারণ করে এই রাস্তার গৌরব বেড়েছে। আমরা লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছি একদল। আমাদের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছেলেরাই। কলকাতায় সে বছর সায়েন্স কংগ্রেস হচ্ছে। আমরা এসেছি delegate হয়ে। ডাঃ সাহানীও এসেছেন। আমাকে ডাঃ সাহানী আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায়। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জীর কাছে। সব ব্যবস্থা করতে। ডাঃ মুখার্জী আমার মুখে সব শুনলেন। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রিপন কলেজের হোস্টেল সুপারিন্টেণ্ডের কাছে। রিপন কলেজ এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। সুন্দর হোস্টেল। রাস্তার ওপরই বড় বাড়ী। তেতালায় একটা বড় ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। দু'দিন পরে অন্যান্য ছাত্ররা সদল বলে এলো। লক্ষ্ণৌয়ের অতি সভ্য

ছাত্ররা দেখে খুসীই হল। বললে—you have made excellent arrangements for us, Mukerjee। So this is your native place! Calcutta! good! very good, you are lueky. we envy you.

আমরা সায়েন্স কলেজ দেখতে গেছি। সেখানে বিরাট উঠোনে চা খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। টেবিলের পর টেবিলে সাদা টেবল-ক্লথ। চা, প্লেট, খাবার ইত্যাদি। সুসজ্জিত সব ডেলিগেট খেতে বসেছে। অধিকাংশই স্যুটেড-বুটেড। সংখ্যাতেও শ' পাঁচেক হবে। বেশ চা খাওয়া চলছে। হাসি ঠাট্টা, মস্করা চলছে। হঠাৎ সমস্ত ডেলিগেটরা উঠে দাঁড়ালো। আমরা অবাক হয়ে চারদিকে দেখছি। কি ব্যাপার?

দেখলাম, একটি বৃদ্ধ, ছোট ধুতি আর কালো কোট পরণে, মুখে দাড়ী, ধীরে ধীরে কলেজের বারান্দা পার হয়ে নেমে আসছেন উঠোনে। তাঁর সম্মানে সারা ভারতের ডেলিগেট কাতার দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমার সহপাঠী অমৃতলাল পাঞ্জাবী। পোশাক-পরিচ্ছদে নিখুঁত সাহেব একেবারে। সে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কৌন হ্যায় জী? কৌন হ্যায়? বললাম—স্যার পি-সি-রায়। আমি তাঁকে চিনতাম। তাঁর মুখ প্রত্যেক বাঙ্গালীর চেনা। অজস্র ছবি দেখেছি। অমৃতলাল অবাক হয়ে গেল। হাঁ করে তাঁকে দেখতে লাগল।

পাশেই ছিল বোস্ ইন্‌স্টিটিউট। স্যার জগদীশচন্দ্র লেকচার দেবেন! আমরা বসে আছি গ্যালারীতে। অপেক্ষা করছি তাঁর আগমনের। তাঁর ছবিও আমার পরিচিত। একটু পরে তিনি এলেন। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারা। তেমনি সাদামাটা পোষাক। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রং। গলাবন্ধ কোট। টাই নেই। যেমন ছিল না পি. সি, রায়েরও। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে। রগের দুই পাশ অনেকটা উঠে গেছে। আমরা যে চেহারার ছবি দেখতে অভ্যস্ত তার কোনখানটাই নন যেন। ইংরাজী উচ্চারণও ভাল নয়। সাহেবী টান্-ফান্ মোটেই নেই। বাঙ্গালী উচ্চারণে বাঙ্গালীর বলা ইংরিজীই

বলছেন। ডাঃ সাহনীর ইংরিজী উচ্চারণ ঠিক যেন সাহেবদেরই মত। এঁর তা নয়। কিন্তু তিনি যখন একটা প্রকাণ্ড সাদা stick হাতে নিয়ে কালো বোর্ডে plant growth দেখাতে লাগলেন, আমরা অবাক হয়ে গেলাম। তিনি যেন এক যাত্নকর। মিষ্টিক। ধ্যানী। একটা আলোর ছোট গোলাকার বৃত্ত চলে গেল, বোর্ডের ওপর দিয়ে, আস্তে আস্তে। এটাই নাকি plant-এর growth-এর চিত্র। crescograph যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক লক্ষ গুণ বর্ধিত। crescograph স্যার জগদীশেরই আবিষ্কার। ভারতীয় কারিগরদের দিয়েই তৈরী। তিনি যখন ঐ আলোর গতি দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব দেখাতে লাগলেন, সমস্ত দর্শক যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। হল অন্ধকার। দেখা যাচ্ছে বোর্ডে এক টুকরো আলো। আর দেখা যাচ্ছে, সাদা pointer হাতে স্যার জগদীশের মাথা। শোনা যাচ্ছে কানে তাঁর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর। তিনি বলছেন—Now I apply poison to the plant. Growth will stop. The light will not move. see! how the plant struggles for life, see! how comes death! see! the death-spasm! Ah! Ah! it dies! it dies! It has stopped growth. The light no longer moves. It is steady! The plant has died. Ah! Ah! This is death! This is death-struggle!
তিনি এমন আবেগের সঙ্গে বর্ণনা করে চলেছেন যে ওই বিরাট জনমণ্ডলীও যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যথায় ব্যথিত হয়ে পড়ছে। তারা রুদ্ধ নিশ্বাসে তাঁর বক্তৃতা শুনছিল, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সামনের আলোর দিকে তাকিয়েছিল। কম্পন দেখছিল। স্থির হয়ে যাওয়াও দেখছিল। সমস্ত বিশিষ্ট শ্রোতাই সেদিন শর্তহীনভাবে ঐ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের কাছে শির আনত করেছিল। এর প্রতিক্রিয়া আমার ওপরে হতে বাধ্য। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। দর্শকদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গও দু'একজন ছিলেন। তাঁরা একেবারে নীরব। নিশ্চুপ।

নিমেষ নিহত। অমৃতলাল বললে—আলবৎ! বাঙ্গালী! আলবৎ ব্রেন হ্যায় ভাই। মান নাহি পড়ে গা। মছ্‌লি খানে সে ব্রেন হোতা হ্যায়। জরুর! মঁ্যায় ভি খাউঙ্গা মছলী।

গেলাম সি ভি রমনের লেকচার শুনতেও। ২১০ নম্বর বৌবাজার ষ্ট্রীট। মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪)-এর দ্বারা স্থাপিত Indian association for advancement of science-এর Hall-এ। রমনের মাথায় সাদা পাগড়ী। কোট প্যাণ্ট পরণে। অতি বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। অতিরিক্ত উজ্জ্বল দুই চোখ। নিজেও যথেষ্ট চঞ্চল মানুষ। অতি চঞ্চলভাবে হাত পা নাড়ছেন। আচার্য জগদীশের মত শান্ত, সৌম্য, সংযত নন। যেন সব সময়ে ছট্‌ফট করছেন। প্রাণের ঐশ্বর্য্যে যেন ভরা। তিনিও একটা experiment দেখালেন। সহকারী ছিলেন কৃষ্ণান্। যিনি পরে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। apparatus ঠিক হতে দেরী হচ্ছিল। কি একটা defect বেরিয়ে গিয়েছিল। স্যার সি ভি রমণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখলাম। শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বললেন—হ্যাঁ। ওরা যন্ত্রটা ঠিক করুক। আপনারা ততক্ষণ একটা গল্প শুনুন। আমারই অভিজ্ঞতা।

শ্রোতারা উন্মুখ হয়ে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন—ইউরোপ গেছি। একদিন আমারও ইচ্ছে হল বরফে skate করি। দেখি বরফের ওপরে অনেকেই অতি সহজেই skate করছে। আমারও ইচ্ছে হল। লোহার জুতো পরে আমিও skate করছি। দিব্যি লাগছে। বেশ ভাল লাগছে। যেন স্বর্গে উঠছি। কিম্বা পাতালে নামছি। হঠাৎ এক জায়গায় যেই এসেছি আর অমনি—বুঝতেই পারছেন কি বলতে চাচ্ছি। একেবারে ভুস্‌ করে জলের নীচে। সেখানকার বরফটা পাতলা ছিল। দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। বলে অঙ্গভঙ্গী করে সেই ডোবার দৃশ্য অভিনয় করে দেখালেন। সবাই হো হো করে হেসে উঠল। তাঁর সেই দুর্গতির চিত্র মনে মনে কল্পনা করতে লাগল। সবাই হাসছে। তিনিও হাসছেন।

ইতিমধ্যে যন্ত্র ঠিক হয়ে গেল। তিনি লেক্‌চার দিতে শুরু করলেন। Raman effect বোঝাতে লাগলেন। Scattering of light দেখাতে লাগলেন। ভাল বুঝলাম না। কিন্তু Nobel Prize পাওয়া বৈজ্ঞানিক তিনি। (১৯৩০ সালে প্রাইজ পেলেন)। একমাত্র ভারতীয় নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানী। মাথা নীচু করতেই হল। তাঁর আবিষ্কার অণুর energy level-এর ওপর আলোকপাত করে। কিন্তু আমরা তাঁর উপস্থিত-বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলাম। কেমন কৌশল করে একটা হাস্যকর অবস্থার বর্ণনা দিলেন। আমাদের কৌতূহল আটকে রাখলেন। কারও কোনও রকম বিরক্তি বোধ হল না। কেউই অসহিষ্ণু হয়ে উঠল না। জীবনে প্রতিবন্ধকতা আসেই। তখন চাই ধৈর্য। ধৈর্যই পথ-প্রদর্শক। তিনি নিজে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেন। সহযোগীদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন না। স্বাভাবিক উজ্জ্বল হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে একটি চমৎকার গল্পও শোনালেন। বৈজ্ঞানিক হলেই সে নীরস অথবা শুষ্ক কঠোর হতে হবে, এমন কোন মানে নেই। আমরা মুগ্ধচিত্তে লক্ষ্য করলাম এতবড় জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকও কত বড় হাস্য-রসিক। কি সুন্দর তাঁর কথা — বলার ঢং। গল্প বলবার কৌশল। বুঝলাম সাহিত্য আর বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী নয়। পরস্পরের পরিপূরক।

এই রকম জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা অভিভূত একটি ছেলে, যখন বিজ্ঞানের শেষ-পরীক্ষা শেষ করে ঠিক করল যে চাকরী করবে না, তখন তার কাছে কোন দরজা খোলা রইল? যখন সে ঠিক করল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে ব্যবসাই করবে, তখন প্রশ্ন হল, কোন ব্যবসা? বন্ধুরাই বন্ধুর উপকার করে। আবার অপকারও তারাই করে। আমারও এক এই রকম বন্ধু জুটল। নাম—তারকনাথ মৈত্র। ভাল অভিনেতা। সেই সূত্রেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব। সে বললে— মোটরের ব্যবসা কর। তার নিজের মোটরের ব্যবসা ছিল। ভাড়ায় মোটর খাটাতো। নিজেই গাড়ী চালাতো। বেশ টাকা পেতো।

তেল খরচ বাদ দিয়ে সমস্তটাই লাভ। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাধা দিলেন না। দু'খানা "সেভ্রোলে"-কার কেনা হল। ঠিক হল নতুন জায়গায় যেতে হবে। যেখানে ট্রেনের ব্যবস্থা ভালো নয়। ঠিক হল, সাঁওতাল পরগণা। সেখানে নাকি ট্যাক্সি, বাস, লরী, চলবার প্রচুর সম্ভাবনা। অতএব গেলাম দেওঘর। বাড়ীভাড়া করলাম। গ্যারেজ তৈরী করলাম। বন্ধু চালাতো গাড়ী। আমি বসে থাকতাম পাশে। একটা ড্রাইভারও রাখলাম। দেওঘরের লোক। নগদ আমদানী বেশ হত। মন খুসী হয়ে উঠত।

এক বৎসর দেওঘরে ছিলাম। কিন্তু একদিনের জন্যেও বৈদ্যনাথের মন্দিরে যাইনি। পাণ্ডাদের শ্রীমুখ দর্শন করিনি। তারাও আমাকে একলা দেখে টুঁ শব্দটি করেনি। তখন ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করতাম না। যাকে বলে rational মানুষ, তাই ছিলাম। নিজেকে তাই মনে করে গর্বও অনুভব করতাম। আমি যুক্তিবাদী মানুষ। যুক্তি ছাড়া এক পাও চলি না।

অবশেষে ঘরে ফিরে এলাম। ব্যবসা তুলে দিয়ে। দেওঘর থেকে পুরী। স্বহস্তে মোটর ড্রাইভ করে। যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আর পারছি না। চেষ্টা করেও পারছি না। এ বিফল! বিফল আমি!

ডাঃ সাহনীর ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও আমি কিন্তু দরখাস্ত করলাম না।

মাতাঠাকুরাণী বললেন—পিতা পড়েছিলেন আইন। পিতামহ পড়েছিলেন আইন। মাতুল পড়েছিলেন আইন। পিতামহ হয়েছিলেন সরকারী উকিল। পিতা হয়েছিলেন সাবজজ। মাতুল হয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট্ জাজ। তুমিও আইন অধ্যয়ন কর। যা হয় হবে।

অতএব কটকে গিয়ে আইন-কলেজে ভর্তি হলাম। লক্ষ্ণৌয়ে আইন পড়তেও পারতাম। তখন একথা মনেও হয় নি। স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি যে আইন আমার জীবিকা হবে। র‍্যাভেন্‌সা কলেজ-হোষ্টেলে স্থান হল না। থাকলাম মঙ্গলাবাগে ক্রীশ্চানদের হোষ্টেলে। আলাদা

ঘর নিয়ে। সকালে আইন ক্লাস। সারাদিন ছুটি। প্রচুর সময়। পড়বার। চিন্তা করবার। লেখবারও।

১৯২৯ সালটা আমার আত্মানুসন্ধানের ভুল রাস্তা অনুসন্ধান করেই গেল। ১৯৩০ সাল থেকে নতুন পথের আস্বাদ পেলাম। আবার ছাত্রজীবন স্বরু হল। আজ প্রায় পঞ্চাশবছর পরে এই যে অক্ষরের পর অক্ষরের লাইন সাজিয়ে চলেছি। এই যে শব্দের নিঃশব্দ অভিসার চলেছে, ভাবছি এই কি আমার নিজস্ব পথ ? মন বলছে, হ্যাঁ। এই-ই তোমার নিজস্ব পথ, এছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। অন্য কোন কাজ নেই। আর সবই বাহুল্য। অনাবশ্যক। আত্মঘাতী। নিষ্প্রয়োজন।

আমার মনটার পরিচয় দিতেই ত বসেছি। তার গড়ে-ওঠার ইতিহাস। এই লেখাটা হল আমার আত্মতত্ত্ব নিরূপণ। আত্ম-বিশ্লেষণ। বসে বসে পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই মনটার কথাই ভাবছি। কেমন সুন্দর ছিলাম লক্ষ্ণৌয়ের হোষ্টেলে। মেষ্টন হোষ্টেল। দোতালায়। বৃহৎ সুসজ্জিত ঘর। কারুর সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করে থাকা নয়। ম্যাটিং পাতা মেঝে। পড়বার টেবিল আলাদা। খাবার টেবিল আলাদা। সাদা এনামেল-করা খাট। ক্যান্‌ভাসের। সাতজন বাঙ্গালী ছাত্র মিলে মেস। ত্নটি চাকর। একটি পাচক। রন্ধনশালা থেকে ঘরে খাবার পৌঁছে দেবার জন্যে একটি চাকর। গরম-গরম সদ্য-সেঁকা রুটি। ঘরে বসে খাচ্ছি। এই রাজসিক জীবনে ত্ন'বৎসর কাটিয়েছি। দরওয়ান প্রতি সকালে ফুলের তোড়া রেখে যায় টেবিলে। পুরোনো তোড়া তুলে নিয়ে যায়। বলে—বন্দেগী! জনাব! বলেই ঝুঁকে সেলাম করে। লক্ষ্ণৌয়ের সেলাম করবার কায়দাই আলাদা। কোমর বেঁকাতেই হবে। শির যৎপরোনাস্তি আনত করতেই হবে। দায় সারা কাজ লক্ষ্ণৌয়ের ভব্যতা রক্ষার কোডে লেখা নেই। পায়খানার কাজে মেথর ফিনাইল ও ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। প্রত্যেকের যাবার পূর্বে ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে দেয়। সারি সারি আলাদা আলাদা

বাথরুম। মাথার ওপর জলের কল। "সাওয়ার" লাগানো। লক্ষ্ণৌ মানেই আদব-কায়দার দেশ। মধুর উর্দু জবান। টাঙ্গাওয়ালা পর্যন্ত চোস্ত উর্দু বলে। শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। মার্জিত রুচি প্রত্যেকটি অধিবাসী। নবাব ওয়াজেদ্ আলির দেশ। সব গেলেও এখনও অনেক কিছু বেঁচে আছে। যা সুন্দর যা চিরস্থায়ী। যা মধুর।

কটকে তিন বৎসর ছিলাম। লক্ষ্ণৌ, দেওঘর, ছাড়ার পরও। এই তিন বৎসর আমার প্রস্তুতির পক্ষে খুবই দরকারী ছিল। ল-কলেজের বুড়ী ছুঁয়ে আছি। পুলিশের নজরে পড়ছি না। বেকারের দলেও যাচ্ছি না। সমস্তই দুই চোখ মেলে দেখে যাচ্ছি। মনের ভেতরে গেঁথেও যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে। আইন ছাড়াও যা ইচ্ছে তাই পড়ছি। প্রচুর সময়। নিজের দিকে দৃষ্টি দেবার যথেষ্ট সুযোগ। আত্ম-অনুসন্ধান করে চলেছি।

কটকে এই তিন বৎসর বাস করবার সময়েই আমি আমার ভেতর তিনটে শক্তি আবিষ্কার করলাম। প্রথম—আমি নাটক লিখতে পারি। দ্বিতীয়—আমি অভিনয় করতে পারি। তৃতীয়—আমি বক্তৃতা দিতেও পারি। কেমন করে আবিষ্কৃত হল এই শক্তি? আমার এই অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান অর্ধডজন গুণী ব্যক্তির কাছ থেকেই পেলাম। যাঁদের সংস্পর্শে আমি এই তিনবছরে এসেছিলাম। এঁরাই ছিলেন আমার জীবনের পথপ্রদর্শক। আত্মার আত্মীয়। এঁদেরই যেন আমি এতদিন মনে মনে খুঁজছিলাম। এঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শিশির ভাদুড়ী, বনফুল, ধীরেন গাঙ্গুলী (ডি জি) এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। এঁদের কথা লিখেই জীবন-সঙ্গীতের প্রথম পর্ব শেষ করব। দুর্ভাগ্য, এঁদের মত মানুষ পরবর্তী জীবনে আর দেখলাম না। কারণ এঁরা রোজ জন্মান না। কোন দেশেই না।

এই সময়টিতেই কখন নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে হৃদয়-দ্বারে এসে করাঘাত করল নারী। প্রথম অভিজ্ঞতা প্রেমের। কি তার মাধুর্য, সেই যেন জীবনে প্রথম সূর্য উঠল। অথচ কিছুই নয়। শুধু স্বপ্ন। আজ মনের

মধ্যে তার কোন অস্তিত্বই নেই। এমন-কি কোনকালে যে কখনো মনে এত আনন্দ হয়েছিল, তা মনেই হয় না। জলের তেলক। কখন মিলিয়ে গেল। আজ স্মরণ-পথে ভুলেও উদিত হয় না। অথচ একদিন মনের মধ্যে কি তাণ্ডবই না সৃষ্টি করেছিল। প্রথম প্রণয়-স্পর্শে কি লোহাও সোনা হয়ে যায়? জানি না। আমি অন্ততঃ হয়ে গিয়েছিলাম। কি প্রচণ্ড কর্মস্পৃহা যে জেগে উঠেছিল তার তুলনা নেই। আদর্শ ইত্যাদিও প্রবলভাবে নাড়া খেল। গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-শান্তি কামনা করতে গেলে কি আদর্শ ইত্যাদিও মনের আকাশ থেকে তারার মত খসে খসে পড়ে? আমার অন্ততঃ পড়েছিল। যে আদর্শের প্রেরণায় চাকরী করব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে আদর্শ কখন যেন মন থেকে চলে গেল। চাকরী পাবার প্রত্যাশী হলাম। ভাল স্বামী হবার আশায়। হায়রে আমার আমি! যে আদর্শের প্রেরণায় ডাঃ সাহনীর অধীনে গবেষণার সম্ভাবনা ছেড়ে চলে এসেছিলাম, সেই চাকরী-রূপ জীর্ণ বস্ত্রখানা আবার সাগ্রহে মাথায় তুলে নিলাম। একটা সর্ব-ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। দিবারাত্র পড়ছি আর পড়ছি। জ্ঞান অর্জন করছি। সফল হতেই হবে। কি সে উদ্দীপনা। কি সে উন্মাদনা। বর্ণনা করতে আজ আমি অক্ষম। কিন্তু হঠাৎ আমার কল্পনার রূপ নটেশাকটি ছাগলরূপ বাস্তব এসে মুড়িয়ে দিয়ে গেল। স্বপ্ন দেখা শেষ হল।

আমার চিঠির উত্তরে প্রেয়সী লিখলেন—হ্যাঁ। তাঁর বিয়ে হচ্ছে বটে। এবং বিয়ে হচ্ছে মনে করে বেশ আনন্দই হচ্ছে। পিতামাতারই দেওয়া বিয়ে। তিনি অমত করতে পারছেন না। কি সুন্দর স্বচ্ছ, স্পষ্ট উক্তি। হায়রে! বাঙ্গালীর মেয়ে! এই তোমার প্রেম? কিন্তু আমিও কম প্রেমিক নই। উন্মত্ত প্রেমিক। উড়িষ্যার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ছুটে গেলাম বিহারের উত্তর প্রান্তে।

আসন্ন বিবাহের পাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। ইচ্ছা তাঁকে নিরস্ত করবার। কিন্তু তাঁকে দেখে সব অভিপ্রায় কোথায় মিলিয়ে গেল।

ভদ্রলোক সন্দেশ খাইয়েই আমার মাথা খেয়ে ফেললেন। তাঁর কর্ণে অমৃত বর্ষণ করতে আর পারলাম না। নির্বাক প্রেমিক, নির্বাক দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করেই ফিরে এল।

ফিরে এল ভাগলপুরে। বনফুলের বাড়ীতে। তিনি তখন ভাগলপুরে প্রাকটিস করছেন। ডাক্তার। থাকেন বারারীতে। তাঁর ছোট ভাই ভোলা সেখানে ডাক্তার। সে আমার বন্ধু। কটকে ডাক্তারী পড়ত। আমার হোটেলের পাশেই ছিল কটকের মেডিকেল স্কুল। তখনই বন্ধুত্ব হয়েছিল। দুই ভাই একসঙ্গে থাকেন।

বনফুলের নাম শুনেছিলাম। সাহিত্যিক বলেও জানতাম। জীবন্ত এক সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ পেলাম। ফল হল এই যে রাত একটা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে তাঁর লেখা শুনতে হল। উপযুক্ত শ্রোতা পেয়ে বলাইবাবু তাঁর সমস্ত উপন্যাস পড়ে শোনাবেনই। শ্রোতার মন তখন অন্য জায়গায়। এক বর্ণও শুনছে না। শুধু মাথা নেড়ে চলেছে। কিন্তু পাঠকের তারজন্যে কোন দুর্ভাবনা নেই। তিনি সোৎসাহে পড়েই চলেছেন। সেইদিনই বুঝলাম তিনি জাত-সাহিত্যিক।

কিন্তু আমিই-বা কেন শোনবার ভান করে জেগে বসেছিলাম? আমারও মধ্যে কোথাও একটা সাহিত্যিক নিশ্চয় লুকিয়েছিল। সে সবেমাত্র আত্মপরিচয় পেতে আরম্ভ করেছে। সে একদিকে সাহিত্য-রস উপভোগ করছে। আর একদিকে ব্যর্থ-প্রণয়ের বেদনারসও উপভোগ করছে।

দেখতে দেখতে রাত একটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস শেষ হল। পাঠক শান্ত হল। শ্রোতা বিশ্রাম নিল। কিন্তু সে আত্মপরিচয় লাভ করল।

বলাইবাবু যেন জোর করে তাকে আত্মপরিচয় পাইয়ে দিলেন। যেন বললেন, তুমি সাহিত্যিক। প্রেম তোমার সাহিত্যের ইন্ধন হতে পারে। জীবনের সর্বস্ব হতে পারে না। প্রেমে বঞ্চিত হয়েছো

হয়তো। কিন্তু এতো অসহায় যথার্থই তুমি নও। তোমারও মূল্য আছে। খোঁজো কোথায় আছে সেই মূল্য।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি। ভোলা সব জানত। সে সহানুভূতি ছাড়া আর কি দেখতে পারে। তাই দেখাচ্ছে। আমি মলিন। বিমর্ষ। ভেতরটা কাঁদছে।

বারারীতে তিনদিন রইলাম। বসে বসে গঙ্গার জলস্রোত শুধু দেখছি। বারারী হাসপাতালের পাশেই ডাক্তারের কোয়ার্টার। সেখান থেকে চোখ তুলে চাইলেই দেখা যায় গঙ্গা। গঙ্গার ধারের সেই অপূর্ব দৃশ্য ভোলবার মত নয়।

বন্ধু ভোলানাথ বেদনা ভোলাবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেদনা বেদনাই। এ বেদনা যে কি তা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেউ বুঝতেই পারবে না। কি যাতনা যে বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে! ভোলো বললেই কি ভোলা যায়? ভোলা কি এতই সহজ?

ভাগলপুর থেকে চলে আসি বোলপুর। কে যেন আমায় হাত ধরে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এল। কানে কানে বলতে লাগল— শান্তি পাবে শান্তিনিকেতনে এসে। রবীন্দ্রনাথকে দেখ। কি তুমি প্রেম প্রেম করে ছটফট করছ? রবীন্দ্রনাথকে দেখো। প্রেম কি বুঝতে পারবে। তিনি কি অপূর্ব প্রণয়-বেদনা ব্যক্ত করেছেন। অজস্র কবিতা লিখে। এত প্রেমে কি কেউ কখন পড়েছে? বেদনায় নিশ্চয় নীল হয়ে গেছে তাঁর হৃদয়। যাও, গিয়ে দেখ, তিনি বেঁচে আছেন কি করে? সময় কাটাচ্ছেন কি করে? তোমার মত হা-হুতাশ করে? অথবা বেদনাকে অতিক্রম করে? এক ব্যর্থ প্রণয়ী আর এক ব্যর্থ প্রণয়ীর কাছ থেকে কি কোন শিক্ষা পেতে পারে না? নিশ্চয় পারে। দেখতে হবে। দেখতে হবে। নিজের চোখে তাঁকে দেখতে হবে। নিশ্চয় তিনি প্রণয়ে গভীর বেদনা অনুভব করেছেন। তবেই ত প্রণয়-বেদনার এমন মনোহর কাব্যরূপ দেওয়া তাঁর পক্ষে

সম্ভব হয়েছে। তাঁকে দেখতে হবে। বুঝতে হবে কি করে তিনি সান্ত্বনা পেয়েছেন। কবিতা লিখছেন। সাহিত্য করছেন। সাংসারিক জীবনও কাটাচ্ছেন। শুধু তাঁর কবিতা পড়লে কিছু বোঝা যায় না। চাক্ষুষ দেখতেও হবে।

রবীন্দ্রনাথকে ছুটে গিয়ে দেখবার কথা মনে হলে আজও আমার মনে প্রচুর আবেগ জন্মায়। তখন ৭ই পৌষ। উৎসব হচ্ছে। শ্রীনিকেতনে। শুনলাম রবীন্দ্রনাথ আসবেন শ্রীনিকেতনে। ভাষণ দেবেন। আগের দিন শান্তিনিকেতনে এসেছি। অতিথিশালায় স্থান পেয়েছি। যা দেখছি, তাই ভাল লাগছে। হ্যাঁ, কবির উপযুক্ত স্থান বটে। অতিথিশালার শৌচাগারের দেওয়ালেও সুন্দর সুন্দর ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ছবি। সাদা-সাদা হংসবলাকা উড়ে যাচ্ছে। দেখলাম দ্বিজু ঠাকুরের "নীচু বাংলা।" রবি ঠাকুরের "উত্তরায়ণ"। কলাভবনে উঁচু মাচার ওপর দাঁড়িয়ে আলুলায়িত কুন্তলা কুমারী মেয়ের দেওয়ালে ফ্রেস্কো আঁকাও দেখলাম। নারীর এই অপরূপ মূর্তি পূর্বে দেখিনি। বিস্মিত হলাম দেখে। ঘরকুনো হেঁসেল-ঠেলা বাঙ্গালী মেয়েদের রবীন্দ্রনাথ কোথায় এনে তুলেছেন। তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন তারাও শিল্পী হতে পারে। স্রষ্টা হতে পারে।

সভা আসন্ন। শ্রীনিকেতনে মাটিতে গালিচার ওপর বসে আছি। চেয়ার টেবিল বেঞ্চের বালাই নেই। রবীন্দ্রনাথের জন্যে সেই মাটিতেই একটা জায়গা আলাদা করে রাখা। স্ত্রী-পুরুষ উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি। কখন কবি আসবেন তাই ভাবছি। সকাল আটটা। শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন মাইল দুয়েক দূরে। শান্তিনিকেতন থেকে একটা করে মোটর আসছে, আর আমি ভাবছি এই বুঝি রবীন্দ্রনাথ আসছেন। তাঁকে আগে কখনও দেখিনি।

দেখবার অদম্য কৌতূহল। একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়েছি। একটা মোটর এল। একজন গৌরবর্ণ পুরুষ নামলেন। ভাবলাম এই বুঝি রবীন্দ্রনাথ। শুনলাম রবীন্দ্রনাথ নন। তবে ঠাকুর-পরিবারেরই

কেউ একজন। আরও একটা মোটর এসে থামল। ইনিও শুনলাম আর একজন। আবার একটা মোটর এল। আমরা বসেই আছি। হঠাৎ সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল। চাপাধ্বনি শুনলাম, কবি এসেছেন। গুরুদেব এসেছেন। গুরুদেব! গুরুদেব! চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মোটর থামল। দেখলাম চোখ মেলে রবীন্দ্রনাথকে। যিনি ছবির নিশ্চল মূর্তি আর নন। জীবন্ত। আমি ছবি দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু এখন দেখছি ছবির মানুষ নড়ছেন। চড়ছেন। মোটর থেকে নামছেন। পা বাড়িয়ে দিয়েই। যেমন আমরাও নেমে থাকি। মোটর থেকে নেমে গট্ গট্ করে দ্রুত পদে সভার দিকে এগিয়ে এলেন। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় এক শুভ্র মস্তক পুরুষ। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে। বুঝলাম, সময়কে ইনি একটা প্রচ্ছন্ন শক্তি বলেই জেনেছেন। তাই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চান না। দুটো তিনটে সিঁড়ি মুহূর্তে পার হয়ে সভায় উঠে এলেন। তিনি তখন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর চলা দেখে মনে হল ইনি জরাকে জয় করেছেন। শরীরে যুবকের ক্ষিপ্রতা। শক্তি।

তাঁর আগমনের মুভি তোলা হতে লাগল। তুলছেন এক গৌরবর্ণ মধ্যবয়সী দীর্ঘকায় প্রৌঢ়। দামী শাল কাঁধে। দিশী ধুতি পরণে। রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার হ্যাণ্ডেল ঘুরোচ্ছেন। শুনলাম, তিনি রবীন্দ্রনাথের পুত্র। রথীন্দ্রনাথ। গোঁফ-দাড়ী কামানো মুখ। দশ আনা ছ'আনা ছাঁটা চুল। পিতার মত বাবরি নেই মাথায়। আধুনিক যুগের মানুষ। ইংরিজী সভ্যতার ছাপ পড়েছে। মোগলাই সভ্যতার ছাপ বিন্দুমাত্রও নেই। পিতাই ছিলো সভ্যতার শেষ প্রতিনিধি। তবে পিতার পরণে এখন ধুতি পাঞ্জাবী।

রবীন্দ্রনাথকে দেখে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল এই যে ইনি মাটির মানুষ নন। স্বর্গের দেবতা। গন্ধর্ব জাতীয় কেউ। নইলে এত সুশ্রী মানুষও হয়? এমন কাঁচা সোনার মত রং। মানুষের চোখ এত বড় হয়? পটলচেরা চোখ কি একেই বলে? এত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি থাকে সে

চোখে? এমন বুদ্ধির দীপ্তি? নিষ্প্রাণ ছবি কত ভুল পরিচয় রবীন্দ্রনাথের বহন করে। ছবিতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব বিন্দুমাত্রও ফোটে না। শুধু আলোছায়া নিয়ে ছবি তুলছে যে, তারই বাহাদুরী থাকে। রবীন্দ্রনাথ থাকেন না। অন্ততঃ জীবন্ত প্রাণবন্ত রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ দেখে আমার এই ধারণাই হল। ছবি চার আনা মাত্র।

ঢেউ খেলানো সাদা বাবরি চুল মাথায়। পরণে একটা খয়েরী রঙের ঢিলে হাতা গরম পাঞ্জাবী। ঝুল আজানুলম্বিত। পরনে সিল্কের ধুতি। পায়ে শুঁড়-তোলা জুতো। তিনি সভায় ঢুকতেই সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সভা নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েই ছিল। এমন একজন লোক এসেছেন, যাঁর আগমনে প্রত্যেকে যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়ে গেছে। এ বিদ্যুৎ কিসের বিদ্যুৎ? বুঝলাম, এ বিদ্যুৎ তাঁর সাধনা-লব্ধ আত্মিক শক্তির বিদ্যুৎ? তাঁর জীবন-দর্শন, লাভ-ক্ষতি মিলিয়ে চলার জীবন-দর্শন নয়।

একদিক দিয়ে দেখলে তাঁর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। আর্থিক ক্ষতি। স্ত্রীর অলঙ্কার। বিয়ের সোনার ঘড়ি। সব আদর্শ বজায় রাখতে বিসর্জন দিতে হয়েছে। কিন্তু সব দিয়েও এমন কিছু তিনি পেয়েছেন, যা কোন কিছু দিয়েই মাপা যায় না। যা অমূল্য। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকালের জন্যে স্থায়ী আসন। অমরত্ব।

রবীন্দ্রনাথ সভায় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলেন। তাঁর দুই দিকে দাঁড়িয়ে একদল ছাত্র-ছাত্রী। একদিকে মেয়েরা। একদিকে ছেলেরা। তাঁরা সমবেত-কণ্ঠে একটা গান গাইল।

সভা শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ ভাষণ শুরু করলেন। যতক্ষণ গান হয়েছে তিনি নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত মেরুদণ্ড সোজা করে চোখ বুজে গান শুনলেন। এমন ভাল শ্রোতা আমি আর দেখিনি। আমরাও ত সেই গান শুনছি। তাঁর মত এতো নিবিষ্ট হয়ে শুনতে পারছি কৈ? এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। দেখলাম তিনি যে কাজটিই করুন না-কেন, সমস্ত মন-প্রাণ সমর্পণ করেই করেন। তন্ময় হয়ে গান শুনলেন।

গানের ভাবটি পর্যন্ত যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করছেন। তাঁরই লেখা গান। গান শুনতে শুনতে তিনি যেন গান রচনার জন্ম মুহূর্তেই পৌঁছিয়ে গেলেন। কোন ভাবের প্রেরণায়, কোন মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে, তিনি ঐ গান রচনা করেছিলেন, তাই হয়ত ভাবছিলেন।

আমি চেয়ে চেয়ে তাঁকে দেখছি। তাঁর প্রত্যেকটি জিনিসই লক্ষ্য করে করে দেখছি। কে বলবে ইনি জীবন্ত মানুষ? মার্বল পাথরের মূর্তি যেন। গম্ভীর, স্থির, আত্মনিমগ্ন। মাথায় সাদা বড় বড় চুল। সাদা গোঁফ দাড়ী। ইনি কি বৈদিক যুগের কেউ? ইনি কি গ্রীসের wise man? উপনিষদের ঋষি? বিংশ শতাব্দীর কেউ নন? ইনি কি বাঙ্গালী?

তখন সদ্য রাশিয়া থেকে ফিরে এসেছেন। ভাষণে বললেন সেই কথাই। কি দেখে এলেন সেখানে। আজও মনে আছে কি বললেন তিনি। এমনই হৃদয়-স্পর্শী ছিল তাঁর বলবার ধরন। যেমন বিদ্যুৎ-জিহ্ব বক্তা, তেমনই অগ্নি-স্রাবী ভাষা। মুহুর্মুহু রক্ত মোচন হচ্ছে মুখ দিয়ে। বেদনায় ভেঙ্গে পড়েছেন যেন। এখানে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে শতযোজন ব্যবধান। যেন নদীর এক পাশে শিক্ষিতের দল। আর এক পাশে অশিক্ষিতের দল। সহরবাসী এবং গ্রামবাসী। এরা যেন এক দেশের অধিবাসীই নয়। কোন সম্বন্ধই যেন নেই পরস্পরের মধ্যে।

কিন্তু রাশিয়ায় দেখে এলেন, ঠিক এর উল্টো। এই একটি কাজের জন্যেই তারা প্রশংসা পাবার যোগ্য। ইংরেজ রাজত্ব তখনও চলছে। তিনি সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। কাজেই এর চেয়ে বেশী আর কিছু বললেন না। বুঝলাম, তিনি একজন অত্যন্ত সাবধানী ব্যক্তি। কিন্তু কি অসাধারণ অভিব্যক্তি। এসব কথা তিনি "রাশিয়ার চিঠি" বইয়ে লিখেছেন। সেই সব কথাই তিনি মুখেও বললেন সেদিন। কিন্তু কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তির মুখ দিয়ে সেই কথাগুলো বেরিয়ে এল। সেই অনর্গল কথার স্রোত। আন্তরিক উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ।

জলন্ত বিশ্বাসে অগ্নিগর্ভ। বুদ্ধির দীপ্তিতে চমকিত। লেলিহান শিখা যেন। হ্যাঁ, একটা বক্তৃতা শুনলাম বটে। মনে রাখবার মত। কবিতা অন্তর্জ্বালার স্বরূপ। এই অন্তর্জ্বালা দেবাদিদেবের বহিঃপ্রকাশ। ইনি জ্ঞানীর জিহ্বায় নৃত্য করেন। এই ওজস্বী বক্তা আটপৌরে বাঙ্গালী নন। ইনি দশজনের একজন নন। দেশের দুর্গতির দুঃখে আক্ষেপ মুখর। ইনি সাহিত্যিক শুধু নন। ইনি প্রচণ্ড দেশভক্ত। মহাকবি। মহাদার্শনিক। সত্যদ্রষ্টা। ঋতম্ভর। অথচ কর্মকুশল। আবেগ-চঞ্চল। সাধারণ মানুষই।

কিন্তু যে জন্যে এসেছিলাম তাঁকে দেখতে, তার ত কোন পরিচয় পাচ্ছি না মোটরে এলেন। নির্ধারিত আসনে বসলেন। জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু মানুষটা কোথায়? প্রণয়-বেদনার অদ্বিতীয় অভিব্যক্তি দিয়েছেন যিনি? বেদনায় নীল হয়ে উঠছেন যিনি? তিনি কোথায়? তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। একটু পরে তাঁকে দেখতে পেলাম। কে বলবে ইনি বেদনায় নীল? ব্যর্থ-প্রেমিক? সাক্ষাৎ আনন্দ-মূর্তি একটি।

মেলা বসেছিল। পৌষের মেলা। তিনি মেলা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। আমি তাঁর যতদূর সম্ভব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রায় গা ঘেঁসেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর প্রত্যেকটি বিষয় লক্ষ্য করতে লাগলাম। তাঁর ভ্রূভঙ্গি, কথা বলার ধরণ, এমন কি তাঁর হাত নাড়া পর্যন্ত। লক্ষ্ণৌয়ে পড়বার সময় ল্যাবরেটরীতে যেমন করে প্রত্যেকটি ফুলকে চিরে চিরে দেখতাম। তেমনি তাঁকেও মনের ছুরি-কাঁটা দিয়ে ব্যবচ্ছেদ করতে লাগলাম। হ্যাঁ, ইনি এক আনন্দিত পুরুষ বটেন। আনন্দের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি যেন। রসের সাগরে সাঁতার কাটছেন যেন। ইনি যখন বক্তৃতার সময় বলেন—রসো বৈ সঃ। অর্থাৎ তিনি রস স্বরূপ। এখন তাঁর মুখে সে কথা মানায় বটে। তিনি আনন্দরসের রসগ্রাহী বটেন। সৌন্দর্যের উপাসক বটেন। "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে, তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ", এই গান ইনিই লিখতে পারেন। কি

আনন্দ! কি আনন্দ! কি আনন্দ!—ইনিই বলতে পারেন বটে। কোন মানুষের মধ্যে আনন্দের এই জ্যোতির্ময় প্রকাশ আমি পূর্বে দেখিনি। অত পাকা গোঁফ দাঁড়ী, মাথায় অত পাকাচুল, অথচ মুখে অত প্রাণখোলা হাসি, আমার পূর্বে দেখার সৌভাগ্য হয় নি। বুঝলাম, বয়স এঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বার্ধক্য এঁর শরীরে ক্লান্তি আনতে পারেনি। যেন সমস্ত বেদনার পরপারে পৌছিয়ে গিয়েছেন ইনি। কে বলবে সত্তরটি শৈত্য এঁর মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেছে। স্যার পি. সি. রায়, স্যার জে. সি. বোস, স্যার সি. ভি. রমণকে দেখেছি। তাঁদের বক্তৃতা শুনেছি। এঁর ব্যক্তিত্বের কাছে তাঁরা অতিশয় নিস্প্রভ। এঁর অভ্রভেদী ব্যক্তিত্ব হিমালয়-সদৃশ সুউচ্চ। একমাত্র সাধনার দ্বারাই তিনি আপন ব্যক্তিত্ব, এত ঋজুরেখ, এত তুঙ্গ-শীর্ষ করে তুলতে পেরেছেন। সর্ব্বং আনন্দরূপং যৎবিভাতি। আনন্দাৎ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। উপনিষদের এই মন্ত্রের সাধক তিনি।

একজন আধুনিকা, স্থূলাদেহী, মধ্যবয়সী মহিলা তাঁকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে দেখছিলেন, এগিয়ে আসতে সাহস হচ্ছিল না যেন। কি জানি এত বড় মহান ব্যক্তি, তাঁর মত সাধারণ মহিলাকে চিনতে পারবেন কিনা। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলেন। দেখেই চেনার আনন্দে মুখ এমন উদ্ভাসিত করে তুললেন যে মহিলাটির তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম করা ছাড়া অন্য উপায় রইল না। রবীন্দ্রনাথ খানিকটা সুর করে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন—কবে এলে? এমন আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, আমি পূর্বে শুনেছি বলে মনে হল না। গলার কি অপূর্ব কারুকার্য। প্রত্যেকটি nuance যেন স্পষ্ট স্বরের কি modulation। সামান্য দুটি কথা। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যহ ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সামান্য দুটি কথায় যে কি অমৃত পরিবেশন করা যায়, তা না শুনলে বোঝানো যায় না। অভিনেত্রী এলেনটেরীর জুলিয়েটের ভূমিকায় good night কথা দুটি শুনে বানার্ড শ বলেছিলেন—ওই কথা দুটি যে এমন করে বলা যায় তা

ভাবতে পারিনি। আমি নিজে অভিনেতা। আবৃত্তিকারও। আমি এ উচ্চারণের ঐশ্বর্য বুঝলাম। মানুষকে এত আপনার মনে করা যায় নাকি? কণ্ঠে এত দরদ ঢেলে দেওয়া যায় নাকি? বাক্-বিভূতি কি একেই বলে?

মহিলাটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা এভাবে অভ্যর্থিত হয়ে গর্বে ফুলে উঠলেন। তাঁর আত্মশ্লাঘা গোপন রইল না। চোখ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে লাগল। জবাবে কি বললেন তা আমার মনে নেই। হয়ত অতি সাধারণ মামুলী কথাই। বললেনও রসকসহীন সাধারণ গলাতেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্ভাষণ? সে যেন আত্মার জিজ্ঞাসা। প্রাণের ক্ষেত্র ফুঁড়ে উঠছে। এঁর এত অমানুষিক ব্যক্তিগত প্রভাব যে কেন, তা বুঝতে আমার দেরী হল না। কবি শুধু নন। দার্শনিক শুধু নন। নিবিষ্ট শ্রোতা শুধু নন। ওজস্বী বক্তা শুধু নন। ইনি সকলের সঙ্গে এক হতে জানেন। ইনি জনসাধারণের মানুষ একজন। স্টলে স্টলে জিনিস দেখে বেড়াচ্ছেন। মিলেমিশে হাসি ঠাট্টা তামাসা মস্করা করে মানুষের মানুষের মধ্যেকার সব বিভেদ ঘুচিয়ে দিচ্ছেন। ইনি অভিজাত নন। জমিদার নন। ইনি শিল্পী। স্রষ্টা শিল্পী। প্রেমিক। ব্যর্থ প্রেমিক নয়! সার্থক প্রেমিক। মনের প্রেমিক। বিশ্বপ্রেমিক।

বক্তৃতা দেবার সময় তিনি আসন-পিঁড়ি হয়ে প্রায় একঘণ্টা বসেছিলেন। দেখলাম তাঁর পায়ের গৌরবর্ণ ত্বক স্থানে স্থানে তখনও রাঙ্গা হয়ে রয়েছে। কাপড়ের ভাঁজটি পর্যন্ত বর্তমান। শ্বেতশুভ্র পদযুগল। একটি লোম পর্যন্ত নেই। এই রকম চরণের নীচে প্রণত হয়েই সুখ। এ রকম সুবাসিত সুকোমল চরণের নীচে।

কবিকে দেখে একটা বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হলাম। প্রণয়-বেদনাকেও অতিক্রম করা যায়। মানসিক বেদনাকেও রূপান্তরিত করা যায়। অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে, ছন্দ গেঁথে গেঁথে, কাব্যের ফুলও ফোটানো যায়। বেদনাই তার উৎস। অতএব বেদনাকে ভয় পাবার কারণ

নেই। দেবদাসই একমাত্র আদর্শ নয়। রবীন্দ্রনাথ আমার প্রাণে আস্থা ফিরিয়ে আনলেন। বিশ্বাসকে আবার প্রতিষ্ঠিত করলেন। জীবন উড়িয়ে দেবার জিনিস নয়। জীবন সার্থক করে তোলবার জিনিস। জীবনে একটা আদর্শ থাকা চাই। জীবনে সংঘর্ষও থাকা চাই। আত্মোপলব্ধিও হওয়া চাই। আদর্শ ও আত্মোপলব্ধি না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শান্তিনিকেতনটাই তাঁর বিচিত্র আত্মোপলব্ধির জ্বলন্ত উদাহরণ। বিনা আঘাতে যেমন বাদ্য বাজে না বিনা বেদনায় তেমনি সাহিত্যও সৃষ্টি করা যায় না। অতএব মাভৈঃ! বেদনাকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। বেদনাই মনুষ্যত্ব গড়ে তুলবে। প্রথম গুরু বেদনা।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন কথা হল না। আমারও তখন মহিলাটির মত অবস্থা। কিন্তু কথা কত নিষ্প্রয়োজন। কি কথা বলতাম? কি জবাব পেতাম? কোন কথা বললাম না। কিন্তু সমস্ত প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখলাম। একটা জ্বলন্ত উদাহরণ দেখলাম। কথা বলে এর চেয়ে বেশি কিছু কি লাভ হত? না! কবি ঠিকই বলেছেন মন দেওয়া-নেওয়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে। নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে। আজ তাঁর অন্য রূপ দেখছি। রাশিয়া ফেরৎ কর্মীরূপ। সত্তর বৎসরের ক্লান্তিহীন এক কর্মী। নূপুর কোথায়? এ যে বজ্র!

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। রবীন্দ্রনাথ পরমত সম্বন্ধে কতটা উদাসীন। নিজের দোষ-ত্রুটি গোপন করা সম্বন্ধেও কতটা নিশ্চেষ্ট। কারুর কোন বিরুদ্ধ মতামতকে তিনি যেন গ্রাহ্যই করেন না। এমন কি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উপেক্ষাই করেন। আমি জানতাম না, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অর্শ রোগের রুগী। মেলায় দিব্যি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথচ দেখছি তাঁর সিল্কের ধুতির পেছন দিকটা রক্তে লাল। অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রকৃতি তার কাজ করে গেছে। কবি-সম্রাট বলে ছেড়ে দেয়নি। কিন্তু ভাবছি কবি সেটা গোপন

করবার চেষ্টা করলেন না কেন? সকলের সামনে এই রোগটার প্রকাশ হয়ে যাওয়া, ইচ্ছে করলে হয়ত নিবারণ করতেও পারতেন। ওই অত্যন্ত অসুন্দর চিহ্ন, ওই উজ্জ্বল শুভ্র বস্ত্রে অত্যন্ত বেমানান। কবিদেরও শারীরিক রোগ থাকে। কেউ কেউ সেটা গোপন করতে চান। কেউ সেটাকে গ্রাহ্যই করেন না। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি। কত উদাসীন প্রকৃতি তাঁর। সাধারণ ভাবে আমরা যে সমস্ত জিনিসকে লজ্জা বলে থাকি, সে সম্বন্ধেও যেন খুব বেশী সচেতন নন। তাঁর শুশ্রূষাকারীদের লেখায় পড়েছি, তিনি প্রয়োজন হলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে কোন রকম সঙ্কোচ অনুভব করতেন না। প্রস্রাবে বিছানা ভিজে গিয়েছে। তিনি মূত্রাধার ঠিক ভাবে ধরতে পারেন নি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শুধু। পরণে বসন নেই। তারজন্যে লজ্জাও নেই। কিন্তু তোষক বিছানা নষ্ট হয়ে গেছে বলে, তারজন্যেই যেন বেশী লজ্জা।

সাহিত্য দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। রবীন্দ্রনাথের লেখক-ব্যক্তিত্ব স্পষ্টরেখ হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথকে আমরা যতটা পূজা করেছি, তার চেয়ে অনেক কম ব্যাখ্যা করেছি। তাঁর বিদ্যুৎ-প্রসবী ভাষার উৎস তাঁর মস্তিষ্ক। তাঁর কবিতা তাঁর আত্মার চৈতন্যে যে গতিধারা, তার একটা পরিণাম মাত্র। তাঁর আত্মার গভীরে আমাদের পৌছানো চাই। সে আত্মা তৈরী করেছে গায়ত্রী মন্ত্রই। "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ" বলতে বলতে তাঁর বুকটা চওড়া হয়ে যেত। চোখের জল আটকাতে পারতেন না। এই গায়ত্রী দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনিই, যার ঔরসে তাঁর জন্ম। আমাদের দ্বারা তাই অতীতকে কিছুতেই মুছে ফেলা সম্ভব হয় না। ভবিষ্যৎকে ভুলে থাকাও চলে না। তাঁর আত্মার মূলে রয়েছে "শ্রুতি"। শ্রুতির এই একটা লাইন! রসোবৈসঃ, রসং হি এব, অয়ং লব্ধা আনন্দী ভবতী"। তিনি রসস্বরূপ। তিনিই রস। এই রসকে পাইয়া মানুষ আনন্দিত হয়। এই হল রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলমন্ত্র। রস এবং আনন্দ। এই

দুটি জিনিসই শুধু তিনি চান। আর কিছুই তিনি চান না। আর কিছুর জন্যেই তাঁর চিন্তা নেই। কে কি বলল বা মনে করল, তার জন্যে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নন। তিনি স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টির দুটি মাত্র পরিচয়। ভাল অথবা মন্দ। ভাল হলেই তিনি খুসী। মন্দ হলে অখুসী। আরো ভাল করতে চেষ্টা করেন। এ রকম ভিত্তি যাঁর, তিনি অর্শ রোগের প্রকাশ হয়ে পড়ার জন্যে দুশ্চিন্তা করতে পারেন কখন? "তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী"। গীতার এই কথাটা তাঁর জীবনে সত্যিই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যেন। তিনি যোগী। আংশিক মাত্রায় হলেও তিনি যোগী। যোগী ছাড়া আর কিছুই নন।

আজ রবীন্দ্রনাথ নেই। তাঁর শিলাইদহ ও পতিসরের জমিদারী চলে গেছে। "কুঠিবাড়ী" পরহস্তগত। এক লক্ষ টাকার খাজনা, আর এক হাজার বিঘে জমি, দুইই অদৃশ্য। তার রূপসুন্দর দেহও শ্মশানে ভস্মীভূত। রয়েছে কি? তার কাব্য। তা থাকবে। আর থাকবে তার সম্বন্ধে মানুষের স্মৃতি কাল যাকে সংহার করে, সময় যাকে ভুলিয়ে দেয়, স্মৃতি তাকে ধরে রাখে। আমার স্মৃতি তাঁকে কিছুটা ধরে রেখেছিল। তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরেও তা লিখতে আমি দ্বিধা করিনি। আমার জীবন্ত অভিজ্ঞতা অবহেলায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে না। মনের এই সমবেদনার রসেই আমার শিল্প সিঞ্চিত। এই রসই আমার সৃষ্টি। এর গুরুত্ব বিস্তৃতে নয়, গভীরতায়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"সাধারণের মন না রেখে, সাহিত্যের বিশিষ্টতা রাখার দায়িত্ব, কোন না কোন জায়গায় থাকা চাই।" আমি তাঁর এই নির্দেশ মেনে চলার পক্ষপাতী। সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতেই হবে।

এই লেখা পড়ে শোনাচ্ছিলাম শান্তিনিকেতনের ছাত্র গোপাল মুখোপাধ্যায়কে। সে গদগদ হয়ে বললে—গুরুদেবের পা দুখানির যা বর্ণনা দিয়েছেন, অতি সুন্দর। আমরা রোজ গুরুদেবকে প্রণাম করতে যেতাম। তাঁর চটিতে ভরা নরম পা দুখানি খুব টিপেও দিতাম। আর হাতটাও ঘসে নিতাম ভাল করে পায়ের ওপর। কারণ পায়ে

সুগন্ধী পাউডার ঘসা থাকত। অনেক কোম্পানী তাদের পাউডার উপহার দিত। তিনি সেগুলো পায়ে ঘসতেন। আমাদের হাতে অনেকক্ষণ সুগন্ধ লেগে থাকত। হাতটা অনেকক্ষণ ধরে শুঁকতাম।
গোপাল কবি। 'গীতাঞ্জলি'কে ভোজপুরীতে অনুবাদ করেছে। রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম ভক্ত। তার স্মৃতিভাণ্ডারে যেটুকু মণিমুক্তো রাখা আছে, তার থেকে আমি একটা মুক্তো তুলে নিলাম। কারণ মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমি কোথাও পাইনি। একথা শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। বিস্মিত হয়েছি। অভিভূত হয়েছি। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" যিনি বলেছেন তাঁর উপযুক্তই এই কাজ। তিনি বলছেন—"আমার একটি যুগ্ম-সত্তা আমি অনুভব করেছিলাম যেন যুগ্ম-নক্ষত্রের মত। সে প্রায়শই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত। তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সঙ্কল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্যে দিয়ে।" অর্থাৎ যন্ত্র স্বরূপ তিনি। যুগ্ম-নক্ষত্র-কথাটা বৈজ্ঞানিক কথা। পড়ে অবাক হয়েছিলাম। ডবল্ স্টার-এর রহস্যও কবি জানেন। বলছেন তিনি—"আমি যেখানে নির্বিশেষ সেখানে আমি বৈজ্ঞানিক। আমি যেখানে বিশেষ, সেখানে আমি আর্টিষ্ট।" আমিও ত আর্টিষ্ট-বৈজ্ঞানিকের মিলনের পক্ষপাতী। আমার সমগ্র লেখাটাই ত তাই।
চল্লিশ বছর আগে আমার এসব কথা অবশ্যই মনে হয়নি। কিন্তু আজ যখন লিখতে বসেছি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, তখন শুধু তাঁর বাহ্য পরিচয় দিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারিনি। এই ত একজন মানুষ যিনি যুগ্ম-নক্ষত্রও বোঝেন। আবার সেই যুগ্ম-নক্ষত্রের সংকল্পই পূর্ণ হচ্ছে তাঁর মধ্যে দিয়ে, তাও বিশ্বাস করেন। প্রাচীন উপনিষদ ও আধুনিক বিজ্ঞান, এই কবি-মনীষীর চিত্তে, একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে। আমরাও ত এই পথেরই পথিক। আধুনিকতম জ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীনতম জ্ঞানের যোগসূত্র খুঁজে মরছি। সত্য কোথায়? কোন গহন বনের গোপন গুহায় লুকায়িত? সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তাই ত খুঁজছি। আমরা কিছুই বাদ দিতে পারি না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম,

সব। সব চাই।

কটকে ফিরে এলাম। মনে দ্বিগুণ বল নিয়ে। প্রেয়সীকে মনে মনে বললাম—তোমাকে তোমার ভাবী স্বামীর হাতে সমর্পণ করে দিলাম। আমার মনে আর আক্ষেপ নেই। আমি এ দুর্বলতা জয় করে উঠতে পারব। রবীন্দ্রনাথ আমার সামনে এক অপরাজেয় মনুষ্যত্বের জয়-পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। একটি মাত্রও কথা না বলে।

আমায় আত্মসাক্ষাৎকার করতে হবে। আত্মোপলব্ধি করতে হবে। আমায় হতেই হবে সাহিত্যিক। আমার জননী ছিলেন কবি। তাঁকে দেখেছি বৃদ্ধ বয়সেও ঠাকুর ঘরে বসে বসে কবিতা লিখতেন। তখন তাঁর মুখে কি ভাব-তন্ময়তা। তিনি তখন যেন আমাদের জননী নন। তিনি তখন যেন সংসারের কেউ নন। তিনি তখন স্রষ্টা। কবি। আমাকেও তাই হতে হবে। স্রষ্টা। লেখক।

জীবনের কাহিনী লেখা বড় শক্ত। তবু লিখতেই হবে। নতুবা কিছুতেই বোঝাতে পারব না, কি করে আমি আত্মপরিচয় লাভে সমর্থ হলাম। রবীন্দ্রনাথকে দেখে, বনফুলকে জেনে, আমি মনে মনে ঠিক করলাম বেদনাকে ভাষা দিতে হবে। বেদনাই মানুষের চরম বন্ধু। বেদনা বৃথা আসে না। বেদনাই মানুষকে মানুষ হতে শেখায়। আমাকেও শেখালো। বসে বসে শুধু চিন্তা করছি। নানারকম চিন্তা। জীবনের চিন্তা।

হঠাৎ একদিন একটা দৃশ্য মনে মনে দানা বাঁধল। কাল্পনিক নাম দিয়ে, কাল্পনিক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে, জিনিসটাকে মনে মনে আকার দিতে লাগলাম। দেখলাম, কথোপকথনের মারফৎ জিনিসটা আপনি ফুটে উঠতে চাচ্ছে। আবেগের মধ্যে দিয়ে। দৃশ্যের পর দৃশ্যে সজ্জিত হয়ে। ক্রোধ, বিরক্তি, মান, অভিমান, ঘৃণা ইত্যাদি যেন প্রকাশ পাবার জন্যে ছটফট্ করছে। উপযুক্ত ভাষা খুঁজছে। সংস্থান খুঁজছে।

সংস্থানই (situation) রসের জন্মভূমি। অতীত বিত্তা যেন পথ দেখাচ্ছে। দিব্যি কাগজ কলম নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। দেখি অজ্ঞাতসারে একটা নাটক গড়ে উঠেছে। একটা নাটকীয় পরিণতিও মনে এসে গেল। উচ্চ ভাব। মানব মহিমা। আর যায় কোথা ? একটা চমৎকার নাটক দাঁড়িয়ে গেল। তিন অঙ্কে সমাপ্ত।

লিখে রেখেছি নাটক। শোনাতে পারছি না কাউকে। কে শুনবে ? ছটফট্ করছি মনে মনে। অবশেষে বলে ফেললাম বন্ধুবর তারকনাথ মৈত্রকে। সে শুনল। সে আমার অন্তরঙ্গ জীবনের কিছু কিছু খবর রাখত। প্রচুর সহানুভূতি দেখালো। এমন কি প্রস্তাব করল অভিনয় করবারই। পুরীতে ছিল "সঙ্গীত-সম্মিলনী" ক্লাব। অনুমতি পাওয়া গেল। রিহার্স্যাল চলতে লাগল। অতিশয় আনন্দ। অতিশয় উত্তেজনা। সে অভিজ্ঞতা কি ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় ? যায় না। কারণ সে অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। যে অনুভব করেছে। শুধু সেই বুঝতে পারবে। অপরে নয়।

অভিনয়ের দিনও স্থির হল। একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিনেই। অর্থাৎ যেদিন রাত্রে আমার বেদনার কারণ, অপরের আনন্দের কারণ হয়ে উঠবে, সেই শুভ রজনীতেই। আমি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ। অভিনয়ের মাধ্যমে আমার হৃদয়ের অপরিসীম জ্বালা ব্যক্ত করছি। আর ওদিকে ধীরে ধীরে আমার প্রেয়সী অপরের প্রেয়সীতে পরিণত হচ্ছেন। অপরের বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে উঠছেন। অহোভাগ্যং। আজ হাসি পাচ্ছে। কিন্তু সেদিন হাসি পায়নি। অভিনয় করছি আর ভাবছি এইবার শুভদৃষ্টি হচ্ছে। এইবার মালাবদল হচ্ছে। শাঁক বাজছে। উলুধ্বনি হচ্ছে। চারদিক আলোয় ঝলমল করছে। সানাই বাজছে। লোক আসছে আর যাচ্ছে। খাচ্ছে আর হাসছে। অসহ্য। দুই বন্ধু অভিনয়ের শেষে বাড়ী আর ফিরিনি। বাড়ী ফিরতে পারি নি। শূন্য হৃদয় বেদনায় গোঙাচ্ছে শুধু। গুলিবিদ্ধ পশুর মত ছটফট করছে। অবরুদ্ধ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। কি হল ? একি হল ? দুই বন্ধু

পাশাপাশি বসে। দুইজনেই নীরব। কথা কত অনাবশ্যক। কত অবান্তর। কথার শক্তি কতটুকু?

সমুদ্রের তীরে চলে গিয়েছিলাম। শুকনো বালুর ওপর বসেছিলাম। চুপ করে। মাথা নীচু করে। সামনে সমুদ্র গর্জন করেই যাচ্ছিল। নিস্ফল গর্জন। নিস্ফল হাহুতাশ! অকারণ জলোচ্ছ্বাস। মানুষের অদৃষ্ট কি মানুষের হাতে? কোথায় আমি আমার অদৃষ্ট পড়তে পারলাম? সবই ত চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে রজনী প্রভাত হল। এবার বাড়ী ফিরে যেতেই হবে। সমুদ্রের ওপর নতুন সূর্য উদিত হল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম অন্ধকার রজনীর কথা আর চিন্তা করব না। নবীন প্রভাতের কথাই শুধু চিন্তা করব। আজ থেকে নবীন সূর্য্য যেন আমার জীবনে শুধু নবীন প্রশ্নই নিয়ে আসে। পুরাতন প্রশ্ন আর নয়। অতীত যেন আমার জীবনে সম্পুর্ণরূপে অতীতই হয়ে যায়। অতীত। বিগত। বিস্মৃত। বিলুপ্ত। বিধ্বস্ত।

বাড়ী ফিরে এলাম। যৎসামান্য নিদ্রাও গেলাম। ঘুম ভাঙার পর শুনলাম একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ঘুমোচ্ছি শুনে চলে গেছেন। বলে গেছেন আবার আসবেন। একটু পরে তিনি এলেন। বছর চল্লিশের ভারিক্কী চেহারার গম্ভীর মানুষ। কলকাতায় ডাক্তারী করেন। চেঞ্জে এসেছেন। কাল রাত্রে আমার নাটক দেখেছিলেন। আমায় অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। হেতু? হেতু নাকি পিতা পুত্রের দ্বন্দ্ব সুন্দর দেখিয়েছি বলে। তিনি আশা করেন নি কলকাতা থেকে এখানে এসে, কোন স্থানীয় লেখকের লেখা নাটক অভিনীত হতে দেখবেন। আমায় অভিনয় করতেও দেখলেন। আরও আশ্চর্য হলেন। আমার বয়স দেখে আরো অবাক হলেন। ইত্যাদি।

অনেক কথা হল। আমার ব্যথিত প্রাণ যেন আস্তে আস্তে জুড়োতে লাগল। কি সুন্দর লাগছে এখন। এই ত জীবন। আর্টিষ্ট

অভিনন্দিত হচ্ছে। কিন্তু প্রেমিক তখনো কাঁদছে। তবে প্রেমিক সান্ত্বনাও পাচ্ছে। জীবন শুধু প্রেম নয়। জীবন সৃষ্টিও। সৃষ্টির আনন্দও কম আনন্দ নয়। অতঃপর এই কাজেই নিযুক্ত হয়ে যাই না কেন? ষোল আনা। অসংখ্য কাজ আছে সংসারে। অসংখ্য আনন্দ আছে পৃথিবীতে। একটি নারীই আমার জীবনে ধ্রুবতারা হয়ে উঠবে কেন?

আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সেই প্রেমটাকে যখন বিশ্লেষণ করে দেখি, তখন কি দেখি? সেটা কি আমার একটা ভয়ঙ্কর রকম প্রেম ছিল? ভয়ঙ্কর প্রেমের লক্ষণ কি! শুনেছি বিচ্ছেদে এবং বিপদেই প্রেমের পরীক্ষা হয়। আমি কি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি? হয়ত হয়েছি। হয়ত হইনি। কিন্তু একথা সত্য যে আজ পর্যন্ত এমন কোন কাজ করতে পারিনি, যাতে তার সামান্য রকমও ক্ষতি হয়। নিজের কাছে, স্বামীর কাছে, অথবা বাড়ীর লোকদের কাছে, ছোট হয়ে যায়। বিবেক দংশন করে। প্রশ্ন ঘোরালো আর জোরালো হয়ে ওঠে।

আজ এই প্রণয়কাহিনী কেউ জানে না। শুধু জানে তার স্বামী। আর আমার স্ত্রী। কি সুন্দর। কোন পক্ষের কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ আমরা কারুর কোন ক্ষতি হতে দিই নি।

জীবনের জল বেশ কলকল করেই বয়ে যাচ্ছে। যাক। তাকে জোর করে ঘোলা করে তোলবার দরকার কি? কাছে গেলে কোন পক্ষের কোন লাভই ত হবে না। দূরে থাকলে কিছু লাভ হয়ত হলেও হতে পারে।

কল্পনার আকাশে দুই পাখা মেলে দিয়ে হয়ত কিছুক্ষণ ওড়া চলতেও পারে। কল্পনা কি সুন্দর। প্রেম ত এক রকম কল্পনাই। শিল্পও কল্পনা। প্রেম মনের ব্যাপারই। একটা বিশেষ বয়সে শরীরে নামতে চায় বটে। কিন্তু সেই বয়সটা কেটে গেলে প্রেম হয়ে ওঠে সর্ব-মলিনতা-বর্জিত হীরক খণ্ড। শুধু ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলতেই থাকে। আলো থাকে। দাহ থাকে না। তৃপ্তি থাকে। উত্তাপ থাকে না। মানুষকে

কবি বানায়। শিল্পী বানায়। প্রেমে ব্যর্থ হয়েছি বলেই আমি শিল্পী হয়েছি।

আমার নাটক অভিনয়ের কয়েক মাস পরেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে জানাশোনা হয়। কিছুদিন আগেই তিনি আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। সেখানে 'সীতা' নাটক বাংলায় অভিনয় করে। পুরীতে শিশিরবাবু এলেন। তিনদিন রইলেন। কঙ্কাদেবীও সঙ্গে ছিলেন। থাকলেন ইন্‌স্‌পেকসন বাংলোয়। কালেক্টর আজানী সাহেব ব্যবস্থা করে দিলেন। তিন দিন আমার আর অন্য কাজ নেই। সকাল সন্ধ্যে ওখানেই মাটি কামড়ে পড়ে আছি। তাঁরা 'দেবদাসী' নৃত্য দেখলেন। কোণারক দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। সেখানে সূর্যোদয়ও দেখবেন। আমার মোটর ছিলই। অতএব আমি নিয়ে যেতে রাজী হলাম।

সে উত্তেজনা আমি আজও ভুলতে পারি না। শিশির ভাদুড়ীকে কোণারক দেখাতে নিয়ে যাবো ? এ সৌভাগ্য যে আমার অদৃষ্টে কখনও হবে তা ভাবিনি। কোণারক আসতে যেতে দেড়শো মাইল। রাত আড়াইটেয় বেরুতে হবে। নতুবা সূর্যোদয় দেখা হবে না। ঠিক সময়েই বাংলোয় পৌঁছিয়েছি। শিশিরবাবু জেগেই ছিলেন। বারান্দায় বসে সিগার টানছিলেন। কঙ্কাদেবী ভেতরে ঘুমোচ্ছিলেন। ডাক শুনে উঠলেন। ভৃত্য ভিখা টিফিন বাস্কেট, গেলাস-কুঁজো, স্টোভ মোটরে তুলল। বললাম—একি !

শিশিরবাবু বললেন—ওখানেই চা খাওয়া যাবে। কোণারক দেখবো আর চা খাবো। কেমন ? ভাল হবে না ?

বললাম—নিশ্চয়। খুব ভাল হবে। চমৎকার হবে।

পঁচাত্তর মাইল নীরবে অতিবাহিত করা হল। আমার চোখের সামনে তখন ছুটি প্রেমিক প্রেমিকা। যাঁরা স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করছেন। দিগন্ত-বিস্তৃত বালুকা রাশির ওপর দাঁড়িয়ে আছে কোণারক। কাছে যাবার কোন বাঁধানো রাস্তা নেই। মোটর রাস্তায়

রেখে আধ মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে। আমরা হাঁটতে লাগলাম। আমি শিশিরবাবু এবং কঙ্কাদেবী। ভিখা ও ড্রাইভার পশ্চাতে রইল। সামনে চেয়ে চেয়ে দেখছি। অদ্ভুত এক শিল্প কীর্তি। জনমানবহীন জায়গায় আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বলছে—এসো! এসো! শিল্প প্রিয়, অনুসন্ধানীর দল। তোমাদের এক অপরূপ জিনিষ দেখাবো। কোণারকের মন্দির যত নিকট হচ্ছে, ততই বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে অন্তর।

একে নির্মাণ করেছিলেন উড়িষ্যার রাজা নরসিংহদেব। সাতশো বছর আগে। গড়ে তুলেছিল ষোলো বছর ধরে বার হাজার মিস্ত্রী। মন্দিরটি দেখতে খুব বড় একটা রথের মত। বারো জোড়া চাকা। প্রধান কারিগর বিষ্ণু মহারাণা। এই মন্দিরকে ঘিরে আজও জড়িয়ে আছে এক করুণ কাহিনী। পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব। কে বড় শিল্পী? মন্দির শেষ হতে চলেছে। শীর্ষ-কলসটি শুধু বসানো বাকী। বিষ্ণু তা বসাতে পারছিল না। পুত্র ধর্মপদ তা বসাতে পারল। বিষ্ণুর মাথা হেঁট হল। পুত্র অনুশোচনায় চন্দ্রভাগা নদীতে আত্মবিসর্জন করল। লজ্জিত পিতাও আত্মহত্যা করলেন। মন্দির নির্মাণ আর সম্পূর্ণ হল না। মন্দির তাই আজও অসম্পূর্ণ। ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী।

চারদিক অন্ধকার। শুধু শুকতারা জ্বলছে দব্ দব্ করে সামনে। হঠাৎ সমুদ্রের ওপরের একটা জায়গা থেকে মুঠো মুঠো আলো যেন বেরিয়ে আসতে লাগল। ঠিক যেন রথে চড়ে কেউ এগিয়ে আসছে। একটু পরে সবিতা দেবতা প্রকাশিত হলেন। টক্‌টকে লাল। গোলাকার অগ্রভাগ। ক্রমশঃ আরো ওপরে উঠছে। অবশেষে এক সোনার কলসী যেন নীল সাগরে বিপরীত-মুখী হয়ে ভাসছে। অপূর্ব দৃশ্য। হঠাৎ দেখা গেল সূর্য্য উঠে পড়েছে। যেন সমুদ্র থেকে লাফিয়ে আকাশে উঠল। এই হল কোণারকের সূর্যোদয়ের মহিমা। ভারতীয় শিল্পী বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। তাঁরা জানতেন এই অক্ষরেখা (latitude) এবং এই দেশান্তর রেখায় (longitude) সূর্য্য এইভাবে উদিত হবেন।

তাই তাঁরা এই জায়গাটিতেই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

ভারতীয় জ্যোতিষী ব্যাবিলন থেকেই জ্যোতিষজ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ব্যাবিলনে দেশীয় জ্যোতিষীরাই প্রথম "কালচক" আবিষ্কার করেন। caldean serus বলা হয় তাকে। হিন্দু, গ্রীক, আরবী, পারসিক, প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা ব্যাবিলন থেকেই এই জ্ঞান পেয়েছিলেন।

শিশিরবাবু হাঁ করে চেয়ে রয়েছেন প্রভাত সূর্য্যের পানে। সেই অপরূপ দৃশ্য ভোলা যায় না। এখানে সভ্যতা নেই। এখানে আছে প্রকৃতি। যা কোন দিন অতীত হয় না। কেন যে একদিন ভারতীয় ঋষির কণ্ঠে ধ্বনি জেগে উঠেছিল—জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং, তা বোঝা শক্ত নয়। ঠিক যেন জবাফুলের মতই টক্‌টকে লাল সূর্য্য। কিন্তু তার পেটের ভেতরটা ১৩ লক্ষ সেন্টিগ্রেড! কুসুমই বটে।

কোণারকে সূর্য্যোদয় দেখে আমাদের তিন জনেরই মন কাণায় কাণায় ভরে উঠল। এবার মন্দির দেখা সুরু হল। শিশিরবাবু বোঝাতে লাগলেন প্রত্যেকটা মূর্তি। কোন দাড়ীটা সেমিটিক, কোনটা আর্য্য। কোনটা South Western Asian, কোনটা Indo-European Nordic Aryan। যেন এক ঘর ছাত্রের সামনে কোন অধ্যাপক অধ্যাপনা করছেন। আমি মন দিয়ে শুনছি। শ্রীমতী কঙ্কা শুনছেনই না।

কোণারক দেখা শেষ হল। আমরা ফিরছি। কিন্তু ফিরছি ত ফিরছিই। পথ আর শেষ হয় না। চারদিকে শুধু বালুকারাশি। পথচারী পথিক একজনও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। দিগন্তে শুধু দেখা যাচ্ছে সবুজ গাছের শ্রেণী। সেখানে কোথায় যে আমাদের মোটর দাঁড়িয়ে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একটু পরে বেশ বোঝা গেল, আমরা পথ হারিয়েছি। শিশিরবাবুর গৌরবর্ণ মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। সাদা আদ্দির পাঞ্জাবীও ঘামে ভিজে উঠেছে। কঙ্কাদেবী 'আর পারছি না হাঁটতে' বলে বসেই পড়েছেন। শিশিরবাবু আমায় একটা উপায় বের করতে বলছেন। কিন্তু আমি কোন উপায়ই বের

করতে পারছি না। লোকজন নেই কোথাও। কাকে কি জিজ্ঞেস করব ? কি উপায়ই বা বের করব ?

শিশিরবাবু যখন বুঝলেন আমিও তাঁরই মত অসহায়, তখন বললেন আচ্ছা, দাঁড়ান। আমি দেখছি একটু ভেবে। বলেই চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবলেন। তারপর চোখ চেয়ে কোণারকের দিকে দৃষ্টি রেখে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে ধীরে ধীরে চলাফেরা করতে লাগলেন। একটু পরে বললেন হয়েছে। প্রথম যখন দেখি কোণারক এই অ্যাঙ্গেল থেকেই দেখেছিলাম। হ্যাঁ। এই। এই। ঠিক এই। এবার about turn করা যাক। বলে বিপরীতমুখী হয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

আমিও তার পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম। তিনি তখন বৈজ্ঞানিক। অভিনেতা নন। এদিক ওদিক চাইছেন শুধু। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন —এই, সেই মনসা গাছ। এই, সেই খেজুর গাছ। ঠিক হয়েছে। ভয় নেই। এগিয়ে চলুন।

একটু পরেই দেখা গেল বৃক্ষ শ্রেণীর অন্তরাল থেকে আমাদের মোটরের বনেট সূর্যালোকে চক্‌চক্‌ করে উঠল। আমি সানন্দে বলে উঠলাম— ওই যে! মোটর।

শিশিরবাবু বললেন—হতেই হবে।

একটু পরেই আমরা মোটরের কাছে পৌঁছলাম। ভিখা বসেছিল। উঠে দাঁড়ালো। বললে—চা বানাই ?

শিশিরবাবু বললেন—না। ফেরা যাক। দেরী হয়ে গেছে।

এত কষ্ট করে টিফিন বাস্কেট ইত্যাদি নিয়ে আসা হল। কিন্তু সবই বৃথা হল। শিশিরবাবু মনে মনে বিরক্ত। যদিও মুখে তার প্রকাশ নেই। কোণারক দেখব ঘুরে ঘুরে, আর চা খাবো। এই ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু এ কি হল ? আর এক মিনিটও এখানে থাকতে চাইলেন না। প্রত্যেক শিল্পীর ভেতরই থাকে দুটো সত্তা। একটা তার পুরুষ-সত্তা। একটা তার নারী-সত্তা। শিল্প একরকম সৃষ্টি। মানসলোকেই

তার সমস্ত কাজটা হয়ে থাকে। সেও একরকম জন্মদানই। বেদনার মধ্যে দিয়ে, আনন্দের রসে ভরপুর হয়ে, শিল্পীর শিল্প জন্মগ্রহণ করে। শিল্পের কাজটা নারী-সত্তার ভেতর দিয়েই হয়ে থাকে। শিশিরকুমার শিল্পী। তাঁর ভেতরেও নারী আছে। সেই নারী-সত্তা এইবার জেগে উঠল, অত্যন্ত অভিমানী এক নারী-সত্তা।

তখন বেলা প্রায় আটটা। তখনো চা খাওয়া হয়নি কারুরই। কিন্তু তাঁর ওপর কথা বলবার কেউই নেই। অত্যন্ত গম্ভীর রাশভারী মানুষ তিনি। আমি বয়সে অত্যন্ত ছোট। কঙ্কাদেবী তাল রেখেই শুধু চলেন। ভৃত্য প্রভুকে চেনে। সেও কিছু বললে না। একমাত্র বিবাহিতা স্ত্রীই এই সময় বাধা দিতে পারতেন। কঙ্কাদেবী তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী নন। তাঁর সম্বন্ধ প্রণয়-সূত্রে বাঁধা, পরিণয় সূত্রে নয়। পার্থক্য অনেক। দেখলামও তাই।

গাড়ী এগিয়ে চলল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতে লাগল। আমরা চারটি মূর্তি। কারো মুখে কোন কথা নেই। আমি শিশিরবাবুকে আড়চোখে দেখছি, আর ভাবছি হল কি এঁর? ইনি এত ছেলেমানুষ? এতো অল্পে রুষ্ট? কোথায় গেল এঁর অধ্যাপক সত্তা? যে একটু আগে বকেই চলেছিল। শ্রোতা শুনতে চাইছে কিনা জানবার দরকার নেই। তাঁকে তখন কথায় পেয়েছে। কথা তিনি বলবেনই। তিনি কোণারক দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর শিল্পী-সত্তা জেগে উঠেছে। তিনি বকে চলবেনই। তিনি বাক-সংযম কি জানেন না। হৃদয়াবেগ প্রকাশেই শুধু তৎপর। তাঁর মস্তিষ্ক আবেগাশ্রয়ী। যুক্তিআশ্রয়ী নয়।

মিউজিয়ামে সপ্তাশ্ববাহিত রথে সূর্যদেবের একটা মূর্তি ছিল। সেটা দেখে শিশিরবাবু উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিলেন। বলে উঠেছিলেন— এই মূর্তির ছবিটা, আমি Havell-এর বই থেকে নিয়েছিলাম! আমার 'তপতী' নাটকে পশ্চাদপট হিসেবে ব্যবহারও করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ দেখে প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর 'তপতী' নাটকে তিনি ব্যবহার

করেন নি।

তিনি কথা বলেই চলেছেন। কারণ তাঁকে কথা বলতেই হবে। এ সময়ে তিনি চুপ করে থাকতে পারেন না। সেই লোকটি হঠাৎ এক মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন? আমার পাশে বসে রয়েছেন এক নীরব, নিস্তব্ধ, বিক্ষুব্ধ, বিরক্ত পুরুষ। তাঁর পাশে বসে আছেন এক অভিনেত্রী। তাঁর সঙ্গিনী। বিবাহিতা পত্নী নন। গাড়ী নিঃশব্দে ছুটে চলেছে। দেখতে দেখতে পঁচাত্তর মাইল পথ শেষ হয়ে গেল। বেলা এগারোটা। ইন্‌সপেক্‌সন্ বাংলোর গেটে গাড়ী ঢুকল। শিশিরবাবু নেমে গেলেন। কঙ্কাদেবীও নামলেন। ভিখা টিফিন ব্যাস্কেট নামাতে লাগল। বললাম—আচ্ছা, তাহলে—।

শিশিরবাবু যেন চমকে উঠলেন। তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেল। বললেন—সে কি কথা—আপনি আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে এত কষ্ট করলেন। একটু চাও খাওয়াবো না—সে কি হয়?

আমি যতই থাক থাক, তাতে কি হয়েছে বলি, শিশিরবাবু ততই জিদ করতে থাকেন। "সে হয় না। নেমে আসুন। চা খেয়ে তবে যাবেন।"

ছোট জিনিষ। কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মার পরিচয় ছোট জিনিষেই। শিশিরবাবুর মুখচন্দ্রের অমানিশা দূর হয়েছে। সৌজন্যের হাসিমুখ দেখা দিয়েছে। এটা তাঁর কোন সত্তা? এটাও তাঁর নারী সত্তা। শিল্পী সত্তা। তিনি শিল্পী। হৃদয়-সর্বস্ব মানুষ। এই মানসিকতা সকল মানসে থাকে না। শিল্পী-মানসেই থাকে। তার ওপর তিনি এক বনেদী পরিবারের ছেলে। আতিথেয়তা বলে একটা কথা প্রচলিত আছে সংসারে। ঐতিহ্য-দীপ্ত পরিবারের ছেলের পক্ষে সেটা ভোলা কি করে সম্ভব? বাংলায় ভদ্রলোক বলতে সে সময় অনেক কিছুই বোঝাতো। বাংলার গৌরবোজ্জ্বল মধ্যবিত্তের সেই স্বর্ণ-যুগের সন্তান শিশিরকুমার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করা, সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত, এক বাঙালী পরিবারের সন্তান তিনি। এখন ভদ্রলোকের

সংজ্ঞা অনেক বদলে গিয়েছে। কিন্তু ১৯৩১ সালে তা ছিল না! শিশিরবাবু ছিলেন সেই সময়ের এক এম-এ পাশ অধ্যাপক। প্রত্যেক দৃষ্টি-কোণ থেকেই ভদ্র। এক স্বভাব-ভদ্র পুরুষ। দাম্ভিক শ্রেষ্ঠ নন। যা তাঁর সম্বন্ধে লোকের প্রচলিত ধারণা। যে ধারণার পরিবর্তন হওয়া অতি প্রয়োজনীয়। অত্যাবশ্যক।

আর কঙ্কাদেবী? হায়! হায়! আজ আমার কলম থেকে কেন এই সব কথা বেরুতে চাচ্ছে? কিন্তু না লিখলে শিশিরকুমারের প্রেমিক-জীবনের একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অংশ অপ্রকাশিত থেকে যাবে। অনেকে কঙ্কার কথা লিখেছেন। তাঁকে আদর্শ স্ত্রী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বৌদি, বৌদি, করে গড়িয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে শিশির-বন্ধু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণও চট্টোপাধ্যায়। আক্ষেপ করেছেন এই বলে যে কঙ্কাও তাঁকে মদ ছাড়াতে পারল না। কেন পারল না? কারণ শিশিরকুমারের মনে স্ত্রী উষার চিত্র তখনো প্রচণ্ডমাত্রায় জাজ্বল্যমান। তাঁর ধারে কাছেও কোনদিন কঙ্কা যেতে পারেন নি। রক্ষিতা কখন স্ত্রী হতে পারে না।

এই ঘটনার মাস দুই পরে শিশিরবাবুর বিড্‌ন্ স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখেছি, শিশিরকুমার একা মাটিতে বসে ভাত খাচ্ছেন। কঙ্কা নেই। তিনি কোথায় জিজ্ঞেস করতে শুনলাম—বেড়াতে গেছে কোথাও। এটা কি বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব হোত? আমি স্তম্ভিত হয়ে তাই ভাবতে লাগলাম। ঘেঁটু গাছে কখন পদ্মফুল ফোটে না। বিবাহ না করেও বিবাহের ভান করা চলে। কিন্তু মর্য্যাদা-দীপ্ত স্ত্রীলোক হয়ে ওঠা যায় না।

কোণারকের পথে যখন শিশিরবাবু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পথ খুঁজছেন, তখন তিনি "আর পারছি না হাঁটতে" বলে বসে পড়লেন। এরকম নারী শিশিরবাবুর ওপর জোর খাটাবেন কি করে? জোর খাটাতে স্বচক্ষে দেখেছি তাঁর ভাই ভবানীকুমারকে। কনিষ্ঠতম ভাই। বয়সের অনেক তফাৎ। কিন্তু কি একটা কথায় শিশিরবাবুকে ধমকে একেবারে ঝেড়ে

কাপড় পরিয়ে দিল। শিশিরবাবু "অ্যাঁ? অ্যাঁ! তাইত! তাইত!" করতেই লাগলেন। প্রতিবাদ করতে সাহস হল না। দন্তস্ফুট করতেও সাহস হল না। জোর বলে একে। স্নেহের জোর। ভক্তির জোর। অবশ্যই যুক্তিটা ভবানীকুমারের স্বপক্ষেই ছিল। অন্যায় কিছু বলছিলেন না তিনি। শিশিরকুমারকে মেনে নিতে হল ছোট ভাইয়ের তর্জন গর্জন। এমন কি ব্যাকরণ বহির্ভূত ভাষা পর্যন্ত। কঙ্কার সে আত্ম-মর্য্যাদা কোথায়? সে শক্তি-সচেতনতা কোথায়?

লোহাই লোহাকে কাটতে পারে। কঙ্কা লোহাই নয়। টিন। শিল্পীর জীবনে স্ত্রী-লোকের স্থান আছে। কোন শিল্পীই স্ত্রী-লোককে পাশ কাটিয়ে চলতে পারে না। তাহলে তার পক্ষে শিল্প-সৃষ্টি করাই সম্ভব হবে না। ভীষ্মদেব, শুকদেব অথবা হনুমানকে আমরা শিল্পস্রষ্টা বলে অভিবাদন করি না। সচ্চরিত্র, ব্রহ্মচারী হিসেবে করলেও। শিল্পীরা অতিরিক্ত মাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ। আর অনুভূতির জন্মদাতা প্রেম। রবীন্দ্রনাথও বলছেন—প্রেম হচ্ছে আর্টের স্বজাতি, তাই অনির্বচনীয়। যৌবনে নারী আসবেই। যৌবন জলতরঙ্গ সৃষ্ট হবেই। শিল্পীদের ত আরো বেশী করে। নারীকে পরিহার করে চলা শিল্পীর পক্ষে দুঃসাধ্য। শিশিরকুমারের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছিল, সাতাশ বছর বয়সে। এখন তাঁর বিয়াল্লিশ বছর বয়স। তাঁর পাশে নারী থাকবেই। সেই নারীটিকে গতকাল কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সময়, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন (কান্তি মুখার্জীর ছোট ভাই) স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন—মিসেস ভাদুড়ী। শিশিরকুমারও প্রতিবাদ করলেন না।

কিন্তু এখন কোণারক দেখে ফিরে এসে সেই মিসেস ভাদুড়ী এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। তিনি সটান বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর উঠলেনই না। পতিদেবতা একজনকে চা খেতে বলেছেন। পতিদেব কিভাবে যে চা খাওয়াবেন তার চিন্তা পর্যন্ত করলেন না। ভৃত্য আছে। যা করবার সে করবেই। ভৃত্য স্টোভ ধরালো। আমি বারান্দায় বসে আড়চোখে ঘরের ভেতরকার কাণ্ড মাঝে মাঝে দেখছি।

দেখছি, উঁচু হয়ে বসে, নগ্ন-গাত্র, লুঙ্গি-পরা, শিশিরকুমার, পাঁউরুটি কাটছেন। মাখন লাগাচ্ছেন রুটিতে। অনভ্যস্ত হাত। কাঁপছে। তবু তিনি কাতর নন। বাইরে বসে আছে অভুক্ত অতিথি। এতবেলা পর্য্যন্ত তারও পেটে কিছু পড়ে নি। শুধু চা কি করে দেওয়া যায়? ভৃত্যের ওপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শিশিরকুমার নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। একটা ভিক্টোরিয়ান যুগের মানসের অধিকারী তিনি। কঙ্কাদেবীও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকালের গ্রাজুয়েট। কিন্তু কোন্ পরিবারের মেয়ে তিনি? মজঃফরপুরের গণেশ সাউ-এর বাঙ্গালী উপপত্নীর গর্ভেই জন্মেছেন ত? কলেজে পড়লে কি হয়? শুধু শিক্ষা মানুষকে সব কিছু দিতে পারে না। সঙ্গে থাকা চাই একটা পারিবারিক ঐতিহ্য। চোখে দেখা দৃষ্টান্ত। কানে শোনা উপদেশ। সত্যিকারের বিবাহ আর মেকি বিবাহের পার্থক্য দেখে স্তম্ভিত হলাম। শিশিরবাবুর জীবনে কঙ্কার স্থান থাকলেও, তাঁর মনে কঙ্কার কোন স্থান নেই।

নিজে তখন আমি অবিবাহিত। ব্যর্থ-প্রণয়ের জ্বালায় জ্বলছি। নরনারীর সম্পর্ক খুব গভীর কৌতূহলের সঙ্গেই লক্ষ্য করছি। নারী-স্ত্রী-প্রেমিকা—একথাগুলোর মানে কি? আমার সাহিত্যিক সত্তা তার উত্তর খুঁজছে। সাহিত্য সহজে সৃষ্টি করা যায় না। শিল্পী সহজে সৃষ্ট হয় না। শিল্পীকে সৃষ্টি করতে যেমন নারীর প্রচণ্ড ক্ষমতা, শিল্পীকে বিনষ্ট করতেও তার তেমনি প্রচণ্ড ক্ষমতা। স্ত্রীবিহীন জীবন শিল্পীর পক্ষে নিছক বোহিমিয়ান জীবন। তার জ্বালা অনেক। দায় অনেক। ঝঞ্ঝাটও অনেক। হাল ধরে কেউ পেছনে বসে না থাকলে জীবনতরী অতি সহজেই বানচাল হয়ে যায়, শিল্প সৃষ্টি করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। শিশিরবাবুর জীবনে এই দুর্গতিই হয়েছিল। আমি শিল্পীদের বিবাহরূপ একটা রবার-স্ট্যাম্প ব্যবহারের পক্ষপাতী। উভয়ের মর্য্যাদা থাকে।

আমার মনে তখন ভবিষ্যতে বিবাহ করা, অথবা না করার প্রশ্ন, অত্যন্ত উগ্র।

শিশিরকুমার শিল্পী। তাঁর জীবনে দেখছি একটি নারী। এই নারী কি শুধু তাঁর নৈশ-সঙ্গিনী? এই নারী তাঁর জীবন সঙ্গিনী হতে পেরেছেন কি? সুখ দুঃখের সাথী। সমব্যথার ব্যাথী? এঁকে নিয়ে শিশিরবাবু সন্তুষ্ট কি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। নইলে তিনি মাটিতে উঁচু হয়ে বসে পাঁউরুটি কাটতেন না কখন। এ শুধু তীব্র অভিমান। কারণ মিসেস তখন বিছানায় শয়ান। এ কাজটা 'বেটার হাফ-'এর জন্মেই ছেড়ে দিতেন। অথবা 'বেটার হাফ'-ই এ কাজটা থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিতেন। কিন্তু রক্ষিতা রক্ষিতাই। পরিণীতা পরিণীতাই। better-half মানে better-half। better-half মানে better-half। কঙ্কা better-half-ই। কঙ্কা শিল্পীই নন। কোণারক সম্বন্ধে একটি কথাও বললেন না। তিনি না গেলেও হয়ত পারতেন কোণারকে।

শিশিরবাবুর চা বানানো, পাঁউরুটি কাটা, মাখন লাগানো, শেষ হল। সীতা নাটকের "রামচন্দ্র" এখন চায়ের কাপে ঘন ঘন চামচ নাড়ছেন। অতিথি সেবার সমস্ত ঝক্কিটুকু মাথায় তুলে নিয়েছেন। ভৃত্যের ওপরও সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারছেন না। কারণ তিনি এক বিবাহিত দম্পতী হরিদাস ভাদুড়ী এবং কমলেকামিনী দেবীর পুত্র। একটু পরে প্লেটে পাঁউরুটি সাজিয়ে, বিছানার দিকে ঘাড় না ফিরিয়েই, বললেন—এসো কঙ্কা? টি রেডি।

কঙ্কাদেবী আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে এলেন! তিনজনে ইন্‌স-পেকসন বাংলোর প্রশস্ত বারান্দায়, সুশোভন চেয়ার টেবিলে বসে, চা খেতে লাগলাম। শিশিরবাবুর থমথমে মুখ। এখন আর এক পরিহাস মুখর অনর্গল বক্তা নন। একটু পরে বিদায় নিলাম। মনটা অতৃপ্তিতে ভরে রইল। এঁরা নকল স্বামী স্ত্রী। ঝুটো মুক্তার মালা পরে আছেন গলায়। শিশিরবাবু অভিনেতা। কিন্তু পড়েছেন এক অভিনেতার চোখে, যে তাঁর ঘাড় না ফেরানো লক্ষ্য করেছে। যে তাঁর ইংরিজী বলা লক্ষ্য করেছে। আত্মভাব গোপন করতে হলে তিনিই বিনীত

ব্যবহার করতেন।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে একটি কথাই শুধু মনে হতে লাগল। শিল্পীর জীবনে নারী থাকলেই বোধ হয় চলে না। বিবাহিতা স্ত্রী থাকলেই বোধহয় বেশী ভাল হয়। যার সামাজিক সম্মান থাকবে। সামাজিক স্বীকৃতি থাকবে। আমাদের "সঙ্গীত সম্মিলনী" ক্লাব, শিশিরবাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে ছিল। কঙ্কাদেবীকে জানায় নি। আমরা তরুণ। বিক্ষুব্ধ ছিলামই মনে মনে। তবু প্রবীণদের রাজী করাতে পারি নি। তাঁরা সামাজিক পরিচয় চান। তাঁকে ক্লাবের দিক থেকে কিছুতেই অভিনন্দন দেওয়া চলে না। অভিজাত ক্লাব। এই সেদিনের সামাজিক মনোভাব ছিল বাঙালীদের। সমাজ সেদিন শক্তিশালী ছিল। হয়ত উদার ছিল না। আজ সমাজ উদার হয়েছে। কিন্তু সমস্ত বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে। আজ সমাজ বলে কোন জিনিসই নেই। কোথাও কোনরকম শাসনই নেই। যে যার আপন মনে চলেছে। ১৯৩১ সালে উড়িষ্যার উপকূলে ক্ষুদ্র এক সহরের মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীরা, এই প্রকার কঠোর রক্ষণ-শীল ছিল। বি-এ পাশ অভিনেত্রীকেও ক্লাবে ডাকা চলবে না। কারণ তার পেছনে সামাজিক স্বীকৃতি নেই।

বিকেলবেলা ইন্‌স্‌পেকশন্ বাংলার বারান্দায় বসে আছি। আমি, শিশিরবাবু ও কঙ্কাদেবী। দেখি, বাংলোর বেহারা কাগজে মোড়া কি একটা পদার্থ হাতে নিয়ে ঢুকছে। ঢুকেই শিশিরবাবুর দিকে তাৎপর্য-পূর্ণভাবে তাকাচ্ছে। শিশিরবাবু তাকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত দিলেন। সে ভেতরে চলে গেল। একটু পরে শিশিরবাবু খুসী খুসী গলায় বলতে লাগলেন—এমন সুন্দর বিকেল। একটু সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে এসো না কঙ্কা।

কঙ্কাদেবী বললেন—যেতে পারি। যদি তুমিও সঙ্গে যাও।

শিশিরবাবু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—আমাকে আর কেন? তোমরাই যাও না। একটু বেড়িয়ে এসো। জিতেনবাবু রয়েছেন। দিব্যি সাথী হবেন।

কঙ্কাদেবী কপট ক্রোধ দেখিয়ে বললেন—জানো ভালো করেই, যে তুমি না গেলে আমি কিছুতেই যাবো না। তবু কেন মিছিমিছি জিদ্ করছ ?

শিশিরবাবু তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন—এই রাজ-বন্ধুটিকে নিয়ে টানাটানি না করলে কি কিছুতেই চলবে না ?

কঙ্কাদেবী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—না। চলবে না।

শিশিরবাবু আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন—তাহলে চল। কৈ ! পাদুকা-যুগল কোথায় গেল ?

পাদুকা-যুগল সেইখানেই ছিল। তিনি পরিধান করলেন। আমরা তিনজনে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হলাম।

সমুদ্রের তীরে একটা সিমেণ্ট-বাঁধানো বেঞ্চ ছিল। শিশিরবাবু গিয়ে বসলেন তার ওপর। বললেন—আমি এখানেই বসলাম। আর পাদমেকং ন গচ্ছামি।

কঙ্কা বললেন—বেশ। বোসো ওইখানেই।

জুতো সেখানে খুলে রেখে আমি আর কঙ্কাদেবী জলের ধারে নেমে গেলাম। সমুদ্রের ঢেউ এসে এসে আমাদের পা ধুইয়ে দিতে লাগল। যেন ক্রমাগত বলছে—এসো এসো। প্রেমের পথও ত অশ্রু সমুদ্রেরই লবণাক্ত পথ। সেই অশ্রু সমুদ্র আমিই। নেমে এসো। নেমে এসো। আমার লবণাক্ত জলে পা ভেজাও। পবিত্র হও। সব দুঃখ দূরে ঝেড়ে ফেলে দাও। এসো স্থলের জীব। জলে নামো।

সমুদ্র আমার কাছে নতুন নয়। সমুদ্র আমার কাছে একটা জীবন্ত জিনিস। ছেলেবেলা থেকে দেখছি একে। এর সঙ্গে আমার খুব ভাব। কিন্তু কঙ্কাদেবীর কাছে নূতন। তিনি নেমে এসেছেন জলে। ঢেউ এসে তার পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। তিনি অতি সাবধানে সায়া শাড়ী তুলে চলেছেন। যতটা শোভন ততটাই। তারপর থেমে গেছেন। আর ওঠাতে পারছেন না শাড়ী। ভিজতে দিচ্ছেন সায়া শাড়ীর প্রান্ত। তাঁর এই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি আমাকে তৃপ্তি দিল। বেহায়া নন ইনি। মার্জিত-রুচি মহিলা একজন। বিবাহিতা স্ত্রী হোন, অথবা সঙ্গিনী

অভিনেত্রীই হোন। রুচিহীনা নন। লজ্জাহীনা নন। ভদ্রা। সমুদ্রের জল ক্রমাগত আসা যাওয়া করছে। এক মুহূর্ত স্থির নয়। জলের ঢেউ ফিরে যাবার সময় কঙ্কাদেবীর পায়ের নীচে থেকে বালি সরিয়ে নিচ্ছে। জলের তোড় এত প্রচণ্ড। বালির আশ্রয় এত দুর্বল। কঙ্কাদেবী সামলাতে পারছেন না নিজেকে। পড়বার মত হয়ে হয়ে যাচ্ছেন। চীৎকার করে বলে উঠতে লাগলেন—একি? পড়ে যাচ্ছি যে! আমি হাত ধরে তাঁকে পতন থেকে রক্ষা করলাম। কঙ্কাদেবী হাসতে লাগলেন। তিনি আর গম্ভীর থাকতে পারছেন না। কিছুতেই না। সমুদ্র মানুষের ভেতর ইতর বিশেষ করে না। সকলেরই পা ধুইয়ে দেয়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সামনে আমরা সকলেই নিজের নিজের বয়স ভুলে যাই। বিস্ময় রস মানুষের আদিম রস। বিস্ময়ে অভিভূত হলে আমরা যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠি। কঙ্কাদেবীও হলেন। আমরা ছুটোছুটি করতে লাগলাম। লাফালাফি করতে লাগলাম। হাসাহাসি করতে লাগলাম। কথার ফোয়ারা ছোটাতে লাগলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে এল। চারদিক অন্ধকার হয়ে এল! পায়ের নীচে ভিজে বালিতে অসংখ্য ফস্‌ফরাস্ জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল। এক অপূর্ব স্থান!

শিশিরবাবু বেঞ্চে বসে আছেন একেবারে স্থির। পাথরের মূর্তির মত। নড়ছেনও না। চড়ছেনও না। কথাও বলছেন না। সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন। এক সদাচিন্তাগ্রস্ত শিল্পী। আমরা নীচে সাগরের তীরে অট্টহাস্য তুলছি। যেন দুটি অপরিণত-বয়স্ক বালক বালিকা।

চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। কতক্ষণ সময় যে কেটে গেছে সে খেয়ালই কারো নেই। হঠাৎ শিশিরবাবু দূর থেকে গম্ভীর গলায় হাঁকলেন—এবার চল। আমাদের যেন জ্ঞান ফিরে এল। জল থেকে উঠে পড়লাম। বেঞ্চের দিকে অগ্রসর হলাম। একটু পরে ওঁদের ইন্‌স্‌পেকশন্ বাংলার গেট পর্যান্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় নিলাম।

পরের দিন বেলা আটটার সময় গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। দেখি বারান্দার চেয়ারে বিমর্ষ মুখে কঙ্কাদেবী বসে। প্রশ্ন করলাম—শিশিরবাবু কোথায়?

কঙ্কাদেবী উদাস কণ্ঠে বললেন—ভেতরে।

বললাম—সেখানে কি করছেন?

বললেন—শুয়ে আছেন।

বললাম –এত বেলা অব্দি শুয়ে যে!

কঙ্কাদেবী বললেন—কাল সারারাত ঘুমোন নি।

বললাম—কেন?

কঙ্কাদেবী নাক তুলে, ঠোঁট বেঁকিয়ে, ঘৃণার সুরে বললেন—ওই ছাইভস্মগুলো খেয়েছেন যে! নিজেও ঘুমোন নি। আমাকেও ঘুমোতে দেন নি। সারারাত্তির মাতলামি করেছেন।

বললাম—পেলেন কোথায়?

কঙ্কাদেবী সকরুণ কণ্ঠে বললেন—পেলেন আর কোথায়? বাংলোর বেয়ারাকে দিয়ে আনিয়েছেন। আশ্চর্য! কেমন করে যে বুঝতে পারেন, কাকে দিয়ে কি আনাতে হবে। আর পাওয়া যাবে কোথায়, তাই ভাবি, আমি আটকাবো কি করে? আমার সাধ্যি আছে? আমার কথা শোনেন নাকি?

মাথা নাড়লাম। মুখে কিছুই বললাম না। মনে মনে বললাম—তোমার সাধ্য থাকবে কি করে? নিজেই যে ছোট হয়ে আছো। বিয়ে না করেও, বৌ সেজে আছো। কাল তোমাকে সুরেশবাবু কালেকটারের কাছে স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন বটে। কিন্তু পনেরো মিনিট পরে নিজের মোটরে সরকারী কোয়ার্টারে কেবল শিশিরবাবুকেই নিয়ে গেলেন। তোমাকে যেতে বললেন না পর্যন্ত। শিশিরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এটর্নী কান্তিবাবুর ভাইও তোমাকে নিজের পরিবারে ডেকে নিয়ে গেলেন না। শিশিরবাবুও ইংরিজীতে বললেন—you stay here Kanka to do all bondobast। তুমি চুপ করে রইলে।

বুঝলে সব। অপমান গায়ে লাগল না তোমার। এখন অনুযোগ করছ কেন? অভিমান তোমার শোভা পায় না। মদ খাওয়ার জন্যে তুমি কিছুই বলতে পারো না। কারণ তুমি নর্ম-সঙ্গিনী মাত্র। বিলাসের সামগ্রী। মদের বোতল আর তোমাতে তফাত কোথায়?

একটু পরে শিশিরবাবু এলেন। অতি শান্ত চেহারা। সম্পূর্ণ আত্মস্থ। প্রকৃতিস্থ। ভারী গলায় বললেন—জীতেনবাবুকে চা দিয়েছ?

কঙ্কাদেবী স্ত্রীর অনুকরণ করে বললেন—তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

শিশিরবাবু তরল পরিহাসের কণ্ঠে বললেন—কেন? কেন? অপেক্ষা করা কেন? আবার হোতো। আবার হোতো। অধিকন্তু ন দোষায়। যেন সত্যিই স্বামী-স্ত্রী। দেওর নিয়ে হাস্য-পরিহাস চলছে।

আঠারো বছর পরে আবার যখন শিশিরবাবুর কাছে গেছি তখন তিনি আমার নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। ১৯৪৯ সালে। তখন তাঁর অতিথিও হয়েছি।

দেখেছি তিনি মদ্যপান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। এমন-কি দুধের সঙ্গে সবুজ-বর্ণ 'ব্রাহ্মী ঘৃত' খাচ্ছেন। পাশাপাশি মাটিতে আসন বিছিয়ে বসে, অন্ন গ্রহণ করতে করতে, এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি। প্রশ্ন করলাম—এত দিনের অভ্যাস ছাড়লেন কি করে?

তিনি বললেন—ডাক্তারদের ওপর রাগ করে। ওরা হেসে হেসে বললে—আপনি ত আর ছাড়তে পারবেন না এ জিনিস। তাহলে শরীর ভাল থাকবে কি করে? শুনে খুবই রাগ হল। এমন ধারা কথা। সঙ্গে সঙ্গে পান করা ছেড়ে দিলাম। বাবুরা তখন বলতে এলেন—এতদিনের অভ্যাস। এক-আধ আউন্স না হয়—। তখন রেগে উঠে বললাম—না ও পাপ আর নয়। যখন ছেড়েছি তখন একেবারেই ছেড়েছি। চিরকালের জন্যে ছেড়েছি। ওসব জিনিস আউন্স মেপে খাওয়া যায় না।

শিশিরবাবুর জীবনে আমি মদ্যপান ও পরনারী সংসর্গের পরিণাম দেখে সাবধান হয়ে উঠেছিলাম। আমার শিল্পমানস গঠনে তাঁর দৃষ্টান্ত, বিলক্ষণ কার্যকর হয়ে উঠেছিল। এ হতেই পারে না। শিল্পসৃষ্টি করব বলে

কি জীবনে অনাসৃষ্টি করে চলব ? এ অধিকার আমাকে কে দিয়েছে ? কেউ নয়। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে আত্মহনন করতে পারে। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে হাসতেও পারে। আমি মানুষ। এই আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শিশিরবাবুও তো আত্মশক্তির উদ্বোধনের দ্বারাই হলাহল পান পরিত্যাগ করতে পারলেন। শয্যাসঙ্গিনী শত চেষ্টা করেও যা করতে পারলেন না। তাহলে ?

আত্মশক্তির মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব। শক্তির চেতনাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। তার অভাবই অজ্ঞান। আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বীতশ্রদ্ধ পরানুকরণকারী জাতিকে স্বজাত্যবোধের স্থির প্রতিষ্ঠাভূমির ওপর পুনঃ স্থাপন করতে হবে। এই আমার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিজাত দ্বিধাহীন বিশ্বাস। চিন্তার স্বাধীনতাই সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উৎস। খাঁচায় বন্ধপাখী ডিম পাড়ে না। শিল্পী হিসেবে চৈতন্যের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব শিল্পীরই।

শিশিরবাবু আমার সবচেয়ে বেশী শক্তির পাত্র। সবচেয়ে বেশী ভালবাসার পাত্র। তবু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে বিশ্লেষণ করেছি। আমার শিল্পজীবন, একটা পরিপূর্ণ অর্ধ-শতাব্দী। ঘটনা-সংঘাতে ফেনিল একটা পূর্ণ পরিচ্ছেদ। পেছনে ফেলে এসেছি হর্ষ-বিষাদের অনেক কাহিনী। অনেক কথা। পুঞ্জীভূত ঘটনার অনেক অভিব্যক্তি। আমার জীবন-যজ্ঞের অনল জ্বলছে, সুখ-দুঃখ কান্না-হাসির সহস্র উপ-ঢৌকন নিয়ে। আমার জীবন-বেদ গড়ে উঠেছে এদেরই বারি-সিঞ্চনে। আমি জীবনকে ভালবেসেছি। যারা জীবনকে ভালবাসল না, তাদের পৃথিবীতে না আসাই উচিত ছিল। কায়া ও ছায়ায় মিলে, এই আনন্দময় জগতই হল শিল্পের জগৎ। জীবনের চেয়ে বড় আর্ট নেই। আমার পিতামাতার কাছ থেকে আমি পেয়েছি জীবন। কিন্তু কেমন করে জীবন যাপন করতে হবে, তা শিখেছি কতিপয় মানুষের জীবন দেখেই। শিল্পের উন্মাদনায় শিল্পী মৃত্যুর গহ্বরের বিভীষিকা ভুলে যায়। আমিও গেছি। শিল্পীর প্রতিভা জীবনের শেষ প্রান্তে

দাঁড়িয়েও অট্টহাসি হাসতে পারে। আমিও তাই হাসছি। কারণ প্রকৃত জীবন-যাপনের সৌন্দর্য আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। সাহিত্যের বিচারশালায় চিরগ্রাহ্য যা, তা হচ্ছে মহৎ বক্তব্য। ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্বই হল, একটা গভীর আত্মদর্শনকে বাইরে নিক্ষেপণ। সাহিত্যের মধ্যে চোখ ঠারাঠারি নেই। সে সূর্যের মত স্বপ্রকাশ। আমি কলম ধরছি। শিল্প সৃষ্ট হয়ে চলেছে। আমার মনটাকেই ত আমি পাঠকের কাছে মেলে ধরতে চাচ্ছি। যারা আমার মনটাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে, তাদের কথাই ত বলে চলেছি। শিশিরবাবুর ব্যক্তিগত জীবন দেখে যে আমি সুখী হতে পারিনি, তা বলাই বাহুল্য। নরনারীর এই সম্পর্ক আমার কাম্য নয়। অভিপ্রেত নয়। আদর্শ নয়।

এই সময়ে বিবাহিত এক শিল্পী-দম্পতি আমার মনে খুব রেখাপাত করেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি-জি) ও তাঁর স্ত্রী প্রেমিকাদেবী। ১৯৭৫ সালে ধীরেনবাবুকে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা পাটনায়। ১৯২৮ সালে। ব্যারিষ্টার এন্-কে ব্যানার্জীর বাড়ীতে। ধীরেনবাবু ব্যারিষ্টার সাহেবের জামাতার ভ্রাতা। আবার কবিগুরুর জামাতার ভ্রাতাও। ব্যারিষ্টার সাহেব ছিলেন আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মামা-শ্বশুর। তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭—১৯০৫) কন্যা শরৎকুমারী দেবী (১৮৫৪—১৯২০) কন্যা চিরপ্রভা দেবীকে। এই হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার এক রকম দাদামশায়। চিরপ্রভা ছিলেন আমার কুটুম্বদের "মেজবৌ"। এই ভদ্রমহিলাকে দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকত না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনী ইনি? রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা সহোদরার কন্যা? জিজ্ঞেস করতাম—আপনার মামা কেমন ছিলেন মামিমা, বলুন না। আমাদের কবিদাদু? রবীন্দ্রনাথ? মহিলাটি ছিলেন আশ্চর্য সুন্দরী। যেমন অসামান্য গৌরবর্ণ দেখতে তেমনি বড় বড়

ভাসা ভাসা চোখ। ঠাকুর-বংশের বাঁধা কাঁচা-সোনার মত রংও পেয়েছিলেন। মুখশ্রীও পেয়েছিলেন তেমনি। গলাটি মিষ্টি কি। ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের গলা। আচরণ? ব্যবহার? অভিজাত পরিবারের ব্যবহার যে কি জিনিস তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত। আমি অবাক হয়ে তাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। এ জিনিস অর্থের বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব নয়। তিন পুরুষের উত্তরাধিকার হিসেবেই পাওয়া যেতে পারে। এ জিনিস যেদিন দেশ থেকে চলে যাবে সেই দিনই বোঝা যাবে কি জিনিস দেশ থেকে চলে গেল।

আজ সাম্যবাদের ঢেউ উঠেছে। সাম্যবাদ জিনিসটাই আধ্যাত্মিক। মনে অধ্যাত্মবোধ না জাগলে সব মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা যায় না। কিন্তু সব মানুষ কখনো সমান হতে পারে না। বৈচিত্র্যই মানুষকে চরিত্র দেয়। একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা একত্রীভূত করার আদর্শ ভারতবর্ষের কোনদিন ছিল না। আজ power needs to be devided, not only wealth। তা কি সাম্যবাদের পীঠস্থানে হচ্ছে? তবে সাম্যবাদ কথাটার মানে কি? খালি মাটি ভাগাভাগি। শক্তি ভাগাভাগি নয়?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনীর ভেতর আমি একটা বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছিলাম। যা আর কোথাও দেখতে পাইনি। একটা নমনীয়তা। একটা কমনীয়তা। একটা স্বভাবসুন্দর কোমলতা। কোথাও এতটুকুও উগ্রতা নেই। অসহিষ্ণুতা নেই। যেমন মিষ্টি হাসি তেমনি মিষ্টি ব্যবহার। নারী ত অনেক দেখলাম। এমন মহিমাময়ী নারী আর দেখতে পেলাম কি? স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬—১৯৩২)-কে লোকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তুলনা করত। খুব যে ভুল করত, তা মনে হয় না। এই মহিলা যেন তাঁর মাসীরই দ্বিতীয় সংস্করণ। যাঁরা স্বর্ণকুমারী দেবীর ছবি দেখেছেন তাঁরা এঁর চেহারা খানিকটা আন্দাজ করতে পারবেন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঠোঁট টিপে হেসে, মাথা দুলিয়ে বলতেন—রবিমামা? কি রকম ছিলেন? খুব গম্ভীর ধরণের মানুষ ছিলেন। এই আর কি! আমাদেরও সঙ্গে বেশী কথাটথা বলতেন না। একলা থাকতে ভালবাসতেন। চিন্তা করতে ভালবাসতেন। সব সময় কিছু একটা পড়ছেন—লিখছেন—বা ভাবছেন।

জিজ্ঞেস করলাম—তিনি কি খুব রাগী গোছের লোক ছিলেন?

তিনি ফিক্ করে হেসে বলতেন—রাগী! রবিমামা? না-না। মোটেই নয়। তুমি যা ভাবছ তা একেবারেই নয়। গম্ভীর মানে কী রাগী? গাম্ভীর্যই ছিল তাঁর ঐশ্বর্য।

জিজ্ঞেস করতাম—আর মহর্ষি? কেমন ছিলেন তিনি?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের ভাব বদলে যেতো। বলতেন—মহর্ষি? (১৮১৭—১৯০৫) দেবতা! সর্বদা ঈশ্বর-ধ্যানে নিমগ্ন। অথচ এদিকে খুব হিসেবী। সংসারী। সবই ছিল তাঁর মাপাজোপা। কারুর কিছু বলবার যো নেই। প্রত্যেক নাতনীর বিয়েতে পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক বরাদ্দ। আর দামী দামী ফার্নিচার। ওই যে আমার ঘরে বড় আয়নাটা দেখছ? আমার দাদুরই ত বিয়ের সময়ে দেওয়া। কতটুকুই-বা দেখতে পেয়েছিলাম তাঁকে? সতেরো বছরেই ত বিয়ে হয়ে গেল। চলে এলাম পাটনা।

সেই আয়নাটা দেখলেই মনে হত মহর্ষির দেওয়া জিনিস বটে! এক-মানুষ উঁচু। ফ্রেমে বাঁধানো ঝক্ ঝক্ করছে বিলিতী কাঁচ। চমৎকার। মহিলাটি প্রথম বয়সে বেশ একহারা গড়নের ছিলেন। পরে বিলক্ষণ স্থূলদেহা হয়ে গিয়েছিলেন। পাটনায় সবজীবাগে থাকতেন। প্রথমটা ভাড়া বাড়ীতে। পরে কদমকুঁয়ায় নিজের বাড়ীও তৈরী করিয়েছিলেন। দু'তলা সুন্দর বাড়ী। কম্পাউণ্ডে ঘেরা। বড় কম্পাউণ্ডই।

আমি তাঁকে ভাড়া-বাড়ীতেই প্রথমে দেখি। স্যার অতুল চ্যাটার্জীর ভাইপো দ্বিজপদর সঙ্গে প্রথমে গিয়েছিলাম। দ্বিজপদ পরে বিলেত গিয়েছিল। স্যার অতুলই ডেকে নিয়েছিলেন। নেভিতে ঢুকিয়ে

দিয়েছিলেন। Naval commodore হয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় বিলিতী সুধা গলাধঃকরণ করত। তাই পরিণতিও সম্মানজনক হল না। বিলেত বাস করে স্যার অতুল গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারলেন। স্বদেশে ফিরে এসে তাঁর ভাইপো তা পারলেন না। কাশ্মীরের বেদানা বাংলা দেশে এসে ডালিম হয়ে যায়। আসামের আনারস লণ্ডনে জন্মায় না। স্যার অতুলের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধে তাঁর ভাইরা যোগ দেননি। সেই অভিমানে স্যার অতুল বিলেতেই বাস করতে লাগলেন। মেমও বিয়ে করলেন। অতি উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা। আত্মীয়দের অনুদারতা তাঁকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করল। দ্বিজপদ আমার আত্মীয়। অতএব এসব কাহিনী আমার অজানা ছিল না।

সবজীবাগে এন-কে-ব্যানার্জীর ভাড়া বাড়ীটা ইঁটের তৈরী ছিল। দোতালাও ছিল। লোকে 'পাকাবাড়ী' বলেই সে বাড়ীর বর্ণনা করত। পাকাবাড়ী বললে ওঁদের ওই বাড়ীটাই বোঝাতো। তখন পাটনায় দোতালা ইঁটের বাড়ী বেশী ছিল না। সংখ্যায় গোনা যেত প্রায়। সেই পাকাবাড়ীর সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন এই মহিলা। এঁকেও তাঁর শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। কারণ, তিনি ছিলেন পিরালী বামুনের মেয়ে। তার ওপর ব্রাহ্ম। কোন একটা বিয়ে উপলক্ষে তাঁকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে একত্রে পংক্তি-ভোজনে বসতে দেওয়া হয়নি। উঠোনের এক কোণে, আস্তাকুঁড়ের পাশে, যেখানে ঘুঁটে, কয়লা ইত্যাদি রাখা হত, সেইখানেই আলাদা করে খেতে দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে তিনি আর কখনও সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে খেতে যান নি। আমাকে বলতেন—জিতেন, তোমরা বামুনরা সত্যি কি! মানুষকে এত ঘেন্না কর? ছিঃ! এতে কত কষ্ট হয় অন্যের তা বোঝো না।

এসব বেশী দিন আগের কথা নয়। মাত্র ষাট বছর আগের কথা। আজকের সমাজের পক্ষে এসব কল্পনা করাও শক্ত। সে হিন্দু-সমাজ

আর নেই। রাতারাতি এরা বদলে গেছে যে চেনা দায়। তবু এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ সবজীবাগের এই অতিরিক্ত গোঁড়া পরিবারেই হয়েছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামা দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্নীর সঙ্গে। ব্যারিষ্টার সাহেব সে বিবাহে এসেছিলেন। কিন্তু বাড়ীর ভেতরে লুকিয়েই ছিলেন। জানলা থেকে বরকে শোভাযাত্রা করে আসতেও দেখেছিলেন। ভগ্নীকে বলেছিলেন—তোর জামাই ত বেশ ভাল হয়েছে রে। নিজে আত্মপ্রকাশ করেন নি। কারণ? কারণ তিনি যে ছিলেন বিলেতফেরত। পিরালী বাড়ীর ব্রাহ্মমেয়েও বিয়ে করেছিলেন। যদি এই নিয়ে কিছু গণ্ডগোল হয়। কি দরকার শুভকাজে ঝঞ্ঝাট করবার। একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে চোরের মত বেরিয়ে গেলেন। তাঁর ভগ্নীই আমাকে একথা অশ্রুসজল কণ্ঠে বলেছিলেন। বলেছিলেন—জিতেন, মেজদাকে ওই ভাবে মাথা নীচু করে মুখ ঢেকে বেরিয়ে যেতে দেখে আমার বুকটা কেঁদে উঠল। কিন্তু কি করি। আমি বিধবা মানুষ। মেয়ের বিয়ে। বর আসছে। আমার কি নিঃশ্বাস ফেলবার যো আছে? কাঁদবার সময় আছে? কাউকে একথা আজ পর্যন্ত বলিনি। তোমাকেই বলছি। এই ছিল আমাদের সমাজ। মাত্র ষাট বছর আগে। আমরা পরাধীন হব না তো কারা হবে? পরাধীনতার জন্যেই আমাদের যাবতীয় দুর্দশা নয়। আমাদের দুর্দশার জন্যেই আমাদের পরাধীনতা। আজও আমরা মানসিক পরাধীনতা ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি কি? পারিনি।

এন-কে-ব্যানার্জীর মেয়ে প্রতিমার সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর মেজদা জ্ঞানেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর বিয়ে হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার। হায়দ্রাবাদে নিজামের অধীনে চাকরী করতেন। ধীরেনবাবুর ফিল্মের জগতে হাতেখড়ি হায়দ্রাবাদেই। প্রতিমার মেয়ে সোনার বিয়ে হয়েছে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার জে-পি মিত্রের সঙ্গে। রবীন্দ্র-জামাতা নগেন্দ্রনাথ (১৮৮৯—১৯৫৪) ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথের

বড় ভাই। এই পরিবারের সঙ্গে আমি খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। প্রতিমার বোন ছিল পূর্ণিমা। যার বিয়ে হয়েছিল কলকাতার City Architect মনোমোহন মৈত্রের সঙ্গে। মনোমোহন প্রতিমার বড় বোন নীলিমারই দেওর। এদের বিবাহ একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতরেই আবদ্ধ ছিল। এন্ কে ব্যানার্জী ব্রাহ্ম ছিলেন না। কিন্তু মেয়েদের বিয়ে হল ব্রাহ্মদের সঙ্গেই। হায়রে হিন্দুসমাজ!

প্রতিমা আমাকে লক্ষ্ণৌয়ে একটা চিঠিতে লিখেছিল একটা কথা। যা আমার আজও মনে আছে। লিখেছিল—যথার্থ শিক্ষিত লোক কখনো যথার্থ দুঃখিত হতে পারে না। সব দুঃখেরই সে একটা কারণ খুঁজে পায়। প্রায়ই আমি এই কথাটা মনে মনে আওড়াই। দুঃখের কারণ খুঁজবার চেষ্টা করি।

ধীরেন গাঙ্গুলীর মত হাস্য-রসিক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উদার-স্বভাব মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। যেমন সরল তেমনি মার্জিত-রুচি। তেমনই ব্যঙ্গপ্রিয়। শিল্পীরা চিরকাল আমার চোখে প্রণম্য। আমি অতি শীঘ্রই ধীরেন গাঙ্গুলীর ভক্ত হয়ে পড়লাম। তাঁর "ভাবের অভিব্যক্তি" বই দেখে অবাক হয়ে যেতাম। নিজের মুখ, চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বদলানোর কৌশল আমাকে মুগ্ধ করত। আজও আমি এই বিদ্যাসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে অতিমাত্রায় আগ্রহী।

ধীরেনবাবু পুরীতে এসেছিলেন বায়ু-পরিবর্তন করতে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা। রোজ বিকেলে সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেরুতেন। আমিও সঙ্গ নিতাম। ধীরেনবাবু অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির মানুষ। তাঁর স্ত্রী প্রেমিকাও ছিলেন ঠাকুর-পরিবারের মেয়ে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের নাতনী। একটা সংস্কৃতির ছাপ যেন তাঁর প্রতিটি অঙ্গে। প্রতিটি আচরণে। প্রতিটি কথাবার্তায়। এমন-কি কথা বলার ধরণেও। এমন স্বভাব-অভিজাত মহিলা খুব কমই দেখা যায়। আমি নিজে হিন্দু পরিবারের ছেলে। যে পরিবারে আধুনিকতার আলোক তখনও প্রবেশ করেনি। এমন কি আচারে-ব্যবহারে গোঁড়ামীর ছাপই প্রবল।

নারী-স্বাধীনতা প্রায় অজ্ঞাত। পর্দা-প্রথা ভীষণ মাত্রায় বর্তমান। লজ্জাই মেয়েদের শ্রেষ্ঠ ভূষণ বলে বিবেচিত। গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারের সেই আমি, গাঙ্গুলী পরিবার অথবা ব্যানার্জী পরিবারের মেয়েদের আচরণ দেখে আনন্দিত হতাম। প্রেমিকাদেবী ফিল্মে অভিনয় করেছেন। তাঁর মেয়ে মণিকাও ফিল্মে অভিনয় করেছে। ধীরেন্দ্রনাথের শ্যালিকা মমতার বিয়ে হয়েছে ফিল্ম ডাইরেক্টর হেমেন্দ্র-নাথ গুপ্তের সঙ্গে। ধীরেন্দ্রনাথ কলাকে জীবনের পরিধির বাইরের জিনিস বলে কখনো মনে করেন নি।

ধীরেনবাবুর ছোট পরিবারটিকে আমার খুব ভাল লাগত। এইত একটি সুন্দর শিল্পী পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ও কন্যা। শোভন। সুরুচিপূর্ণ। অসংলগ্ন একটি কথা কখনো শুনিনি। অসংযত একটি আচরণ কখনো দেখিনি। শিশির ভাদুড়ী ও কঙ্কাদেবীর পরিচয় পাবার পর ধীরেন গাঙ্গুলী ও প্রেমিকাদেবী আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দিলেন। আমার তরুণ মনে এর প্রভাবও যথেষ্ট পড়ল। শিল্পী হলেই যে সমাজের বাইরের মানুষ হয়ে যেতে হবে, তা আমার মন কিছুতেই স্বীকার করতে চাইত না। শিল্পীজীবনের সঙ্গে পারিবারিক জীবনও সুন্দরভাবে এক সঙ্গে থাকতে পারে। ধীরেনবাবু তাঁর দৃষ্টান্ত।

কলকাতায় ধীরেনবাবুর মোহনলাল ষ্ট্রীটস্থ বাগানবাড়ীতে অনেকবার গেছি। ত্রিতল ছোটবাড়ী। ধীরেনবাবু ও জ্ঞানবাবু তখন একসঙ্গেই থাকতেন। জ্ঞানবাবু তখন হায়দ্রাবাদ থেকে চলে এসেছেন। এইখানে নগেন্দ্রনাথকেও দেখেছি। তিনি তখন Royal Commission of Agriculture-এর সভ্য। Lord Linlithgow-এর সঙ্গে এদিক ওদিক সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। Lord Linlithgow পরে ভারতের বড়লাট হয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন Commission-এর চেয়ারম্যান। নগেনবাবু কলকাতাতেও আসেন মাঝে মাঝে। যখন আসেন তখন এই বাড়ীতেই এসে ওঠেন। ওঁরা বরিশালের মানুষ। অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল। নগেন্দ্রনাথের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না।

জোড়াসাঁকোর শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল না। শ্যামবাজারে তিনতলায় তাঁকে একটি আলাদা ঘর ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। আমি তাঁকে দেখতাম আর ভাবতাম কি সুন্দর মানুষ ইনি। তাঁর মত এমন সুন্দর পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। ঠিক যেন অ্যাপোলোর মত সুশ্রী, সুন্দর, সুগঠিত। যেমন নাক মুখ চোখ। তেমনি লম্বা একহারা গড়ন। আর তেমনি গৌরবর্ণ রং। সিল্কের স্যুটে তাঁকে ঠিক ইংরেজ বলেই ভ্রম হত।

ভাবতাম রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও কম বাস্তববাদী ছিলেন না। অতি সুশ্রী ব্যক্তিকেই কনিষ্ঠ জামাতা মনোনীত করেছিলেন। শুনেছি ব্রাহ্ম সমাজের এক সভায় ছেলেটিকে দেখেই তাঁর পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। জামাই না করে ছাড়েন নি। ছোট মেয়ে মীরার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। বড় মেয়ে বেলা (মাধবীলতা ১৮৮৬—১৯১৮) বত্রিশ বছরেই মারা গেল। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। মজঃফরপুরেই থাকত। মেজ মেয়ে রেণুকার (রাণী) (১৮৯০-১৯০৩) তেরো বছরেই মারা গেল। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। দুজনেই যক্ষ্মা রোগে মারা গেল। মীরা (১৮৯৽)-র একটি ছেলে নীতীন্দ্র ও একটি মেয়ে নন্দিতা। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে মিল নেই। নগেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ এগ্রিকালচার পড়তে বিদেশ আমেরিকায় পাঠালেন। মিঃ গাঙ্গুলী যদিও দেখতে সাহেব, কিন্তু মনটি খাঁটি বাঙ্গালীর। পরিচ্ছন্ন পরিহাসে সদা উল্লসিত। একটা জীবন্ত মানুষ। ভাবতাম এমন সুন্দর মানুষকে তাঁর স্ত্রী সহ্য করতে পারেন না কেন? কি এর দোষ? প্রতিমার সঙ্গে ব্যবহার করছেন ঠিক নিজের মেয়ের মত। প্রেমিকাকে আদর করছেন এমনভাবে, ঠিক যেন এক খুকী। আমি এসব দেখতে অনভ্যস্ত। অথচ এন্ এন্ গাঙ্গুলী Royal Commission-এর মেম্বর। বিলাত-প্রত্যাগত। রবীন্দ্র-জামাতা। হাই-সার্কেলের মানুষ। ভাবতাম তাহলে ছোট ভাইদের বৌদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করাই উচিত।

একদিন দুই ভাদ্রবৌকে নিজের দুই কোলে বসিয়ে ঠিক নিজের মেয়ের মতই আদর করতে লাগলেন। আমার সামনেই মেয়ে দুটি আপত্তি করেছিল প্রথমে। সে বোধ হয় আমার মত হিন্দুর উপস্থিতির জন্যেই। কিন্তু সাহেব বিস্ময়ে ভুরু তুলে ইংরিজীতেই বলে উঠলেন—Why! you are like my daughter! আমি ভাবতে লাগলাম আমাদের হিন্দু-সমাজের নিয়ম-কানুন। কোন্‌টা ভাল—ভাদ্দর বৌয়ের ছোঁয়াচ একেবারে বাঁচিয়ে চলা? অথবা কোলে বসিয়ে আদর করা? হয়ত মধ্যবর্তী কোন সুন্দর পথও আছে। ব্রাহ্মসমাজ আমাদের কাছে একটা অগ্রগতির দৃষ্টান্ত রেখেছে। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার। পর্দাপ্রথার বিরোধ। নবীন বঙ্গের জীবন-প্রভাত ওদের দ্বারাই সূচিত হয়েছিল। আত্মবিস্মৃতি দূর করে আত্মজ্ঞানের প্রথম উদ্রেক করে ব্রাহ্ম-সমাজই। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)-এর সূত্রপাত করেন।

নগেন্দ্রনাথের পুত্র নীতুকেও দেখেছিলাম। লম্বা, সুশ্রী, কিশোর। পরে শান্তিনিকেতনেও নীতুকে দেখেছিলাম। একটা ড্রেসিং গাউন পরে, হাতে একটা সুদৃশ্য বই নিয়ে 'উদয়ন' থেকে বেরিয়ে আসছে। শান্তিনিকেতনের এক অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন এখনকার বাতাসে একটু "শ্বেত-প্রীতি" আছে। দেখেছিলাম শুধু ইংরাজ-প্রীতিই নয়। ভেদাভেদ-জ্ঞান ভীষণ ভাবে বর্তমানেও। নীতুর জার্মানীতে অকালমৃত্যু হল। রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড শোক লেগেছিল। তবু মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে সুন্দর একখানা চিঠি লিখতেও পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেছিলেন মীরা ও নগেন্দ্রের মিল করতে। কিন্তু তিনি তা পারেন নি। জগদীশচন্দ্রের সাহায্য নিয়েও নয়। আমি নগেনবাবুকে দেখতাম আর ভাবতাম কেন কবি-কন্যা এরকম অসাধারণ মনোভাব-সম্পন্ন। যে সন্ধি করতে শিখল না সে যে জীবনে কিছুই শিখল না। কিছুই না। কিছুই না।

মীরা দেবীর কন্যা বুড়ীকেও (নন্দিতা কৃপালনী) পাটনায় দেখেছিলাম। ব্যানার্জী সাহেবের পুরানো বাড়ীতেই। আজও মনে আছে পাকা

বাড়ীর ছাদে তার সেই নাচ। সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক নাচ। রবীন্দ্রনাথ যার প্রবর্তক। হাত-পা নেড়ে নেড়ে গান গাইতে গাইতে, তালে তালে ছন্দে ছন্দে সেই নৃত্য। মুখে গান চলছে—"সহসা ডালপালা তোর উতলা যে! ও চাঁপা! ও করবী! কারে তুই দেখতে পেলি আকাশ মাঝে, জানি না যে জানি না যে।" কিম্বা "ও আমার চাঁদের আলো!" কি ভাল যে লাগত বলা যায় না। আমার ভেতরের শিল্পী যেন উৎফুল্ল হয়ে নেচে উঠত। শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথ নিজে নেচে নেচে নাতনীকে এই নাচ শিখিয়েছিলেন। নাতনী সেই নাচ আমাদের দেখাচ্ছে। নেহাৎ আত্মীয়দের কাছে বলেই। কাকীমার আদেশ অমান্য করতে পারে না বলেই। নন্দিতা আর নেই। তার স্বামী কৃষ্ণ কৃপালনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সাহিত্য অ্যাকাডেমীর সেক্রেটারী ছিলেন।

ধীরেনবাবু কলকাতায় এক নতুন ফিল্ম কোম্পানী সুরু করলেন। নাম দিলেন—British Dominions Film Ltd.। কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করতে অন্ততঃ সাতজন Promoter চাই। ধীরেনদা ছ'জন অংশীদার পেয়েছেন। আর একজন চাই। সে আর পাচ্ছেন না কিছুতেই। আমি তাঁর কোম্পানীর সপ্তম অংশীদার হয়ে পড়লাম। ধীরেনদা বললেন—সই কর এখানে। সই করে দিলাম। পাঁচশো টাকার শেয়ারের মালিক হলাম। এতটা জোর ছিল তাঁর আমার ওপর। তাঁর ষ্টুডিও তৈরী হল দমদমে। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখতেও গেলাম। ৪৪ নম্বর দমদম রোড। এক ধনীর বাগানবাড়ী। মাঝখানে পুকুর। ঘরের দেওয়ালে অসংখ্য ফোটো। নর ও নারী। তিনি ছিলেন managing director। তাঁর এই studio-তেই দেবকী বোস, নীতীন বোস, দীনেশ দাস, সবিতা দেবীর হাতেখড়ি।

কিন্তু বাঙ্গালীর ব্যবসার যা চিরকেলে পরিণাম। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী হয়ে উঠল না। হয়ে উঠল কেরাণী, মাষ্টার আর উকিল। বুদ্ধিজীবী। শ্রমজীবী আর নয়। পুঁজিবাদীও নয়। তাই আজ

Capital-ও আমাদের হাতে নেই, Labour-ও আমাদের হাতে নেই। আছে শুধু কালচার। তাও আছে কি! দাঁড়িয়েছে ত অপসংস্কৃতিতে এসে। A bastard bantling of western civilisation। কালচার বজায় রাখতে গিয়ে শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটর উঠে গেল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভদ্রাসন বিকিয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথের বসতবাড়ী বিক্রী হয়ে গেল। তবু কালচার হিপি-কালচারে পরিণত হল। হায়!

ধীরেনবাবুকে কুড়ি বছর পরেও আমি ভুলি নি। আমার 'পরিচয়' নাটক তখন "শ্রীরঙ্গমে" অভিনীত হচ্ছে। তাঁকে নেমতন্ন করে ডেকে এনে নাটক দেখিয়ে তবে আমার তৃপ্তি। তিনি সপরিবারে এসে দেখলেন। তখন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। প্রেমিকা দেবী আর নেই। আমার নাটক পূর্ণিমা ও মনোমোহনবাবুকেও দেখলাম। পূর্ণিমা বললে —আপনার নাটকের একটা কথা আমার ভাল লেগেছে। যেখানটা বলছেন—জীবনে এরকম হয়েই থাকে। accept করে নিতে হয় gracefully। কি ভেবে এই কথাটা সে বললে তা সেই জানে। আমি মাথা নাড়লাম। যদিও নিহিতার্থ বুঝলাম না।

শিশিরবাবু এবং ধীরেনবাবু। দুজনেই উচ্চ শ্রেণীর অভিনেতা। আমি তাঁদের শিল্পী হিসেবে তুলনা করতে যাচ্ছি না। মানুষ হিসেবে তুলনা করব। পারিবারিক মানুষ হিসেবে। সামাজিক মানুষ হিসেবেও। তখন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। শিল্প-শক্তির স্ফুরণ পারিবারিক শান্তির ওপরে নির্ভর করে কিনা। আজ সত্তর বছরের শেষে এর উত্তর পেয়েছি। শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন, শিল্প-প্রতিভার বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ধীরেনবাবু আশী বছরেও অভিনয় করেছেন। অলীকবাবুর ভূমিকায়। ষ্টার থিয়েটারে। তাঁর পারিবারিক জীবন সুখের ছিল। শিশিরবাবুর ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। কারণ তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন না। ভাবলেন বিবাহ না করলেও চলবে। চলল। কিন্তু অত্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলল। আমি তার

প্রত্যক্ষ সাক্ষী। যদি বিবাহ করতে পারতেন, তাঁর জীবন অন্য রকম হত। বাংলা রঙ্গমঞ্চের পরিণতি, উলঙ্গ জঙ্ঘা দেখানোতেই শেষ হত না। যাত্রাও নিজের বৈশিষ্ট্য হারাতো না।

এই দুই শিল্পীর পারিবারিক জীবন অতি ঘনিষ্ঠভাবে দেখে সেদিন এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিল্পী মনে অনেক প্রেরণা পেয়েছিল। নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ-পন্থা ঠিক করতেও বোধ হয় কিছুটা পেরেছিল। ঠাকুর-পরিবারের ঐতিহ্যের সামাজিক প্রতিক্রিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী জন-সাধারণের ওপর প্রচুর। আমি দেখেছি বাংলার বাইরেও ঠাকুর-পরিবারের প্রভাব। লক্ষ্ণৌয়ে দেখেছি অসিত হালদারের প্রভাব। পাটনায় দেখেছি ভাগিনেয়ীর প্রভাব। তাঁকে দেখে সকলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। রূপ ছিলই। ঐশ্বর্য ছিলই। ঐতিহ্যও ছিল। মহর্ষির নাতনী। সোজা কথা! প্রথমে খুবই মেমসাহেব ছিলেন। ব্যারিষ্টারের পত্নী। হবে না কেন? সে ব্যারিষ্টারের প্রচুর রোজগার। গয়ায় তখন ডি, এন, রায় এবং লোকেন পালিত, উচ্চরাজকর্মচারী। এন-কে ব্যানার্জীর বন্ধু। ব্যানার্জী সাহেবের ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়েছে মেম গবর্নেসের হাতে। বড় ছেলের নাম—জর্জ। ব্যারিষ্টার সাহেবের ক্রমশঃ আয় কমে গিয়েছিল। তিনি সাধারণ বাঙ্গালীর মতই থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। ব্যারিষ্টার এন, কে-ব্যানার্জী অবশেষে আত্মহত্যা করে ভবযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বোধহয় এই অন্তিম পরিণাম। আত্মহত্যা। অসন্তোষ। প্রতিমার শেষে মস্তিষ্ক অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। মনোমোহনের মৃত্যুর পর পূর্ণিমা মুসুরীতে Lady supdt-এর চাকরী নিতে বাধ্য হয়েছিল। সাহেব-মেমসাহেবদের একি হল শেষে? ব্যানার্জী পরি-বারকে দেখে আমার শিক্ষা হল। এই শিক্ষা হল যে সাহেবীয়ানা এদেশে একেবারেই চলবে না। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। অনুকরণ করে কখনো বড় হওয়া যায় না।

ধীরেন্দ্রনাথ কলার জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলেন। স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে

ফিল্মে নেমেছেন। বুঝলাম সর্বস্ব পণ না করতে পারলে বোধহয় পাওয়ার মত কিছু পাওয়া যায় না। তিনি আমার মনে শিল্প-প্রীতি জাগিয়ে তুলেছিলেন। আর জাগিয়ে তুলেছিলেন বিবাহিত জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। হ্যাঁ, আমাকেও শিল্প সিদ্ধি আয়ত্ত করতে সর্বস্ব পণ করতে হবে। সর্বস্ব। সর্বস্ব। সর্বস্ব সমর্পণ করতে না পারলে, পাওয়ার মত কিছুই পাওয়া যাবে না।

পুরীতে সে সময় একটি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। বীরেন রায়। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। পেশায় কনট্রাকটর। আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতেন। নানারকম পুরানো শিল্প-সামগ্রী জোগাড় করতে করতে বাড়ীতে একটা ছোটখাটো মিউজিয়ামই তৈরী করে ফেলেছিলেন। একটি মাত্র ব্যক্তির একলার সংগ্রহে একটা মিউজিয়াম গড়ে তোলা? আজ অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হয়। কিন্তু এক একজন মানুষের এমনি শিল্প-প্রীতি থাকে। এই নেশার শিকার হয়ে অনেকে পয়সাই অপব্যয় করতেন। কিন্তু এদের কাছে টাকা আনা পয়সার হিসেবই একমাত্র হিসেব নয়। এরা চলে আকাশ পানে চেয়ে। কোন এক অজানা কল্পলোকের সন্ধানে। আমার শিল্প-রুচি হয়ত অজ্ঞাতসারে এদের দ্বারাই রচিত হয়েছিল।

পুরীতে সে সময় রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এরকম লোক যে এরকম উৎসব নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠবে তা আর বিচিত্র কি! তিনিও হলেন। আমায় বললেন—তোমাকেও কিছু বলতে হবে, ভায়া। তোমার মতন ইত্যাদি। আমি হেঁ হেঁ করতে লাগলাম। কিন্তু শুনে বিস্মিত হলাম যে অগ্নিযুগের বিখ্যাত বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষও কিছু বলতে রাজী হয়েছেন। চমকে উঠলাম। এক প্লাটফরমে আমি আর অগ্নিযুগের অগ্নি-ঋষি? ভীত হয়ে উঠলাম। সেই আমার প্রকাশ্য সভায় প্রথম বক্তৃতা করা।

সুরু করলাম। অনর্গল বকেও গেলাম। বিষয় নিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা। অধীত বিদ্যায় কিছুক্ষণ পাণ্ডিত্য করা গেল। কিন্তু

আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন বক্তৃতার শেষে লালগোলার কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন—কি বক্তৃতাই দিলে ভাই। কলকাতার বাইরে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে এরকম বিশ্লেষণ শুনতে পাবো আশা করি নি। ধন্য। ধন্য!

ধীরেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন আবেগের রুগী। দীর্ঘকায়। শালপ্রাংশু মহাবাহু। বড় বড় চোখ। ব্যাঘ্রশিকারী। বীরত্বের পূজারী। বারীন্দ্রকুমারের ভক্ত। নিজেও লেখক। সাহিত্যিক। কবি। শিল্পী। অভিনেতা। আমি তাঁর প্রশংসা পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। কোথায় উড়িষ্যার সমুদ্রকূলে পড়েছিলাম একপাশে, নোনা জলে স্নান করতে করতে, নোনা হাওয়া খেতে খেতে, শরীর মনে নোনা ধরে গিয়েছিল। আমার ভাগ্যে একি আশাতীত সৌভাগ্য! প্রথম প্রয়াসেই একেবারে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা। সেই মুহূর্তে একটা জিনিস বুঝলাম। এই শক্তি নিয়েই আমি জন্মেছি। আমার ব্যর্থ জীবন সার্থক হবার একটা নতুন রাস্তা খুঁজে পেল। আমি আত্মসচেতন হয়ে উঠলাম। আমার ভেতর তিনটি গুণ আছে। আমি বক্তা। আমি অভিনেতা। আমি নাট্যকার। ধীরেন্দ্রনারায়ণ পুরীতে অভিনয়ও করেছিলেন। সাজাহানে 'দারা', আমিও কিছু একটা করেছিলাম মনে আছে। আর আমায় পায় কে?

বারীন্দ্রকুমার কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনে ধীরেন্দ্রনারায়ণের মত গদগদ হয়ে ওঠেন নি। তিনি হাল্কা, ভাবপ্রবণ, মানুষ ছিলেন না। কঠিন, নিয়মনিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, আত্মসম্বিৎপূর্ণ, স্থিতধী, মানুষ একটি। তাঁর বাড়ী গেছি। কিন্তু তিনি পারতপক্ষে আমায় বিদেয় করতে পারলে যেন বাঁচেন। কেন ছোকরা ফিরে ফিরে আসছে তাঁর কাছে। পুলিশের লোক নয় তো? সদা সর্বদা অসাধারণ গাম্ভীর্য তাঁর মুখমণ্ডলে। অগ্নিযুগের ঋষি! বাপ্‌রে! অগ্নিতে ভরা যেন ভেতরটা। যেন ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস। অতিরিক্ত শীর্ণকায় ব্যক্তি। গা খালি থাকলে হাড়গুলি

পর্যন্ত গোনা যায়। মাথায় কিঞ্চিৎ লম্বাই বলা যেতে পারে। নাকের নীচে কিঞ্চিৎ অযত্নরক্ষিত কৃষ্ণবর্ণ গুম্ফ। নাসিকা মুখের তুলনায় বড়। সোনার চশমা চোখে। গোল নয়। পুরানো আমলের সেই elliptical। নাকের পাশে 'একজিমা'র কালো দাগ। এই সুন্দর ব্যাধিটি আন্দামানের উপহার। দামী মটকার পাঞ্জাবী পরণে। গলায় সিল্কের চাদর। এটি বিশেষভাবেই পরা। একটা প্রান্ত ঝুলছে হাঁটু পর্যন্ত। আর একটা প্রান্ত কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে, অপর পাশে ফেলা। পায়ে চপ্পল। পরিধানে ফিন্‌ফিনে আটচল্লিশ ইঞ্চি ধুতি। অরবিন্দের সৃষ্ট যোগীরা গেরুয়া পরেন না। কম দামী জিনিসও পরেন না।

শ্রীঅরবিন্দ শঙ্করের মায়াবাদের বিপক্ষে। শঙ্কর জগতকে মায়া বলে অভিহিত করেছেন। ব্রহ্মের সঙ্গে এক করেন নি। Plato-ও বলেন world of copies। world of ideas থেকে পৃথক। প্লেটোর দর্শন যেন প্রচ্ছন্ন শঙ্কর-দর্শন। উভয়কে অদ্বৈত-বেদান্তের ভাষ্যকার বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্লেটো এবং শঙ্কর উভয়েই মনে করেন জগত যেন সলিলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র স্বপ্ন।

অরবিন্দ (১৮৭২—১৯৫০) তা মনে করেন না। জগতটাকে মায়া বলে তিনি মনে করেন না। শঙ্করের (৭৮৮—৮২০) সঙ্গে Spinoza (১৬৩২—১৬৭৯) Bergson ও Decartes-এর খুব মিল আছে। কিন্তু অরবিন্দ এসবের থেকেও ওপরে উঠেছেন। তিনি জগতটাকে, এমন কি, মনুষ্য দেহটাকে অত্যন্ত সত্য বলে মনে করেন। দেহটাকে god's happy living tool বলে মনে করেন। তিনি ভোগ-বিমুখ নন। অথচ ভোগের দাসও নন। তাঁর শিষ্যেরা সৌন্দর্যের পূজারী। সুন্দর জিনিস পেলে তা পরতে কাতর হন না। কৃচ্ছ্রসাধন তাঁদের সাধনার অঙ্গ নয়। দারিদ্র্যব্রতধারীও নন। কঠোরতার উপাসকও নন। তাঁরা সহজ সরল মানুষ। আত্মস্বরূপ উদ্ধারের কঠোর ব্রতে ব্রতী। মন এবং মনের ওপরের জিনিস নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত। খাওয়া-দাওয়া

পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত নন। অন্নবস্ত্রের ন্যূনতম জোগাড় হলেই তাঁরা খুসী। অথচ সব বিষয়েই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ময়লা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। মাদার (মীরা রিসাড়) স্বহস্তে ঝাঁটা ধরতেও কাতর নন। বারীন্দ্রকুমার স্বহস্তে এঁটো চায়ের কাপ ধুতে ইতস্ততঃ করেন না। আমি পরে স্বচক্ষে দেখেছি। আমারই এঁটো কাপ ধুচ্ছেন। হায়! হায়!

কোন্ জিনিসটা বারীন্দ্রকুমারের প্রতি আমায় আকৃষ্ট করেছিল ? তাঁর বিরাট ঐতিহ্য। আমি তখন আইনের ছাত্র। আলিপুর বম্ব ট্রায়াল এবং Emperor vs Barindra kr. Ghosh পড়তে হয়েছিল। 16 Calcutta Weekly Notes-এ reported হয়েছিল তাঁর কেস। আইনের ছাত্রদের কাছে তিনি এক স্বনামধন্য পুরুষ। ষড়যন্ত্র কাকে বলে তা আমাদের শেখানো হয়েছিল তাঁর কেসটাকে ভিত্তি করেই। অতএব তাঁকে চাক্ষুষ দেখবার কৌতূহল ছিলই। আইনের ছাত্র হিসেবেই। দেশপ্রেম ভেতরে কিছু ছিলই। কাজেই বঙ্গবিভাগ কেন হল, কার্জনের উদ্দেশ্য কি ছিল, সব জানতাম। তার প্রতিক্রিয়া কি হল তাও জানতাম।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলাকে দু'ভাগ করা হল। ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার নরেন গড়ে লাট সাহেবের ট্রেন বম্ব দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হল। ১৯০৮ সালের এগারই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের জীবননাশের চেষ্টা হল। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে মিসেস্ এবং মিস্ কেনেডি নামক দুই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলার প্রাণনাশ হল। উদ্দেশ্য ছিল জেলা জজ Kingsford-কে মারা। কারণ সুশীল সেনকে বন্দেমাতরম্ বলার অপরাধে তিনি বেত মারবার হুকুম দিয়েছিলেন কলকাতায় চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট থাকবার সময়। এরই জন্যে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে।

আলিপুর বম্ব ট্রায়াল শুরু হয় ১৯০৮ সালের ২০শে অক্টোবর। তেত্রিশ

জন আসামী। সরকারী উকিল Yardley Norton। অ্যাডিসনাল্ সেস্‌ন জাজ আলিপুরের এজলাসে। Charge ছিল—Between 15th May 1908, or a year before that in 32 Murari-pukur road and elsewhere, you conspired to wage war against his Majesty, punishable u/s 121 I.P.C. Barley I.C.S.-এর কোর্টে committing চলেছিল। ৭৬ দিন। সেসন কোর্টে বিচার চলেছিল। ১৩১ দিন। চার হাজার exibit ছিল। Bomb, revolver, cartridge, chemicals, Bomb fuse Detonator ইত্যাদি।

১৯০৯ সালের ৬ই মে বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকরের ফাঁসীর হুকুম হয়। ১২১ ধারা অনুসারে। ধারাটা এই ঃ Whoever wages war against his majesty the king Emperor of India or attempts to wage such war or abets the waging of such war, shall be punished with death or imprison-ment for life. ১৯১০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টে মৃত্যু-দণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পরিবর্তিত হয়। জজ ছিলেন Sir Law-rence Jenking এবং Carnduft। পাঁচ জনের রেহাই করা সম্বন্ধে তাঁরা একমত হতে পারলেন না।

তৃতীয় জজ Harrigton-এর কাছে যখন Advocate General Kenrik বক্তৃতা করছিলেন তখন হাইকোর্টের বারান্দাতেই সামসুল আলম নামক এক পুলিশ অফিসারকে হত্যা করা হয়। তার পূর্বে Norton-এর সহকারী আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করা হয়েছিল। জেলের ভেতর রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে সত্যেন বোস এবং কানাই-লাল দত্ত, হত্যা করেন। ফাঁসীও যান।

নয় মাস ফাঁসীর হুকুম মাথায় নিয়ে যে ব্যক্তি কাটিয়ে দিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া স্বাভাবিক। বারো বছর আন্দামানে যে ব্যক্তি কাটিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আন্দামান থেকে

ফিরে যে ব্যক্তি পণ্ডিচেরীতে আট বৎসর যোগ সাধন করেছিলেন তাঁর প্রতি আগ্রহ হওয়াও স্বাভাবিক। উল্লাসকর ত পাগল হয়ে গেলেন। তাঁকে Madras-এ lunatic asylum-এ পাঠানো হল। হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল বিশুদ্ধানন্দ স্বামীতে পরিণত হলেন। ভবভূষণ মিত্র জগতগুরু সত্যানন্দ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যতে পরিণত হলেন। এসব আমি জানতাম। তাই চেয়ে দেখতাম এত বিপুল যার অতীত, তার এতো সাধারণ চেহারা, পোষাক, কথাবার্তা? তাঁর এত শান্ত আত্মস্থ প্রকৃতি? দেখলেই মনে হয় তিনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। মাথায় দীর্ঘ চুল। মাঝখানে সিঁথি। অতি প্রশস্ত ললাট।

এঁর কাছে আমি আসা যাওয়া করতেই লাগলাম। চুম্বকের মত তিনি আমায় আকর্ষণ করতেন। কয়েকদিন পরে যখন শুনলেন, আমি তাঁর কাছে যোগ শিখতে চাই, তখন আমায় নিরুৎসাহ করবারই চেষ্টা করতে লাগলেন। বললেন—এখনো অনেক জিনিস হতে বাকী। মনের অনেক স্ফুরণ। হৃদয়ের অনেক সুন্দর সুন্দর কোমল প্রবৃত্তি। আগে তাদের বিকাশ হোক। তবে ত যোগ করবে। Greater realisation-এর দিকে যাবে।

বললাম—যদি সেগুলো চূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে? shattered!

তিনি বিরক্ত হয়ে, ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—Nonsense! চূর্ণ কখন হয় নাকি?

বিস্মিত হয়ে বললাম—হয় না?

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—না। গাছের একটা ডাল কেটে দিলে আর একটা ডাল বেরোয় না, কি? সেই সবুজ পাতা। সেই fresh vigour। বলে, এইবার যেন একটু হাসলেন। বুঝলাম, অগ্নিযুগের ঋষিদের মনেও দুর্বলতা থাকে। হয়ত নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এই কথা বললেন।

খোঁচাবার জন্যেই বললাম—মানুষের হৃদয় আর গাছ? এক হল? বললেন—এক। দুটোই জীবন্ত জিনিস। যদি শক্তি থাকে, এরকম

এক-আধটা ঘটনায় কিছুই যায় আসে না। বলে হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বলে বসলেন। কে জিজ্ঞেস করেছিল সেই কথা? কেউ নয়। তবু তিনি বললেন। কেন? কারণ যথার্থ জীবন-জিজ্ঞাসুর কাছে কোনরকম ছলাকলা নেই। ভণ্ডামী নেই। আত্মগোপন নেই। আছে সরল অকপট স্বীকারোক্তি। এই আমি এক নতুন রকমের মানুষ দেখলাম। আন্দামান-ফেরতা, যোগাশ্রম-ফেরতা। সংসারের গড় পড়তাদের চেয়ে কত তফাৎ। আমার সঙ্গে ক'দিনেরই বা আলাপ? তবু নিজের হৃদয়-পৃষ্ঠার গোপন পরিচ্ছেদ একেবারে মেলে ধরতে এতটুকু ইতস্ততঃ করলেন না। বললেন—আমার জীবনেই ত কতগুলো love affair হয়ে গেছে। এক একবার মনে হয়েছে বুঝি গেলাম। there I am! বলে ইংরেজী কায়দায় কাঁধ তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল ইনি জন্মেছেন ইংল্যাণ্ডে। Craydon-এ। আদ্ধেক সাহেবই ইনি। British Born subject। হাত দুটো ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন—মনে জোর থাকলে কিছুর জন্যই ভাবনা থাকে না।

এমন জোর দিয়ে এমন কথা ত আর কেউ বলেনি। সকলে হা-হুতাশই করেছে। প্রেমের জয়গানই করেছে। ব্যর্থ-প্রেম পরিহাস করে কেউ ত উড়িয়ে দেয় নি। কোন রকম ভণিতা না করে, কত সহজে তিনি এই কথাটা বললেন। বারীন্দ্রকুমারের ব্যক্তিত্বের দিকে আমি আরও বেশী আকৃষ্ট হতে লাগলাম। তিনিও বলতে লাগলেন, নিজের অনেক কথা।

অবশেষে তিনি আমায় যোগ-শিক্ষা দিতে রাজী হলেন। নির্দিষ্ট দিনে তাঁর সঙ্গে ধ্যানে বসলাম। অদ্ভুত অনুভূতি হল। তারপর থেকে বারবার তাঁর কাছে আসতে লাগলাম। বারবার তাঁর সঙ্গে ধ্যানে বসতে লাগলাম। নানা আলোচনা হতে লাগল। আমার ব্যথিত হৃদয় নানাভাবে সান্ত্বনা পেতে লাগল। কটক থেকে প্রায়ই ছুটে ছুটে আসতে লাগলাম পুরীতে। তিনি আমার মনকে সবল সুস্থ করে তুললেন। আত্মহত্যা করবার সাধু সংকল্প ক্রমশঃ পরিত্যাগ করলাম।

একদিন এমন ভাব সত্যিই হল, যে আমার বাক্সের তলায় সযত্নে রাখা, পোটাসিয়াম সায়ানাইডের শিশিটা, নিজের হাতে সমুদ্রের কালো জলে, বহুদূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। দিয়ে যেন ভারমুক্ত হলাম।

এই সময়ে আমার জীবনে শরৎচন্দ্রও এলেন। তখন বারীন্দ্রকুমার কটকে। একটা বাসা নিয়ে আছেন। একদিন বললেন, শরৎচন্দ্র আসছেন। আমাকে বললেন কিন্তু একটি শর্তে। কারুর কাছে প্রকাশ করতে পারব না একথা। রাজী হলাম। কটক স্টেশনে গিয়েছিলাম শরৎবাবুকে আনতে। আমি এবং বারীন্দ্রকুমার। সময় ভোর চারটে। পুরী এক্‌স্‌প্রেস্‌ কলকাতা থেকে আসছে। তিনি ফার্স্ট ক্লাসে। সঙ্গে সহচর একজন। কলকাতার ধনী ব্যক্তি। তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল তুলসীপুরের নির্জন ডাকবাংলায়। চারদিকে মাঠ-জঙ্গল। বড় বড় অশ্বত্থ গাছ। বট গাছ। বিপুলকায় মহানদীর বিরাট জলরাশি খানিক দূরেই। ঠাণ্ডা বাতাসও ঝিরঝির করে ভেসে আসছে। শরৎবাবুকে আমি একটা দেবতা-দেবতার মতই কিছু ভেবে রেখেছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে যে বিস্ময় নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম, তাঁকেও সেই বিস্ময় নিয়েই দেখতে গিয়েছিলাম। এঁরা প্রতিভাশালী লোক। প্রতিভা গাছের ডালে জন্মায় না। এঁদের একটা কিছু বিশেষত্ব নিশ্চয়ই আছে।

শরৎবাবুর প্রথম আচরণেই অবাক হলাম। বারীন্দ্রকুমারের কাছে আমার পরিচয় পেয়েই গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি কিছু তফাতে দাঁড়িয়ে এঁদের দেখছি। প্রথম দৃষ্টিতে ট্রেনের কামরায় তাঁর মুখ দেখে আনন্দিত হয়েছি। হ্যাঁ, এই, আমার প্রশ্নের উত্তর লেখা রয়েছে। উত্তর—শরৎবাবুর চোখ অসামান্য উজ্জ্বল। অদ্ভুত-তড়িৎ-শক্তি-সম্পন্ন। ছবিতে কিছুই বোঝায় না তার শক্তি। ট্রেনের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কাকে যেন খুঁজছেন। সম্ভবতঃ বারীন্দ্রকুমারকে। বুঝলাম এর সমস্ত শক্তি মস্তিষ্কে। অসাধারণ ধারালো ওঁর মস্তিষ্ক। ইনি যা দেখবেন তা এমন করে দেখবেন, যা আর কেউ দেখতে পারবে না।

সেই দেখা জিনিস এমন পরিষ্কার করে অপরকে দেখাবেন, যে তেমন করে আর কেউ দেখাতেই পারবে না। ইনি জগতকে দুই চোখ মেলে দেখবার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। যেখানেই থাকুন, যেমনভাবেই থাকুন, ইনি জীবনকে দেখবেনই। সামান্য জীবন। অসামান্য জীবন। সবই। সাধারণ ব্যক্তি। অসাধারণ ব্যক্তি। সব তাঁর চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বল্‌বে। তিনি সেই দেখা দৃশ্য, কল্পনার ময়ান দিয়ে, পুনর্জীবিত না করে থাকতে পারবেন না।

কিন্তু সেই অসামান্য দ্রষ্টাকে এমন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে দেখে অবাক হলাম। তিনি আমার উপস্থিতি পছন্দ করছেন না। মুস্কিল! ভাবছেন কি দরকার ছিল, একে আনবার। বারীন্দ্রকুমার একাই একশ। বারীন্দ্রকুমার দুর্বলতা দেখিয়ে ফেলেছেন। তাঁর যোগ-শিষ্য'ক সঙ্গে এনে ফেলার দুর্বলতা। যে শিষ্য সাহিত্য-প্রেমিক। যে শরৎবাবুর অন্ধ ভক্ত। কিন্তু শরৎবাবু ঘা-খাওয়া মানুষ। সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। আমি তখন ভাবছি এই বুঝি, মানবদরদী, মানব প্রেমিক! ঔপন্যাসিক! আমাকেই সহ্য করতে পারছো না। কিন্তু তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। আজ তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পরে আমি তাঁর একটা গোটা পৃষ্ঠা উন্মুক্ত করে দিচ্ছি ত? তাঁর সযত্নে আচ্ছাদিত জীবন পৃষ্ঠার একটা পাতা। খুব গৌরবোজ্জ্বল পাতাও নয়। সাহিত্য-স্রষ্টা সাহিত্য পাঠকের বিশ্লেষণের বাইরে নয় বলেই তা দিচ্ছি। তাঁর সাহিত্যের দুর্বলতাও তাঁর এই গোপনতা। সবই গোপনে। ইঙ্গিত মাত্র। ছেলে ভোলানো।

কিন্তু তিনি ত তখন সাহিত্য-স্রষ্টা নন। এক সাধারণ মানুষ। বন্ধু-বৎসল। যে দুর্বলতা বারীন্দ্রকুমার আমার প্রতি দেখিয়ে ফেলেছেন, সেই দুর্বলতাই ত তাঁকেও কলকাতা থেকে কটকে টেনে এনেছে। তিনি তখন এক ভক্তবৎসল মানুষ। এক বড়লোক ভক্তের উপকার করতেই এসেছেন। ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়ালে থেকেই তা করতে চান। অতএব বাইরের লোক এখানে কেন? কিন্তু এখন উপায় কি! ঘোমটা

ঢাকা শরৎবাবুর ঘোমটা খসেই গেছে। এখন এগুলেও বিপদ। পেছুলেও বিপদ। বিদেয় করলেও বিপদ। সঙ্গে নিলেও বিপদ। কিন্তু অন্য কোন রাস্তা আর নেই। বারীন্দ্রকুমার গোপনতা ভেঙ্গেই দিয়েছেন। অসন্তুষ্ট শরৎচন্দ্র কলকাতার সহচর ও বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে স্টেশনের বাইরে এলেন। কি করবেন? কলকাতায় ফিরে যাবেন পরের ট্রেনে? সেটা ভালো হবে? অনেকগুলো টাকা খরচ হয়েছে একজনের। এই জন্যেই বলে দুর্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। কাদার ছিটে কিছু লাগেই।

শরৎবাবুর গায়েও আজ লাগছে। আমি কি করব, আমি এখন ঐতিহাসিক।

Rankeo-র মত আমিও বলি—I am first a historian, then a christian। এত দায়িত্ব ঐতিহাসিকের?

বাইরে ভাড়াটে মোটর অপেক্ষা করেই ছিল। তিনি তাতে গিয়ে উঠলেন। আমি পেছনে পেছনে নত মস্তকে আসছি। বারীন্দ্রকুমারের ডাকে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলাম। বুঝলাম শরৎবাবু লোকটি সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। মানুষকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না। বোধ হয় জীবনে অনেক দাগা খেয়েছেন বলেই। বড় শিল্পী হতে গেলে বড় মানুষও যে হতে হবে, এমন কোন মানে নেই। শিল্পী জীবনস্রষ্টা জীবনশিল্পী নাও হতে পারেন। রূপস্রষ্টা শিল্পী হতে পারলেও। জীবন-শিল্পী হওয়া বোধ হয় রূপশিল্পী হওয়ার চেয়েও শক্ত। শরৎচন্দ্র রূপ-শিল্পী। জীবন-শিল্পী নন। রবীন্দ্রনাথ রূপশিল্পী এবং জীবন-শিল্পী। দুইই। গান্ধী রূপশিল্পী নন। জীবন-শিল্পী। অরবিন্দ রূপশিল্পী ও জীবন-শিল্পী দুইই। art of life-ও কম বড় আর্ট নয়। শরৎবাবুর লেখায় আর্ট আছে। জীবনে নেই।

তাঁর প্রথম প্রশ্ন শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলেন— এখানে আমার বই লোকে পড়ে? ১৯০৭ সালে যে লোক বড়দিদি লেখে, সে যদি ১৯৩২ সালে এই প্রশ্ন করে তাহলে কি মনে হয়? পর্বত-

প্রমাণ অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা ছিল বলেই তিনি অজ্ঞাত পরিচয় হয়েই কটকে তিন দিন কাটালেন। কটকের অগণিত পাঠকের কাছে নিজের লেখক-দায়িত্ব পালন করলেন না। জবাব দিলাম—পড়ে শুধু নয়, খুব বেশী রকমই পড়ে। আপনার সব বই আমাদের কলেজে আছে। বাঙ্গালী ছেলেরা ত পড়েই। ওড়িয়া ছেলেরাও পড়ে। শরৎবাবু বললেন—তাহলে ত এদেশের উন্নতি হবে মনে হচ্ছে।

উড়িষ্যা সম্বন্ধে ও-কিরকম ধারণা শরৎবাবুর? আজ বাংলার প্রতি সারা ভারতের বিরূপতার কারণ এইখানেই। অকারণ উন্নাসিকতা। ইংলণ্ডের কোন ইংরিজী লেখক কি আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এসে এ রকম প্রশ্ন করতে পারতেন? সমারসেট মম্ একটা বই লিখতে সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতেন। রবার্ট লুইস স্টিভেনসন (১৮৫০-১৯৪১) সামোয়াতে এসে মারা গেলেন। লণ্ডনের লেখক লণ্ডনের বাইরের পৃথিবীর সম্বন্ধে এতখানি অজ্ঞ থাকে না। কলকাতার লেখক কটকের পাঠকের সম্বন্ধে যদি এতটা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, কটকের পাঠক কলকাতার লেখককে শ্রদ্ধা করবে কেন? তবু তারা করে। তারা জিওগ্রাফি দিয়ে শিল্পশক্তির পরিচয় মাপে না। শিল্প শক্তির পরিচয়েই তাঁরা শিল্পের মূল্যায়ন করে। তারা শরৎ-বাবুর উচিত মূল্যায়ন করেছে। তাঁর সব বই লাইব্রেরীতে রেখেছে। কিন্তু, শরৎবাবু তাদের দর্শন দেওয়াও দরকার মনে করলেন না। এ আক্ষেপ আমার আজও গেল না।

কত সময় ভাবি বাঙ্গালী কবি শুধু বাঙ্গালী কবি হয়েই থাকবে কেন? আমরা কি রবীন্দ্রনাথকে অবাঙ্গালী ভারতীয়দের কাছে উপযুক্ত ব্যাখ্যা করেছি? রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে ইংরেজদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। রদেন্‌স্টাইন গীতাঞ্জলীর অনুবাদটা কবি ইয়েট্‌সকে পড়তে দেন। তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য স্টার্জ মুরকে দেন। মুর সুইডিস অ্যাকাডেমীর নোবেল কমিটির কাছে সুপারিশ করেন। সুইডিস ভাষাতেও ততদিনে অনুবাদ হয়েছিল। সুইডিস সাহিত্যিক

ভার্নার ফন হেইডেনস্টান নোবেল কমিটির কাছে সুপারিশ করেন। এ তো হল ইউরোপের কথা। ইউরোপীয় ভাষার কথা। আমরা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করেছি। ব্যাখ্যা করিনি। অবাঙ্গালীরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত করেছে। কিন্তু তাঁর লেখাকে, যতটা পড়া উচিত ছিল, ততটা পড়েনি।

অনেক সময় ভাবী বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক শুধু বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক হয়েই থাকবেন কেন? নিজের প্রদেশের প্রান্ত অতিক্রম করে তাঁদের কি দৃষ্টি যেতে চায় না? শরৎবাবু কি ভেবেছিলেন ভবিষ্যতে বিষ্ণু প্রভাকর নামে এক অবাঙ্গালী তাঁর সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ একটা জীবন-কাহিনী লিখবে? যার মূল্য হবে পঁয়তাল্লিশ টাকা! স্বপ্নেও ভাবেন নি।

শরৎবাবুর পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল একেবারে সাদাসিদে। দেখলে বিশ্বাসই হয় না যে অত বড় একজন ঔপন্যাসিক কি করে এই পোষাকে বাইরে বেরুতে পারেন। কিন্তু শরৎবাবুর সেসব খেয়ালই নেই। এসব বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। একটা সাদা, কলার-হীন, চীনে কোট পরণে। খাটো সিল্কের ধুতি। পায়ে চটি। হাতে মোটা বেতের লাঠি। যা দেখতে অতি বিশ্রী। কোটে নিকেলের বোতাম। দেখতেও তিনি অতি সাধারণ। দশ-জনের মধ্যে থাকলে চোখেই পড়ে না। লক্ষ্য করা যায় শুধু এক মাথা সাদা বড় বড় রুক্ষ চুল। যেন কখনো তেল পড়েনি। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। গোঁফ দাঁড়ি কামানো মুখ। সারা মুখে অসংখ্য লাইন। কেউ যেন পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কেটেছে। আমি তাঁর মুখের দিকে খুব লক্ষ্য করে দেখেছি। প্রতিভার চিহ্ন খুঁজেছি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সদা-চঞ্চল, চোখ দুটি ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করবার মতই নয়।

যে কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য বুঝতে গেলে মানুষটিকেও বুঝবার চেষ্টা করা উচিত। সাহিত্যও তাঁর মানসলোকেরই সৃষ্টি। তাঁকে দেখে প্রথম আমার যা মনে হয়েছে তা এই: তিনি সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য-প্রভাবমুক্ত। তাঁর যুগে এ কাজ সহজ ছিল না। এটা কম

মেরুদণ্ডের কথা নয়। ভারতীয় সভ্যতার অন্তরে তিনি প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। ধর্মে তিনি বৈষ্ণব। তখন দেশ পরাধীন। ইংরেজের রাজত্ব চলছে। প্রজারা সকলেই প্রায় সাহেব হয়ে উঠতে ব্যস্ত। আশ্চর্য হয়ে দেখতাম, শরৎবাবু এ ধরনের কোনো চেষ্টাই করতেন না। ডাক-বাংলায় দেশী ধরনের পায়খানা ছিল না। গোসলখানায় কমোড ছিল। পাশে ছিল ইংরেজদের কবর দেবার গোরস্থান। ওড়িয়া ভাষায় যাকে বলা হত—"গোরা কবর"। ইংরেজ শোকার্তদের জন্যেই ছিল এই ডাক-বাংলা। সেখানে দেশী পায়খানার কোন প্রয়োজনই ছিল না। শরৎচন্দ্রের সুখ-সুবিধা দেখার ভার বারীন্দ্র-কুমারের ওপরই ছিল। তিনি বাথরুমে কমোড দেখেই সন্তুষ্ট। কিন্তু শরৎবাবু কমোড ব্যবহার করতে সম্পূর্ণ অসম্মত। সভয়ে বলে উঠলেন বাপ্‌রে! ওতে বসতেই পারব না। একবার দার্জিলিং-এ আমায় কমোড দিয়েছিল। তার ওপর চড়ে বসতে গিয়ে পা যা কাঁপতে লাগল। উঃ! বলে নিজেই হেসে অস্থির। একটু পরে বললেন—তুমি অত ভাবছ কেন, বারীন! আমি ত পাড়াগাঁয়েরই ছেলে। এমন খোলা মাঠ চারদিকে। দিব্যি হবে। একটা ঘটি দাও ত!

শুনে অবাক হয়ে গেলাম। উপন্যাস-সম্রাট একি বলছেন? একটা সিগার ধরিয়ে তিনি বললেন—কৈ! কোথায় যেতে হবে বল। আমি ডাক-বাংলার মগ তুলে নিয়ে বললাম, চলুন। শরৎবাবু একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বলে উঠলেন—ছি-ছি-ছি। তুমি বামুনের ছেলে। আমার জন্য জল বয়ে নিয়ে যাবে? তাও কি হয়?

কিন্তু তাও হতেই হল। আমি ছাড়লাম না! অগত্যা তিনি ডাক-বাংলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন।

পাশেই ছিল "গোরা কবর"। প্রায় এক-মানুষ উঁচু পাঁচিল। দরজা তালাবন্ধ। শরৎবাবু এগিয়ে গেলেন পাঁচিলের দিকে। তারপর গোড়ালি তুলে উঁকি মারলেন ভেতরে। বাস্! অমনি তাঁর ভেতরকার সাহিত্যিক জেগে উঠল। এ যে গ্রেভ্-ইয়ার্ড! মানুষের

সব খেলা শেষ হয়ে যাবার পরও আর এক খেলা খেলবার জায়গা। অতএব একটার পর একটা থান্ ইট এনে এনে রাখছেন। আমি এই প্রবীণ সাহিত্যিককে অসীম কৌতূহল নিয়ে দেখছি। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট করতে করতে শেষে পনেরো মিনিট কেটে গেল। প্রত্যেক সাহিত্যিকরাই কিছুটা দার্শনিক হয়েই থাকেন। তিনিও হলেন। আমি শুধু দেখছি তাঁকে। পেছন থেকে। কি রোগা গড়ন। কত পাতলা কোমর। কত ছোট পাছা। পেছন থেকে দেখলে স্কুল-কলেজের ছাত্র বলেই ভ্রম হয়। মাথার চুলটাই শুধু পাকা আর সবই যুবকদের মত। মেদের বাহুল্য কোথাও নেই।

ভাবছিলাম সাহিত্যিক হবার বিশেষ গুণ কি। তা আর আমার কাছে অজ্ঞাত রইল না। অভিনিবেশ। একেই ডিকেন্স বলেছেন, এটেনশান। এই শক্তি যার আছে তাকেই বলব, প্রতিভা। শুধু সিগার থেকে ধোঁয়া ছাড়ছেন। আর অভিনিবেশপূর্বক চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন। সময় আর তার কাছে সময় রইল না। কাল আর তাঁর কাছে কালই রইল না। তাঁকে যে মহাকালের ক্রোড়ে স্থান পেতে হবে। পল-অনুপলের দিকে দৃষ্টি দিলে মহাকাল তাঁকে স্থান দেবে কেন? বিস্ময়ই হল সাহিত্য-সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই বিস্ময় অপরের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়ার নামই হল শিল্প। রূপস্রষ্টার স্পর্শ পেলেও শিল্পও হয়ে ওঠে শিল্প। একটু পরে শরৎবাবু মগ তুলে নিয়ে চলে গেলেন। মাঠের দিকে। আমিও ডাক-বাংলায় ফিরে এলাম।

দ্বিতীয় জিনিস যা শরৎবাবুর ভেতরে দেখতে পেলাম, তা হল এক অসামান্য দরদী হৃদয়। শরৎচন্দ্রের সহচরের প্রণয়িণী থাকতেন কটকে। রাজপরিবারের বধূ। অসামান্য সুন্দরী। পরে স্বাধীন দেশের মন্ত্রীও। আসতেন গোপনে। দুপুরবেলায়। যখন গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর শান্ত ও নিস্তব্ধ হয়ে যেতো। আসতেন নিজের মোটরে। ঘণ্টা দুই তিন থাকতেন। শরৎবাবুর সহচরটির সঙ্গে নিভৃতে বন্ধ দরজার ভেতরে

আলাপ করতেন। বারান্দায় বসে মজুর টানা পাখা টানত। শরৎবাবু ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়া টানতেন। তামাক আর নল কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আমি সব তদারক করতাম। কিন্তু ওখানে খেতাম না। নিজের হোস্টেলেই চলে যেতাম।

যেদিন তিনি চলে যাবেন সেদিন বিদায় নিতে গেছি। প্রণাম করেছি। হঠাৎ তাঁর দরদী হৃদয় জেগে উঠল। বললেন—তুমি আমার এত সেবা করলে, অথচ একদিনও আমার সঙ্গে খেলে না ত? আমি যেমন বলতে হয় তেমনি 'তাতে কি হয়েছে' 'তাতে কি হয়েছে' বলতে আরম্ভ করেছি। তিনি হঠাৎ বারীনদাকে এবং তাঁর সহচরকে সজোরে ডেকে উঠলেন। বললেন—আমার না খাওয়ার কথা। আমি অনেক আপত্তি করলাম। বারীন্দ্রকুমারও অনেক বোঝালেন। কিন্তু শরৎ-বাবুর বিশেষত্বই হল অসামান্য জেদ। যা বলেছেন তা হতেই হবে। তখন বারীনদা বললেন—আচ্ছা তাই হবে। ও আজ খাবে এখানেই। নিশ্চিন্ত হলেন ত?

শরৎবাবু হাসলেন। নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—বোসো জিতু। গল্প করা যাক। আমি বসলাম। বললেন—আমার সব বই পড়েছো? বললাম—পড়েছি শুধু নয়। গিলেছি। জায়গায় জায়গায় মুখস্থ। বলেন ত শুনিয়ে দিতে পারি।

বললেন—কেমন লাগে?

বললাম—তাও জিজ্ঞেস করছেন? খুব ভাল। অতিরিক্ত রকম ভাল।

বললেন—কেন তাও বল।

বললাম—আপনার মত অসামান্য প্রেমের চিত্র আর কে আঁকতে পেরেছেন, শরৎদা?

শরৎবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—কোন্ প্রেমের চিত্রটা তোমার সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে?

বললাম—শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী।

শরৎবাবু মৃদু হাসলেন। বললেন—এই চিত্রটাই তোমার সবচেয়ে

বেশী ভাল লেগেছে? জানো, রাজলক্ষ্মী কোন দিনই শ্রীকান্তকে ভালবাসেনি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সে কি?

শরৎবাবু উদাস কণ্ঠে বললেন—সে যাকে ভালবাসে সে তাকে সব দেয়। সমাজ, সংসার, সম্মান, সন্তান, রাজলক্ষ্মী কি দিয়েছিল এসব কিছু শ্রীকান্তকে? তবে তার ভালবাসা কিসের?

তার চোখ ছলছল করে উঠল। আমি আশ্চর্য হয়ে এই প্রবীণ সাহিত্যিককে দেখতে লাগলাম। তাঁর রচিত চরিত্রের সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ আছে নাকি? তাঁর নিজেরও? নিজের জীবনেরও? নিজের প্রেমেরও? আজ আমি জানি যে আছে। রাজলক্ষ্মী হল ব্রঞ্জ, কপার আর টিন। মৎস্যকন্যা। নীচেটা মৎস্য। ওপরটা মানবী। সে মানবী অজ্ঞাতা নয়।

এ সম্বন্ধে "দেশ" পত্রিকায় কিছু লিখেছিলাম। ১৯৭১ সালে। কারণ ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছিলেন—শরৎচন্দ্র নাকি পিউরিটান। পড়ে আমি আর হেসে বাঁচি না। শরৎচন্দ্র পিউরিটান? তাহলে অপিউরিটান কে? আমার লেখা কেউ মেনে নিল। কেউ মানে নি। তাতে কি এসে গেল? সত্যি যা, তাতো বলতেই হবে। এদেশের যা দস্তুর। কথায় কথায় বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠল। অন্নদাশঙ্কর রায় আমাকে সমর্থন করলেন। এমনকি আমায় শরৎবাবুর ওপর একটা বই লিখতেই বললেন। আমি লিখলামও। তিনি তার ভূমিকাও লিখেছিলেন। যা তিনি দেন না। এমন কি রাজপরিবারের বন্ধুটির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে দ্বিধা করলেন না। সে বই এখনো ছাপানো হয় নি। কারণ, প্রকাশক নেই। আমাকেই ছাপাতে হবে। বিলম্ব হবে। কি করব?

গত বৎসর থেকে শরৎ-বার্ষিকী চলেছে। যেখানে সেখানে শরৎ-পূজা চলেছে। এটা একটা মৌখিক অনুষ্ঠান মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা কে জানে? আমরা জাতি হিসেবে এখনও সাহিত্যকে মহত্ব দিতে

শিখিনি। সাহিত্যিকদের জীবন সম্বন্ধেও খুঁটিনাটি জানতে উৎসুক নই। সুনীতি দুর্নীতি দিয়ে শিল্পীকে বিচার করি। এই সমাজের শিল্পীরাও এত ভয়ভীত। বড় শিল্পীও হলাম। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষও হবো। হয় কি ?

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এক টেবিলে বসে যখন রাজসিক আহার করছিলাম, তখন আমি কে ? কিছুই নই। একটা সামান্য আইনের ছাত্র মাত্র, আর তিনি ? সাহিত্য-সম্রাট। অসীম তাঁর খ্যাতি। অপরিসীম তাঁর প্রতিষ্ঠা। তিনি যদি আমায় তাঁর সঙ্গে খেতে না বলতেন, কিছুই ক্ষতি হত না তাঁর। আমিও কিছুই মনে করতাম না। কিন্তু তাহলে তিনি সাহিত্য-সম্রাট হতে পারতেন না। অসামান্য মানবিক সম্পদের অধিকারী না হলে কেউ সাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট হতে পারে না। অত্যন্ত ছোটকেও বড় করে দেখতে পাওয়াটাই সাহিত্যিকের সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি আমাকে বড় করে দেখেছিলেন। দেখতে পেরেছিলেন। তাই পতিতার ভেতরেও নারীত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

চন্দ্রমুখীর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। পিয়ারী বাইজীরও। পোড়া কাঠের ভেতরেও সবুজ প্রাণের ইসারা দেখতে পেরেছিলেন। এইখানেই ছিল তাঁর সমগ্র সাহিত্য-রচনার প্রেরণা (মটিভ্)। কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী, কুকুর বেড়ালের ওপরেও ছিল তাঁর অসাধারণ দয়া! দরদ। বাঙ্গালী প্রাণ ভরে এইরকম এক সাহিত্য পড়েছিল। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এইরকম এক তীব্র অনুভূতি-সম্পন্ন লেখক খুঁজেছিল। অপরাজেয় কথাশিল্পী বলে নাট্যাচার্য তাঁর মাথায় তাজ পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে মানবিকতা দেখতে পেয়েছিলেন। মঞ্চ ও চিত্রের মাধ্যমে তার প্রকাশও করেছিলেন।

সূর্যের আলো প্রথমে পর্বত শিখরেই পড়ে। শিশিরকুমার ছিলেন এই রকম এক শিল্প পর্বতের চূড়া। শরৎচন্দ্র নামেই শুধু শরৎচন্দ্র। আসলে তিনি ছিলেন জ্বলন্ত হাইড্রোজেন গ্যাস। হট প্লাজমা। অর্থাৎ সূর্য। উপন্যাস জগতের প্রদীপ্ত সূর্য। তাঁর photosphere ক্রমাগত

white corona, red prominences আর রঙীন chromosphere সৃষ্টি করে যাচ্ছে। আমরা মর্ত্যের মানব তাঁর চোখ দিয়ে বাঙ্গালী সমাজকে দেখেছি। তিনি আমাদের দিব্যদৃষ্টি দিয়েছেন। সেই দৃষ্টিতে সমাজকে দেখবামাত্রই সমাজ এক সেকেণ্ডে বদলে গেল। লোহা সোনা হয়ে উঠল। পরশমণি তিনিই আনলেন। নইলে একি কখন সম্ভব যে এই মাত্র একশো বছর আগে প্রথম স্টিমার নদীতে দেখে "ধোঁয়াকলের লা এয়েছে রে" বলতে বলতে গ্রাম জনশূন্য হয়ে যেতো। স্টিমার থেকে নেমে দুধ কিনতে গেলে দুধ পাওয়া যেতো না। বলেছেন অরবিন্দের দাদামশায়—রাজনারায়ণ বসু। এ যাদু মাত্র, প্রতিভার মন্ত্র। শরৎবাবুর এই প্রতিভা ছিল। তিনি বাঙ্গালী সমাজের অসাধারণ পরিবর্তন করেছিলেন কলমের খোঁচা মেরেই।

শরৎবাবুর মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছিলাম আর একটা জিনিস। মেকি জিনিসের প্রতি অনাস্থা। কোনরকম বাহ্যিক আড়ম্বর এই সাহিত্যিকের ছিল না। সাহিত্যিক হতে গেলেই যে আদ্দির পাঞ্জাবী আর মাটিতে লোটানো দিশী-ধুতির কোঁচা আবশ্যক তা নয়। এমন কি গলায় দোদুল্যমান চাদরও নয়। ওটা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতিরই শোভা পেত। নিকেলের বোতাম লাগানো চীনে কোটেও সাহিত্যিক খুব জ্বল জ্বল করে জ্বলতে পারেন। যদি অবশ্য পাঠকদের চিত্ত জ্বালাবার ক্ষমতা তাঁর থাকে।

গভীর অভিনিবেশের কথা আগেই বলেছি। আমাকে কথাচ্ছলে বলেছিলেন—যখন তিনি লিখতেন, এত নিবিষ্ট হয়ে যেতেন যে পাশের ঘরে ড্রাম বাজালেও শুনতে পেতেন না। লেখা শেষ হবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত মাথাটা খালি খালি মনে হত। বলতেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়েছি শুধু। বছরের পর বছর। চোদ্দ বছর চোদ্দ ঘণ্টা করে পড়েছি। অক্লান্ত পরিশ্রম বিনা কোন সৃষ্টিই অমরত্বের অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে না। সাহিত্যেও অমৃতলোকে উত্তরণ চাই। সাহিত্য জীবনের ফটোগ্রাফ মাত্র নয়। অনন্তের ইঙ্গিত যে সাহিত্যে নেই, সে সাহিত্য

বুদ্বুদ সাহিত্য মাত্র। চির স্থায়ীত্বের দাবী সে করতে পারে না।
তৃতীয় জিনিস যা শিখলাম শরৎবাবুর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে তাহল এই—বড় ঔপন্যাসিক হতে হলে মানবপ্রেমিক হতেই হবে। সাহিত্যের চিরন্তন সত্য হল, মানবিকতা। শরংবাবুর লেখার ছত্রে ছত্রে আমি দেখতে পাই এই মানবপ্রেম। জীবনেও দেখতাম তা। আমায় না খাইয়ে ছাড়লেন না। তাঁকে কলকাতায় তাঁর ধনী সহচরের বাড়ীতেও দেখেছিলাম। কিন্তু সামাজিকতা সাহিত্যিকের মৃত্যুর কারণ। জনপ্রিয়তা সাহিত্যিকের পক্ষে হলাহল স্বরূপ। সকাল বেলা। ঘর ভরা লোক। শরৎবাবু সভার মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন। লোক বক্ বক্ করে চলেছে। অকারণ। তিনি শুনে চলেছেন। অকারণ। উপভোগ করছেন বলেই মনে হল। তাঁর সৃষ্টি-শক্তি অন্তর্হিত। তাঁর প্রতিভা-অনল নির্বাপিত। হেতু? তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন। জনসমাগম পছন্দ করছেন। চারদিকের মূল্যবান সোফা-সেটির মধ্যে চীনে কোটে নিকেলটাই জ্বলছে শুধু। হাতে বেতের বীভৎস লাঠিটিই শোভা পাচ্ছে শুধু। অহিফেন, তামাক, চা এবং আর একটা জিনিস খেয়ে খেয়ে তিনি তিরিশ ফুট লম্বা alimentary canal জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছেন। তিনি নিষ্কাষিত বাষ্প বেলুনের মত চুপসে গেছেন। ভিজে মুড়ির মত মিয়িয়ে গেছেন। দেখে দুঃখ হল। টিসিয়ান নিরানব্বই বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। Ranke ৯১ বছর বেঁচে ছিলেন। পাবলো পিকাসো ৯১ বছর। বাট্রাণ্ড রাসেল ৯০। মাইকেল এঞ্জেলো ৯০। টলস্টয় ৮২। গ্যয়টে ৮৩। টেনিসন ৮৩। কার্লাইল ৮৭। আর আমাদের ঈশ্বর গুপ্ত ৪৬, কেশবচন্দ্র ৪৬, দীনবন্ধু ৪৪, মধুসূদন ৫০, বঙ্কিম ৫৫, এমন যে অসাধারণ প্রতিভা কালীপ্রসন্ন সিংহ তিনি মাত্র ৩২ বৎসর বাঁচলেন। দ্বিতীয় "হুতোম প্যাঁচার নকসা" আর লেখা হল না। বড় দুঃখ হয় যে চার্লস চ্যাপলিন যিনি শিশির বাবুর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় তিনি ৮৮ বছর বেঁচেছিলেন। আর শিশির বাবু কুড়ি বছর হতে চলল মৃত। শিল্প-সাধকের দেহও ভাগবতী-তনু

হয়ে ওঠা উচিত। Go I's happy living tool হওয়া উচিত। আমরা আমাদের শরীরের ট্রাষ্টী। ন্যস্ত ধন সযতনে রক্ষা করা উচিত।

এইবার উপসংহারে আসি। ছাত্র-জীবনের কাহিনী শেষ হল। এর পরের পর্ব। কর্মজীবন। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব—ছুটোছুটি। আর লুটোপুটি। পঞ্চম পর্বে এসে প্রশান্তি। পাঁচ খণ্ড মিলিয়ে মানবজীবনের মহাকাব্য। এটা নাকি মহাকাব্যের যুগ নয়। এ যুগ নাকি মুখ্যত পত্রিকার যুগ। ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যের যুগ। আমি বিশ্বাস করি না তা। পরাধীন যুগের কবি মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। পরাধীন দেশের ঔপন্যাসিক বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত। স্বাধীনোত্তর যুগের কবি বা ঔপন্যাসিক বোধ হয় এখনও জন্মায় নি। আমি তাদের জন্ম-মুহূর্তের পল গুণছি। একটা বিরাট প্রতিভা শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করবে। ছাত্রজীবনেই আমি দেশের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম। তাঁরা আমাকে নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার আমার চিন্তার ধারা বদলে দিলেন। তিনিই আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে নিজের শক্তির চেয়ে বড় আরও একটা শক্তি আছে। সে শক্তিটা যে কত বড় তা আমরা যতই বুঝতে পারি, নিজের শক্তিটা যে কত ক্ষুদ্র তাও যেন ততই বুঝতে পারি। আজ স্বশক্তির চেয়ে সেই শক্তিটার ওপর নির্ভর করতে শিখে দেখছি প্রতিকূল কিছুই নয়। সবই আমার দেখবার ভুল। এই উপলব্ধিটাই আমার বর্তমান জীবন-দর্শন। আমার লেখার ভেতর যদি কোন সত্য প্রকাশ পেয়ে থাকে তা হল এই। অনেক বেদনার পর এই উপসংহারে এসেছি। বেদনাই চরমবাণী। অনুভূত সত্য। জীবন থেকে উত্থিত। শত কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত। জীবন-মন্থন করা অমৃত। তাকে প্রকাশ করাই ত সাহিত্য।

আজ জীবনের শেষে এসে নিজেকে প্রশ্ন করছি—আমার পরিচয় কি? কি আমি? উত্তর পাচ্ছি। জীবন প্রভাতে, নাট্যকার। সৃষ্টি শক্তির উদ্ভব ও প্রকাশ। দিব্যচক্ষু বা গুরুনেত্র উন্মোচন করলেন

শিশিরকুমার। মধ্যাহ্নে সৃষ্টির স্থিতি ও পূর্ণতা। অনেক ভুল পথে ভ্রমণ। অনেক অযোগ্যদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা পাত্র হাতে গমনাগমন। জীবনসায়াহ্নে সৃষ্টির পরিণাম ও প্রতিসংহার। পথ-প্রদর্শক বারীন্দ্র-কুমার। তাঁর দৌলতেই আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম। আমার সত্যিকারের আমিকে।

শিশিরকুমারের কাছে আমি কি পেয়েছিলাম? নাটক রচনায় প্রাথমিক শিক্ষা। ১৯৩২ সালে। যেদিন তিনি পুরী ছেড়ে যাবেন সেদিন তাঁকে বলেছিলাম—অধীনের একটি নিবেদন আছে। তিনি কৌতূহল প্রকাশ করাতে বলেছিলাম—আমার নাটক লেখার অভ্যাসের কথা। তিনি শুনে খুসী হলেন। এমনকি আমার লেখা নাটক নিয়েও গেলেন কলকাতা। কঙ্কাকে বললেন—রেখে দাও ত নাটকখানা।

পুরীতেই নাটকখানা তু'এক পাতা উল্টিয়ে দেখে বললেন—আচ্ছা বলত? ড্রামার আসল জিনিস কি?

আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন—ডায়ালগ্। ডায়ালগের আসল জিনিস কি?

চুপ করে রইলাম। হিমালয়ের কাছে উই ঢিপি কথা বলবে কি? তখন তিনি বললেন—ডায়ালগের আসল জিনিস, বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্য কি? তুলনা করা যেতে পারে হাতের টিপের সঙ্গে। পৃথিবীর প্রত্যেক লোক আলাদা। প্রত্যেক লোকের চরিত্রও মেলে না। চরিত্র কি? আচরণের নকসা। আচরণ কি? কথাবার্তা ব্যবহার অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি। প্রত্যেক লোকের কথা বলবার ধরণ আলাদা। একটা লাইনই হয়ত পাঁচজনে পাঁচভাবে বলবে। তাদের ভাষা আলাদা। গলার স্বরের উত্থানপতন আলাদা। আগে কান পেতে প্রত্যেকের কথা শোনবার চেষ্টা কর। কোন বিশেষ কথাটিতে কোন চরিত্রের কোন বিশেষতা প্রকাশ পাচ্ছে? সেইটি নিজের মাথা খাটিয়ে বের কর। কেউ নাটক লেখা শেখাতে পারে না। নিজেকেই ঠেকে

ঠেকে শিখতে হয়। কেউ ডায়ালগ সৃষ্টির প্রণালী বলে দিতে পারে না। এর কোন শর্টকাট নেই। কোন রয়েল রোডও নেই। বই পড়ে পড়ে এসব পরীক্ষায় পাশ করা চলে না। জীবন থেকেই এর মর্ম উদ্ধার করতে হয়। পরপর কতকগুলো দৃশ্য বা কথোপকথন সাজিয়ে গেলেই নাটক হয় না। এ হল জীবন-ভোর সাধনা করে যাবার মত বিষয়। অতএব আজ থেকে তাই কর। মন দিয়ে অপরের কথা শোনবার চেষ্টা কর। আনন্দ পাবে। আর তা যদি পাও বুঝবে তুমি একজন নাট্যকার। Try to listen, Listening is a great art. How many of us know how to listen? very few. How many actors know how to listen? very few.

শিশিরবাবু কিছুক্ষণ নীরবে সিগার টানলেন। তারপর বললেন—দ্বিতীয় জিনিস হল, অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা না হলে কেউ নাটক লিখতে পারে না। তোমার এখন অভিজ্ঞতা কতটুকু? এই অভিজ্ঞতা সম্বল করে তুমি নিজের বেদনাই প্রকাশ করতে পারো শুধু। অপরের বেদনা প্রকাশ করার শক্তি এখনও তোমার হয় নি। কারণ অপরের মনে প্রবেশ করবার মত সহানুভূতি তোমার মনে এখনো জাগে নি। এখন কিছুকাল দুই চোখ মেলে চেয়ে থাকো। কৌতূহল, পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি স্মৃতির ভাণ্ডারে কিছুকাল ধরে রেখে ফারমেণ্ট করতে দাও। সদাসর্বদা সেইগুলি নিয়ে চিন্তা কর। এইটেই হল শিল্পীর প্রস্তুতি-পর্ব। ইনকিউবেসান পিরিয়ড। অপরের মনের ভেতর প্রবেশ করবার ক্ষমতা অর্জন কর। অপরের মনের দ্বন্দ্বটা কি, ভাবতে চেষ্টা কর। দ্বন্দ্বটা কার সঙ্গে, কি নিয়ে বাধছে, লড়াইয়ের অস্ত্রগুলো কি, রণক্ষেত্রটা কোথায়, এসব স্পষ্ট করে দেখতে চেষ্টা কর। কি কারণে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি, কি উপায়ে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি, ভালো করে তলিয়ে দেখতে শেখো। এই সবই হল নাট্যকারের তূণীরের ব্রহ্মাস্ত্র। পাশুপত অস্ত্র। তোমার ভাণ্ডারে এখন যথেষ্ট অস্ত্রই নেই। লড়বে কি করে? হ্যাঁ। লড়াই। আশ্চর্য হচ্ছ? শুধু লড়াই নয়। তুমুল

লড়াই। কার সঙ্গে লড়াই? দর্শক মনের সঙ্গে লড়াই। তারা তোমার কল্পনা বিশ্বাস করবে। অথবা অবিশ্বাস করবে। যদি বিশ্বাস করে, তোমার জিত। যদি অবিশ্বাস করে, তোমার হার। এই ত নাট্যকারের চিন্তার একমাত্র বিষয়। বেশ। খুব ভাল। তুমি চেষ্টা করলে নাট্যকার হতে পারো। কিন্তু, মাই ইয়ঙ্ ফ্রেণ্ড, সাধনা দরকার। সাধনা ছাড়া কিছুই হয় না। সাধনা কখনও বিফলেও যায় না। শুধু গর্জন করলেই বর্ষণ হয় না। রোরিং ক্লাউড সেলডম রেনস্। ধৈর্য চাই। তাড়াহুড়ো করে কেউ কিছু হয়ে উঠতে পারে না। হয়ত লিরিক্ পোয়েট হতে পারো। ড্রামাটিষ্ট কিছুতেই নয়। নেভার। কীটস্ হতে পারো ছাব্বিশ বছরে। সফোক্লিস হতে সময় লাগে। বাট ইট ওয়ার্থ হোয়াইল টেকিং দি ট্রাবল!

বুঝলাম, নাট্যকার হতে গেলে সাধনা চাই। আজও সেই সাধনাই দিবারাত্র চলেছে। আমার অন্য কোন কাজ নেই। অন্য কোন বিলাস নেই। অন্য কোন চিন্তা নেই। অন্য কোন সঙ্গীও নেই। আমি নিঃসঙ্গ। একাকী। সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত। সর্বতোভাবে বর্জিত।

বারীন্দ্রকুমারের কাছে আমি কি শিখলাম? তিনি ছিলেন আসলে যোগী। ফাঁসীর হুকুম শোনার পর সাড়ে নয় মাস তিনি ফাঁসী হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করলেন। এইটেই তাঁকে আদ্দেক যোগী করে তুলল। আলিপুর জেলে এই সাড়ে নয় মাস কনডেম্ড সেল-এ একাকী প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় তাঁর কেমন কেটেছিল তা কল্পনার জিনিস। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে তাঁর মস্তিষ্কের ওপর কি প্রচণ্ড প্রহার চলেছিল। ১৯৩২ সালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল। চলে গেলেন শিশিরকুমার। চলে গেলেন বারীন্দ্রকুমার। শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই। তাঁর প্রথম যৌবনের সাথী। তাঁর উত্তর-জীবনের যোগ-শিষ্য। তাঁর প্রতিটি কথায় মানবজীবন সম্বন্ধে এমন একটি নতুন কথা শুনতাম যে অবাক হয়ে যেতাম।

তুলসীপুরের ডাক বাংলায় বারীন্দ্রকুমার ও শরৎচন্দ্রকে একসঙ্গে পাশা-

পাশি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বারীন্দ্রকুমার মাটিতে উঁচু হয়ে বসে খালি গায়ে স্যালাড বানাচ্ছেন। স্যালাড বানাতে আর বেলের সরবত করতে তিনি অদ্বিতীয়। শরৎচন্দ্র সিগার টানতে টানতে চেয়ারে বসে তাই দেখছেন। মাঝে মাঝে বলছেন তুমি ত এসব বেশ পারো বারীন। বারীন্দ্রকুমার অমনি ছেলেমানুষের মত খুসীতে গদগদ। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বলছেন—তা একটু পারি বটে, শরৎদা।

আর আমি ভাবছি যে হাত একদিন বোমা তুলেছিল, রিভলভার ছোঁড়া অভ্যাস করেছিল—সে হাত টেমোটো কেটেও ত বেশ আনন্দ পাচ্ছে। হয়তো দুটো আনন্দই সমান। দুটোই জীবনানন্দ। আমি দেখছি একজন দেবদাস, শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মীর সৃষ্টি করেছেন। আর একজন কয়েদীর পোষাক পরে আন্দামানে সেলুলার গেট-এ ওয়ার্ডার দেখলেই উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিয়েছেন। ওই হাতটাই কপালে তুলেছেন।

শরৎচন্দ্র ও বারীন্দ্রকুমার। কে আমাকে বেশী শক্তি দিয়েছে? নিঃসন্দেহ বারীন্দ্রকুমার। শ্রীঅরবিন্দের জ্বলন্ত সূর্যের মত বুদ্ধির উত্তাপ বারীন্দ্রকুমারের হাস্য পরিহাসের বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে সহনীয় হয়ে আমার কাছে এসে পৌঁচেছিল। বারীন্দ্রকুমার ভ্যান এ্যালেন বেল্ট-এর কাজ করেছিলেন। বারীন্দ্রকুমার প্রেমকে খুব বড় জিনিস বলে মনেই করলেন না। মনের জোর থাকলে ওসব কিছুই নয়। আর শরৎচন্দ্র বললেন - রাজলক্ষ্মী কোন দিনই শ্রীকান্তকে ভালবাসে নি। তাহলে তিনি লিখলেন কি মাথা মুণ্ড ছাই পিণ্ড? জীবন দিয়ে তা যদি সমর্থিত না হয়। বারীন্দ্রকুমার বলতেন—প্রেমই জীবনের একমাত্র জিনিস নয়। তার চেয়েও বড় জিনিস আছে। আত্মজ্ঞান। আত্মোপলব্ধি।. সেই থেকে ক্রমশঃ আরও বিরাট উপলব্ধি। বিশ্ব-চৈতন্য। বিশ্বস্রষ্টার সম্বন্ধেও চৈতন্য।

তাঁর মুখে শুনেছি শ্রীঅরবিন্দ বলতেন—লাভ! হোয়াট লাভ? ক্যাটস্

লাভ। ভগস্ লাভ। হোয়াট দেয়ার ইন লাভ? মানুষকে আরো ওপরে উঠতে হবে। লাভকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। লাভকে স্পিরিচ্যুয়ালাইজ করতে হবে। ক্রিয়েটিভ করতে হবে।

বারীন্দ্রকুমার বলতেন—প্রেম প্রেম করে হা-হুতাশ করে লাভ কি? ইচ্ছে করে ত আবার প্রেমে পোড়ো। শুকনো মাঠ আবার সবুজ হয়ে উঠবে। এক পশলা বিষ্টি হতেই যা বাকী। আসতে দাও জীবনে আবার নারীকে। মহাভারতকার বলছেন—নাস্তি ভার্য্যা সমা বন্ধুঃ নাস্তি ভার্য্যা সমা গতিং। অতএব ভার্য্যা সংগ্রহ কর। মনের মত ভার্য্যা। মনোবৃত্তি অনুসারিণী। বুঝলে জিতু! নাথিং হ্যাজ বিন লষ্ট। ইউ উইল গেট ব্যাক এভরি থিং! এভরিথিং।

বারীন্দ্রকুমার আমার জীবনে আবার আশা এনে দিলেন। আমি যেন নব-কলেবর পেয়ে বেঁচে উঠলাম। শরৎবাবুর জীবন দেখলাম। যেন নিরানন্দের ধূসর মরুভূমি। বসে বসে শুধু তামাকই খাচ্ছেন। আনন্দের ফেটে-পড়া উল্লাস নেই। শান্তির অতলস্পর্শী স্থির সমুদ্রও নেই। আর বারীন্দ্রকুমার? হাহা করে হেসে ফেটে পড়ছেন। মহা সদানন্দ লোক। মিষ্ট ভাষী। পরিহাসপ্রিয়। বয়স যেন এতটুকুও হয় নি। আমার যেন সমবয়সী। বন্ধু লোক। আত্মার আত্মীয়। সহমর্মী। সহধর্মী।

আর শরৎবাবু যেন শত যোজন দূরের মানুষ। তাঁর লেখা ভাল লাগে। তাঁকে নয়। আমি দেবদাসের স্রষ্টাকে মন থেকে বিসর্জন দিলাম। যোগসাধক বারীন্দ্রকুমারকে সর্বান্তঃকরণে মনের মধ্যে গ্রহণ করলাম। শরৎবাবুর সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা নেই। বারীন্দ্রকুমারের জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ।

প্রথম পর্ব এইখানেই শেষ করলাম। আমার মনের রোগমুক্তির ইতিহাস। দ্বিতীয় কর্ম জীবনের নিদারুণ সংঘর্ষের কাহিনী। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে জীবনের নানা অলি গলি। কখন আলো। কখন অন্ধকার। অবশেষে আত্মসচেতনতা। পঞ্চম পর্বে এক বৈজ্ঞানিক

আধ্যাত্মিকে রূপান্তর লাভ।

আঠারো পর্ব না লিখে মহাভারত শেষ করা যায় নি। পাঁচ পর্ব না লিখলে জীবন-সঙ্গীত সুলিখিত হয় না। জীবনরাগিণী সুগীত হয় না। জীবন-সঙ্গীতের এই পাঁচ পর্বের ইতিহাস মানবমনের দুঃখ জয়ের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। দুঃখের মূল অনুসন্ধান করতে শিখেছি। দুঃখের গভীরে ডুবে গিয়ে দেখতেও চেষ্টা করেছি। কি আমায় দুঃখ দিচ্ছে? কি কি? হঠাৎ বিস্মিত হয়ে দেখি, দুঃখ অদৃশ্য হয়ে গেছে। দুঃখ কোথায়? দুঃখ ত নেই। দুঃখ ত আমার মনের মধ্যে। মনেরই সৃষ্টি। আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে নাশও করতে পারি। করেওছি। আর ভয় কি? আত্মপরিচয় লাভ করেই আমি শক্তি লাভ করেছি! এক অজেয় শক্তি। আত্মিক শক্তি। আধ্যাত্মিক শক্তি। এর জয়গান করতে আমি লজ্জিত নই। এর শক্তি প্রচার করতেও আমি পশ্চাদপদ নই। এমন কি তাই করবার জন্যই এই লেখা লিখতে বসেছি।

নমস্কার! হে আমার প্রিয় পাঠক! তোমাকে নমস্কার। তোমাকে ঠকাইনি। ঠকাতে চাইনি। তুমি মহাকাল। স্ত্রীপুত্রকন্যাপ্রেয়সী সব সমসাময়িক কাল। তুমি চিরকাল। তুমি যুগযুগধাবিত যাত্রী। তুমিই ত চিরসাথী। তাই তোমাকেই সন্তুষ্ট করতে চেয়েছি। আর কাউকে নয়।

দ্বিতীয় পর্ব

১৯৩২ সাল। সন্ধ্যাবেলা। পুরী স্টেশনের প্লাটফরম। পরিপূর্ণ জনতা। অশান্ত। উদগ্রীব। পুরী একস্প্রেস্ ছাড়ব ছাড়ব করছে। গাড়ীর মধ্যে একটি যুবক থর থর করে কাঁপছে। উত্তেজনায়। তার জীবন-যাত্রা শুরু হয়েছে। কর্ম-জীবন। অর্থ অন্বেষণ। ভাগ্যপরীক্ষা। পশ্চাতে পড়ে রইল যুবকটির বাল্য, কৈশোর, যৌবন। যৌবনের প্রথম উন্মেষ। ভোরের অনেক স্বপ্ন। পেছনে পড়ে রইল বিরাট অন্তহীন নীল সমুদ্র। স্তব্ধ, শান্ত দিগন্ত-বিস্তৃত।

ট্রেনের ভেতরে কম্পমান পঁচিশ বছরের যুবকটি। পরনে হাফ প্যাণ্ট, হাফ সার্ট। সে একাকী। কেউ তাকে ট্রেনে তুলে দিতে আসে নি। একান্ত একাকী। জীবন ভরই সে একাকী। সঙ্গীহীন। আজও তাই। পঁয়তাল্লিশ বছর কেটে গেছে। আজও সে তেমনই একাকী। কি সুন্দর এই একাকীত্ব। হ্যাঁ, সে একান্ত একাকী। তার মনেরও সঙ্গী কেউ নেই। অথচ তার সবই আছে। স্ত্রী পুত্র কন্যা। আত্মীয় স্বজন। প্রতিবেশী। কিন্তু সব থাকা সত্ত্বেও সে একাকী। একাকী থাকতেই সে অভ্যস্ত।

সেই পঁচিশ বছরের যুবকটি আজ সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। কাল সন্ধ্যায় সে স্ত্রীকে সত্তরে পড়েছি বলাতে স্ত্রী পরিহাস করে বলেছে—সত্তর হল? সত্তর মানে কি সত্বর? সত্বর যেতে হবে। এই কথা বলতে স্ত্রীর মনে এতটুকু দ্বিধা নেই। এই জন্যেই সে তার স্ত্রীকে এত ভালবাসে। স্পষ্টবক্তা। শিশুর মত সরল। পরিহাস করেই বলেছিল। পরিহাস করতেই চায়। কিন্তু পারে না। এমনিই অকৃত্রিম শিশু সে আজও। ষাট বছরেও। ব্যঙ্গ পরিহাস কে স্বচ্ছন্দে করতে পারে? যার মস্তিষ্ক উচ্চ কোটির। যে তার আপন শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সচেতন। এ ভদ্রমহিলা তা পারবেন কি করে?

ট্রেন চলেছে কলকাতায়। যুবকটিও চলেছে কলকাতায়। তারপর যাবে পাটনা। তারপর যাবে গঙ্গার তীরে। মহেন্দ্রু ঘাটে।

যুবকটি ভাবছে। কল্পনার চোখে দেখছে কাল সে তরতর করে নামবে অগণিত সিঁড়ি। পেছনে পেছনে নামবে স্টীলট্রাঙ্ক আর বিছানা মাথায় নীলকোর্তাপরা কুলি। গঙ্গায় ভাসমান জাহাজের কোলে এসে সে আশ্রয় নেবে। জাহাজ গম্ভীর গলায় সঙ্কেত ধ্বনি বাজিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়বে। চেয়ে চেয়ে সে দেখবে ছবির মত সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে পাটনা শহর। ঘরবাড়ী, কলেজ, কাছারী। অন্ধকার পাটনা। অতীতের পাটলীপুত্র। মৌর্যবংশের কীর্তি-স্তম্ভ। প্রাচীন মগধ। বৌদ্ধদের পীঠস্থান। বৌদ্ধবিহার। এখানেই রাজগৃহ। বৈশালী। মহাবীরের জন্মস্থান। এখানেই বুদ্ধ গয়া। বোধিবৃক্ষ মূলে ভগবান বুদ্ধের বোধিলাভ। বিহারের রাজধানী পাটনা। কি প্রচণ্ড ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ শহর। এর কাছে কলকাতার কি ঐতিহ্য? তিনশ বছর মাত্র। গঙ্গার অপর পারে জাহাজ এসে থামবে। পালেজা ঘাট। সেখান থেকে সোনপুর স্টেশন। আবার সে ট্রেনে চড়বে। নামবে ছোট একটা অকুলীন স্টেশনে। ছাপরা। সেখানে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করে থাকবে সবুজ-রঙের একটি ছোট বেবি অষ্টিন গাড়ী। পাগড়ী বাঁধা চাপরাসী। ভ্রাতুষ্পুত্রও। যাবে সে ইলিয়ট-টাঙ্কের ধারে এক বাগান-ঘেরা বাংলোয়। চারদিকে অজস্র ফুল ফোটা। সিঁড়িতে টবের পর টব সাজানো। পাতাবাহারের গাছ। পাম, ফার্ণ, অর্কিড, হলিহক্‌স্। তার পাশ দিয়ে যাবে সে এক সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে। অভ্যর্থনা পাবে এক সহাস্যবদনা গৌরাঙ্গী মহিলার। এক স্নেহশীতল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার। সে উভয়কে প্রণাম করবে। তাকেও আভূমি প্রণত হয়ে সেলাম জানাবে অপেক্ষমান চাপরাসীর দল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পেতলের তক্‌মা বুকে বিরাট পাগড়ীধারী দীর্ঘদেহা চাপরাসীরা। এখানে আসছে সে ওকালতী করতে।

এখানে থাকেন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। হেলথ্ অফিসার। সামনে

রয়েছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ট্রেন পুরী স্টেশন পার হল। যুবকটি স্বপ্ন দেখছে। চুপ করে বসে রয়েছে। ভাবছে কি হবে তাঁর ভবিষ্যৎ। যুবকটির বুক আশঙ্কায় কম্পমান। ভবিষ্যতের স্বপ্নে রঙীন। আশা-নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান। শুভ-অশুভের পরিণাম-চিন্তায় অস্থির। সালটা ছিল ১৯৩২। ইংরেজ তখনো প্রভু। দেশ তখন পরাধীন। ট্রেনে তখন একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা আলাদা করে রাখা হত ইংরেজদের জন্যে। লেখা থাকত ফর ইউরোপীয়ানস্‌ অন্‌লি। কিন্তু খাঁটি ইউরোপীয়ানরা তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করত না। আবশ্যক হত না। উচ্চ শ্রেণীর টিকিট কেনবার শক্তি তাদের থাকত। অতএব ওই কামরাটা ছিল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, নেটিভ ক্রীশ্চিয়ান আর দেশী সাহেবদের জন্যেই। কি করে বোঝা যাবে কে ইউরোপীয়ান, কে নয়? তার মাপকাঠি প্যাণ্ট। প্যাণ্ট পরা থাকলেই ইউরোপীয়ান। ফুল প্যাণ্ট হোক অথবা হাফপ্যাণ্ট। ধুতির বদলে প্যাণ্ট থাকলেই সে ইউরোপীয়ান। টিকিট-চেকার আর কিছু বলবে না। ইউরোপীয়ান থার্ড ক্লাসে ভীড় কম। অতএব অনেক ভারতীয় ইউরোপীয়ানে পরিণত হতে দ্বিধা করত না। সুবিধাবাদ নিঃসন্দেহ। কিন্তু সেকালের ভারতবর্ষে সুবিধাবাদ ছাড়া আর ছিল কি? ইংরেজ হওয়াই সকলের একমাত্র সাধনা। Macauley-র brown Englishman হয়ে যাওয়া। চাকরী করা, ইংরেজের অনুকরণ করা, আর ইংরেজদের প্রশংসা পেলে গলে যাওয়া। এই ছিল সে সময়কার প্রত্যেকেরই বাসনা।

কলকাতা থেকে পাটনা। দিল্লী এক্‌স্‌প্রেস। সারারাত্তিরে ট্রেনে কাটাতে হবে। বারো ঘণ্টার জার্নি। আবার সেই ইউরোপীয়ান থার্ড ক্লাস। পরণে প্যাণ্ট কোট।

সেপ্টেম্বর মাস। শীতের আমেজ আসছে রাত বারোটার পর। কিউল, ঝাঝা, মোকামা স্টেশন পার হয়ে গেছি।

পাটনা জংসন স্টেশন এল। স্টেশনের বাইরে এলাম। দীর্ঘকায়,

নীলকোর্তা পরা, পশ্চিমদেশীয় কুলী, ষ্টীল-ট্রাঙ্ক আর বিছানা নিয়ে বাইরে এল। পাটনা আমার অপরিচিত নয়। কতবার এসেছি গেছি তার ঠিকানা নেই। লক্ষ্ণৌয়ে পড়বার সময় পাটনাই ত ছিল আমার কলকাতা আর লক্ষ্ণৌয়ের মধ্যকার সেতু। পাটনা কলেজ কতবার চেয়ে চেয়ে দেখেছি। আমার পিতা এই কলেজেই পড়েছেন একদিন। স্টেশনের বাইরে অগণিত ফিট্‌ন। তখন ট্যাক্সি ছিল না। বাস ছিল না। সাইকেল রিক্‌সাও ছিল না। ছিল অসংখ্য এক্কা গাড়ী। জীর্ণ-শীর্ণ-কদর্য চেহারা। আজ তারা লুপ্ত। একসঙ্গে চারজন বসতে পারে। দুর্বল, অর্ধভুক্ত, ঘোড়াটি চালকের মুখের অদ্ভুত শব্দ শুনতে শুনতে নিজ জননী এবং জায়ার সম্বন্ধে নানা বিশেষণ শুনতে শুনতে ঠুকুস ঠুকুস করে চলে। একশো পা যেতে না যেতেই পিঠে বেত পড়ে। গতিবেগ সামান্য বৃদ্ধি পায়। আবার যথাপূর্বং, তথা পরং। আমার সঙ্গে ছিল মালপত্র। অতএব ফিটনেই চড়ে বসলাম। বললাম—মহেন্দ্রু ঘাট।

মাইলখানেক পথ। কলকাতার পর পাটনা। শান্ত। নিস্তব্ধ। লোকজনের ভিড় নেই। এপথ সেপথ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ফিটন এলো গঙ্গার তীরে।

মহেন্দ্রু ঘাট। সামনে প্রসারিত দিগন্ত-বিস্তৃত গঙ্গা। কুল কুল করে বয়ে চলেছে জলের স্রোত। এই গঙ্গাকে পনেরো বছর আগেও এমনি বয়ে যেতে দেখেছি। যখন দশ বছরের ছিলাম। যখন পাটনার স্কুলে পড়তাম। তেমনিই ময়লা জল। তেমনিই ওপারে সবুজ ক্ষেত। তারও ওপারে বৃক্ষ শ্রেণী। সবুজ আর সবুজ। চারদিকেই শুধু সবুজ। কলকাতার ট্রাম বাস হট্টগোলের পর কি অদ্ভুত শান্তি। কলরব নেই। কোলাহল নেই। লোকের ভিড় নেই। জীবন এখানে কত স্বচ্ছন্দ। নির্ঝঞ্ঝাট।

সামনেই গঙ্গার ওপর ভাসছে একটা বড় জাহাজ। চিমনী দিয়ে কালো ধুঁয়ো উঠছে। একটু পরে বিরাট এক হুঙ্কার ছাড়ল। ইঞ্জিন ঘর

থেকে খচ খচ করে শব্দ আসছে। এমনি জাহাজই ত বম্বে থেকে ছাড়ে। আমি ভাবতে লাগলাম আমিও যেন বিলেত চলেছি। তবে পড়তে নয়। রোজগার করতে। কর্মজীবন শুরু হচ্ছে।

জাহাজ সশব্দে ছাড়ল। ইঞ্জিন গর্জন শুরু করল। জাহাজ গতি লাভ করল। যা ছিল স্থির, তা হয়ে উঠল অস্থির। কেমন বৃহদাকার জীবন্ত জানোয়ারের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। পাটনা শহরের পাশ দিয়েই চলেছে। শহরের ঘর বাড়ী তরুলতা সব চলেছে যেন সঙ্গে সঙ্গে। দীর্ঘ পথ। কি সুন্দর লাগে নদীর ওপর দিয়ে এই আস্তে আস্তে যাওয়া। ছবির মত বড় বড় বাড়ী একটার পর একটা আসছে। বড় বড় কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ী। কলেজ। কোর্ট। গির্জা। হাসপাতাল। কি সুন্দর!

অবশেষে জাহাজ ডানদিকে ফিরল। ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। অদূরে কোলাহল মুখরিত কর্মব্যস্ত পালোজা ঘাট। জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি নীল কোর্তা কুলীর দল! সকলের এক পোষাক। সকলে প্রায় একই রকম দেখতে। প্রায় পঞ্চাশ জন। জাহাজ থামবার পূর্বেই তারা লাফিয়ে জাহাজে উঠল। কি বিরাট লম্ফ-প্রদান। কি ক্ষিপ্র গতি তাদের। কি প্রবল দুঃসাহস। কে প্রথমে মাল-সংগ্রহ করতে পারবে। তারই আপ্রাণ প্রয়াস। জীবন-যুদ্ধ। জীবিকা-সংগ্রহ। জীবিকা! জীবিকা! পেছনে রয়েছে ড্রিল সার্জেন্ট ক্ষুধা। সেই তাদের এই ক্ষিপ্র গতি দিয়েছে। দুঃসাহস দিয়েছে। কর্ম-শক্তি দিয়েছে। প্রয়াস করবার ক্ষমতা দিয়েছে।

পালোজা ঘাট থেকে ছাপরা প্রায় তিরিশ মাইল। বাস ছিল না। ট্যাক্সি ছিল না। যেতে হত সোনপুর স্টেশনে। সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ট্রেন পাওয়া যেত। পার হতে হত বাকী পথ ট্রেনেই।

সোনপুর স্টেশনে পৃথিবীর দীর্ঘতম প্লাটফরম। এখানেই হরিহর-ছত্রের মেলা। হাতী ঘোড়া থেকে আরম্ভ করে গরু, বলদ, উট, মোষ, ছাগল,

ভেড়া, গাছপালা, পাখী, জানোয়ার ইত্যাদির জগদ্বিখ্যাত মেলা।

অনেকক্ষণ পর ট্রেন এল। আবার অপেক্ষা করার পালা। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে ত দাঁড়িয়েই আছে। একবার থামলে আর ছাড়বার তাড়াই থাকে না। তখনই এই রেলপথের নাম ছিল বি, এন, ডবলিউ, আর। অর্থাৎ বেঙ্গল নর্থ ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে। ছোট লাইনের অতি শ্লথগতি ট্রেন। লক্ষ্ণৌ পাটনায় থাকা ছেলে এ কোথায় এসে পড়ল? প্রায় বিকেল নাগাদ ছাপরা স্টেশনে এসে দাঁড়ালাম। এখানেই নামতে হবে। পূর্বাহ্নে খবর দেওয়াই ছিল। প্লাটফরমে অপেক্ষা করছিল চাপরাসী কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্র। আজ সে বনহুগলীর বিখ্যাত হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। বিলাত প্র ত্যাগত ডাক্তার। কাকাকে দেখে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। চাপরাসী বিনয়ে একেবারে অবনত হয়ে সেলাম করল। এই বিনয় ইসলামিক রাজত্বের উত্তরাধিকার। নবাব বাদশাদের রাজত্বের চিহ্ন। মুসলিম কালচারের পরিত্যক্ত ছিবড়ে।

প্লাটফরমের বাইরে অপেক্ষা করছিল ছোট বেবি অষ্টিন। চড়ে বসলাম। একটু পরে এক বিরাট পুষ্করিণীর পাশে এসে পৌঁছলাম। তার পাশে কোণের দিকে উঁচু ঢিবির ওপর চমৎকার এক বাংলা। আগে ছিল সার্জেন্টের বাংলা। সেকেণ্ড গীয়ার দিতে, তবে গাড়ী চড়ল বাড়ীর বাগানে। থামল এসে বারান্দার প্রান্তে। গাড়ী থামতেই এক পাগড়ী বাঁধা চাপরাসী নীচু হয়ে সেলাম জানালো। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন হাস্যমুখী ভ্রাতৃজায়া। ভেতরে সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলাম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাস্য মুখে এসে কুশল সম্ভাষণ করলেন। উভয়কে প্রণাম করলাম। ভ্রাতুষ্পুত্রী এসে প্রণাম করল। সকলের হাসি মুখ। এক হাস্যোজ্জ্বল সুখী পরিবার।

গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়ে গেছি। এবার শুরু হবে আমার কর্ম-জীবন। এইখানেই আমার ভবিষ্যৎ। এখানে কোথাও কোন যন্ত্রণা নেই। যুগ-যন্ত্রণা এখানে অনুপস্থিত। ইংরেজ-সৃষ্ট মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সুখী

চিত্র এখানে। দুশ্চিন্তার স্থান নেই। রামায়ণের আদর্শ এখনো চলছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা এখনও পিতৃতুল্য। ভ্রাতৃজায়া সীতা-সদৃশ। সেই সুখী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমি। মধ্যবিত্তের স্বর্ণ-যুগের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা সাক্ষী।

সে স্বর্ণযুগ আমার চোখের সামনেই দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। আজ আদর্শবাদী সুখী বাঙ্গালী একান্নবর্তী পরিবার আর নেই। সব ছিন্ন ভিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মানুষ এখন স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।

এখানে আমার রোজগার করে খেতে হবে। জীবনে যা কিছু কাম্য তাই কামনা করতে হবে। জীবনে যা কিছু প্রাপ্য, তাই পেতেও হবে। তাই হোক। পুরুষকে পুরুষ হতে হবে। স্বাবলম্বী হতে হবে। জয় হোক আমার। জয় হোক আমার আত্মশক্তির।

অগ্রজের বাসাটা ছিল আগে Bihar Light Horse Infantryর Sergant-এর কোয়ার্টার। অতি চমৎকার। একটা উঁচু জায়গার ওপর তৈরী। ঠিক রেল লাইনের ধারেই। বাগান একেবারে রেল লাইনের তিন হাত কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। Sergant B. N. W. R কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিয়েই বাগান অতটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ফল হয়েছিল অতি মনোরম। বাড়ীর সামনেই অতি বৃহৎ গোলাকার সুদৃশ্য গোলাপ বাগান। অগ্রজের ছিল বাগানের সখ। প্রত্যেকটি ফুল যেন ওঁর প্রাণ। নিজের হাতে ঝারি থেকে জল দেবেন। প্রত্যেক গাছে। মালী ছিল। কুলী ছিল। ডোম মেথরের ত কথাই নেই। তবু সব নিজের হাতে করতেই হবে। বাগানের মাঝখানে একটা গোলাকার স্থানে টেবিল, চেয়ার, টুল, ডেক-চেয়ার, ইত্যাদি বিছানো। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাগানে জল ছেটানো হয়। ভৃত্য চেয়ার ইত্যাদি বিছিয়ে দেয়। পেট্রোমাক্স্ জ্বালে। একটা উঁচু তে-পায়া টেবিলের উপর রেখে দেয়। সমস্ত পরিবার সন্ধ্যা থেকে সেখানেই এসে বসে থাকে। পাকশালায় পাচক রান্না করছে। ভৃত্য

ছোট ছেলেদের খেলাচ্ছে। ভ্রাতৃজায়ার তদারকি করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। কেউ কেউ বেড়াতেও এসে থাকেন। গল্প হয়। চা পান হয়। হু হু করে বইতে থাকে উন্মুক্ত বাতাস। বাংলোর পূর্বদিকে বিরাট পুকুর। পশ্চিমে বিরাট মাঠ। তার ওপারে জিলা স্কুল ও বোর্ডিং। উত্তরে বিরাট ধানের ক্ষেত। যতদুর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ ধানের ক্ষেত। এখন সেখানেই জগদ্দম্ কলেজ। দক্ষিণ দিকে তখন ছিল সাহেবদের Mess এবং College। সারি সারি কয়েকটা ঘর। Bihar light horse infantry-র সাহেবরা কখন কখন এসে থাকতেন। মেম সাহেবরাও। এখন সেখানে তৈরী হয়েছে Power house-এর অফিস। ম্যানেজারের থাকবার কোয়ার্টার। Mess Cot নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এত সুন্দর জায়গা যে কল্পনা করা যায় না। আমার খুবই পছন্দ হল। কাব্য করবার মত জায়গাই বটে। বাংলোর উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল Strong room। এইখানে বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদি থাকত। খুব ভারী লোহার দরজা। ইংরেজ আমাদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখবার জন্যে কোন সুযোগই ছাড়ে নি। আশেপাশের ইংরেজ, স্কচ, প্লান্টারস্ অথবা চিনির কলের Chemist ও technician-রাই Bihar light horse infantry-র সভ্য হত। উত্তরের বিরাট মাঠে, চাঁদমারী হত। Bull's eye—ভেদ করা হত। পিক্‌নিক্ করা হত। সাহেব মেমদের মদ্য পান ও যুগলনৃত্যও চলতো। জিলা স্কুলের পাশে ইউরোপীয় ক্লাব। সেখানে টেনিস কোর্ট। Celler ভর্তি মদের বোতল। খানসামা বেয়ারা ইত্যাদি। আজও তাই আছে। ইংরেজরা জীবন উপভোগ করতে জানত। করেও গেছে। আজ সাহেবরা চলে গেছে। পড়ে আছে সবই। সেই ভাবেই। তবে সে জৌলুস নেই।

সাহেবদের পরিত্যক্ত এই Strong roomটিই আমার বাসস্থান নির্ধারিত হল। আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম। পশ্চিম দিকে একটি

মাত্র জানলা। সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। স্কুলের পশ্চিমে রেলওয়ে স্টেসনের Distant Signal। ইঞ্জিনের ধুঁয়ো। ট্রেনের আসা যাওয়ার দৃশ্য। সামনে দিয়ে হুস্ হুস্ করে চলে যাচ্ছে ছোট লাইনের ছোট ছোট গাড়ী। নির্দিষ্ট সময়ে। নির্দিষ্ট দিকে। আমরা গোল হয়ে বসে আছি। ট্রেন চলে যাচ্ছে আমাদের কয়েক হাত দূর দিয়ে। যাত্রীরা জানলা দিয়ে দেখছে কত সুখী এক বাঙ্গালী পরিবার। অফিসার শ্রেণীর নিশ্চয়ই। অনেকের হয়ত ঈর্ষাও হত। আমরাও দেখতাম চেয়ে চেয়ে ট্রেনের আসা যাওয়া। সবই মন্থর গতি।

এরপরে সাক্ষাৎ করতে গেলাম জজ সাহেবের বিরাট বাংলায় জজ সাহেবের সঙ্গে। জজ সাহেব পি. এল সেন। রোগা খিটখিটে মানুষ। অজীর্ণ রোগে ভুগছেন। সদাই অপ্রসন্ন। হাসতে জানেন না। কাষ্ঠ ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। বাঙ্গালী উকিলকে দেখলে প্রত্যেক বাঙ্গালী জজ মনে মনে ভয় পান। কে বুঝি দেখে ফেলল এই ঘনিষ্ঠতা। কে বুঝি চেয়ে বসল কিছু সুযোগ সুবিধা। স্বাভাবিক কেউই থাকতে পারেন না। মুনসেফ থেকে জজ-হওয়া এই বাঙ্গালী জজকেও দেখলাম। আই-সি-এস জজ সুধাংশুকুমার দাসকেও দেখলাম। যিনি পরে Supreme Court-এর জজ হয়েছিলেন। একই মনোভাব। একই ভয়। একই আত্মসঙ্কোচ। সেন মহাশয় বাঙ্গালীই ছিলেন। ইংরেজ নকল করতে করতে ইংরেজ হয়ে যান নি। তাঁর ছেলে মদনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্বও হয়েছিল। তাঁর বাড়ীতে নেমন্তন্নও খেয়েছিলাম।

বাঙ্গালীদের মধ্যে নামকরা উকিল ছিলেন হেমচন্দ্র মিত্র, রায়বাহাদুর বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (পরে দেওয়ান বাহাদুর) ও মণীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। সকলেই খুব উৎসাহ দিলেন। ওকালতির সনদ পাওয়ার জন্যে পাটনা হাইকোর্টে দরখাস্ত করলাম। কালো কোট, সাদা প্যাণ্টের অর্ডার দিলাম। গাউনও কিনে নিলাম। সংসারে আরো পাঁচজন যা চায় আমিও তখন তাইই চেয়েছিলাম। মান, সম্মান, ধন, সম্পত্তি। যা কিছু

ইহ জগতে কাম্য। সবকিছুই। স্থির করলাম ওকালতীই করব। ভাল ভাবেই করব। সাংসারিক সফলতা যাকে বলে, তাও প্রাপ্ত হবো। আমাকে সফল হতে হবে। জীবনে সফল হতে হবে।

ওকালতীতে আমার প্রথম হাতে খড়ি হয় মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর বাড়ী কাছেই ছিল। বৃহৎ দোতালা বাড়ী। তাঁর সেরেস্তায় প্রত্যহ সকালে হাজিরা দিতাম। আইন-সংক্রান্ত নানা আলোচনা করতাম। মক্কেল আসতো। মণিবাবু নামী ফৌজদারী উকিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি। অতিশয় সুবক্তা। ইংরেজী বলতেন খুব ভাল। জেরা করতেন উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালী হাকিমরা তাঁকে খুব সমীহ করতেন। অতিরিক্ত সাদাসিদে লোক ছিলেন। চাল এতটুকুও ছিল না। পুরানো সমাজ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। সংস্কৃত শাস্ত্র ইত্যাদি বিলক্ষণ পড়া। গান গাইতে পারতেন অতি চমৎকার। যেমন ভরাট গলা তেমনি রাগরাগিণীর চমৎকার জ্ঞান। অভিনয় করতে পারতেন অতি সুন্দর। তাঁর অভিনয়-ক্ষমতা দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হতাম। তিনি কবিতা লিখতে পারতেন। নাটক লিখতেও পারতেন। তাঁর লেখা "সতী" নাটক আমরা স্থানীয় মঞ্চে অভিনয় করেছিলাম। মণিবাবু হিন্দী পড়তে খুব ভাল পারতেন। উর্দুতেও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর সঙ্গে আমি তাঁর মোটরেই কাছারী যেতাম। নিত্য তাঁর ওখানে চা পান আমার বরাদ্দ।

বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কুচবিহারের লোক। ওঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিহারে সরকারী চাকরীতে ছিলেন। অতএব উনি এসেছিলেন ভাগ্য পরীক্ষা করতে এখানে। ভাগ্যলক্ষ্মী ওঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রসন্ন হাসি হেসেছিলেন। উনি লক্ষ্মীলাভে সফল হয়েছিলেন। একটি মাত্র জিনিষকে আশ্রয় করে। জিহ্বা। বাংলায় যাকে বলে তৈল-প্রদান। এই পদার্থটির সুপ্রয়োগে ইনি ইংরাজ জজ কালেক্টর থেকে আরম্ভ করে হাথুয়া মহারাজকেও বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আমার নাট্যপ্রীতি সকলের জানা ছিল। আমার অভিনয়-ক্ষমতা

সকলের দেখাও ছিল। আমার সর্ব প্রধান দুর্বলতা মঞ্চকে আশ্রয় করেই ছিল। আমি সর্বোচ্চ সম্মান মঞ্চ থেকেই প্রাপ্ত হতে পেরেছিলাম। অতএব মঞ্চ থেকে নির্বাসিত করতে পারলেই, আমাকে সবচেয়ে বেশী আঘাত করা হবে। সূক্ষ্ম আইনজ্ঞান সম্পন্ন এই ব্যক্তিটি তা বুঝতে পেরেছিলেন। অতএব একদিন নাট্যসমিতির সভা ডাকা হল। সকলেই একত্রিত হল। আমিও হলাম। একটা নাটকও মনোনীত হল। সাজাহান। অওরঙ্গজেবের ভূমিকায় আমারই নাম প্রস্তাবিত হল। কিন্তু মিটিং-এর সভাপতি বললেন—ওঁকে কোন পার্ট দেওয়া হবে না। কারণ? কারণ, প্রেসিডেন্ট হেমবাবুর আদেশ। ওঁর অপরাধ? উনি নাকি প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে অসম্মানজনক কথা বলেছেন। একথা কে বললেন—তাও আপনারা শুনতে কৌতূহলী হবেন নিশ্চয়? ডাঃ শিবদাস সুর। স্বাধীন ব্যবসায়ী এক ডাক্তার। নিজেও অভিনেতা। কথাটা কি অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই হয়েছিল।

আমার কলম ইতস্ততঃ করেছে লিখতে। তবু লিখেছি। কারণ এ প্রশ্ন ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়। জাতিগত। কর্তৃপক্ষকে পূজা যে করবে না, কর্তৃপক্ষ তাকে আঘাত করবেই। যদি মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল, যদি জানু পেতে সে ভিক্ষা চাইল, কর্তৃপক্ষ ক্ষমা করবেনই, সকলেই জানে তা। কিন্তু প্রতিপক্ষকে মস্তক অবনত করতে হবে। তবেই কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকবে। আমার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ভাবা গিয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সামান্য ভুল করেছিলেন। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁরা বারীন্দ্র-শিষ্যের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, প্রতিপক্ষ বাঁকুড়ার হরিহর মুকুজ্যের নাতি। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন এই তরুণ উকিলের প্রধান শক্তি, আত্মিক শক্তি। তাঁকে হত্যা করা যেতে পারে। তাঁকে পদানত করা যেতে পারে না।

ডাঃ সুরের মধুমাখা বাণী শুনে আমি নিঃশব্দে মিটিং ছেড়ে চলে আসি।

তাকিয়ে দেখি আমার পেছনে চারজন মিটিং ছেড়ে চলে আসছেন। আমি তাঁদের ডাকিনি। অনুরোধ করিনি। তাঁরা স্থানীয় উকিল সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শান্তিচন্দ্র ঘোষ, স্থানীয় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রামনারায়ণ রায়, স্থানীয় মুন্সেফ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। মিটিং আর চললই না। ভেঙ্গে গেল।

কয়েক বৎসর পরে আবার আমাদের সসম্মানে ডেকে আনা হল। হেমচন্দ্র মিত্রের চিরউন্নত শির অবনত হল। কিন্তু তিনি চতুর ব্যক্তি। কিল খেয়ে কিল হজম করতে জানতেন। এই ছিলেন হেমবাবু। আজ তিনি মৃত। তাঁর অসম্মান করতে আমি চাই না। নিজের বাহবাস্ফোট করবার জন্যে আমি একথা লিখছি না। কিন্তু মেরুদণ্ডের মূল্য কি তাই আমি জানাতে চাই। মেরুদণ্ডহীন জাতি পরাধীন হবেই। স্বাধীনতা ফিরে পেলেই শুধু চলবে না। মেরুদণ্ড গড়ে তুলতে হবে। মনের রূপান্তর ঘটাতে হবে। যে রূপান্তর আংশিক মাত্রায় বারীন্দ্রকুমার আমার মনের মধ্যে ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই শত দুর্যোগের মাঝেও আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইনি। যোগশক্তির দ্বারা অর্জিত আত্মশক্তির ওপরেই নির্ভর করে থাকতে পেরেছিলাম। আজও তাই আছি।

সালটা ১৯৩২। এখানে ক্লাব ছিল। লাইব্রেরী ছিল। অবৈতনিক মঞ্চ ছিল, মেয়েদের স্কুল ছিল। নিজেদের প্রশস্ত পাকা মঞ্চ ছিল। বাঙ্গালী বাংলাদেশ ছেড়ে যেখানে গেছে, সেখানেই নিয়ে গেছে তার দুর্গাপূজা আর থিয়েটর। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। এখানেও চাঞ্চল্য জেগে উঠল। পূজো আসছে। থিয়েটর করতে হবে। থিয়েটরের প্রচণ্ড উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন ডাঃ শিবদাস সুর। বাংলার বাইরেও পূজো পূজোই। বাঙ্গালীর হৈ চৈ করে ওঠার সময়। মিটিং হল। এই আমার প্রথম উপস্থিতি। যে মিটিং-এর কথা বলেছি সে মিটিং নয়। প্রথম সিটিং। বই ঠিক হল। শরৎচন্দ্রের "রমা"। তখন মেয়েদের পার্ট ছেলেরাই করত। আমি অপরিচিত। মিটিং-এ এক

পাশে চুপ করেই বসেছিলাম। ভাল অভিনেতা বলে সুনাম ছিল সুধাংশু বলে একটি ছেলের। তাকে দেওয়া হল রমেশের পার্ট। মেয়েদের পার্ট করত সুশ্রী চেহারার গৌরবর্ণ একটি পাতলা গড়নের ছেলে। ডাকনাম পেলু। তাকে দেওয়া হল রমার পার্ট। আমাকে দেওয়া হল বেণী ঘোষালের পার্ট। আমি ষ্টারে এই অভিনয় দেখেছিলাম। অহীন্দ্রবাবু করেছিলেন 'রমেশ'। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য করেছিলেন 'বেণী'। নীহারবালা 'রমা'।

চুপ করে বসে সব দেখে যেতে আর শুনে যেতে লাগলাম। নতুন এসেছি। বেশী কিছু বলা সুশোভন নয়। মনে মনে ভাবলাম যে কোন পার্টই হোক না কেন, আমি ভাল করবই। অভিনয়েরও একটা নিয়ম আছে। সেটা মেনে চললে লক্ষ্য কখনও ভ্রষ্ট হয় না। হলও তাই। আমি উত্তীর্ণ হলাম।

তখন ওখানে মেক্-আপের রহস্য ভালভাবে সকলের জানা ছিল না। আমি ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে মেক্-আপের প্রেরণা পেয়েছিলাম। দেহের পরিবর্তন, মুখশ্রীর পরিবর্তন ঘটাবার কৌশল শিখেছিলাম। Spirit gum, crepe আর কালো পেনসিলের ব্যবহার শিখেছিলাম, এখানেও "বেণীর" চমৎকার মেক্-আপ নিলাম। গোঁফ পরলাম ক্রেপের। দাঁত ফোগলা করলাম। ভুরু বানালাম। লাইন দিলাম নানা রকম। মুখের শ্রী অতি বিশ্রী করে তুললাম। এক হৃদয়হীন অত্যাচারী জমিদার। কুৎসিত গালাগালি করতে যার দ্বিধা নেই। চকচকে জুতো পায়ে পরে এক প্রজাকে লাথিও মেরেছি। সে সুদ-মাপ করবার জন্যে অনুনয় বিনয় করছে বলে। এ সীন বইয়ে ছিল না। স্টারেও দেখিনি। আমারই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কি যে ফলপ্রসূ হল। এক মিনিটে বেণীর চরিত্র যেন প্রাণ পেয়ে গেল। বেণীর দুর্দ্ধর্ষ অভিনয়ের কাছে 'রমেশ' ম্লান হয়ে গেল। প্রশংসা পেলাম যথেষ্ট। বিপিন বলে একটি ছেলে চাকরী করত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে। তাকে বুড়ো সাজালাম। বিনা ক্রেপেই। জিন্‌ক্ অক্সাইড গুলে দুই

হাতে নিয়ে তার মাথাটা থাবড়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এক বৃদ্ধে পরিণত হয়ে গেল। দু'চারটে লাইন টেনে দিতেই বার্ধক্য যেন স্থায়ী রূপ ধারণ করল তার মুখে। গ্রীনরুমে উঁকি দিতে এলেন ত্রৈলোক্যবাবু। হেমবাবুর জামাতা। তিনি ফিস্ ফিস্ করে পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ইনি কে? ইনি বিপিন শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন —হ্যাঁ মেক-আপের বাহাদুরী আছে বটে। চিনতেই পারিনি হে! আমার মেক-আপের ক্ষমতার সম্বন্ধে আমি সচেতন হলাম। আমার অভিনয় ক্ষমতার সম্বন্ধেও আমি অবহিত হলাম। নতুন দৃশ্য পরিকল্পনায়, আমার উদ্‌ভাবনী-শক্তি সম্বন্ধেও আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

আমার আর একটা ক্ষমতাও ছিল। লেখবার ক্ষমতা। একটা হাতে-লেখা মাসিক-পত্রিকা বের করা হল। তাতে লিখতে লাগলাম গল্প। সুধাংশু তার বাড়ীতে একটা লাইব্রেরী স্থাপনা করলে। 'ফাল্গুনী' লাইব্রেরী। অতি আধুনিক বই সেখানে আনানো হতে লাগল। যা কালীবাড়ীর 'সতীশ' লাইব্রেরীতে আনানো বারণ ছিল। যথা অন্নদাশঙ্করের "আগুন নিয়ে খেলা"। সে সময়কার উত্তেজনা সহজে ভোলবার নয়। তরুণরা যেন ক্ষেপে উঠল। বৃদ্ধেরা রোষ-কষায়িত লোচনে তাকাতেই লাগলেন। সকলে বলাবলি করতে লাগল বাইরে থেকে ছেলেরা এসেই সব নষ্ট করল। এদের স্রোতচাঞ্চল্যে সমাজের সব পুরানো বিশ্বাস যেন ভেঙ্গে যেতে বসেছে। বৃদ্ধেরা আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। যুবকেরা আমাকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করলেন। বিহারের এক ঘুমিয়ে থাকা শহরে আমি যেন নবীন প্রাণের মাদকতা নিয়ে এলাম। নবীন এবং প্রবীণ বলে দুটো দলের নাম তখন থেকেই শোনা যেতে লাগল।

এইবার এমন একটা জিনিসের কথা আমায় লিখতে হবে যা না লিখলে আমার কিছুই লেখা হয় না। আমার মনে হয় আমার এ লেখা কেউ পড়বে না। এ কেবল আমার আত্মসাক্ষাৎলাভের কাহিনী। সারাজীবন আমি কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে

মনে হয় বুঝি পেয়েছি। কিন্তু ভুল ভেঙ্গে যেতে দেরী হয় না। আমি বিস্মিত লোচনে নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকি। এখানে এসেও তাই হল। বন্ধু-বান্ধব কিছু জুটলো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি কয়েক পা মাত্র চলতে পারলাম। সম্পূর্ণ পথ চলতে পারলাম না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আমার দৃষ্টিভঙ্গী কোন সীমাই মানে না। স্যার পি. সি. রায়ের কাছে শিখেছিলাম বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহারের কথা। গান্ধীজির কাছে শিখেছিলাম জাতিভেদের অর্থহীনতা। বর্ত্তমান যুগে জাতিভেদ মানা আর চলে না। আমার বিজ্ঞান-শিক্ষাও আমায় শেখালো acquired characters are not inherited। তাহলে আমি নিজেকে একটা শ্রেষ্ঠতর জীব বলে কল্পনা করি কেন? ব্রাহ্মণ্যধর্ম একটা সংস্কৃতি। একটা কালচার। এই পর্যন্ত মানতে আমি প্রস্তুত। তার বেশী নয়। একদিন হয়ত এর প্রয়োজন ছিল। আজ শেষ হয়েছে। বিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব অগ্রগতির যুগে অতীতের একটা পুরাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।

আমার মনে আছে দশবছর আগে আমি স্বেচ্ছায় আমার বর্ণের অহঙ্কার পরিত্যাগ করেছিলাম। তখন কটক কলেজে পড়ি। হোস্টেলে থাকি। জলখাবার খাই মেসের একটা দোকান থেকে। একদিন খেতে বসেছি। মেসের মেথর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে খাবার থেকে কিছু তুলে নিতে বললাম। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। হাত আর বাড়ায় না। বললাম গান্ধীজির আদেশ। অস্পৃশ্যতা দূর করতেই হবে। তুমি স্পর্শ করে দাও। দেখি আমি তারপরও খেতে পারি কি না। তার মুখের সেই হাসি মেশানো কৌতুকের ভাব আজ পঞ্চাশ বছর পরেও আমি ভুলতে পারি না। একবার হাত বাড়াচ্ছে। একবার হাত টেনে নিচ্ছে। আমি ধমকে উঠলাম। অবশেষে একটা লুচি সে পাত্র থেকে তুলে নিল। আমি সেই থালা থেকে আবার খেতেও লাগলাম। মেথর বাবাজী বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল। ভাবতে

লাগল তাহলে সত্যিই অস্পৃশ্যতা দূর হল বুঝি। সেই থেকে আমার মনে দৃঢ় ধারণা হল যে জাতিভেদ দূর করতেই হবে। নইলে দেশে একজাতি কখন তৈরী হবে না। এক মন, এক প্রাণ, কখন গড়ে উঠতে পারবে না। একটা শক্তিশালী জাত কখন তৈরী হবে না। মনের এই দৃষ্টিভঙ্গীর অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতেও লাগল।

আজ আমার সেই পঞ্চাশ বছব আগেকার জীবনের দিকে কৌতূহল ভরে চেয়ে দেখছি। এর সমস্ত কিছু যদি না লিখি তাহলে কিছু লিখবার আবশ্যকতাই বা কি? আমার কিছুই নষ্ট হয়নি। মানুষের কিছুই নষ্ট হয় না। মনের অসাধ্য কিছুই নেই। পথ আপনিই চোখে পড়ে। চলতে চলতেই চলা শেখা যায়।

আজ সত্তর বৎসরে উপস্থিত হয়ে নিজের দিকে একটু চেয়ে দেখবার অবসর পাচ্ছি। এই দীর্ঘ জীবনে আমি কি পেয়েছি? পেয়েছি একটা জিনিষ। শান্তি। কোন জিনিষেই এখন আর আমি সহজে বিচলিত হই না। কি করে পেলাম এই শান্তি? আমার চেয়ে বড় আরও একটা শক্তি রয়েছে, এই ভেবে। অনেক, অনেক বড়। তার কাছে আমি কিছুই নই। সূর্যের বিস্ফোরণের ছবি দেখছি।

২৩শে জানুয়ারী ১৯২৩ আমার লাইসেন্স এসে গেল। অতএব কালো কোট, সাদা প্যাণ্ট, কালো টাই লাগিয়ে কোর্টে যেতে সুরু করলাম। বার লাইব্রেরীতে বাঙ্গালী উকিলরা একটা আলাদা ঘরে বসতেন। ছোট ঘর। বারোটা চেয়ার। একটা বড় টেবিল। নানা গল্পগুজবে সময় কেটে যেত। প্রবীণ নবীন সব একত্রেই বসতেন। হেমবাবু, বীরেনবাবু, মণিবাবু ভূপেনবাবু, পাঁচুবাবু, পটলবাবু।

এবার শ্রীমতীর কথা একটু বলি। যিনি আমার হৃদয়ে পুনর্বার দাগ কেটেছিলেন। তিনি বারীন্দ্রকুমারের এক শিষ্যার কন্যা। হৃদয়-বিনিময় পূবেই হয়েছিল। ফুল-বিনিময় হওয়াটাই বাকী ছিল। তাঁর জননী খড়দা স্কুলের শিক্ষিকা, সেখানেই পড়ছিল। তাঁকে কলকাতায় এনে হোষ্টেলে রেখে পড়াবার বাসনা হল। বারীন্দ্রকুমার

অনুমোদন করলেন। আমায় যেতে লিখলেন। কলকাতা গেলাম। তাকে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন স্কুলে ভর্তি করে এলাম। সেখানকার হোষ্টেলে থাকবার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। ভাবলাম আইন ব্যবসায়ে আর একটু স্থিতি হোক। দাম্পত্য জীবন আর একটু বিলম্বে শুরু করলেই চলবে। ফিরে এলাম ছাপরা। হৃদয়ে অসীম আনন্দ। কর্মে প্রবল উৎসাহ। ওকালতী এবং সাহিত্য পাশাপাশি চলতে লাগল। নিত্য কোর্টে যাচ্ছি। অর্থ পাই অথবা না পাই কোন পার্থক্যই নেই। অন্নচিন্তা ভয়ঙ্করী নয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন। খাওয়া পরা থাকার ব্যবস্থা তাঁর ওপর।

আমার প্রণয় কাহিনী দাদা-বৌদি অবগত ছিলেনই। এমন কি কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও মাঝে মাঝে করতেন। নতুবা ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের স্কুল-খরচ ও হোস্টেল-খরচ মেটানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁরা কলকাতা যেতে বাধা দিলেন না। কাউকে যদি ভালবেসেই থাকে, কি আর করা যাবে, তাকেই যদি বিয়ে করতে চায়, উপায় কি? অসবর্ণ বিবাহ সমাজ-অনুমোদিত নয়। কিন্তু আধুনিক ছেলেদের মনের রহস্য কে বুঝতে পারে? বড় হয়েছে, শিক্ষা সমাপ্ত করেছে, পেশায় যোগ দিয়েছে, বলবার কি আছে।

আমি অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি আমার মায়ের কথা। কত উদার ছিল তাঁর মন। আজ থেকে প্রায় একশো বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেও তিনি কি করে সত্যের সঙ্গে অত পরিচিতা হতে পেরেছিলেন? আর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া? কত ক্ষণভঙ্গুর ছিল তাঁদের মন। তাঁরা জানতেন সব কথাই। এমন কি বিবাহ করার সম্ভাবনাও তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না। অস্ফুট অনুমোদনও ছিল। কিন্তু যেই আমি বিবাহ করে সস্ত্রীক তাঁর বাসায় ফিরে এলাম, ভিন্ন দুই ব্যক্তিকে দেখলাম। দেখলাম, ইতিমধ্যে তাঁদের মনের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমাদের গ্রহণ করলেন বটে। কিন্তু ভ্রাতৃজায়া করুণকণ্ঠে একথা জানাতেও দ্বিধা করলেন না যে এখানকার

বাঙ্গালীরা বলেছেন আপনাদেরও বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে ঘরে। সে কথাটাও মনে রাখবেন। অসামাজিক ব্যক্তিকে গৃহে স্থান দেওয়া আর অসামাজিক কাজ করা একই কথা। ফল ভুগতেই হবে। কি হৃদয়হীন ভীতি প্রদর্শন। সেদিনকার সমাজ এই ছিল। ভ্রাতৃজায়ার অনুচ্চারিত ইঙ্গিতটা বুঝলাম। বুঝলাম, এখানে আর স্থান নেই। অমৃত গরলে পরিণত হয়েছে। অতএব পত্রপাঠ বিদায় গ্রহণের ব্যবস্থায় নিযুক্ত হলাম। পরদিনই অন্য বাড়ীতে চলে গেলাম।

সেই থেকে আমি স্বাধীন, স্বতন্ত্র, আত্মনির্ভরশীল। আজও জীবনতরী নিজ বাহু বলেই বেয়ে নিয়ে চলেছি। সেদিন দেখেছি সবই প্রতিকূল। আজ দেখছি কিছুই প্রতিকূল ছিল না। সবই আমার দেখার ভুল ছিল। আজ দেখছি সবই অনুকূল। ইতিমধ্যে আমার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে।

নতুন ছোট বাড়া। তিনটি ঘর। রান্নাঘর। ভাঁড়ার ঘর। উঠোন। পাইখানা। স্বতন্ত্র বাথরুম রাখার প্রয়োজন বিহারী বাড়ীওয়ালা বোঝেনি। তিনি অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের দারোগা। দীর্ঘকায়। স্বল্প-ভাষী। ব্রাহ্মণ। মাসে মাসে শুধু ভাড়া নিতে আসতেন। ভাড়াটি নিয়ে চলে যেতেন। আমিও বাঁচতাম। তিনি কম কথা বলতেন। আমিও বেশি কথা বলার আগ্রহ দেখাতাম না।

নব-পরিণীতা স্ত্রী। সদ্য-বিবাহিত স্বামী। উভয়ে পুরাতন আবাসস্থল থেকে বিতাড়িত। সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত। ঘোরতর পাপী সন্দেহ নেই। মুনি-ঋষিদের স্থাপিত যুগ-যুগান্তরে পুরাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম ভঙ্গ করেছে। আমার কি নরকেও স্থান আছে? নেই। কি লাভ করেছি এই কাজ করে? একটি পয়সাও নয়। স্ত্রীর বেনারসীও নেই। গহনাও নেই। হাত খালি। গলা খালি। নাক খালি, কান খালি। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও আমার কোন কষ্ট হত না। স্ত্রীরও হত না। আমরা এসব তুচ্ছ জিনিসকে গ্রাহ্যই করতাম না।

কিন্তু একদিন কি একটা উপলক্ষ্যে স্থানীয় কালীবাড়ীতে কি একটা

অভিনয় দেখতে উভয়েই গেছি। তিনি মেয়েদের ভেতর বসেছেন। কি একটা প্রয়োজনে তাঁকে খুঁজতে গিয়ে আর খুঁজে পাই না। ঘোমটা এতদূর টেনেছেন যে কান পর্যন্ত ঢাকা। গলা পর্যন্ত ঢাকা, হাত পর্যন্ত ঢাকা। আমাকে দেখে তিনি চিনতে পারলেন বটে। হাসিমুখে চেয়ে দেখলেনও বটে। মিষ্টকণ্ঠে কথা বললেনও বটে। কিন্তু আমার পিঠে কে যেন সপাং করে চাবুক মারল। বললেন, এভাবে সালঙ্কারা স্ত্রীদের মধ্যে অলঙ্কারহীনা স্ত্রীকে বসিয়ে রাখবার তোমার কোন অধিকার নেই। কিন্তু তখন আমিও অসহায়। কিছুই করতে পারি না। কোন রকমে বাড়ীভাড়া দিয়ে, ঠিকে ঝিয়ের মাইনে দিয়ে, দু'বেলা দু'মুঠো আহার্যের সংস্থান করতে পেরে, নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। কোন পাওনাদার তাগাদা দিচ্ছে না। উদর অসম্পূর্ণ থাকছে না। আর কি চাই ?

কাছেই নদীর তীর। বহুদূর বিস্তৃত বালুকা রাশি। তারও অনেক পরে নদী। আমরা দু'জনে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যে এই নদীর তীরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে চোখ ক্ষয়ে গেল। কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। কারও আসবারও প্রয়োজন নেই। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল হুস হুস করে। আমরা দুই প্রেমিক-প্রেমিকা তখন স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত। অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করছি। গুরুজনের কটাক্ষ নেই। শ্বশুর-শাশুড়ী দেওর-ননদ কেউ নেই। স্ত্রী একাকিনী। দু'বেলা রান্না করে। ঘর পরিষ্কার রাখে। কোর্ট থেকে ফিরবার সময় আসন্ন হলে পথের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে। যেদিন দুটো টাকাও পেতাম, সেদিন ঘরে ঢুকবার সময় একটু শব্দ না তুলে ছাড়তাম না। টাকার শব্দ। আহা! কি মধুর। স্ত্রীর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমার স্ত্রী হয়ে তার কি দুর্গতি। যেদিন শব্দ তুলতে পারতাম না, সেদিনও কিন্তু তার মুখে হাসি ফুটতে দেরী হত না। তবে সেটা হত চেষ্টাকৃত হাসি। স্বতঃস্ফূর্ত নয়। আমি বুঝতে পারতাম। একটা নিশ্বাস

চেপে নিতাম। এছাড়া আর কি করতে পারতাম ?

মানুষ সব ভোলে, ভোলে না আন্তরিকতা। আজ তেতাল্লিশ বছর পরে সব ভুলেছি। ভুলতে পারিনি এক 'ঘাটবাবু'র কথা। 'ঘাটবাবু' বলেই তিনি পরিচিত। বাঙ্গালী ভদ্রলোক। নদীর কিনারায় একটা ছোট বাড়ীতে সপরিবারে থাকেন। তাঁর স্ত্রী আমাদের কথা হয়তো কারো কাছে শুনে থাকবেন। আমাদের নিত্য নদীর ধারের বালুর চরে ঘুরে বেড়াতে হয়ত দেখেন। হয়ত মনে দয়া হয়। ভাবেন আহাঃ একা একা দুজনে সকাল সন্ধ্যা নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়। সমাজ এদের পরিত্যাগ করেছে। একদিন এদের কিছু ভোজন করালে কেমন হয় ? আমাদের কাছে প্রস্তাব করলেন, আমরা অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—কি বলছেন কি ! আমরা যে—আমরা যে—। ঘাটবাবু বললেন—আমি গ্রাহ্য করি না কাউকে। ঘাটের ধারে থাকি। জাহাজ এসে লাগে। মাল ছাড়ানো দেখি। মাল তোলা দেখি। সমাজের ধার ধারি না। আপনারা আজ রাত্রে আমার ওখানে খেলে খুশি হব। আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। সমাজের বাইরের এই লোকটির কাছে পাওয়া সম্মান। অযাচিত। মানুষ সব ভোলে, সম্মান পাওয়া ভোলে না।

আমার এই দীর্ঘ সত্তর বছর বয়সে অনেক কিছুই দেখলাম। কিন্তু মায়ের মত অপূর্ব জিনিষ আর কিছু দেখলাম না। মা যেমন পুত্রের ব্যথা বুঝতে পারেন, পুত্রও পারে না তা নিজে। সমাজ আমার বিপক্ষে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়া, আমার বিপক্ষে! আমায় অ্যালিউ-মিনিয়ামের ছোট ছোট হাঁড়ি কড়াই কিনে রান্না করতে হল। এনামেলের থালায় খাওয়া সাঙ্গ করতে হল। সবই হাসিমুখে করে যাচ্ছি। আমি সমাজকে আঘাত করেছি। সমাজ আমায় আঘাত করবে না কেন ?

মাতাঠাকুরানীকে পত্র দিয়েছি। বিবাহ করার সংবাদ দিয়েছি। আলাদা বাসা করার খবরও দিয়েছি। মাতাঠাকুরানী প্রত্যুত্তরে শুধু

একটি কথা লিখলেন। তুমি বিবাহ করে আমার কাছে এলে না কেন? নতুন বৌকে আমি বরণ করে ঘরে তুলতাম। দেখতাম আমায় কে একঘরে করে? গোঁসাই শিষ্যাকে একঘরে করতে পারে কে? কার এত বড় শক্তি? চিঠি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম না জানি কত তিরস্কার ভৎর্সনা শুনব। কিন্তু পবিবর্তে কি দেখলাম? দেখলাম জননীর হৃদয়। কত উদার। শরৎবাবুর কথা মনে করে মনে মনে হাসলাম। তিনি আমায় এইরকম বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন। এতে নাকি আমার জননীর হৃদয়ে ব্যথা লাগবে। হায় উপন্যাস-সম্রাট! জননীর হৃদয়ের রহস্য তুমি কতটুকু জানো। মাতৃস্নেহ যে অপরাধের মহাসমুদ্র এক গণ্ডূষে পান করে নিতে পারে। চিঠির উপসংহার করেছেন এই লিখে—"আমার দুঃখ হচ্ছে তুমি বিবাহ করেছো বলে নয়। তোমার বিবাহ কেউ জানতে পারল না বলে।"

চিঠিখানা রেখে সামনের দিকে চেয়ে রইলাম। এ দুঃখ সত্যিই আমার মনে জাগে নি। কিন্তু জননীর মনে জেগেছে।

১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৪। হঠাৎ দুপুরবেলা ছাপরা শহর কেঁপে উঠল ভূমিকম্পের দোলায়। সে কি দোলা! কল্পনা করা যায় না। যা কিছু ছিল অচল অটল স্থির। তা যেন থর থর করে কেঁপে উঠল। আমি তখন কোর্টে। সেকেণ্ড সাবজজের কোর্টে। সাক্ষীর কাঠগড়ায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছি। কার সঙ্গে যেন কথা বলছি। এজলাসে হাকিম নেই। টিফিন হয়েছে। হঠাৎ কাঠগড়ার কাঠ তীব্রবেগে নড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতও। তাকিয়ে দেখি সামনের দোতালা বাড়ীটাও থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে। দেওয়াল ফেটে যাচ্ছে চড়চড় করে। বিকট একটা শব্দ আসছে শোঁ শোঁ করে। যেন প্রবল ঝড় উঠেছে। পাখীরা গাছে গাছে চেঁচিয়ে উঠেছে। গরু বাছুর ভয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম। পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে। পা কিছুতেই স্থির রাখতে

পারছি না। শরীরও দুলে দুলে উঠছে। প্রত্যেকটি লোকের মুখে ভয়ের চিহ্ন। মুসলমানরা "কেয়ামৎ" "কেয়ামৎ" করে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল। হিন্দুরা "জয় রাম সীয়ারাম" বলে চেঁচাতে লাগল। একটু পরে পৃথিবী আবার স্থির হল। এই হল ভূমিকম্প। সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট বন্ধ হয়ে গেল। যে যার বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগল। না জানি সেখানে গিয়ে কি দেখবে। সে কি ভয়! সে কি অজানার আশঙ্কা। বর্ণনা করা যায় না।

আমিও বাড়ীর দিকে ছুটে গেলাম। পথে দেখি সকলে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। সবাই ভীত। সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। এক মিনিট একি কাণ্ড হয়ে গেল। ভগবান এত নির্দয় কেন? হঠাৎ অমন রুদ্র মূর্তি ধরলেন কেন?

তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম স্ত্রী অক্ষত দেহে বিদ্যমানা। উঠোনে বেরিয়ে পড়েছিলেন। দক্ষিণ দিকের দোতালা বাড়ীটা দেখিয়ে দিলেন। ওটা নাকি সজোরে কাঁপছিল। তাকিয়ে দেখলাম, ফালা ফালা করে ফেটে রয়েছে দেওয়ালটা। পাড়াপড়শীর খবর নিতে লাগলাম। প্রাণ যায় নি কারুর। বাড়ী ভেঙ্গে পড়েনি কারুর মাথায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাড়ী গেলাম। সেখানেও কোন ক্ষতি হয় নি। তবে পুরানো বাড়ী নিরাপদ নয় আর। তাঁরা হেমবাবুর বাড়ীর কম্পাউণ্ডে তাঁবু খাটিয়ে থাকা স্থির করেছেন। এমন কি যাবার আয়োজনেই ব্যস্ত। ভূমিকম্প একবার আরম্ভ হলে দ্বিতীয় তৃতীয়বারও নাকি হয়ে থাকে। এখানে থাকা আর নয়। কখন কি হয়ে যেতে পারে। অতঃপর কয়েক দিন ধরে চলল শুধু ভয় আর ভয়। কখন আবার দ্বিতীয় ঝাঁকানি দেয়। রাত্রে পাশের বাড়ীর বাঙ্গালী পরিবার উমাশঙ্কর মিত্ররা শুতে এলেন আমার এখানে! আমার ছিল নতুন বাড়ী। অতএব বেশী নিরাপদ। কয়েকদিন রাত্রে লোকে আর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারে না। ভয়ে ভয়ে রাত কাটায়। সদা সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। একটু দোলানি খেলেই যেন রাস্তায়

বেরিয়ে পড়তে পারে। কয়েকদিন পরে এমন হাস্যাস্পদ অবস্থা হল যে বার-লাইব্রেরীর বিরাট হলে বাসা করে থাকা পায়রাদের মধ্যে সামান্য একটু ঝগড়া শুরু হল। আর ভয়ে সমস্ত বার-লাইব্রেরী খালি হয়ে গেল। এই বুঝি আবার ভূমিকম্প শুরু হল। আজ হাসি পাচ্ছে বটে, এই কথা লিখতে গিয়ে। কিন্তু সেদিনের জনসাধারণের মনের অবস্থা বোঝাতে এর চেয়ে ভাল উদাহরণ আর খুঁজে পাচ্ছি না। সবাই যেন অষ্টপ্রহর ভূত দেখতে লাগল। ভূমিকম্পের ভূত! মানুষ কত অসহায়! প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে কত ক্ষুদ্র।

মানুষ যদি ভবিষ্যৎ দেখতে পারত? তবে অন্ততঃ পক্ষে যদি কল্পনাও করতে পারত? আজ সেদিনকার সেই অসহায় শিশুটি বিয়াল্লিশ বছর পরে এক বিরাট মহীরূপে পরিণত হয়েছে। আমি বিদেশে পড়ে আছি। সে কলকাতায় চাকরীতে নিযুক্ত। আমি আজও জীবিকা অর্জনের কার্য্যে নিযুক্ত। নিজ গৃহ নির্মাণ করতে পারিনি। যে বাড়ীতে আমি ভাড়াটে সে বাড়ীর মালিকের সঙ্গে আমার মোকদ্দমা চলছে। আমি চিন্তিত। কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। পুত্র নিজের জননীর কাছ থেকে সামান্য ইঙ্গিত পেল সে আমায় অভয় দিয়ে লিখল বাড়ীটা কেনো। আমি টাকা দেব।

আমি কি সেদিনের সেই ক্রন্দনশীল শিশুটিকে দেখে স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম এই অসহায় শিশু একদিন আমার এত বড় হয়ে উঠবে। মানুষ ভবিষ্যৎ জানে না। তাই নির্ভর করতে পারে না। একটা শক্তি আছে। যে ওই শিশুটিকে ক্ষমতাশালী করে তুলল। যে তাকে পিতামাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ করে তুলল। পৃথিবী একটা অসুন্দর। যুক্তিহীন, পীড়াদায়ক জায়গা মাত্রই নয়। এখানে অনেক সৌন্দর্য আছে। তবে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করার শক্তি থাকা চাই।

এখানকার পারিপার্শ্বিকে আমি ক্রমশঃ অপরিতৃপ্ত হতে লাগলাম। আরো বৃহত্তর ক্ষেত্র চাই। আত্মপ্রকাশের আরও বৃহত্তর ক্ষেত্র। কলকাতা আমায় ডাকছে। আমি বিহারের এক ক্ষুদ্র শহরে জীবিকা

অর্জনের চেষ্টা করতে করতে শেষ হয়ে যেতে পারি না।

অতএব কলকাতা গেলাম। মঞ্চের চেয়ে সিনেমার দিকে আকর্ষণ বেশী। দেবকী বোসের ঠিকানা জোগাড় করলাম। পাঁচ নম্বর সর্দার শঙ্কর রোড। একদিন গিয়ে উপস্থিত হলাম। আত্মপরিচয় দিলাম। ধীরেন গাঙ্গুলীর British Dominions Films Ltd-এর কথা বললাম। তিনি কৌতূহলী হয়ে শুনলেন। তাঁর ভীমসিংহের ভূমিকা অভিনয়ের কথা বললাম। নীতিন বোসের কথা বললাম। ৪০ নম্বর দমদম রোডের ষ্টুডিওর কথা বললাম। Flames of Flesh-এর কথা বললাম। তিনি ক্রমশঃ অবাক থেকে অবাকতর হতে লাগলেন। চা খাওয়ালেন। ডালমুট খাওয়ালেন। আমায় সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। সেই ফিল্ম কোম্পানী-র আমি ছিলাম প্রোমোটার। এখন বিদেশে ওকালতী করে খাচ্ছি। শুনে তিনি হেসে বললেন—আশ্চর্য !

দেবকী বোস লোকটি ছিলেন শ্যামবর্ণ। উজ্জ্বল চোখ। পাতলা গড়নের। তিনি তখন নিউ থিয়েটারস্-এর তরফ থেকে বি. এন. সরকার-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন একটা ফিল্ম পরিচালনা করতে। ছয় মাসের জন্যে। পনেরো হাজার টাকায়। নাম "বিদ্যাপতি"। একটা নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—অনুরাধা। নজরুলের লেখা থেকে চরিত্রটার ইঙ্গিত পেয়েছেন। অনুরাধা সেজেছেন কাননবালা। তখনো তাঁর তেমন নাম হয় নি। কিন্তু দেবকীবাবু বললেন—এবার তাঁর নাম হবে। কথায় কথায় বললাম—তাঁর 'সোনার সংসার' দেখেছি। খুব ভাল লেগেছে।

দেবকীবাবু বললেন—অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। বেকার যুবকদের চরিত্র পরিকল্পনা নিয়ে। বাংলা দেশের বেকার যুবকদের নাকি ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

বললাম—ঠিক উল্টো। চার্লি চ্যাপলিনও ত ব্যঙ্গ চরিত্র। কিন্তু মানবিক আবেদনে কতদূর অন্তর স্পর্শ করে ? এই চরিত্রগুলিও করেছে।

দেবকীবাবু বললেন—এ বিষয়ে যদি কিছু লিখতে পারেন, ছাপাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

রাজী হলাম। ফিরে এসে একটা প্রবন্ধ লিখলাম ইংরিজীতে। The six unemployed characters in "Sonar Sansar". "Deepali" 1936-এর December সংখ্যায় বেরিয়েছিল। পড়ে আনন্দ পেলাম। আবার কলকাতা গেলাম। দেবকীবাবু খুব প্রশংসা করলেন লেখাটার। একটা ছোট এক "রিলার" লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। দেবকীবাবু মন দিয়ে শুনলেন। ভাল বললেন। শেষটা আর একটু বাড়াতে বললেন। শুধু মুখেই বললেন না। নিজেই খচ্ খচ্ করে লিখে যেতে লাগলেন। সে লেখা অনেকদিন আমার কাছে পড়েছিল। studio-তে যেতে বললেন। যামিনী মিত্তিরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বি. এন সরকারের সঙ্গেও। script দিলাম। বিচারাধীন রইল।

দেবকীবাবু নিউ থিয়েটারসের এক নম্বর ষ্টুডিওতে যেতে বললেন। সে অভিজ্ঞতা আমি সহজে ভুলব না। ষ্টুডিও? এই ফিল্ম ষ্টুডিও? এ যে বিরাট এক বাগানবাড়ী। দোতালা বাড়ী। ডিরেক্টরদের আলাদা আলাদা ঘর। দোতালায়। পাশে Sound-Studio। দেবকীবাবুর পাশের ঘরে ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। দেবকীবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাই কি না? বললাম—অতি অবশ্যই চাই। এখানকার সব কিছুই জানতে চাই।

দেবকীবাবু প্রমথেশ বড়ুয়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রমথেশ বড়ুয়া ছিলেন রাজার ছেলে। গৌরীপুরের রাজা। তাঁর ঘরে গিয়েই সেটা বুঝতে পারলাম। আসবাবপত্র সব দামী দামী। বুঝলাম, সব তাঁর নিজস্ব জিনিষই। তিনি বাঙ্গলা চমৎকার বলেন। যদিও আসামের অধিবাসী। চেহারা হলুদ রঙের। বড় বড় চোখ। মাথায় একটু খাটো। পরণে বিলাতী পোষাক। দেবকীবাবু স্টুডিওতে যেতেন ধুতি এবং পাঞ্জাবী পরে। একমাত্র

তাঁকেই দেখেছি স্বদেশী পোষাকে। আর কাউকে নয়। প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে কথার পর কথা বলে চললাম। তিনি চুপ করে শুনে যেতে লাগলেন। আমি বক্তা তিনি শ্রোতা। তবে আগ্রহী শ্রোতা। বললাম—আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের প্রথম প্রবেশের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক চিত্র আপনারা ফিল্মে আনেন না কেন? তিনি ব্যাখ্যা করতে বললেন। বললাম—ধরুন একটা গ্রামে উড়ো জাহাজ এসে নামল। এই প্রথম এল। গ্রামবাসীদের এই অদ্ভুত যন্ত্রটিকে আশ্চর্য হয়ে দেখা কি ফিল্মে দেখানো যেতে পারে না? চলমান ট্রেন, ভাসমান জাহাজ, কি ছবিতে দেখানো যেতে পারে না? মাইক্রোসকোপ, টেলিফোন, কি কৌতূহল উদ্রেক করবে না? তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে যেতে লাগলেন। তাঁর শোনার আগ্রহ আমায় উৎসাহিত করতে লাগল।

এক কোণে একটা আয়না ছিল। তবে লুকোনোই ছিল। তিনি আমার কথা শুনছেন, আর আয়নায় নিজের মুখ দেখছেন। আমি কৌতূহলী হয়ে সেইদিকে তাকাতেই আয়নাটা দেখতে পেলাম। যা এতক্ষণ অপ্রকাশ্যই ছিল। বুঝলাম তিনি জাত-অভিনেতা। আয়না ছাড়া থাকতে পারেন না। ক্রমাগত নিজের মুখভঙ্গি লক্ষ্য করেন আয়নায়। অভিনেতাদের একাজ করতেই হবে। নইলে তাদের নিষ্কৃতি নেই। নইলে তারা অভিনেতাই নয়।

অনেক বছর পরে শিশির ভাদুড়ীকেও এই কাজ করতে দেখেছিলাম। হোটেলে আমার ঘরে এসেছেন। সামনে রয়েছে ড্রেসিং টেবলের ওপরে আয়না। তিনি খাটে বসেছেন। ক্রমাগত আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের মুখ দেখছেন। প্রত্যেক অভিনেতারই আছে এই দুর্বলতা। আত্মপ্রীতি। narcisism শিল্পী আত্মপ্রেমে আত্মহারা। ego-centric।

একটু পরে প্রমথেশবাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন। দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তারপর নীচে

নেমে গেলেন। আমি চেয়ে চেয়ে তাঁকে দেখতে লাগলাম। এক রাজপুত্র, ভারতবর্ষের এক ষ্টুডিয়োতে। যে কোন নতুন চিন্তা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করছেন। বুঝতে পারলাম ফিল্মজগতে দাগ রেখে যাবার ক্ষমতা এ ব্যক্তির আছে। কারণ, তাঁর আছে শিল্প প্রীতি ও মানব প্রেম। আমায় বললেন এ সম্বন্ধে আরও চিন্তা করতে, পরে তাঁকে জানাতে।

দেবকীবাবুর সঙ্গে ষ্টুডিওর মিউজিক রুম-এ গেলাম। সেও এক অভিজ্ঞতা। সেখানে কাননবালা ও লীলা দেশাই এক পাশে বসে। কানাকেষ্ট, পাহাড়ী সান্যাল, আর এক পাশে। রাইচাঁদ বড়াল মিউজিক ডাইরেক্টর। তিনিও আছেন। অনেক যন্ত্রী বসে আছেন। মাটিতে ফরাসের ওপরে সকলেই বসে। দেবকীবাবুও মাটিতেই বসলেন। গান হচ্ছে, বাজনা বাজছে? চুপ করে চোখ বুজে দেবকীবাবু শুনছেন। আমি একপাশে একটা চেয়ারে বসে। বার বার একটা লাইনই গাওয়া হচ্ছে। দেবকীবাবু শুনছেন। আবার আর একটা লাইন সুরু হল। এমনি করে গানটার রিহার্সাল চলতে লাগল। দেবকীবাবু কখন 'হ্যাঁ' বলছেন। কখন 'না' বলছেন। বসে বসে আর মধুর বিদ্যাপতির গান শুনতে শুনতে, আমার ঘুম পেয়ে গেল। সত্যিই একঘণ্টা যেন অভিভূত হয়ে শুনলাম। আচ্ছন্ন হয়ে শুনলাম। বুঝলাম কত কষ্টে সিনেমার গানের একটা একটা লাইন তৈরী হয়; আর দর্শকদের সেটা শুনতে কত অল্প সময় লাগে।

পাহাড়ী সান্যালের সঙ্গেও কথা হল। অসিত হালদারের "বাঁশীর ডাক" নাটকে তাঁর সঙ্গে অভিনয়ের কথাও বললাম। তিনি শুনে খুসি হলেন, আশ্চর্যও হলেন। পাহাড়ীবাবুর চেহারা আরো সুন্দর হয়েছে। স্নো-পাউডার চর্চিত মুখ আরো দেখবার মত হয়েছে, পাতলা ধুতি পাঞ্জাবী পরে রীতিমত বাঙ্গালী হয়েছেন, ইস্‌লামী সভ্যতার ছাপ ফিকে হয়ে এসেছে, লক্ষ্ণৌয়ে দাগটা খুব দগ্‌দগে ছিল। লক্ষ্ণৌয়ের বওয়াটে ছেলে, অবশেষে স্থান পেয়েছেন কলকাতার

অভিজাত স্টুডিয়োতে। এখন নামী সম্মানিত শিল্পী। আমার আনন্দ হবার কথাই। অনেক গল্প হল তাঁর সঙ্গে। প্রায়ই স্টুডিয়োতে যেতে লাগলাম। পৃথ্বীরাজ কাপুরের সঙ্গে আলাপ হল। পৃথ্বীরাজ চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরাজীতে অনেক কথা বললেন, তিনিও নাকি আইনের ছাত্র ছিলেন। Intermediate পাশও নাকি করেছিলেন। তারপর হকি খেলতে কলকাতায় এসেই বিপদে পড়ে গেলেন। ডাক এলো। প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। আইনের কি ভবিষ্যৎ আছে? স্টুডিয়োতে ঢুকে পড়লেন। তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ চেহারাই, তাঁর বিশাল বক্ষস্থল ও সিংহের মত ক্ষীণ কটিই, এর জন্যে দায়ী। মেদবর্জিত, গালে খাঁজ পড়া মুখ। সত্যিকারের স্পোর্টসম্যানের মত চেহারা, কলকাতায় এসে বাংলা বলতে শিখেই ইনি নিজের সর্বনাশ করলেন। আয়াসী হয়ে পড়লেন, ভাত খেতে খেতে ভেতো বাঙ্গালী হয়ে গেলেন। সে পেশোয়ারী চেহারা কোথায় চলে গেল। চর্বি জমতে লাগল পেটে। দেহ স্থূল হয়ে উঠল, তিনি যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন পরণে ছিল টেনিস খেলার পোষাক, সাদা হাফ প্যান্ট, সাদা সার্ট সাদা মোজা, সাদা জুতো, হাতে টেনিস র‍্যাকেট। একটু পরে লীলা দেশাইয়ের সঙ্গে স্টুডিওর টেনিস কোর্টে চলে গেলেন। ইনি ১৯৬৯ সালে পদ্মভূষণ হন, মারা যান ২৯শে মে ১৯৭২, সঙ্গীত নাটক আকাদমীর ফেলো হন, আট বৎসর রাজ্য সভার মেম্বর ছিলেন। পেশওয়ারের লোক।

আমি তাঁর সেই টেনিস খেলায় পোষাকে সজ্জিত চেহারা মনে করি আর আজকের পৃথ্বীরাজের চেহারা দেখে অবাক হই। আকবরের চেহারায় তাঁর 'মোগলে আজমের' রূপ দেখি আর মনে মনে হাসি। এঁর দুর্গতির কি শেষ আছে? ইনি হলেন কিনা পার্লামেন্টের সভ্য? রাজ্য সভার মনোনীত সভ্য? একদিন নাকি এক অসফল বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির যে সাপে-নেউলের সম্পর্ক তা

কি এর জানা ছিল না? দিব্যি হিন্দী থিয়েটর সুরু করেছিলেন। আরো অগ্রসর হলে একটা স্থায়ী নাম থাকত। চলচ্চিত্র শিল্প কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অন্ততঃ সে নিয়ে তর্ক চলে। তিনি শুধু মাত্র একটা নাম হয়েই রইলেন। একটা শিল্পী পরিবারের পূর্ব পুরুষ। তার বেশী আর কিছুই না। তাঁকে স্রষ্টা বলে অভিবাদন করব কি দেখে? তিন পুরুষে মিলে এক সঙ্গে ফিল্মে নামলেই কি বড় শিল্পী হওয়া হয়ে গেল?

তখন 'দিদি'র স্যুটিং চলছিল। নীতিন বোসের পরিচালনা। বি-এন সরকার অতিশয় ভদ্র-মানুষ ছিলেন। প্রিমিয়ার 'শো'তে যেতে পাশ দিয়ে দিলেন। প্রথম 'শো'তে দর্শক ছিল আর্টিষ্টরা আর টেকনিশিয়ানরা। পঙ্কজ মল্লিকও ছিলেন। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বি. এন. সরকার যে একদিনকার ল' মেম্বার এন এন সরকারের ছেলে, তা কিছুতেই ভোলা যায় না। গৌরবর্ণ চেহারা। স্থূল গঠন। বেশ সুখেই যে মানুষ হয়েছেন তা দেখলেই বোঝা যায়। তিনি নিজে কিছু করেন না। কিন্তু অপরকে কাজে লাগাতে জানেন। অপরের কোন কাজে নাক গলাতেও যান না। নিজে কাউকে বাধাও দেন না। তিনি কথা বলার আর্ট জানেন। অপ্রিয় কথা কেমন করে বলতে হয় তা তিনি যেন জানেনই না। তাঁর যা কিছু কাজ সবই অপরের মারফৎ। ভাল কাজও। মন্দ কাজও। আমার স্ক্রিপ্ট কাজে লাগাতে পারবেন কিনা তা নিজে মুখে বলতে পারবেন না। যামিনী মিত্তিরকে দিয়ে বলাবেন। ইনি কখন স্টুডিও চালাতে পারেন? ভদ্র ব্যবহার আর মিহি কথা ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই। ইনি জোগাড় করেছিলেন অমর মল্লিককে। পি-এন-রায়কে। সায়গলকে। পাহাড়ী সান্যালকে। পঙ্কজ মল্লিককে। সকলে নাম করল তাঁর নিউ থিয়েটারস্ থেকে। তিনি কিন্তু নিউ থিয়েটারস্‌কে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। "জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্" ছিল এদের শ্লোগান। কিন্তু তা ছায়ার মতই

মিলিয়ে গেল। জীবিত করতে আর পারল না ছায়াকে। সারা ভারতে যে কত বড় সুনাম রচনা করেছিল, তা আমরাই জানি। কিন্তু কোথায় যেন সব তলিয়ে গেল। বাঙ্গালীর ব্যবসা। এক হাস্যাস্পদ ব্যাপার। মোদের গরব মোদের আশা, সবই শুধু ভাসা ভাসা। ডেপ্‌থ নেই।

নিউ থিয়েটরসের দু'নম্বর স্টুডিওতে "বিদ্যাপতির" স্যুটিং দেখতে গেলাম। দেবকীবাবুর নাম করতেই স্টুডিয়োর দরওয়ান তাঁকে জিজ্ঞেস করতে গেল। তিনি হ্যাঁ বললেন। দরওয়ান ফিরে এসে আমাকে আইয়ে বলে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেবকীবাবুর কাছে পৌছিয়ে দিয়ে এল। বাইরের লোকের স্টুডিয়োর ভেতরে প্রবেশ নিষেধই ছিল। কিন্তু দেবকীবাবু আমাকে এইটুকু কৃপা করতেন। গেটকিপারকেও বলে রেখেছিলেন। কেউ তাঁর নাম করলেই খবর দিতে।

তখন বিদ্যাপতির স্যুটিং-এর শেষ পর্যায় চলছে। পৃথ্বীরাজ কাপুরকে রাজা শিবসিংহের বেশে কি অপূর্বই না লাগছিল। সত্যিই যেন রাজা শিবসিংহ। কানাকেষ্ট ছিলেন। কাননবালা ছিলেন। সাউণ্ড আগেই তুলে নেওয়া হয়েছিল। সাউণ্ড প্রজেক্ট করা হচ্ছিল আর শিবসিংহ মন্দির থেকে ছুটে ছুটে আসছিলেন। কাননবালার চোখে গ্লিসারিন দেওয়া হয়েই ছিল। কিন্তু তাঁর অভিনয় কিছুতেই দেবকীবাবুর মনঃপুত হচ্ছিল না। ক্রমাগত কাট্, কাট্, করছেন। ধমকের সুরে বলছেন—হচ্ছে না। হচ্ছে না।

কাননবালার গলা শুকিয়ে উঠছে। বলছেন—আর কিরকম করে করব, স্যার!

দেবকীবাবু বলছেন—প্রাণ আসছে না।

কাননবালা বলছেন—প্রাণ কি করে আনব, স্যার?

দেবকীবাবু প্রাণ আনার রহস্য বোঝাচ্ছেন। কিন্তু তবু কাননবালার প্রাণ আনা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। কি হবে? কি হবে? স্টুডিও শুদ্ধ লোক আতান্তর। প্রাণ আর আসছে না। ফিলম্ নষ্ট হচ্ছে।

পি. এন. রায় মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না। তিনি বি. এন্. সরকারের প্রতিনিধি। তাঁর production manager। কিন্তু তিনিও কিছু বলতে সাহস করছেন না। আমি কৌতূহলী হয়ে প্রত্যেকটি খুঁটি নাটি লক্ষ্য করে যাচ্ছি। চমৎকার শিক্ষা হচ্ছে আমার। এই স্যুটিং! অবশেষে দেবকীবাবু একটি উপায় বের করলেন। তিনি "start" বললেন।

কাননবালা অভিনয় সুরু করলেন। দেবকীবাবু হঠাৎ হাঁটু গেড়ে, তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়লেন। হাঁটু ধরে জোরে জোরে ঝাঁকুনী দিতে লাগলেন। মুখে খুব উৎসাহ দেখিয়ে—"হ্যাঁ হ্যাঁ হচ্ছে হচ্ছে"—বলতে লাগলেন। mid shot ছিল। কাজেই দর্শকরা কিছুই বুঝতে পারবে না, নীচে কে বসে আছে। কাননবালার আদ্দেকটা ছবিতে উঠছিল। দেখতে দেখতে কানননবালা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। দেবকীবাবু সন্তুষ্ট হলেন।

তাঁর সন্তুষ্টি পরে হাউসের ভেতর দর্শকদের ভেতর ছড়িয়ে পড়তেও সমর্থ হল। আমিও বুঝলাম দেবকীবাবু বড় ডিরেক্টর কেন। কাননালার ওই 'অনুরাধা' ভূমিকা অভিনয়ের পরই নাম ছড়িয়ে পড়ল। ভাল অভিনয় অমনি হয় না। অনেক খড়-জল পোড়াতে হয়। দর্শক তার কতটুকু জানে? দু'ঘণ্টার পরিশ্রম দু'মিনিটে শেষ।

আমার নিজের কোন কাজই শেষ পর্যন্ত হল না। প্রতিকূল, সমস্তই প্রতিকূল। দেবকীবাবুর সহস্র সুপারিশ সত্ত্বেও একটা ছোট টু-রীলার স্যুটিং করাতে পারলাম না। আসা যাওয়াই সার হতে লাগল। মানুষের উৎসাহ কত দিন থাকে? উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগল। বুঝলাম সিনেমায় দন্তস্ফুট করা আমার কর্ম নয়।

এদিকে আমার রোজগার বিশেষ কিছুই নেই। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভুলেও একবার প্রশ্ন করছেন না। কিভাবে আমার চলছে জানবার কোন কৌতূহলও নেই। মাতাঠাকুরাণীও তথৈবচ। অর্থনৈতিক দিকটা কেউ যেন দেখেও দেখতে চাচ্ছেন না। বিদেশে বিহারীদের মধ্যে

এক তরুণ সমাজ-পরিত্যক্ত আইনজীবী কিই বা রোজগার করতে পারে?

অবশেষে গৃহিণীও আমায় পরিত্যাগ করে খড়দায় নিজের মাতার কাছে চলে গেলেন। আমি একা বসে বসে কড়িকাঠ গুণতে লাগলাম। হা হতোস্মি! শেষে এই লেখা ছিল অদৃষ্টে? নেহাৎ সস্তা-গণ্ডার দেশ ছিল, তাই চলে যাচ্ছিল কোনরকমে। টাকায় আট সের সুগন্ধী বাসমতী চাল, টাকায় আঠারো ছটাক বিশুদ্ধ মহিষের ঘৃত। পাঁচ আনায় এক সের মাংস। ছ আনায় এক সের চিনি। ষোল টাকা বাড়ী ভাড়া। ছুটো মানুষের খেতে পরতে আর বেশী কি লাগে? টাকায় চৌষট্টিটা ভাল মালদই আম। আট আনার আম কিনে খেয়ে শেষ করতে পারি না। কত খাবো? পচতে আরম্ভ করল অবশেষে। স্টোভে খিচুরী রাঁধছি। আলু-সেদ্ধ খাচ্ছি। আম-দুধের অভাব নেই। সুজি-চিনির অভাব নেই। হালুয়া বানাচ্ছি। পেয়ালার পর পেয়ালা চা ধ্বংস করছি। কিন্তু মন অত্যন্ত খারাপ। একা মানুষ থাকতে পারে কখন? বাড়ীতে তালা লাগিয়ে কোর্টে যাচ্ছি। ফিরে এসে তালা খুলছি। ঘরে ঢুকছি। কিন্তু শূন্য বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করছে। কথা বলবার একটা লোকও নেই। করি কি? যাই কোথায়? দেওয়ালে টিকটিকি দেখছি। একমাত্র সঙ্গী।

একদিন অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে বমি করে ফেললাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম অতঃপর কি করা যায়? সবই যে প্রতিকূল। অভিমানে গলা পর্যন্ত বাষ্প ঠেলে আসতে লাগল। যার জন্য সব ছাড়লাম, সেই শেষে আমায় ছেড়ে চলে গেল। এই নাকি ভালবাসা। এরই নাম নাকি প্রেম! ধিক্কার লাগল জীবনে। মনে মনে শুধু ছি-ছি করতে লাগলাম।

আজ আমার নিজের কাছে নিজের পরাজয় স্বীকার করতে লজ্জা নেই। শারীরিক অসুস্থতা মনকেও দুর্বল করে দিল। একমাস

হয়ে গিয়েছিল। আর যেন সময় কাটছিল না। হঠাৎ পাড়ি দিলাম খড়দায়। গৃহিণী দেখে আনন্দিতই হলেন। প্রস্তুত হলেন আমার সঙ্গে ফিরে আসতে। কিন্তু তাঁর জননী কটু কথা শোনাতে কার্পণ্য করলেন না। এতদিন বিয়ে হল। ছেলে পুলেও হল। তবু একটা গয়না নেই মেয়ের গায়ের, একটা ভাল শাড়ী নেই পরনে? কোন মুখ নিয়ে আবার নিতে আসা হয়েছে? বাধ্য হয়েই যেন কন্যাকে ছাড়লেন। বলতে ত্রুটি করলেন না - নেহাৎ তুমি এসেছ নিতে, তাই যেতে দিচ্ছি। নইলে দিতাম না।

মাথাটি হেঁট করেই সস্ত্রীক ফিরে এলাম। এই-ই সাধারণ নর-নারীর প্রতিক্রিয়া। সভ্য মানুষেরা একটু মিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করে মাত্র। কিন্তু মনের ভাবটা একই। যার পয়সা নেই, তার কোথাও সম্মান নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজে এছাড়া কারুর অন্য কোন ভাবই নেই। ধন ছাড়া মান নেই কোথাও। পিত্রালয়ে, মাতুলালয়ে, শ্বশুরালয়ে। এমন কি ভ্রাতার আলয়ে পর্যন্ত। কোথাও নেই।

পনরো তারিখ পড়তেই বাড়ীওয়ালা এসে উপস্থিত। বিরাট চেহারার মানুষ। রাগৎ বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর। সাড়ে ছ'ফুট মাথায়। অবসরপ্রাপ্ত দারোগা। বয়স ৭২। কিন্তু অপরূপ স্বাস্থ্য! কি গলা! যেন বজ্র নির্ঘোষের আমেজ সে গলায়। শুনবামাত্র অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তবু তাকে ফেরাতে পারতাম না। ফেরাই নি কোন দিনই। ভাড়ার টাকা যোগাড় করেই রাখতাম। তার কপালে আগাগোড়া চন্দন। মধ্যে সিঁদুরের ফোঁটা। জাতিতে ব্রাহ্মণ। নাম মথুরা পাণ্ডে। তাকে সাইলক ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারতাম না।

কপর্দকশূন্য অবস্থা যে কাকে বলে সে কথাটা যে জীবনে জানল না, সে জীবনের কিছুই জানল না। এই অবস্থাটা জানলাম একদিন। গৃহিণী কিছুই জানেন না আমার অবস্থা। কোর্টে গেলাম। কিছুই পেলাম না। শূন্য হাতে ফিরে এলাম। কিন্তু পেট ত শূন্য থাকতে

পারে না। তাকে পূর্ণ করতেই হবে। অর্থের বিনিময়েই আহার্য সংগ্রহ করতে হবে। অথচ অর্থ নেই। কি করা যাবে?

বিকেলবেলা কোর্ট থেকে এসে ভাবছি এইবার কি হবে। একটি পয়সাও নেই হাতে। যথার্থই নেই। শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত ব্যয় করে ফেলেছি। অতঃপর কি করা যাবে? রাস্তার ধারের বারান্দায় ধীরে ধীরে পায়চারী করছি। জানি একটু পরেই গৃহিণী অর্থ চাইবেন। কি বলব তখন?

পায়চারী করছি আর করছি। পাশেই রাস্তা। কত লোক পথ দিয়ে আসা যাওয়া করছে। তারা কি কল্পনাও করতে পারে উকিল সাহেবের মস্তকে এখন কি চিন্তা। তারা জানে উকিল-সাহেবের ভাই হেলথ-অফিসার। তারা জানে এর দরজায় মাঝে মাঝে বেবি-অস্টিন এসে লাগে। যার মধুর হর্ণ শুনলে পাড়া সচকিত হয়ে যায়। তারা জানে উকিল সাহেব জজ-সাহেবকা লড়কা। কিন্তু উকিল-সাহেব যে এখন কি, তা উকিল-সাহেবই শুধু জানেন। এক কপর্দকশূন্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। ভদ্রলোক! আহা! ভদ্র বলে কি বেচারা লোক নয়?

হঠাৎ মনে পড়ল কিছুদিন আগে একটা কমিশন করেছিলাম। কিছু টাকা পেয়েছিলাম। কিছু টাকা বাকী ছিল। যৎসামান্যই। যা হয়ত একদিন ওই কেসের উকিলের মুন্সী নিজেই দিয়ে যাবে। সেই মুন্সীই সেই কেসের সমস্ত তদ্বির তদারক করে। ভাবলাম, একবার তার কাছে গিয়ে দেখব নাকি? উকিল-সাহেবের পক্ষে নিজের থেকে মুন্সীর বাড়ী যাওয়া অত্যন্ত অশোভন। অপমানজনক। কিন্তু আমি তখন সমস্ত মান মর্যাদা জ্ঞানের অপর পারে। আমার তখন টাকা চাই। অন্ততঃ দুটো টাকা। ভাবলাম, যদি বলে টাকা নেই। তাহলে কি হবে। তাহলে কি যে হবে তা ভাববার সময় আমার নেই। বারীন্দ্রকুমার বলেছিলেন কাজ করে যেও। ফলাফল দেখবার দরকার তোমার নেই। অতএব আমাকে যেতেই হবে। মুন্সীজীর দরজায়

কড়া নাড়তেই হবে। এইটুকুই আমার কাজ। টাকা দেওয়া না দেওয়া মুন্সীর কাজ। সে কি করবে না করবে, আমার ভাববার দরকার কি? আমাকে আমার কাজের অংশটুকু পালন করতেই হবে। বেরিয়ে পড়লাম। মুন্সীজি বাড়ীতেই ছিল। বললাম—দুটো টাকা দাও। আমার গলা কি অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল? জানি না। আমার মুখে চোখে কি নিদারুণ উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল? জানি না। মুন্সীজি কি দেখল, কি ভাবল, তাও জানিনা। এক মিনিট আমার মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইল। আমি তার চোখে চোখ রাখতে পারলাম না। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। মাথাটি কি আমার নীচের দিকে ঝুলে পড়ছিল? জননী বসুন্ধরাকে বলেছিল দ্বিধা হও? জানিনা।

মুন্সীজি ঘর থেকে নিঃশব্দে দুটো টাকা এনে আমার হাতে দিল। আমি হাত পেতে নিলাম। মুন্সীজি বয়সে প্রবীণ। কোর্ট কাছারীর পোকা। পৃথিবী অনেক দেখেছে। সে শান্ত নির্লিপ্ত ভাবে, এমন কি মৃদু হেসেই যা ভোজপুরীতে বলল—তার মানে হল এই:—উকিল সাহেব নিজে যখন এসেছেন, তখন বুঝতেই পারছি খুবই দরকার। হয়। হয়। এরকম হয়।

মুন্সীজি ছিল ভূমিহার বাম্মণ। এদেশের এক অতি ভয়ঙ্কর জীব। ধূর্ত। মিথ্যাবাদী। শঠ। প্রবঞ্চক। সবই। সে স্বচ্ছন্দে আমায় ফেরাতে পারত। ওজরের অভাব হত না। কিন্তু অতি বড় পাপীর ভেতরেও হয়ত মনুষ্যত্ব থাকে। অন্ততঃ সেদিন সেই ধূর্ত মুন্সীর ভেতর তাই প্রত্যক্ষ করলাম। এতদূর অভিভূত হয়েছিলাম, যে তার কাছে আমার বাকী প্রাপ্য কোন দিনই আর চাইতে পারলাম না। সব মাফ করে দিলাম। সেও যেন বাঁচল। আমার নামে খরচের খাতায় লিখে রাখতে ত্রুটি করবে না। কিন্তু আমিও অকৃতজ্ঞ ছিলাম না। বাঙ্গালী হওয়া সত্ত্বেও। সময়ে যে সাহায্য করে তার সাহায্য চতুর্গুণ মূল্যবান হয়ে ওঠে।

দু'টাকা আমার কাছে সেদিন দু'শো টাকা মনে হয়েছিল।
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই অবস্থা আমার জীবনে আর কখন আসেনি। একেবারে সত্য সত্যই কপর্দক শূন্য যাকে বলে তা আর কখন হইনি। জীবনে কখন ঋণ করিনি। করতে হয়নি। কিন্তু এ অহঙ্কার আমার থাকবে কেন? বিধাতা নির্মম হস্তে আমার সে অহঙ্কার ভেঙ্গে দিলেন। ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম তিন মাস অন্তর দিতে হত। সময় উত্তীর্ণ হতে চলল। ব্যাঙ্কে যৎসামান্য যা ছিল তা তুলতে তুলতে শেষ করে ফেলেছি। প্রিমিয়াম দেবার মত সঞ্চিত অর্থও আর নেই। ব্যাঙ্ক অফ বিহার-এ অ্যাকাউন্ট ছিল। সেখানকার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ছিল আমার বন্ধু। রামপরায়ণ রায়। আমি প্রায়ই হাতে কাজ না থাকলে তার কাছে গল্প সল্প করতে যেতাম। মনের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হত। কথায় কথায় হয়ত বলেও ফেলেছিলাম, তাকে এবিষয়ে কিছু। হয়ত বলেওছিলাম হেসেই—যাকগে? ল্যাপ্স করুক ইন্সিওরেন্স। কি আর করা যাবে। কয়েকদিন পরে শুনলাম সে তার নিজের account থেকে আমার নামে প্রিমিয়াম জমা করে দিয়েছে। এও ঋণই। প্রার্থনা করতে হয়নি, এই পর্যন্ত। কিন্তু ঋণ ঋণই। নরক দর্শন করতেই হল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেই আমার প্রথম ও শেষ ঋণ!
শুধু অর্থনৈতিক দিকই নয়। আমার মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমি বিপদে পড়লাম। আমার দুরন্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত মানস। জন্মেছি শ্রীমতাং গেহেই। চিরকাল বাস করেছি ভাল ভাল বাড়ীতেই। কম্পাউণ্ড ঘেরা বাড়ী। দরিদ্র, অথবা নিম্নবিত্তদের সঙ্গে একেবারে একাসনে এসে দাঁড়াতে হয়নি কখন। কিন্তু হল। আমার মনস্তত্ত্বের ওপর নিদারুণ প্রহার পড়তে লাগল।
আমার বাড়ীটা ছিল রাস্তার ওপরেই। তাতে ছিল এক চিলতে খোলা বারান্দা। ছাত নেই। ঘেরা নেই। সেই বারান্দায় রাত্তিরে এসে শুতো পাড়ার কেউ কেউ। আমার তাতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? ছিলও না। কিন্তু তারা ত শুধু শুতোই

না। গল্পও করত। ব্যাড় ব্যাড় করে। অনেক রাত পর্যন্ত। পাড়ায় ছিল এক ফেরিওয়ালা। "গুলাবী রেউড়ী" আর "চিনিয়া বাদাম" ফিরি করে করে বিক্রী করত। সন্ধ্যে থেকে "গুলাবী রেউড়ী" আর "চিনিয়া বাদাম," "বাদাম চিনা" হাঁকতে হাঁকতে তার গলা হয়ে উঠেছিল অতিশয় কর্কশ। আস্তে কথা বলতে সে জানতই না। ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে চাইলেও, গলা যৎপরোনাস্তি হেঁড়ে গলাই হয়ে উঠত। বয়সে যুবক। রঙ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। মুখে বসন্তের দাগ। যা অত্যন্ত স্পষ্ট। আর একটি রোগও ছিল। গঞ্জিকা সেবন। এখানে এই শ্রেণীর মধ্যে ওই পদার্থটির চলন অত্যন্ত বেশী। ব্যতিক্রম নেই বললেও চলে। সে ফেরি করা শেষ করে রাত্রে এসে ওই খানেই বিশ্রাম করত। মুহুর্মুহু কলকেয় দম পড়ত। কলকে শ্রোতার হাতেও যেত। তারপর উভয়ে বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত হত। সে কি আলাপ। শ্রোতা ছিল ছুতোর-মিস্ত্রী। উভয়েই সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত। সেফটি ভাল্‌ব খোলা পেত রাত্রে। যত রকম অভিজ্ঞতা। যত রকম বীরত্ব। সব পরস্পর পরস্পরকে শোনাতো। সে কি বীরত্বের কাহিনী। আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়ানকেও হার মানায়। উপযুক্ত মাত্রায় বাহবাস্ফোটের সঙ্গে উচ্চারিত।

বারান্দার পাশেই আমার শোবার ঘর। কেউ পাশের বারান্দায় সজোরে চীৎকার করে কথা বলতে থাকলে ঘুম অসম্ভব। ছেলেবেলা থেকে এই আবহাওয়াতেই আমি মানুষ। আমার পারিপার্শ্বিককে আমি অতিক্রম করি কি করে? যতবার তাকে বলি—আস্তে! আস্তে! সে একটু আস্তে বলার চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার স্বাভাবিক হেঁড়ে গলা বেরিয়ে পড়ে। আমার পক্ষে ঘুমোনো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ এই নিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করতেও বাধে। আমার সাম্যবাদী মন অধিকার জানাতে কুণ্ঠাবোধ করে। তাকে বারান্দায় শুতে

বারণ করতেও পারে না। মনে মনে শুধু গুমরে গুমরে মরি। রাত একটা বেজে যায়। তিতিবিরক্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসি। অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস দেখি। ঘুম নেই। ঘুম নেই। চোখে বিন্দু মাত্র ঘুম নেই।

এমন সময় কি একটা উপলক্ষে বাঁকুড়ায় যাবার প্রয়োজন হল। আমার পিতামহের তৈরী বাড়ী। ত্রিতল অট্টালিকা। বিস্তৃত অঙ্গন। প্রাঙ্গন। রাত্রে তেতালায় পালঙ্কের ওপর নরম গদীতে শুয়ে আছি। রাস্তা অনেক দূর সেখান থেকে। গল্প-রত কারুর কোন উচ্চকণ্ঠের আলাপ নিদ্রার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত করতে পারে না। নিদ্রা অন্তে সকাল বেলা জানলা দিয়ে নীচে চেয়ে চেয়ে দেখছি। জনতার কাছ থেকে আমি কতদূরে। কত উর্ধে। এই আমার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার। এই আমার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পারিপার্শ্বিক। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল আমার মধ্যবিত্ত মানস। এই সব নিয়েই আমার অহংবোধ। এক কথায় এই আমার আমি। এই আমার পরিচয়।

কিন্তু ভাগ্য আমাকে একেবারে ফেরিওয়ালা ছুতোর মিস্ত্রীর পাশে শুতে বাধ্য করেছে। একটি দেওয়াল মাত্র ব্যবধান। একেবারে জনতার পাশে এনে দাঁড় করিয়েছে। কেন? এই প্রশ্ন জাগল মনে। উত্তরও পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। তেতালার ঘরে শুয়ে নির্বিঘ্নে যে ঘুম ঘুমানো যায়, সে ঘুম আমার জন্যে নয়। জনতার স্পর্শ বাঁচিয়ে যে জীবন কাটানো যায়, সে জীবন আমার জন্যে নয়। যদি সেই জীবনই আমার জন্যে নির্দিষ্ট হত, তাহলে চাকরী না করার বাসনা জাগত কেন চিত্তে? জীবন প্রভাতেই কেন প্রতিজ্ঞা করে বসলাম যে চাকরী কখনও করব না জীবনে? স্বাধীন থাকব বলেই ত? স্বাধীন না থাকলে সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারব না জীবনে। জনতার সুখ-দুঃখ না বুঝতে শিখলে আমার রচনায় জীবনীশক্তি আনতে পারব না। আমার রচনা মুচি মেথরের জন্যে নয়। সর্বজনগ্রাহ্য

যাতে হয়, সেই আমার স্বপ্ন। তাই আমার তেতালায় উত্তরাধিকার ছেড়ে হকার, ফেরিওয়ালার, কর্কশকণ্ঠ নিদ্রাহীন চোখে বসে বসে শুনতে হয়। বলতে হয় আহা! ওরাও ত মানুষ। এই ত ওদের দুঃখ। এই ত ওদের আনন্দ। কাল সকালে আবার ত কাজে লাগতে হবে। রেউড়ী তৈরী করা। কাঠের তক্তার ওপর রঁ্যাদা চালানো। বলুক। বলুক। একটু উচ্চকণ্ঠেই বলুক। আমার ঘুমোবার সময় কৈ? আমাকে যে লিখতে হবে। এ সবই লিখতে হবে। প্রেম নয়। বিলাস নয়। সাধারণ মানুষের জীবন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ।

আমার মনের মধ্যে একটা আদর্শ আছে। সততার আদর্শ। অসাধু হতে পারব না। কি একটা কমিশন পেয়েছিলাম। দু'দিকে দুই প্রবল প্রতিপক্ষ। এদেশে মোকদ্দমা লড়াটা একটা বিলাস। তাতে খরচ করা একটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। না করলেই নয়। তারজন্যে যা কিছু করা দরকার, নির্ভয়ে করা যেতে পারে। কমিশনারকে ঘুস দেওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এক প্রতিপক্ষ দুই হাতে অঞ্জলি ভরে আমায় টাকা দিতে উদ্যত। কমিশনার সাহেবের সেবার জন্যে যৎকিঞ্চিৎ *হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ*। ছেলেদের মিষ্টি খাবার জন্যে *হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ*। আমি প্রত্যাখ্যান করছি। সে অনুনয়-বিনয় করে বলছে এর বেশি আর পারবে না। ক্ষমতা নেই। বড্ড গরীব। আমি যত বলছি এর চেয়ে কম হলেও আমি নিতে পারব না, ততই সে অবিশ্বাস করছে। এমন ধারা কথা ত সে তার দীর্ঘ জীবনে কখন শোনেনি।

আমার একটা পারিবারিক ঐতিহ্য আছে। আমার পিতা তখন পাটনার প্রথম সাব-জজ। রাজায় রাজায় একটা সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। তাঁর এজলাসেই মামলা। এক লক্ষ টাকা ঘুস পাওয়া কিছু শক্ত নয়। পিতৃদেব বিপদ দেখে পেন্‌সন নিয়ে বসলেন। পেনসন্ নেবার সময় আসবার আগেই। ওপরওয়ালার চাপও দেখতে পেলেন।

তাঁকে সেসন্ পাওয়ার দেবার কথা হয়েছিল। বললেন কাউকে জেলে পাঠাতে পারব না। ফাঁসী দিতেও না। সত্য-মিথ্যা বিচার করা অতি কঠিন ব্যাপার। যে জিনিস নিজে চোখে দেখিনি, তা অপরের কথা শুনে কেমন করে বিশ্বাস করব।

তাঁর পুত্র আমি। ঘুস নিই কি করে? আমার শ্যালক এই দৃশ্য জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। দিদিকে গিয়ে বলছে দেখছ দিদি! মক্কেল এক মুঠো টাকা নিয়ে খোসামদ করছে। জামাইবাবু নিচ্ছেন না। তার দিদিও অবাক হচ্ছে। এত অভাব, এত অনটন, তবু একি? এতো পাগলামী। তবু সেই পাগলামী সেদিন করেছিলাম। বোধহয় আজও সেই পাগলই আমি আছি।

ক্রমশঃ বুঝতে পারছি নিয়মিত আঠারো টাকা বাড়ীভাড়া দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। সেই দীর্ঘকায়, চন্দনচর্চিত, রাগভবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরের অধিকারীটি মাসের পনেরো তারিখে ঠিক এসে হাজির হবে। সাক্ষাৎ যমদূতের মতই। তাকে ফেরাতে পারব না। তাকে দিতেই হবে টাকা। সেও এত নিঃসন্দেহ যে এসেই টেবিল থেকে কাগজ-কলম তুলে নিয়ে রসিদ লিখতেই বসে যাবে। গৃহিণী হয়ত তখন পাশের বারান্দায় বসে শিল-নোড়া নিয়ে হলুদ পিষছেন। আড় চোখে অঙ্গনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলবে ওকিল সাহেব! আপকা মেহেরারু বড়ি মেহনতী হ্যায়। অর্থাৎ আপনার স্ত্রী অত্যন্ত পরিশ্রমী। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা এত পরিশ্রমী নয়। তারা শুধু বসে থাকবে। আর পরাৎ পরাৎ করে হুঁকো টানবে। শুনে আমি সৌজন্যের হাসি ফোটাই মুখে। বলতে পারি না, গত্যন্তর নেই। দারোগা সাহেব! এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অনেক কষ্টে একটা ঠিকে ঝি মাত্র রাখতে পেরেছি। সে দু'বেলা বাসন মেজে দিয়ে যায়। আর ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়। বাড়ীতে জলের ব্যবস্থা নেই। দু' বালতি স্নানের জল আর এক বালতি মিষ্টি জল দিয়ে যায় মাত্র। বাকী সব কাজই করতে হয়

এ বাড়ীর বধূটিকেই। আমিও শ্রম করতে কাতর নই। আমার স্ত্রীও নয়। নইলে বিদেশে ওকালতী করতে এসেছি কোন সাহসে? অবসরপ্রাপ্ত দারোগা সাহেব মাথা নাড়তে থাকেন। বলেন হিন্দীতেই দেখুন ওকিল সাহেব। আমি রোজগার করেছি বিস্তর। লাখো টাকার সম্পত্তি করেছি। হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে, আর তেজারতী করে, বাড়িয়েছিও বিস্তর। সব যে মাইনের টাকায় হয়েছে তা ভাববেন না। মাইনে ত মাত্র আশী টাকা। দু'হাতে টাকা নিয়েছি। তবে হ্যাঁ, যার টাকা নিয়েছি, তার কাজও করেছি। আর একটা কাজও করেছি ওকিল সাহেব। দু' পক্ষের কাছ থেকে টাকা নিইনি কখন। তাই চাকরীতে কখন কোন দাগ লাগেনি। সঞ্চয়ও করেছি বিস্তর।

তাঁর ভীষণাকৃতি মুখ থেকে রাসভবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরের মারফৎ মধুর চেয়ে মিষ্টি উপদেশামৃত পান করতে করতে আমি অধৈর্য হয়ে উঠতাম। কিন্তু তিনিও তাঁর উপলব্ধির কমণ্ডলু থেকে উপদেশের অমৃত বিতরণ করতে ক্ষান্ত হতেন না। বাহাত্তর বছর বয়সেও কি গলার আওয়াজ। সবই মহিষ-দুগ্ধ ও ভঁইসা-ঘৃত খাওয়ার ফল। চলেন কি লম্বা লম্বা পা ফেলে। মেরুদণ্ড কি সোজা করে। দারোগা সাহেবকে মনে মনে ঈর্ষা না করে থাকতে পারতাম না। সামান্য কনস্টেবল হয়ে চাকরীতে ঢুকেছিলেন। লক্ষপতি দারোগা হয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন। এখন বাড়ী ভাড়া আর সুদ, আর পেনসন আদায় করেই জীবন কাটাচ্ছেন। বিহারের সফল ব্যক্তি একজন।

অনেক বৎসর পরে স্থানীয় রাজেন্দ্র কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক ভট্টাচার্য মশায় আমাকে তাঁর কলেজে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেক্সপীয়র-এর একটা দৃশ্য নাকি অভিনয় হবে। দুটি মেয়েকে ইংরাজী উচ্চারণ শেখাতে হবে। বি-এ ক্লাসের মেয়ে। গেলাম। দেখলাম, দুটি সুশ্রী মেয়ে। উচ্চারণ শেখালাম। একটি মেয়ের যেমন একহারা পাতলা লম্বা চেহারা, তেমনি সে মিষ্টি গলার অধিকারিণী। তেমনি টকটকে রং। পরিচয় নিয়ে জানলাম ইনি স্থানীয় জিলা স্কুলের

শিক্ষকের কন্যা। আর, আর—হ্যাঁ সেই মথুরা পাণ্ডের পৌত্রী। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এত মিষ্টি গলা। এত লজ্জাশীলা। এত নম্র। এত বিনয়াবনতা! ইনি এঁর পিতামহের কোন গুণটা পেয়েছেন? কোন গুণই নয়। এঁর কাপড় চোপড় যে দেখছি ভাল। কলেজেও পড়ছে। তবেই হয়েছে। শিক্ষার আদর্শ ঢুকেছে—পরিবারে। তাহলে সব হবে! কিন্তু লক্ষপতি থেকে আর পদোন্নতি হয়ত হবে না। অবনতি হলেও হতে পারে।

এঁর পিতামহকে আমি রাস্তায় দেখামাত্রই আইয়ে, আইয়ে, প্রণাম! বলে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা জানাতাম। তিনি সহাস্যে জবাব দিতেন—প্রণাম। কহিয়ে ওকিল সাহেব! কেয়া হালচাল? বলতাম—সব আপকী মেহেরবাণী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাগজ টেনে রসিদ লিখতে বসতেন। বলতেন—ভগব'ন কী মেহেরবাণী। হম্ কৌন হোতে হেঁ। কুছ নেহি। কুছ নেহি।

এই তন্বী মেয়েটি সেই ভীষণাকৃতি ব্যক্তির পৌত্রী? এর পিতা শিক্ষক? স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী! কি চমৎকার? কালের গতি কেউ রোধ করতে পারে না।

শুনলাম তার পিতামহ নাকি মৃত। মনে মনে বললাম—আহা! ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি বিধান করুন।

অর্থাভাব লেগেই ছিল। ছয় মাস পরে তার জননী ছ'মাসের পুত্রটিকে কোলে নিয়ে নিজের জননীর হাত ধরে আমায় আবার পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। এবার স্বদেশে। পূর্ববঙ্গে। ফরিদপুর জেলার এক গণ্ডগ্রামে। একটা বৃদ্ধা ঝি রান্না করে দিয়ে যেত। আমি কোনরকম ক্ষুন্নিবৃত্তি করতাম। একা একা দিন আর কাটে না। তবে এবার আর ফিরিয়ে আনতে যাব না। মনে মনে ঠিকই করলাম। সমস্ত দুঃখ সহ্য করতে লাগলাম। কতটুকুই বা দুঃখ? কিছুই না। কতটুকুই বা খাদ্য? কিছুই নয়। অতি নোংরা পারিপার্শ্বিক। ন'টাকা যার মাত্র ভাড়া সেখানে কি রকম পারিপার্শ্বিক আশা করা

উচিত ? আগের থেকে কম ভাড়ায় ঘর। বর্ষাকালে ছাদ দিয়ে জল পড়ছে টপ্‌টপ্‌ করে।

একদিন মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। তখন প্রবল বর্ষণ সুরু হয়েছে। প্রবলতর বেগে ছাদ দিয়ে জল পড়াও চলেছে। বিছানা ভেসে যাচ্ছে। খাট সরাতে সরাতে সারাঘর প্রদক্ষিণ করা হয়ে গেছে। তবু জলের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। অবস্থাটা বর্ণনা করবার মত নয়, কল্পনা করবার মতই। মনে মনে খালি অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। পরদিন সারাদিনটাই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। বসে বসে একটা নাটক লিখতে সুরু করলাম। ছোট একাঙ্ক নাটক। নাম "গ্রন্থকার"। এইটেই পরে পূর্ণাঙ্গ নাটকে পরিণত হল। নাম হল "ভাবী মানব"। পরে নাট্যাচার্য মঞ্চস্থ করলেন। নাম দিলেন "পরিচয়"।

বেশ আছি। জগতে আমি একা। আমার কেউ নেই। কোর্টে যাচ্ছি। কখন কিছু পাচ্ছি। কখন পাচ্ছি না। আমার কথা কে শুনছে ? আমার কথা কে ভাবছে ? কোন দিকে কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। সকলেই পরিত্যাগ করেছে। স্ত্রী পর্যন্ত। তাহলে আছে কে ? আমি এবং আমার অস্তিত্ব। শত অসুবিধা সত্ত্বেও বেঁচে থাকতে হবে। হার স্বীকার করা চলবে না। এই হল জীবন সংগ্রাম। সংঘর্ষ। মনুষ্যত্ব এইতেই নাকি গড়ে ওঠে। বেশ, তাই হোক। দেখি কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। হ্যাঁ, হার স্বীকার করব না। স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে যাব না। বেশ আছি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রশ্নই তুলছেন না। জননীকে চিঠি লিখে শুধু ধিক্কারই পাচ্ছি। রোজগার করতে পারছ না ? টাকা চাইছ ? ছিঃ ! তোমাকে শতধিক্। তোমাকে পাঠাবার মত যথেষ্ট অর্থ আমাদের নেই। এখানেও অনেক খরচ। অতএব আকাশের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। চুপ করে বসে থেকে মিনিটের পর মিনিট অতিবাহিত হতে দিচ্ছি। স্ত্রীর যাওয়া প্রায় দু'মাস হল হয়ে গেছে।

হঠাৎ টেলিগ্রাম এল পূর্ববঙ্গ থেকে। মৈমনসিংহের এক গণ্ডগ্রাম

থেকে। পুত্রের কঠিন পীড়া। দ্বিতীয় পুত্র। আটমাসের শিশু। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলাম। গিয়ে শুনলাম টাইফয়েড। পাড়া গাঁ জায়গা। ভাল ওষুধ নেই। ভাল ডাক্তার নেই। কিছুই নেই। আমি এসে কি করতে পারি? আমায় কেন আসতে লিখল? ইচ্ছে করেই আমি পুত্রের কাছে যাচ্ছি না। অন্য ঘরে বসে আছি। একবার আসা যাওয়ার পথে তাকিয়ে দেখি, সে ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বড় বড় চোখ করে। নীরব ভংর্সনা করছে আমায়। তবু তার কাছে গেলাম না। এমনি নির্দয় পিতা আমি। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার অনিচ্ছায় ঘটেছে। আমি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত ক্রুদ্ধ। শুধু রাগে ভেতরটা জ্বলছে। স্নেহ, মমতা, ইত্যাদি কোন প্রকার দুর্বলতা দেখাতেই প্রবৃত্তি হচ্ছে না। কি রকম এক আলাদা মানুষ হয়ে গেছি। ভাবছি এই নাকি শ্বশুরালয়। শাশুড়ী আছেন। যত্ন করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যত্ন নিতে চাচ্ছে কে? তাঁর ওপরেও মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছি! তিনিইত স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে বিচ্ছেদ এনেছেন। সুখে দুঃখে একরকম করে কাটছিল দিন। কন্যাটিকে সরিয়ে নেবার কি দরকার ছিল? আমাকে জব্দ করা ছাড়া? রঙীন চশমা পরা থাকলেই আত্মীয় স্বজনকে সুন্দর দেখায়।

চোখের সামনে পুত্রটিকে নিঃশব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখলাম। পুত্রশোক। খুব দুঃখের ব্যাপার বলেই শুনেছি। কিন্তু কৈ? আমার ত শোক লাগছে না। ক্রোধ হচ্ছে শুধু। যেখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, সেখানে মানুষ আসে কেন? রাত্রে মৃত্যু হল। ভোর বেলা একজন যুবক আত্মীয় এসে বললেন—তাহলে অনুমতি দিন। আমি বুঝতে পারছি না। বলছি - কিসের অনুমতি? যুবকটি ম্লান হেসে বললে—পুঁততে হবে না? এবার আমি বুঝলাম। বললাম—ও! হ্যাঁ, তা নিয়ে যান। জিজ্ঞেস করার কি দরকার? তিনি বললেন—বাঃ আপনি পিতা। আপনার অনুমতি ছাড়া—হেসে বললাম—আচ্ছা অনুমতি দিচ্ছি। ওরা শিশুকে তুলে নিয়ে গেল। ছোট একটা পুঁটলী!

কাপড়ের পুঁটলী। ওর ভেতর সব আছে। শুধু প্রাণ নেই। কাজেই ওকে মাটিতে পোঁতা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? অনুমতি! জীবন্ত মানুষটাকে আনবার সময় অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি?
ওর জননী মাটিতে বসে, পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল। দূর থেকেই দেখলাম। আমার চোখে জলও নেই। বুকে নিঃশ্বাসও নেই। সব দেখে যাচ্ছি শুধু। একটা পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেল, জীবন-পুস্তকের। পুত্রের মৃত্যু। স্বামী-স্ত্রী শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে এলাম।
ছাপরা। সেই বাড়ী। গলির ভেতর। ঢোকবার মুখেই একটা অশ্বত্থ গাছ। দেখলে ভয় করে। আবার ফিরলাম সেই বাড়ীতে। ছুটো শোবার ঘর। একটা আমার। একটা গৃহিণীর। সেই ঘরে ছুটি পুত্র নিয়ে থাকতেন তিনি। তার মধ্যে একটি পুত্র গিয়েছিল তাঁর কোলে চড়ে। কিন্তু আর কোলে চড়ে আসে নি ফিরে। সে আজ বসুন্ধরার কোলে। জননী গিয়েছিলেন পিত্রালয়ে। রাগ করে। ফিরে এলেন একটি পুত্রকে নিয়ে। অতঃপর সব শান্ত। নীরব। আর কান্নাকাটি চেঁচামেচি নেই। সব নিঝুম।
গৃহিণী সেই ঘরের ছুয়ারে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ। পাথরের মূর্তির মত। স্তব্ধ। অতি অল্প বয়সেই, পুত্রশোক পেয়েছেন তিনি। এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই ভেতরে আর ঢুকতে পারছে না। ঘরে যে শূন্য।
তাঁর অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, আমি লক্ষ্য করলাম। কেন যে তিনি ঢুকতে পারছেন না, তা বেশ বুঝতে পারছি। সমবেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে আমার মন।
সদ্য সন্তান হারা জননীকে কি বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়? আর সান্ত্বনা দেবেই বা কে? তৃতীয় ব্যক্তি ত কেউ নেই। আমরা উভয়েই সমানে ছুঃখিত। পীড়িত। কিন্তু কতক্ষণ আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? অবশেষে তিনি শূন্য পরিত্যক্ত ঘরে প্রবেশ করলেন। যে

ঘরের চারদিকে এখনো মৃত পুত্রের জামাকাপড় কাঁথা বিছানা ছড়ানো।

দু'জনের নির্বাক সেই মুহূর্তকটি আমার বুকে অনন্ত হয়ে রইল। কি কথা বলা চলত সে সময়? কিছু না বলাই কি সবচেয়ে বেশী বলা ছিল না? নির্বাক, নিঃশব্দ, কয়েকটি মর্মস্পর্শী মুহূর্ত, আজ চল্লিশ বছর পরে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সেই ঘরটি। সেই দিনটি। সেই মুহূর্তটি। আমাদের দুজনের সেদিনকার অসহায়তা আজও পরিষ্কার উপলব্ধি করছি। মানুষ কত অসহায়। মানুষ কত একা। মানুষ কত ক্ষুদ্র। কিন্তু তবু মানুষ মানুষই। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তবু মানুষ অজেয়। অপরাজেয় হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ, পারে। কোমর বেঁধে তখুনি কাজে লাগলাম। সবই বিশৃঙ্খলা। তবু এরই মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। বসে বসে শোক করবার ত সময় নেই। আমাকে কোর্টে যেতে হবে। গৃহিণীকে রান্না ঘরে ঢুকতে হবে। দেখতে হবে কি কি আনাতে হবে। কেউ ত আমাদের জন্যে রেঁধে বসে নেই। আমাকে বাজার করতে হবে। পয়সা বের করতে হবে। পৃথিবীর দাবী মেটাতে হবে। জঠরের দাবীও। ক্ষমা নেই, দয়া নেই, অনুকম্পা নেই, সহানুভূতি নেই। এই পৃথিবী। পৃথিবীর রুক্ষ রূপ আমায় দেখতে হবে। নইলে আত্মসাক্ষাৎকার হবে কি করে? শিল্পী হব কি করে? সাহিত্যের মাধ্যমে মনের বেদনা ফোটাবো কি করে? দুঃখ! দুঃখ। দুঃখের চেয়ে সার্বজনীন জিনিস আর কি আছে?

আমি আমার জীবন-কাহিনী লিখতে বসি নি। কিম্বা আমার দুঃখের কাহিনী বলতেও নয়। আমার দুঃখ, আমারই দুঃখ। অপরের কি! আমি যদি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরতে মনস্থ করি, জগতের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হবে তাতে? কিছুই নয়। তবে এ কাহিনী লিখছি কেন? হয়ত আমার মত আদর্শের পেছনে অন্য সহস্র যুবকও ছুটেছে। ছুটছে। তারা ভাষা দেয়নি তাদের দুঃখ কষ্টের। পরীক্ষা নিরীক্ষার।

অপমান লাঞ্ছনার।

আজ সত্তর বছরে এসে সেই কথাটাই ত ভাল করে বুঝলাম এই তিলে তিলে বোঝার কাহিনী যদি জগতকে শুনিয়ে না যাই, তাহলে জন্মগ্রহণ করলাম কেন? নিজের প্রতি সত্য হতে পারলেই ত জগতের প্রতি সত্য হতে পারা যায়। এ শুধু একটি জীবন-কাহিনী নয়। মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের এক বিচিত্র আলেখ্য।

নতুন বাড়ীতে উঠে এলাম। বিহারী বাড়ীওয়ালা। বড় রাস্তার ওপরেই দোতালা বাড়ী। ছাদ কিন্তু খাপরার। পুরাণো ধরণের বাড়ী। বিহারের নিজস্ব ধরণ। যে দেশের যেমন। এদেশে এইরকম বাড়ী করাই রীতি। খুব সংক্ষেপে। খুব সস্তায়। সৌন্দর্য প্রকাশ, গৃহ রচনার উদ্দেশ্য নয়। প্রয়োজন সাধনই উদ্দেশ্য। মাথার ওপর একটা ছাদ আছে ত? তাহলেই হ'ল। ঘর সব শুদ্ধ পাঁচটা। দোতালায় রাস্তার ধারে কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা খানিকটা বারান্দাও আছে। ভেতরে উঠোনও। আর কি চাই? সে বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে। আজ তার স্থানে মনোরম দ্বিতল অট্টালিকা। নতুন মালিক কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে নির্মাণ করিয়েছেন। পুরাতন যা কিছু সবই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সহরও দেখতে দেখতে নব কলেবর ধারণ করছে। পরাধীন, পরপদানত, ভারত আর নেই। স্বাধীন, উন্নত-মস্তক, নির্ভীক, ভারত আস্তে আস্তে রূপ পরিগ্রহ করছে।

সাজিয়ে গুজিয়ে বসলাম! সাইনবোর্ড টাঙালাম। হয়ত তা দেখে আইনের বই বিক্রী করার এজেন্ট এসে উপস্থিত হল। কিস্তিতে কিস্তিতে বই কেনবার উপদেশ দিল। অর্ডার দিয়ে দিলাম। ফার্ণিচার বিক্রীর এজেন্ট এল। আলমারী টেবিল চেয়ার এমন কি রিভোল্‌ভিং আলমীরার অর্ডারও দিয়ে দিলাম। সব বেরিলী থেকে আসবে। এলও। সাজিয়ে রাখলাম। সোনার জলে নাম ছাপা চামড়ায় বাঁধানো সুদৃশ্য আইনের বই। নাগপুর থেকে এসে উপস্থিত হল।

হ্যাঁ, সব দিক দিয়েই সুসজ্জিত হয়ে বসলাম। মক্কেল এলেই হয়। আসতেও লাগল এক আধটা। ক্ষুৎ-পিপাসা মিটতেও লাগল। সস্তার দিন। কতটুকুই বা খরচ। ষোল টাকা বাড়ী ভাড়া। লাইফ্ ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম। আইনের বইয়ের পার্শেল ছাড়ানোর খরচ। এই কটি কাজ করতে পারলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করতাম। তারপর সাদাসিদে খাওয়া দাওয়া। দুধ সস্তা। ঘি সস্তা। ফল সস্তা। তরী তরকারী প্রচণ্ড সস্তা। মাছ মাংস সস্তা। দুঃখ কিসের ?

জীবন প্রভাতে দুটি সংকল্প মনে মনে গ্রহণ করেছিলাম। চাকরী কখন করব না। পাতানো বিয়ে কখনো হবে না। এই দুটি আদর্শ অনুসরণ করতে করতেই ত জীবন পথে এগিয়ে চলেছি। সমাজ বিদ্রোহ করেছি। এখনো পতাকা সমান উঁচুতেই উড়ছে। মাটির ধুলোয় নামিয়ে আনার প্রয়োজন হয় নি। প্রথম যৌবনের আদর্শ পরবর্তী জীবনে বিসর্জন দিতে হয় নি।

আমার নতুন বাড়ীওয়ালা ছিলেন একটি অদ্ভুত জীব। বিহারী নিশ্চয়ই। তিলি সম্প্রদায়ের। ডাক নাম সাউজী। লেখাপড়ার ধার ধারেন না। কিন্তু সূচ্যগ্রবুদ্ধি মানুষ। স্থূল মোটা শরীর। কৃষ্ণবর্ণ রং। এমনিতে বিনয়ের অবতার। ভদ্র, শান্ত, বিনীত। কুসীদজীবী। টাকা ধার দেন। সুদ তোলেন ঘরে। হ্যাণ্ডনোটের পর হ্যাণ্ডনোট লেখান। সম্পত্তির পর সম্পত্তি বাঁধা রাখেন। বাড়ীর পর বাড়ীর মালিক তিনিই। সহরের একজন বিশেষ ধনী। লক্ষপতি ত বটেনই। যে কোন সময়ে নগদ এক লক্ষ টাকা গুণে দিয়ে দিতে পারেন। তাঁর হুণ্ডি চলে বাজারে।

আমার এখানে আসতেন ভাড়া নিতে। খালি গায়ে। কাছেই বাড়ী। অতএব পোষাক-আষাকের ধার ধারতেন না। লোক দেখানো হামবড়ামি তাঁর নেই। গণ্ডূষ মাত্র জলে সফরীর মত ফর্ ফর্ করেন না। তিনি স্বনামধন্য পুরুষ। অর্থই তাঁর শোভা।

বসন-ভূষণের প্রয়োজন নেই। লোকে জানে তিনি ধনী। হয়ে গেল সবকিছু। দামী পোষাক পরে জাহির করবার দরকার কি?

ছেলে নেই। একটি মাত্র মেয়ে। সেই উত্তরাধিকারিণী। নাম—ভোলা সাউ। তার নাম কেউ নেয় না। নিলে আহার জুটবে না সেদিন। এমনিই স্বনামধন্য পুরুষ তিনি। কৃপণের অবতার। তাঁর হাত দিয়ে একটি পয়সা কখন গলে না। সন্ধ্যের পর নিজেই বাজারে যান। থলিতে করে তরি-তরকারী নিয়ে আসেন। যেটা সবচেয়ে সস্তা। আদ্ধেক পচা হলেও ক্ষতি নেই। আহারের কোন প্রকার বিলাস নেই। ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হলেই হল। মাছ মাংস খান না। আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন। বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে নানা গল্প করেন। পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের খবর জানতে চান। খুব জিজ্ঞাসু ব্যক্তি। গম্ভীর নন মোটেই। মনটাকে খুলে ধরতেও পারেন। অহঙ্কারের লোহার সিন্দুকে মনরূপী অলঙ্কার বন্দী করে রাখেন না। আমার সঙ্গে রাজনীতিও আলোচনা করেন। প্রতিদিন বিকেলের দিকে বাজারে যান। সেই তার সান্ধ্য ভ্রমণ। কারও দোকানে হয়ত বসে গেলেন। সে কৃতার্থ হয়ে গেল। ধনী বলে নাম আছেই। সকলেই খাতির করে। লোক দেখানো হলেও করে। তিনি তাদের কাছে খুব ভারিক্কি চালে নতুন নতুন রাজনৈতিক মতবাদ ছাড়েন। যা পূর্বে আমার কাছ থেকে আলোচনাসূত্রে আহরণ করেছেন। অত্যাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি। সকলে অবাক হয়ে শোনে। এত খবর তিনি জানেন। এত সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাঁর! আশ্চর্য! খবর সংগ্রহ করতে ত আর পয়সা লাগে না। খবর বিতরণ করতেও পয়সা খরচ হয় না। অতএব আমার সঙ্গে তাঁর খুব সদ্ভাব। কিন্তু বাড়ী মেরামত করতে বললেই সদ্ভাব বিরুদ্ধভাবে পরিণত হয়। পয়সা কি খরচ করার জন্যে? পয়সা কড়া সুদে ধার দেওয়ার জন্যে। যে পয়সা খরচ হয়ে গেল সে পয়সা ত আর বাচ্চা দেবে না।

তিনি বলতেন আচ্ছা উকিল সাহেব বলুন তো পৃথিবীতে সবচেয়ে

আশ্চর্য জিনিস কি? আমি মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতাম—মানুষ প্রতিদিন মানুষকে মরতে দেখেও ভাবে সে বুঝি মরবে না। এর চেয়ে আশ্চর্য জিনিস আর কি হতে পারে?

সাউজী হাসতেন মৃদু-মন্দ হাসি। বলতেন—হল না। আরও ভাবুন।

আমি পৃথিবীর সাতটা আশ্চর্য জিনিষের কথা বলতাম। তাজমহল, পিরামিড, কোহিনূর, ঝুলন্ত বাগান, ইত্যাদি।

সাউজী হেসে বলতেন--হল না। আরও ভাবুন।

অবশেষে আমি হার মানতাম। তাঁর মত কি জানতে চাইতাম, তিনি কোনরকম আড়ম্বর না করে বলতেন—সুদ। সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস পৃথিবীতে হল—সুদ। কে বের করেছে জানি না। কবে বের করেছে জানি না। কিন্তু যে বের করেছে তার মাথা আছে। এর চেয়ে আর আশ্চর্য জিনিস কি আছে পৃথিবীতে। নিজের থেকেই বেড়ে চলে। বাড়তে বাড়তে আকাশে ওঠে। আপনাকে কিছুই করতে হয় না। এই যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এ একদিন থামবে। আমি কখনও ভাবি না যে থামবে না! কিন্তু সুদ কোনদিন বাড়তে ভুলে যাবে না। বেড়েই চলবে। চলবেই। চলবেই।

আমি মুগ্ধ হয়ে এই কুসীদজীবীর কথা শুনতাম। আমার মত শ্রোতা পেয়ে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠতেন। বলতেন খানিকটা নিজের থেকেই—জানেন উকিল সাহেব। আমি খুব গরীব ঘরেরই ছেলে। খেতে পেতাম না ভাল করে। এক পয়সা, দু' পয়সা করে জমিয়ে জমিয়ে সামান্য কিছু পুঁজি গড়ে তুললাম। তারপর থেকে আর আমাকে কিছুই করতে হল না। দোকানেও বসতে হল না। কোন রকম ব্যবসাও করতে হল না। আফিস-কাছারীতেও যেতে হল না। অথচ আজ আমার—বলে গলায় একটু খুক্ খুক্ করে কাশির শব্দ তুলেই বক্তব্য অসমাপ্ত রাখলেন।

আমি তাঁর বিনয় দেখে অবাক হয়ে গেলাম। নিজের ঢাক নিজে বাজাতে ইনি জানেন না। অথচ কি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী। অবাক

হয়ে গেলাম। এরাই হল বিহারের গৌরব। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, নিজের চেষ্টায় বড়লোক হয়েছে। একটু কৃপণ বদনাম হয়ত হয়েছে। তাতে কি! কৃপণ না হলে পয়সা জমে কখন? আজ এঁর যেমন ধনের সীমা নেই, তেমনি খরচের কোন রকম বালাই নেই। এই ঢাক ঢোলের যুগে, কোনরকম ডঙ্কা নিনাদ নেই। এই বাগাড়ম্বরের যুগে কোনরকম আড়ম্বর নেই। জীবন কত সহজ। কত সরল। দুশ্চিন্তার কোনরকম রেখা নেই কপালে। আমি অবাক হয়ে বিহারের এই অধিবাসীটির দিকে, বাঙ্গালীর মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে, চেয়ে থাকতাম। নগ্ন দেহ, মলিন ধুতি, খালি পা। কখন পায়ে একটা শতচ্ছিন্ন জুতো। যা হয়ত কেনবার পর আর কখন রং লাগানোর মুখ দেখেনি। অথচ টাকার কুমীর নিজে।

এঁর একমাত্র জামাতা পড়লেন ফৌজদারী কেসে। তিনি গ্রামের গ্রাম-পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ। সারণ জেলার দিঘ্ওয়ারা থানার কোন একটা গ্রামে থাকেন। সারণ জেলার প্রধান সহর ছাপরা। নৈমিষারণ্যের অপভ্রংশ সারণ। নিয়েছেন ঘুস। পড়েছেন বিপদে। হয়েছে সেসন্ কেস্। হয়ত জেলও হতে পারে। কি জানি কেন আমাকেই রাখলেন। হয়ত শ্বশুরের কথাতেই। কিম্বা সস্তায় সারবেন ভেবে।

জামাতা বাবাজীবন দেখতে অতি সুপুরুষ। কথাবার্তা অত্যন্ত মার্জিত। পোষাক পরিচ্ছদ ভদ্র। তাঁর সব ভাল। কিন্তু ফিস্ দেবার বেলা বজ্রমুষ্ঠি। বললাম--আপনার ভাবনা কি পয়সার? এমন শ্বশুর। বললেন—ওকিল সাহেব! সেটি হচ্ছে না। পয়সা দেবেন নাকি উনি? বামঃ! একটি পয়সাও হাত দিয়ে গলবে না। তাতে জেল হয়, আমার কর্মফল। উনি কি করবেন? বললাম—এক মাত্র জামাই জেলে গেলেও এক পয়সা—। জামাতা গম্ভীর হয়ে বললেন—না। অর্থের চেয়ে মূল্যবান কোন জিনিষই নয় ওঁর কাছে।

জামাই কিন্তু ছাড়া পেলো। শ্বশুরকে বললাম—খাওয়ান। শ্বশুর

অম্লানবদনে বললেন—যাকে ছাড়িয়ে এনেছেন, সেই খাওয়াবে। আমি ও সবের কি জানি!

ভাবলাম এ না হলে পয়সা কখন জমে, তার পরের কাহিনীটাও মনোরম। একরকম বিনা চিকিৎসাতেই এই বিরাট ধনী, পরমানন্দেই মরলেন। জামাইকে বললেন—সময় যখন হবে, কোন শালা আটকাতে পারবে; ডাক্তারদের তাহলে পয়সা দেব কেন?

এমন কৃপণের শ্রাদ্ধ হল কিন্তু মহাসমারোহে। আমাকে জামাই নেমন্তন্ন করেছিল। প্রচুর খরচ হল শ্রাদ্ধে। খুব আলো জ্বলল। লুচি ভাজা হল। বিশুদ্ধ ঘৃতের গন্ধে সারা বাড়ী আমোদিত। যারা খেতে এসেছিল তারা ওপর দিকে আঙুল তুলে দেখাতে লাগল—ওই দেখ। ভোলা সা দেখছে। আর রেগে আগুন হচ্ছে। বলছে—আমি ত মরেছি। এখন খুব খাও। খুব খাও। খুব ঘি পোড়াও। সবচেয়ে তামাসা হল যখন জামাতা বাবাজীবন ওরই ফাঁকে এক সময় আমায় এসে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন—Death-Duty-র হাত থেকে বাঁচা যাবে কি করে? হায়। হায়! এখন এঁর এই একমাত্র চিন্তা। কিন্তু বাঁচলেন না তিনি পুরোপুরি। গবর্ণমেণ্টের পেটে অনেক পয়সা চলে গেল। ভোলা সা-র বহু কষ্টার্জিত সম্পত্তি। বহু লোকের চোখের জলের বিনিময়ে জোগাড় করা অর্থ। ভোলা সা তখন আকাশ থেকে কি করছিলেন, তাই ভাবি: যক্ষের ধন আগলাতে পারলেন কি! সব সরকারের খাজনা খানায় ঢুকল গিয়ে।

ভোলা সাও মানুষ। মনে মনে ভাবি এই রকম জীবন কি আমার কাম্য? মন কিছুতেই সায় দেয় না। না-না। কদাপিও না। পয়সাটাই পৃথিবীতে একমাত্র জিনিষ নয়। ভোলা সার নাম কেউ মুখে উচ্চারণ করে না। বলে সারাদিন তাহলে উপবাসে কাটবে। এ আমার আদর্শ নয়।

আজ ভোলা সার নাতিকে দেখি, দামী প্যাণ্ট, দামী বুস্-সার্ট, পরে হন্‌হনিয়ে চলেছে। আজ ভোলা সার জামাইকে দেখি দামী সিল্কের

পাঞ্জাবী, দামী ফিন্‌ফিনে মিলের ধোয়া ধুতি, আর চকচকে জুতো পরে সাইকেল রিকসায় যাতায়াত করছে। বাবাজীবন পায়ে হেঁটে আর চলেনই না। নিজেকে বঞ্চিত করে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত করে, শ্বশুরের লাভ হল কি, কতবার বলেছি সাওজী, একটা সৎ কাজে কিছু দান কর।

তিনি জিজ্ঞেস করেছেন—কি সৎ কাজ ?

বলেছি—কলেজ, স্কুল, ইউনিভার্সিটি, কত কি আছে। দান কর।

বললেন—তাতে লাভ কি হবে ; লেখাপড়া শিখলেইত বাবুগিরিও শিখবে।

বললাম—হাসপাতালে দিন।

তিনি বললেন—গিরধর গোপালজী অ্যাডভোকেট ত পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন হাসপাতালে। বাচ্চারা দুধ খাবে বলে। তাঁর বাচ্চা হল না ? মনের দুঃখে টাকা দান করলেন। ভাবলেন আমার হল না তাতে কি ! যাদের হয়েছে, অথচ পয়সার অভাবে দুধ জুটছে না, তাদের ছেলেমেয়েরা খেয়ে বাঁচুক। কিন্তু দুধ খাচ্ছে কে ? খবর নিয়ে দেখুন। হাসপাতালের স্টাফ। আর ডাক্তাররা। বাচ্চা রুগীদের পেটে এক ফোঁটা দুধ যাচ্ছে নাকি ? আপনি আমাকে ওই রকম একটা ছেলেমানুষী কাজ করতে বলছেন ? আমি চুপ করে থাকতাম। এর ওপর আর কথা কি ? সত্যিই ত ! দান করার কি সার্থকতা আছে এদেশে। যেখানে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত সবাই—।

এইবার আমি আমার ওকালতী জীবনের যৎসামান্য দু'একটা কথা বলব। এটা আধটা কেসের কথাও বলব। নিজের কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে নয়। এইগুলোকে উপলক্ষ্য করে এখানকার লোকদের আচার-ব্যবহার, জীবন, মনস্তত্ব ইত্যাদি কিছুটা প্রকাশ পাবে বলেই। যার হয়ত কিছু ঐতিহাসিক মূল্যও থাকতে পারে। এই যুগটা ত হুস্ হুস্ করে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর কোন দিন ফিরে পাওয়াও যাবে না। এমন কি আর কিছু দিন পরে এসব কথা লোকে

বিশ্বাসও করবে না। ধনতান্ত্রিক সমাজের, বিলীয়মান বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের কথা কিছু বলে রাখি।

প্রথমেই বলি একজন অতি বিখ্যাত বিহারী অ্যাডভোকেটের কথা। তিনি আমার ওপর প্রভুত প্রভাব ফেলেছিলেন। এক হিসেবে তাঁকে ওকালতী জীবনের আদর্শ বলেই মনে করেছি। তাঁর নাম নাগেশ্বর প্রসাদ। বিহারে শিক্ষিত লোকদের ভেতরে এমন একজনও বোধ হয় নেই, যে তাঁর নাম জানে না। এত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তিনি। এত ধনী। এত সফল। এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি। একটা মোকদ্দমাকে ত্রিকোণ কাঁচ হিসেবে ব্যবহার করব। বিহারের সমাজ-জীবনের তৎকালীন আলেখ্য সপ্তবর্ণে রঙীন হয়ে ফুটে উঠবে। বাঙ্গালী, বিহারী, মাড়ওয়ারী, হিন্দু, মুসলমান সব মিলিয়ে এ এক চমকপদ কাহিনী। সাতটি রঙে রাঙ্গা রামধনু।

১৯৩৮ সালে ছাপরার টাউন থানার অফিসার-ইন-চার্জ ছিলেন, একজন বাঙ্গালী। দুর্গা বোস। স্থানীয় কালিবাড়ীতে ছিল বাঙ্গালীদের প্রথম সিনেমা হাউস "লক্ষ্মী-টকিস্"। হেমচন্দ্র মিত্রের নাম আগেই করেছি। একজন সফল আইনব্যবসায়ী। কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয়ে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ব্যবসা করে আরো ধনী হবো ভেবেছিলেন। প্রকৃষ্ট ব্যবসা হিসেবে মনোনীত করলেন সিনেমা-ব্যবসা। আর চিনির কল। দুটোই আজ বেহাত হয়ে গেছে। বাঙ্গালীরা আর এদের সত্ত্বাধিকারী নয়। বাঙ্গালীদের এমনই সুন্দর ব্যবসাজ্ঞান। লক্ষ্মী টকিজের অপারেটর ছিল, দুর্গা বোস।

সিনেমার দর্শক নানারকমের হয়ে থাকে। বাসদেও সা ছিল স্থানীয় বাজারের এক কাপড়ের ব্যবসায়ী। তরুণ স্বাস্থ্যবান যুবক, কিছু উদ্ধত প্রকৃতির। দীর্ঘকায়। কোন একটা উপলক্ষ্য নিয়ে অপারেটর বোস এবং বাসদেও সা-র, সিনেমার ভেতরে ঝগড়া হয়েছিল। বোসকে নাকি মারধোর করা হয়েছিল। বোস নালিশ করেছিল দারোগা বোসের কাছে। বাজারে বাঙ্গালীদের এক বড় ওষুধের দোকান ছিল। এল্

এন্ নিয়োগী অ্যাণ্ড কোম্পানী। তার এক অংশীদার ছিলেন যতীন্দ্র নাথ সুর। মাতব্বর ব্যক্তি। খদ্দর পরেন। গান্ধীজির চেলা হয়ে ছিলেন। পরোপকারী লোক। বাজারে খুব প্রভাব। বাঙ্গালীরাও তাঁকে মানে টানে, বিহারীরাও শ্রদ্ধা করে। দারোগা বোস মাঝে মাঝে তাঁর দোকানে আসেন। চা খান। গল্প করেন। দারোগা বোস হৃষ্ট পুষ্ট ব্যক্তি। বড় বড় চোখ। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। দারোগা হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। গম্ভীর ভারিক্কী কণ্ঠস্বর।

সেদিন বিকেলে দারোগা সাহেব ওষুধের দোকানে এসেছেন। পেছনে পেছনে নালিশ জানাতে জানাতে এসেছে অপারেটর বোস! তখন ইংরেজ রাজত্ব। বাঙ্গালীরা বিহারে ছিল ইংরেজের ডান হাত। প্রত্যেক সরকারী চাকুরে বাঙ্গালী, নিজেকে একটা কেওকেটা বলে মনে করত। দারোগা বোস তাঁর অনুচর সিপাহীকে হুকুম দিলেন, বাসদেওকে ডেকে আনতে। বাসদেওর দোকান কাছেই। সে নিজে ত এলোই না। উল্টে সিপাহীকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিল।

তখন দেশে নতুন হাওয়া বইতে সুরু করেছিল। বাসদেও ছিল দেশপ্রেমিক। গান্ধীভক্ত। নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। অপরের দোকানে তাকে ডেকে পাঠাবার কি অধিকার দারোগার? তার কাছে তখন বসেছিল তার বন্ধু নন্দলাল জালান। মাড়োয়ারী যুবক। কাপড়-ব্যবসায়ী। দুজনেই খুব ধমকে দিল সিপাহীকে। সিপাহীর অপমান হল যথেষ্ট। কাঁদতে কাঁদতে দারোগার কাছে গিয়ে নালিশ করল। বললে—মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাজারের মধ্যে বসে এই কথা শুনে দারোগার মেজাজ বিগড়ে গেল! কিছু দর্শকও ছুটে গিয়েছিল তামাসা দেখবার জন্যে। দারোগা উঠলেন। গেলেন বাসদেওর দোকানে। সেখানে কথাকাটাকাটি হল। দারোগা এতে অভ্যস্ত নয়। সে থানা থেকে আরো সিপাহী ডেকে পাঠাল। রীতিমত হৈ চৈ ব্যাপার সুরু হল। বাসদেও ও নন্দলালকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে চললেন। রাত্রে প্রচুর প্রহারও নাকি করলেন। বাজার ভেঙ্গে

পড়ল। একি উপদ্রব পুলিশের ; বলেইছি তখন নতুন হাওয়া চলছে। দারোগার একটু হিসেবে ভুল হয়ে গেল। শুধু মারলে, গ্রেপ্তার করা চলে না। অতএব কিছু নুন মেশানো হতে লাগল। সিপাহীকে নাকি গলায় দড়ি বেঁধে প্রাণে মারবার চেষ্টা করা হয়েছিল। আইনে যাকে বলে ৩০৭ ধারা। তাই লাগানো হল। তিলকে তাল করা হল। একেই বলে থানা, পুলিশ, আর ফৌজদারী কেস। মিথ্যার পাহাড়।

পরদিন বাসদেও ও নন্দলাল ছাড়া পেল বটে, কিন্তু বাসদেওর শরীরে ছিল আঘাতের চিহ্ন। ডাক্তার সার্টিফিকেটও দিল। নালিশ করা হবে ঠিক হল। দারোগার ওপর নালিশ। কিন্তু কে দাঁড়াবে দারোগার বিরুদ্ধে? তেমন উকিল কোথায়? কিছু মোক্তার পাওয়া গেল। তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিষ্টার কেম্প্। আই. সি. এস। চতুর, বুদ্ধিমান, কৌশলী। বিহারী মোক্তাররা খুব সোরগোল তুলে বাঙ্গালী দারোগার বিরুদ্ধে ইংরেজ-কালেকটরের কাছে নালিশ করলে। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে প্রত্যেক শিক্ষিত বিহারীর তখন প্রবল বিতৃষ্ণা। ওরা আমাদের দেশে এসে সব লুটে খাচ্ছে। ওদের তাড়ানো উচিত। ইত্যাদি। অতএব বাজার সরগরম। খুব আলোচনা চলেছে। সহরের প্রতিটি কোণে। সাক্ষীর পর সাক্ষীর এজাহার নেওয়া হচ্ছে। কালেকটরের কোর্টে। কেম্প সাহেব খুব সহানুভূতি দেখাচ্ছেন। তারপর একদিন মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করে দিলেন। সহরে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠল। আমি কথাচ্ছলে একজনের কাছে বলেছিলাম, জজ সাহেব ইচ্ছে করলে, কালেকটরের হুকুম উলটিয়ে দিতে পারেন।

যার কাছে বলেছিলাম তার কথাটি এখানে না বললে আর এক পা অগ্রসর হতে পারছি না। কারণ, ওকালতী করতে গেলে বহুলোকের মঙ্গল-কামনা সহযোগিতা ইত্যাদি দরকার হয়। কোর্টের আশেপাশে চরকী মারছে অজস্র লোক। অসংখ্য দাবী-দাওয়া নিয়ে। সারা জেলার শত শত লোক কোর্টে আসছে। আসতে বাধ্য হচ্ছে।

এন্ নিয়োগী অ্যাণ্ড কোম্পানী। তার এক অংশীদার ছিলেন যতীন্দ্র নাথ সুর। মাতব্বর ব্যক্তি। খদ্দর পরেন। গান্ধীজির চেলা হয়ে ছিলেন। পরোপকারী লোক। বাজারে খুব প্রভাব। বাঙ্গালীরাও তাঁকে মানে টানে, বিহারীরাও শ্রদ্ধা করে। দারোগা বোস মাঝে মাঝে তাঁর দোকানে আসেন। চা খান। গল্প করেন। দারোগা বোস হৃষ্ট পুষ্ট ব্যক্তি। বড় বড় চোখ। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। দারোগা হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। গম্ভীর ভারিক্কী কণ্ঠস্বর।

সেদিন বিকেলে দারোগা সাহেব ওষুধের দোকানে এসেছেন। পেছনে পেছনে নালিশ জানাতে জানাতে এসেছে অপারেটর বোস! তখন ইংরেজ রাজত্ব। বাঙ্গালীরা বিহারে ছিল ইংরেজের ডান হাত। প্রত্যেক সরকারী চাকুরে বাঙ্গালী, নিজেকে একটা কেওকেটা বলে মনে করত। দারোগা বোস তাঁর অনুচর সিপাহীকে হুকুম দিলেন, বাসদেওকে ডেকে আনতে। বাসদেওর দোকান কাছেই। সে নিজে ত এলোই না। উল্টে সিপাহীকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিল।

তখন দেশে নতুন হাওয়া বইতে সুরু করেছিল। বাসদেও ছিল দেশপ্রেমিক। গান্ধীভক্ত। নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। অপরের দোকানে তাকে ডেকে পাঠাবার কি অধিকার দারোগার? তার কাছে তখন বসেছিল তার বন্ধু নন্দলাল জালান। মাড়োয়ারী যুবক। কাপড়-ব্যবসায়ী। দুজনেই খুব ধমকে দিল সিপাহীকে। সিপাহীর অপমান হল যথেষ্ট। কাঁদতে কাঁদতে দারোগার কাছে গিয়ে নালিশ করল। বললে—মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাজারের মধ্যে বসে এই কথা শুনে দারোগার মেজাজ বিগড়ে গেল। কিছু দর্শকও ছুটে গিয়েছিল তামাসা দেখবার জন্যে। দারোগা উঠলেন। গেলেন বাসদেওর দোকানে। সেখানে কথাকাটাকাটি হল। দারোগা এতে অভ্যস্ত নয়। সে থানা থেকে আরো সিপাহী ডেকে পাঠাল। রীতিমত হৈ চৈ ব্যাপার সুরু হল। বাসদেও ও নন্দলালকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে চললেন। রাত্রে প্রচুর প্রহারও নাকি করলেন। বাজার ভেঙ্গে

পড়ল। একি উপদ্রব পুলিশের ; বলেইছি তখন নতুন হাওয়া চলছে। দারোগার একটু হিসেবে ভুল হয়ে গেল। শুধু মারলে, গ্রেপ্তার করা চলে না। অতএব কিছু খুন মেশানো হতে লাগল। সিপাহীকে নাকি গলায় দড়ি বেঁধে প্রাণে মারবার চেষ্টা করা হয়েছিল। আইনে যাকে বলে ৩০৭ ধারা। তাই লাগানো হল। তিলকে তাল করা হল। একেই বলে থানা, পুলিশ, আর ফৌজদারী কেস। মিথ্যার পাহাড়।

পরদিন বাসদেও ও নন্দলাল ছাড়া পেল বটে, কিন্তু বাসদেওর শরীরে ছিল আঘাতের চিহ্ন। ডাক্তার সার্টিফিকেটও দিল। নালিশ করা হবে ঠিক হল। দারোগার ওপর নালিশ। কিন্তু কে দাঁড়াবে দারোগার বিরুদ্ধে? তেমন উকিল কোথায়? কিছু মোক্তার পাওয়া গেল। তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিষ্টার কেম্প্। আই. সি. এস। চতুর, বুদ্ধিমান, কৌশলী। বিহারী মোক্তাররা খুব সোরগোল তুলে বাঙ্গালী দারোগার বিরুদ্ধে ইংরেজ-কালেকটরের কাছে নালিশ করলে। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে প্রত্যেক শিক্ষিত বিহারীর তখন প্রবল বিতৃষ্ণা। ওরা আমাদের দেশে এসে সব লুটে খাচ্ছে। ওদের তাড়ানো উচিত। ইত্যাদি। অতএব বাজার সরগরম। খুব আলোচনা চলেছে। সহরের প্রতিটি কোণে। সাক্ষীর পর সাক্ষীর এজাহার নেওয়া হচ্ছে। কালেকটরের কোর্টে। কেম্প সাহেব খুব সহানুভূতি দেখাচ্ছেন। তারপর একদিন মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করে দিলেন। সহরে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠল। আমি কথাচ্ছলে একজনের কাছে বলেছিলাম, জজ সাহেব ইচ্ছে করলে, কালেকটরের হুকুম উলটিয়ে দিতে পারেন।

যার কাছে বলেছিলাম তার কথাটি এখানে না বললে আর এক পা অগ্রসর হতে পারছি না। কারণ, ওকালতী করতে গেলে বহুলোকের মঙ্গল-কামনা সহযোগিতা ইত্যাদি দরকার হয়। কোর্টের আশেপাশে চরকী মারছে অজস্র লোক। অসংখ্য দাবী-দাওয়া নিয়ে। সারা জেলার শত শত লোক কোর্টে আসছে। আসতে বাধ্য হচ্ছে।

স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা শিশু পর্যন্ত। এখানে আলোচিত হয় না, মানব-জীবনের এমন কোন অংশই নেই। হাসপাতালে থাকে রুগ্ন মানুষ। ব্যাক্‌টিরিয়া, ভাইরাস, ব্যাধিনাশের আক্রমণে যারা পরাজিত। শারীরিক অসুস্থতার দ্বারা যারা পীড়িত। কোর্টে আসে স্বাভাবিক মানুষই। কিন্তু যারা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অদ্ভুত আচরণ করে ফেলার জন্যে অভিযুক্ত। যেমন করে ফেলেছিলেন দারোগা বোস। কোর্টে কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডই যে হয়। জীবন-যজ্ঞ চলে এর প্রত্যেক কামরায়। এখানে রাজপুতরা সবাই নিজেদের মনে করে রাণা প্রতাপের বংশধর এক একজন। রাজপুত যে কত রকমের, তার ঠিক নেই। এরা কথাচ্ছলে বলে রাজপুত কয় প্রকার আর ধান কয় প্রকার তা বলা যায় না। অগণিত নাকি। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বিষেণ, উজেন, নিকুম্ভ, পাঁওয়ার, গৌতম, লোহতমিয়া, চৌহান, রাঠোর, তিলকচন্দি ইত্যাদি কতরকম রাজপুতই না আছে। এরা মনে মনে সকলেই আভিজাত্য-গর্বে গর্বিত। সকলেই "বাবু-সাহেব"। সকলেই জমিদার। রেজিষ্টার "ডি"তে নাম থাকলেই হল। সে একজন জমিদার। শাসকশ্রেণী। সামন্ততন্ত্র বিহারে যেমন সমাজের গভীর তলদেশ পর্যন্ত শেকড় গেড়ে আছে, তেমন আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বিহারে সবচেয়ে শক্তিমান জাত রাজপুত এবং ভূমিহার। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং ভূমিহার। অর্থমন্ত্রী অনুগ্রহ নারায়ণ সিং রাজপুত। স্বরাজ হওয়ার পর অনেক বৎসর এই দুইজন ব্যক্তিই বিহারকে শাসন করেছে। কংগ্রেসের সবচেয়ে বেশী ভক্ত ভূমিহার এবং রাজপুত। কারণ এরা সকলেই অল্পবিস্তর জমিদার। আর কংগ্রেসে ছিলই জমিদার এবং ব্যবসাদারদের আধিপত্য। গান্ধীজির দৌলতে।

এটা আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে প্রত্যেক রাজপুতই সম্ভ্রান্ত। নীচ কাজ তারা করতে পারে না। তারা খুন করতে পারে। লাঠি চালাতে পারে। এক টুকরো জমির জন্যে প্রাণ দিতেও পারে। নিতেও পারে। তাতে কোন দোষ নেই। জেলে যায়। ফাঁসী যায়। বেশ

হাসিমুখেই যায়। বলে ছেলেপুলেদের জন্যে যাহোক কিছু ব্যবস্থা করে গেলাম ত! আমি ফাঁসী গেলাম। কিন্তু ছেলে ভাইপো জমি ভোগ করবে ত? এই এদের মনোবৃত্তি। তারা গরুর গাড়ী চালাতে দ্বিধা করে না। কিন্তু তাদের "বাবু-সাহেব" বলে সম্বোধন করতে হবে। তবে তারা একটু পাশ কাটিয়ে রাস্তা ছেড়ে দেবে। নইলে পেছনের গাড়ী বা সাইকেল রিক্সা পেছন পেছন আসতেই বাধ্য হবে। তারা ডাকাতিই করবে। সঙ্কোচ অনুভব করবে না। বলবে সেতো মরদের কাজ। এখানকার একটা প্রচলিত পরিহাস এই ছড়াটাতে ব্যক্ত হয়—"সিপ্‌হীকে চোর, ঝরইকে ডাকু, অওর দোনোকে সর্দার কোরেয়াকে বাবু।" অর্থাৎ সিপাহী গ্রামের চোর এবং ঝরই গ্রামের ডাকাত বটে, কিন্তু দুজনকারই সর্দার কোরেয়া গ্রামের "বাবু-সাহেব।" জমিদার স্বয়ং। এ পরিহাস চোর ডাকাত এবং জমিদার সকলেই উপভোগ করে।

আমি এখানে শুধু জীবন বর্ণনা করতে বসি নি। জীবন ব্যাখ্যা করতেও বসেছি। সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক জীবন, কিছুই আমার পরিধির বাইরে নয়। বাংলা সাহিত্যে বিহারী চরিত্র খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত হতে বেশী দেখতে পাই না। আমি নিজেকে বিহার ও বাংলার মধ্যেকার বেসরকারী দূত বলেই মনে করি। Liason-Officer। তাই বিহারী চরিত্র একটু পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করে চলেছি।

আমার ওকালতী-জীবনটা উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য আরও গভীর। এক মহাভারত গড়ে তোলার। এক মহাজাতি নির্মাণ করার। সে জাতির নাম ভারতীয় জাতি। সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। বাঙ্গলা নয়, বিহার নয়, উত্তরপ্রদেশ নয়, অন্ধ্রপ্রদেশ নয়, উড়িষ্যা নয়। কিন্তু সকলকে মিলিয়েই এক মহাদেশ। emotional integration হবে কি করে? আবেগ সঞ্চারিত হবে কি করে। যদি পরস্পর পরস্পরকে নাই জানল, পরস্পর পরস্পরের প্রতি আবেগে

আপ্লুত হবে কি করে? পরস্পরকে ভালবাসতে গেলে, আগে পরস্পরকে জানতে হবে। বাঙ্গালী বিহারীকে সঠিক জানে না। বিহারী বাঙ্গালীকে সঠিক জানে না। পরস্পরের চরিত্রের সৌন্দর্য পরস্পরে অনুভব করবে কি করে? যদি উভয়ে উভয়কে ভাল করে না জানে! তাই পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি হবার আশঙ্কা জেনেও আমি এই কাজে কিছুটা অগ্রসর হচ্ছি। আমি শিল্পীর চোখ দিয়ে মানুষের জীবনের ইতিহাসকে দেখি।

আমার বাসাবাড়ীটা একটু বড়ই ছিল। রাস্তার ওপরে একটা ঘর অব্যবহৃত পড়েই ছিল। কোর্টে ঘুরে বেড়ানো এক রাজপুত "বাবু সাহেবের" সঙ্গে মৌখিক পরিচয় হয়েই গিয়েছিল। একদিন তিনি বললেন—তাঁকে ওই ঘরটায় থাকতে দিতে পারি কিনা। আমি রাজী হলাম। ভাড়ার কথা তিনিও তুললেন না। আমিও তুললাম না। আমি এই শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে খুব সমীহ করেই কথা বলতাম। এমন-কি কিছু কিছু মাপ বাড়িয়েই। কখন্ যে পান থেকে চুন খসে যাবে তাতো জানি না। আর পান থেকে চুন খসলেই এদের একেবারে ধনুষ্টঙ্কার! এমনি স্পর্শকাতর এই দেশের এই জাতটার মর্যাদা সম্বন্ধে।

বাবু সাহেব থাকতে লাগলেন। তিনি কাছারীতে প্রতিদিন যেতেন। নিজের মামলা-মকদ্দমা থাকতই। অপরের মামলা-মকদ্দমা তদ্বিরের কাজও করতেন। ছোটখাটো গ্রাম্য জমিদার ছিলেন। বলেইছি বিহারে জমিদারদের বেজায় খাতির। যত ছোট জমিদারীই হোক, তিনি মালিক-শ্রেণীরই একজন। প্রজা-শ্রেণীর নন। রায়ত নন। জমিদার। তার ওপর যদি রাজপুত হন, তাহলে আর কথাই নেই। তাঁকে লোকে "বাবুসাহেব" বলে সম্বোধন করবেই। না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। মালিক বলে সেলাম করবে। রাজপুত হলে 'বাবু সাহেব' বলবে। ভূমিহার হলে 'মালিক'। তিনি গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বরে "জীও" "জীও" বলে আশীর্বাদ বিতরণ করবেন। এই রাজপুত ও

ভূমিহার-শ্রেণীই বিহারের মেরুদণ্ড। ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরে আসেন। আহির, গোয়ালা, তিলি, কাহার, কুর্মী, সওথিয়ারা, পরে আসে। বলাবাহুল্য বর্ণ হিসেবে তারা সমাজে একটু নিম্নস্থানই অধিকার করে। বাঙ্গলাদেশের মত শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবী সম্প্রদায়, এখানে খুব বেশী সংখ্যায় সে সময় ছিল না। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরাণী খুব বেশী ছিল না। বাঙ্গালীরা এসে সেই স্থানটা দখল করেছিল। বাঙ্গালীরা একটা স্বতন্ত্র জাত। তাদের আচার, ব্যবহার, পোষাক-আসাক, খাদ্য, ভাষা, সব পৃথক। কাজেই তারা ব্রাহ্মণও নয়, কায়স্থও নয়, রাজপুত ও ভূমিহার ত নয়ই। তারা সরল করে নিয়েছিল সম্পর্কটা। ওরা বাইরের লোক। ইংরেজের পেছনে পেছনে এসেছে। শিক্ষাদীক্ষায় বেশী অগ্রসর। কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হয়েছে ১৮৫৭ সালে। তখন বাঙ্গলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, সব এক প্রদেশেই ছিল। বেঙ্গল। এক হাইকোর্ট। এক লাটসাহেব। এক বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯১২ পর্যন্ত কলকাতাই ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। সংস্কৃতির কেন্দ্রও ছিল কলকাতা। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সব একটি জায়গাতেই একদিন স্থান পেয়েছিল। সে স্থান ছিল উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন একটি সহর, একসঙ্গে এতগুলি ক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থানীয় হয়ে ওঠেনি। এই সৌভাগ্য হয়েছিল কলকাতার। এই সৌভাগ্য হয়েছিল বাঙ্গালীর। তাই সারা ভারতবর্ষের চক্ষুপীড়ার কারণ তারা হয়ে উঠেছিল। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, বাঙ্গালীর সেই সৌভাগ্যের দিন আর নেই। শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এখন দিল্লী। ভারতবর্ষের মক্কা। সকলেই হজ করতে সেখানে ছুটেছে। বাঙ্গালীর মধ্যে এখনও বেঁচে আছে সেই সৌভাগ্যের স্মৃতি। এখনও বেঁচে আছে ইংরাজের স্মৃতি।

তাই বাঙ্গালী অপর প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। কেমন যেন একটা বাধো-বাধো ঠেকে। উভয় পক্ষেরই।

তখন বিহারের মধ্যে সব চেয়ে নামী ফৌজদারী উকিল নাগেশ্বর প্রসাদ। পাটনায় থাকেন। হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট, কিন্তু অধিকাংশ দিনই মফঃস্বলে ঘোরেন। খুনের জটিল মোকদ্দমায়। সারা বিহার চষে বেড়ান। এখানেও এসেছিলেন। তাঁকে জেরা করতে দেখেছিলাম। বক্তৃতা করতে শুনেছিলাম। খুব প্রাণ ঢেলে কাজ করেন। সাব্যস্ত হল তাঁকেই রাখা হবে। আমি জজের কাছে দরখাস্ত লিখে দিলাম। তিনি এলেন। তখন জজ ছিলেন T.G.N. Iyer। মাদ্রাজী আই-সি-এস। তিনি আবেদন admit করলেন। অপরপক্ষকে নোটিশ দেওয়া হল। শুনানীর তারিখ পড়ল। আয়ার-সাহেবের গৌরবর্ণ রং। মাথা-জোড়া টাক। তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ। মিষ্টি হাসি সব সময়ে ঠোঁটের কোণে।

কাল শুনানী হবে। আজ কোর্টে কাজ করছি। বেলা বারোটা। হঠাৎ বাসদেও সপারিষদ এসে বললে—এখনি আপনাকে পাটনা যেতে হবে। নাগেশ্বরবাবু ফোন করেছেন। বলেছেন, আপনাকে নিয়ে আসতে। নইলে তিনি কাল এখানে এসে কাজ করতে পারবেন না। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—তিনি ত কাল আসছেনই এখানে। কাগজ পত্র নিয়ে যাও। তাঁকে তৈরী করাও।

তারা বললে—ওঁর এই হুকুম। আপনাকে যেতেই হবে। ছাপরার জনসাধারণের এই দাবী। আপনাকে শুনতেই হবে।

অগত্যা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হল। সন্ধ্যাবেলা পাটনা পৌঁছলাম। পাটনার সেরা জায়গায় নাগেশ্বরবাবুর বিরাট বাড়ী। নাগেশ্বরবাবু আমাদের খুসী হয়েই গ্রহণ করলেন। ভেতরে অফিসে গিয়ে বসতে বললেন। সুসজ্জিত অফিস। বইয়ের আলমারী চারদিকে। একটু পরে নাগেশ্বরবাবু এলেন। এসেই বললেন—নজীরগুলো এনেছেন?

বললাম—হ্যাঁ।

তিনি পড়তে লাগলেন। খুব নিবিষ্টমনেই পড়তে লাগলেন। একটার পর একটা। তারপর আলোচনা আরম্ভ হল। গোড়া থেকে শেষ

পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলেন। আমিও বলছি। মক্কেলরাও বলছে। তিনি সকলের কথাই ধৈর্য ধরে শুনছেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি তাঁকে। ভাবছি বড় উকিল হওয়ার রহস্যটা কি! কি এঁকে এত বড় করেছে? অধ্যয়ন? জ্ঞান? মস্তিষ্ক? বাচনভঙ্গী? কি? কি? আমি দেখছি তাঁকে অসীম কৌতূহল নিয়ে। এত আজেবাজে কথাও মানুষ এত ধৈর্য ধরে শুনতে পারে? আমিই অধৈর্য হয়ে পড়ছি। কিন্তু তিনি নন। তিনি নির্বিকার চিত্তে সবই শুনে যাচ্ছেন। এক মিনিটে তাঁর সফল হওয়ার সমগ্র রহস্য আমার সামনে ঝল্‌সে উঠল। এক উত্তম শ্রোতা। উত্তম শ্রোতা না হলে উত্তম বক্তা হতে পারা যায় না।

নটা বাজল। আমি উঠতে চাইছিলাম। বললেন কোথায় যাবেন?

বললাম—আত্মীয় আছেন কাছেই। তাঁর কাছেই যাব।

ভাবলাম এইবার বুঝি তিনি কাষ্ঠ হাসি হেসে সৌজন্য সহকারে বলবেন—বেশ! তাহলে আসুন। কিন্তু বিস্মিত হয়ে শুনলাম তিনি বলছেন—বাঃ আমি আপনাকে আনালাম আর আপনি অন্য জায়গায় থাকবেন? সে কি করে হয়? আমি আপনাকে আনিয়েছি। মক্কেল আমার কথায় আপনাকে নিয়ে এসেছে। অতএব আপনাকে আমার কাছেই থাকতে হবে। সকালের ষ্টিমারেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। কেমন? বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে ভেতরে চলে গেলেন।

মক্কেলরা খুব খুশী।

একটু পরে ডাক এলো ভেতর থেকে। নাগেশ্বরবাবুর সঙ্গে ভেতরে গেলাম। একটা বারান্দার মেঝেতে দুটো আসন পেতে ঠাঁই করা হয়েছে। দুটো থালায় লুচি। বাটিতে মাংস। প্লেটে কাটলেট, চপ ইত্যাদি। হোটেল থেকে সদ্য সদ্য আনানো হয়েছে তা বোঝাই গেল। নাগেশ্বরবাবু বেশ খেতে পারেন। আমায় কম খাওয়ার জন্যে অনুযোগ করলেন। নাগেশ্বরবাবু কিছুদিন আগে বিলেত ঘুরে এসেছিলেন। সারা ইউরোপ ঘুরেছিলেন। কিন্তু তাঁর কোনখানটাতেই

সাহেবীয়ানা নেই। না পোষাক-আষাকে। না খাওয়া-দাওয়ায়। তিনি অত্যন্ত গরীব ঘরের ছেলে, তাঁর মা পরের বাড়ী রান্না করে তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন। মনে মনে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী। অহঙ্কারে বিন্দুমাত্র স্ফীত-মস্তিষ্ক নন। আজ তিনি পঁচাশী বছর বয়সে পৌছেছেন। কিন্তু আজও কর্মক্ষম আছেন। আজও তাঁর দৈনিক ফি তিন হাজার টাকা। হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। কিন্তু পদত্যাগ করলেন। কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার কেসে সরকারী উকিল হয়ে গিয়েছিলেন। পাটনায় তাঁর অগণিত বাড়ী। সারা বিহারে ছড়িয়ে আছে ক্ষেতের পর ক্ষেত। জমির পর জমি। আজ তাঁকে কোটিপতি বললেও ভুল হবে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটা ঘরে নিয়ে এলেন। বিছানা প্রস্তুত। পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভশয্যা। নেটের মশারী। আমি শুয়ে পড়লাম। তিনি নিজের হাতে মশারী গুঁজে দিলেন। বললেন—এই আপনার খাবার জন্যে জল রাখা রইল গেলাসে। পাশেই বাথরুম। সেখানে সবই ঠিক আছে। রাত চারটের সময় আপনাকে এসে তুলব। তারপর মহেন্দ্রু ঘাটে যাব জাহাজ ধরতে। আমার মোটর প্রস্তুত থাকবে।

তিনি চলে গেলেন ভাবতে লাগলাম কোথায় ছাপরার কোর্ট বারটার সময় কালো কোট সাদা প্যান্ট পরে কাজ করছিলাম। কোথায় শুয়ে আছি রাত এগারোটার সময়। সে কি আমার এই আমি ? সবই কি আমার শক্তিতেই হয়ে চলেছে ? অথবা অন্য কোন একটা শক্তিও আছে ! এই ত আমার চিরদিনের প্রশ্ন। আমিই কি সর্বেসর্বা ? অথবা তৃতীয় একটা শক্তি আমার পেছনে আছে !

ভোর চারটের সময় নাগেশ্বরবাবু এসে ডাকাডাকি করছেন।—উঠিয়ে ওকিল সাহেব ! চার বাজ গিয়া। তাড়াতাড়ি উঠলাম। মুখ-হাত ধুলাম। চা খেলাম। তারপর রওনা হয়ে পড়লাম। নাগেশ্বরবাবুর মোটর প্রস্তুতই ছিল। মহেন্দ্রু ঘাটে গিয়ে জাহাজে উঠলাম, দোতালার

উচ্চশ্রেণীতে।

জাহাজের দোতালা থেকে গঙ্গার কিছুদূর দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। তখনো সূর্য ওঠেনি। কিন্তু চারদিক ফর্সা হয়ে গেছে। নীচে জাহাজের ইঞ্জিন গর্জন করছে। ফেরিওয়ালা চা, পান, চুরুট, মাখন, ফিরি করছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু জল আর জল। ওপারে ক্ষীণ দিগন্তরেখা। আকাশের সঙ্গে যেন মিশে গেছে তরুশ্রেণীর রেখা।

জাহাজে নাগেশ্বরবাবু গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। সহরের ইট কাঠ ছেড়ে কি সুন্দর মুক্তি। প্রকৃতি এখানে মুক্ত।

গঙ্গা পার হতে দু ঘণ্টা সময় লাগল। আমরা কেউ কোন কথা বলছি না। শুধু গঙ্গা দেখছি।

অবশেষে আমরা পলেজা ঘাটে পৌঁছলাম। তখনকার দিনে পলেজা ঘাট থেকে ছাপরা পর্যন্ত ট্রেন ছিল না। আমরা সোনপুর স্টেশনে গেলাম। সেখানে গিয়ে ছাপরাগামী ট্রেনে চড়ে বসলাম। ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাস সম্পূর্ণ খালি।

এইবার নাগেশ্বরবাবু একটি কাজ করলেন যার জন্যেই তিনি নাগেশ্বরবাবু। যা আজও আমার স্মৃতিতে বেঁচে রয়েছে।

ছাপরা পৌঁছতে দেড় ঘণ্টা লাগল। এই দেড় ঘণ্টা আমি অনর্গল বক্তৃতা করে গেলাম। শ্রোতা কেউ নেই। আমরা দুজন মাত্র কামরায়। সেকালে সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ে পয়সা নষ্ট করার মত বোকা, এখানকার লোক ছিল না। তারা থার্ডক্লাসে চড়ত বাধ্য হয়ে। ফোর্থ ক্লাস নেই বলে। তাও বিনা টিকিটে যেতে পারাটা পৌরুষের চিহ্ন বলেই ধরে নিত। স্টেশনে থামলে আমরা নাটকের যবনিকাপাত করতাম। নতুবা ভিড় জমে যাবে জানলার ধারে। তারপর চলত এই প্রহসন। নকল অ্যাডভোকেট নাগেশ্বর প্রসাদ, তার শ্রেষ্ঠ বর্ণনাশক্তির পরিচয় দিতে লাগল। নকল জজ সাহেব চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে শুনে যেতে লাগলেন। দুজনেই জানি অভিনয় হচ্ছে। কিন্তু এই অভিনয়ের মাধ্যমে একজন যে নিঃশব্দে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছেন, তা বুঝতে আমার

বাকী রইল না। জুনিয়ার সিনিয়ার চায়। আইনের জগতে একথাটা খুবই জানা। কিন্তু সিনিয়রও যে জুনিয়ার চায়, এ কথাটা নতুন শিখলাম। কিন্তু শুধু চাইলেই হল না। তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করাটাও জানতে হবে। দেখলাম, নাগেশ্বরবাবু তা জানেন। তাই সাফল্যের পর্বত-শিখরে তিনি আরোহণ করতে পেরেছেন। যার উপর কেউ পারেনি। আইন ব্যবসায়ীদের ঘোড়দৌড়ের মাঠে তিনি প্রথম স্থান দখল করেছেন। বিনা কারণে নয়। সাফল্য বায়ু-পথে উড়ে আসে না। বীর্যশুল্কে তাকে অর্জন করতে হয়। যখন থেকে আমি নাগেশ্বরবাবুর কাছে এসেছি। তখন থেকে তিনি আমাকে চিনির কলে যেমন করে আখ নিঙড়োয়, তেমনি করে নিঙড়াচ্ছেন।

এগারোটায় কোর্টে গেলেন। অতি সুন্দর বক্তৃতা করলেন। যদিও ভাষার চাকচিক্য নেই। বাক-প্রবাহ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কিন্তু যুক্তি কি অকাট্য। বিশ্লেষণ কি মনোরম। শ্লেষ, কটাক্ষ, বিদ্রূপ, কি হৃদয়গ্রাহী। সমস্ত আদালত-কক্ষ যেন রসসাগরে ভাসমান। ইংরেজ আই-সি-এস, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, উপহাসিত হচ্ছেন। ভারতীয় আইনজ্ঞ, ভারতীয় বিচারকের সামনে এই দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত। দর্শক, শ্রোতা সমস্তই ভারতীয়। তখন দেশ পরাধীন, ইংরাজের রক্তচক্ষুর সামনে থরহরি কম্পমান।

পাটনায় যখন নাগেশ্বরবাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম তখন সেখানে দু' একজন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেটও ছিলেন। তাঁরা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। ছাপরার জুনিয়ারকে পাটনায় আনবার আবশ্যকতা কি? নাগেশ্বরবাবু সংক্ষেপে বলেছিলেন—আবশ্যকতা আছে। কি সেই আবশ্যকতা, তা সকলে বোঝে না। তাই তারা যেখানে আছে, সেখানেই থেকে যায়। নাগেশ্বরবাবুর আবশ্যকতা, আর অন্যান্য সকলের আবশ্যকতা এক নয়। তাই নাগেশ্বরবাবু, নাগেশ্বরবাবু। বিহারে তাঁর অবর্তমানে আর দ্বিতীয় নাগেশ্বরবাবু হবে না। প্রস্তুতি না থাকলে অভিলষিত পরিণতি হয় না। প্রস্তুতির ফলই পরিণতি।

প্রত্যেক হাইকোর্টের প্রত্যেক অ্যাডভোকেটের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। যথোপযুক্ত প্রস্তুতিই থাকে না অনেকের।

ছাপরার লোক তিনি। ছাপরায় তাঁর বিরাট প্রাসাদ। সেখানে সকালে গেছি। তিনি কথা বলছেন। একজন ভৃত্য তাঁর মাথায় তেল ঘসছে। সুগন্ধি তেল। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম বাংলার গৌরব। জবাকুসুম। প্রায় একঘণ্টা তেল-মালিশ চলে। শিশিরবাবুকে দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর পা টেপা চলেছে। রক্ত চলাচল দ্রুত না হলে, মস্তিষ্ক দ্রুত চিন্তা করতেই পাবে না।

জীবন-প্রভাতেই নাগেশ্বরবাবুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে হয়েছিল। একজন মিউনিসিপাল কমিশনারের মিথ্যা-ভাষণের অপরাধে সাজা হয়েছিল। বিরাট ধনী ব্যবসায়ী। নাগেশ্বরবাবুকে বহু খরচপত্র করে আনিয়ে ছিল। আপীলের সময়। জজসাহেব ছিলেন ইহুদী আই-সি-এস লুকাস সাহেব। আমি ছিলাম সরকারী উকিল। সবচেয়ে জুনিয়র সরকারী উকিল ছিলাম বলেই বোধহয় সরকারী উকিল রায়বাহাদুর বৃজবিহারী প্রসাদ আমার কাছেই ব্রিফ্ পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান অভিযুক্ত রখুনী সাহ তাঁর বন্ধু। আসছেন নাগেশ্বরবাবু। ফল পূর্বাহ্ণেই অনুমান করা যায়। কিন্তু বিধির বিধান। আপীল ডিসমিস হয়ে গেল। ইহুদী জজ ধনীকে রেহাই দিলেন না। নাগেশ্বরবাবুর সকল প্রচেষ্টা বিফল হল।

নাগেশ্বরবাবু সেই থেকেই হয়ত আমাকে মনে রেখেছিলেন। মক্কেলের মুখে আমার নাম শুনে আমাকে ডেকে পাঠানোর সময় একটা কৌতূহল যে উঁকি মারেনি তা আমি জোর করে বলতে পারি না। নাগেশ্বরবাবুর দ্বিতীয় বিশেষত্ব আমি দেখলাম—কৌতূহল। আকর্ষণীয় কৌতূহল। সব বিষয়েই। তিনি ইউরোপ গিয়েছিলেন শুধু বেড়াতে। শুধু কৌতূহল মেটাতে। পৃথিবীটাকে জানতে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম —আপনি ব্যারিস্টার হলেন না কেন? তিনি বলেছিলেন—কি জন্যে হব? ব্যারিস্টার হলেই যে লক্ষ্মীলাভ হবে নতুবা হবে না তার কোন

মানে আছে কি? আপনাদের রাসবিহারী ঘোষ কি ব্যারিস্টার ছিলেন?

এম্‌জেড খান ছিলেন অতিশয় স্বল্পবাক ব্যক্তি। অতিরিক্ত গম্ভীর। অতিরিক্ত সাহেবী-ভাবাপন্ন। কিন্তু মনে মনে সাহেব আই সি এস-দের বিপক্ষে। কেম সাহেব যা করেছেন, তার উল্টো করাই চাই। কেম বোস দারোগার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা খারিজ করেছিলেন। ইনি বোস দারোগার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালু করেছিলেন। এতটা আমিও ভাবতে পারিনি।

তিনটি সিবিলিয়ানই প্রায় সমবয়সী। সুশ্রী, সুশিক্ষিত, মার্জিত রুচি। পোষাকে-আসাকে তিনজনই টিপটপ সাহেব। কিন্তু ইংরেজ-বিদ্বেষে দুই ভারতীয় সিবিলিয়ানই সমান। একজন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। আর একজন বিহারী মুসলমান। মনোভাব দুজনেরই এক। ইংরেজের প্রভুত্ব কেউ চায় না।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রায় চল্লিশ বছর আগে বর্মায় সাহিত্য-সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—"বাঙ্গালীরা বর্মা দেশে এতদিন রইল। কিন্তু বর্মীদের জীবনচিত্র বাংলা-সাহিত্যে খুব প্রতিফলিত হতে দেখা গেল না। শরৎচন্দ্র ও সীতাদেবী কিছু লিখেছেন বটে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আমার মনে কথাটা গেঁথে গিয়েছিল। আমরাও ত বিহারে এতদিন ধরে আছি। কিন্তু বিহারী-চরিত্র আমাদের কলমে কতটুকু ফুটেছে? বিহারের আর্ট, কালচার, সংস্কৃতি, সম্বন্ধে আমরা কতটুকু আলোকপাত করেছি?

মোহিতলাল মজুমদার পাটনার সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করতে এসে বলেছিলেন—আপনাদের বাঙ্গালী প্রাণ ও প্রতিভা ভারতের সর্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া, এমন একটি স্পন্দন অনুভব করিতে পারে যাহাতে বাংলা ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতির একটি পূর্ণতর রূপ প্রতিফলিত হয়। আপনারা যদি প্রাদেশিকতামুক্ত হইয়া ভারতবর্ষের আত্মাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে বাঙ্গালী জাতির জন্যে একটি

নূতন গৌরব অর্জন করিবেন।"

কথাগুলো কি কেবল বক্তৃতার মঞ্চ থেকেই শ্রুত হবে? জীবনের মঞ্চে প্রতিফলিত হবে না? আমি যতদূর সম্ভব সেই চেষ্টাই করব। প্রথমেই ধরি নাট্য-সংস্কৃতি। কারণ সেই দিকটাতেই আমার প্রচণ্ড কৌতূহল। প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু আজও সব পরিষ্কার মনে আছে। যেন কালকের ঘটনা। খোলা মাঠে ষ্টেজ বেঁধে তাঁবু খাটিয়ে নাট্যাভিনয় হচ্ছে। হিন্দী নাটক। ইলেকট্রিক নেই। কাজেই গ্যাসবাতি জ্বালানো হয়েছে। কারবাইটের সেই পরিচিত গন্ধ আজও যেন নাকে লেগে আছে। সেদিন থিয়েটারের সঙ্গে এই তীব্র আলো এবং তীব্র গন্ধ যেন এক হয়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। পুরীতেও ছিল তাই। এখানেও দেখলাম তাই। নাটকের নাম কি? শুনলে বাঙ্গালীরা হয়ত আশ্চর্য হয়ে যাবেন। ডি. এল. রায়ের "পরপারে"। হিন্দীতেই তর্জমা করা হয়েছে! নাম দেওয়া হয়েছে "উসপার"। ভাব একই। ভাষা সামান্য পৃথক। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাটক দেখতে লাগলাম। বিলক্ষণ কৌতূহল। আমরা মানে কয়েকজন বাঙ্গালী ছেলে। তার মধ্যে একজন বন্ধুবর রামনারায়ণ রায়। বিহার ব্যাঙ্কের অ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার। খাস ভবানীপুরের ছেলে।

একটি পুরুষই নায়িকা সেজেছে। নাম মহম্মদ হাফিজ। খুব সুন্দর অভিনয় করছে। যথেষ্ট নাটকীয়তা জ্ঞান আছে তার। উত্তেজনা সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়েছে। হয়ত একটু over acting হচ্ছে। কিন্তু এখানে তা ছাড়া চলে না। এখানে তখন দানীবাবুরই প্রভাব। শেষে তার climax scene-এর acting দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। খুব জোরের সঙ্গে করতালি দিতে লাগলাম। আমার সঙ্গী বন্ধুরাও খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। কথাটা কর্তৃপক্ষের কানে গেল। আমরা ছিলাম সবার পেছনে। সকলের পশ্চাতে। অনাহুত, রবাহুত দর্শক। প্রবেশ-পত্রের কথা ভাবতেও পারে না কেউ সে সময়। বেড়িয়ে ফিরছিলাম। গ্যাসের আলো আর কোলাহল দেখে সেইদিকে

গিয়েছিলাম। নাটক হবে শুনে থেকে গেলাম। ড্রপসিন অতি সুন্দর। শ্রদ্ধা উদ্রেক করল। এ তো কলকাতার চিত্রকরের হাতের নমুনা বলেই মনে হচ্ছে।

তখন শীতকাল। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতও বাড়তে লাগল। হঠাৎ দেখি ট্রেতে সুসজ্জিত চায়ের পেয়ালা। ধূমায়মান। বাহক বললে—আপনাদের জন্যেই এনেছি। কি ব্যাপার? আমরা অবাক হয়ে গেলাম। কে পাঠিয়েছে? তখন থিয়েটারের আশে-পাশে চায়ের দোকান গজিয়ে উঠত না। অথচ এই বহু প্রত্যাশিত জিনিসটি কে দয়া করে পাঠিয়েছে? কে সেই মহানুভব কার এত দরদ উথলে উঠল? সামান্য কয়েকটি বাঙ্গালী ছেলের প্রতি। দামও লাগল না। কিছুই না। শুনলাম, ম্যানেজার সাহেব পাঠিয়েছেন। কে ম্যানেজার সাহেব? কোথাকার ম্যানেজার? কেন পাঠিয়েছেন?

শুনলাম, বিহার ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। নাম মহেন্দ্রপ্রসাদ। খুব নাট্যোৎসাহী ব্যক্তি। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় নাট্যাভিনয় হচ্ছে। আমাদের অভিনয় যে ভাল লেগেছে তা তাঁর কানে পৌঁছিয়েছে। তাঁর ভেতরের সেই কলকাতার সুপ্ত ছাত্রটি জেগে উঠেছে। তিনি খুসী হয়েছেন। ভেতরে চায়ের ব্যবস্থা ছিলই। অভিনেতারা চা খাচ্ছেই। দর্শক বঞ্চিত থাকবে কেন? কিন্তু বোদ্ধাদর্শক ত অনেক ছিল। তারা চা পেল না কেন? আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজনই-বা পেলাম কেন? কারণ আমরা বাঙ্গালী। এই সম্মান সেদিন বাঙ্গালীর জন্যে এদেশে নির্ধারিত ছিল। কারণ মহেন্দ্রপ্রসাদ উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন কলকাতাতেই। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছিল কলকাতার ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গীর মতই। কলকাতার এ ঋণ সারা ভারতবর্ষকে স্বীকার করতেই হবে। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা অনেকের অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার দূর করেছিল। অনেকের চক্ষু উন্মীলন করেছিল। আধুনিক একলব্যরা গুরুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করে অবশ্যই।

কিন্তু গুরু গুরুই থাকেন। ছাত্র ছাত্রই থাকে।

আমার নাট্যাভিনয় এত ভাল লাগল যে আমি "শাস্তার" ভূমিকাভিনয়কারী হাফিজকে একটি রৌপ্যপদক দিতে চাই, বলে ঘোষণা করালাম। ম্যানেজার সাহেব তা মঞ্চের ওপর এক তরুণ বাঙ্গালী উকিলকে দিয়েই ঘোষণা করালেন। তাঁর নাম ছিল সুশীলকুমার মুখার্জী। সরকারী উকিল মৃত বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জীর পুত্র।

দাদামশায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রামচন্দ্র সিং। জাতে রাজপুত। লম্বা, একহারা, সুশ্রী গঠন। বাঙ্গলা বলতেও পারতেন। কলকাতার থিয়েটর খুব দেখেছেন। আর হাফিজও নাকি কলকাতায় ষ্টার থিয়েটারে দানীবাবুর অভিনয় দেখেছে। দেখে মুগ্ধ হয়েছে। মহেন্দ্রবাবু থিয়েটরের খুব ভক্ত হয়েছেন। কলকাতায় থাকার জন্যে। "আলিবাবা" দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এখানেও আলিবাবা অভিনয় করিয়েছেন। তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বড় ভাই। তাঁর স্রষ্টা। মহেন্দ্রপ্রসাদ না থাকলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ হতেন না। এই এখানকার লোকেদের বিশ্বাস। রাজেন্দ্রবাবুও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছিলেন। তিনি ছাপরা জিলা স্কুল থেকেই পড়াশুনো করেছিলেন। একজন বাঙ্গালী শিক্ষকই তাঁর মনে বড় হবার আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। তাঁর কথা রাজেন্দ্রবাবু নিজের জীবনীগ্রন্থে স্বীকার করতে কার্পণ্য করেননি। তাঁর নাম রসিকলাল মিত্র। রাজেন্দ্রবাবু কলকাতায় ইডেন হোস্টেলে থাকতেন। দেখতে অসুন্দরই ছিলেন। রোগা, ঢ্যাঙ্গা, কৃষ্ণবর্ণ, বালক একটি। কিন্তু বাঙ্গালীরা গুণের আদর করতে জানে। তারা ওই অসুন্দর বালকটিকেই কলেজের স্টুডেণ্ট-ইউনিয়নের সেক্রেটারী মনোনীত করল। ইংরাজ প্রিন্সিপাল পারসিভেল সাহেব তা সমর্থনও করলেন। এসবের প্রভাব স্পর্শকাতর তরুণ-মনে পড়া স্বাভাবিক। ভাই দুটির মনে পড়েও ছিল।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন সহপাঠী জে এল মজুমদার। পরে যিনি লেবার ট্রাইবিউনালের জজ হয়েছিলেন। যিনি দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনেই উঠতেন। রাজেনের সঙ্গে বাঙ্গলায় কথা বলতেন। নাম ধরে ডাকতেন। তুমি বলে সম্বোধন করতেন। ভারতের রাষ্ট্রপতিকে। তাঁর কথাতেই রাজেন্দ্রবাবু প্রেসিডেন্টের পদের জন্যে নিজের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি। সে সময় জওহরলাল তাঁর প্রতি বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের হিন্দুস্থানীর জন্যে জওহরলাল তাঁকে দেখতে পারতেন না। সর্দার প্যাটেল রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুরাগী ছিলেন। জওহরলালের উগ্র সাহেবীয়ানার জন্যে সর্দারজী তাঁকে দেখতে পারতেন না। মজুমদার সাহেব কিছুতেই তাঁকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে দিলেন না। একথা আমি মহেন্দ্রবাবুর জামাতা নর্মদেশ্বরবাবুর মুখে শুনেছি। নর্মদাবাবু এখানকার আদালতেরই অ্যাডভোকেট। মজুমদার সাহেবের জিদের কাছে রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরাজয় স্বীকার করলেন।' তাই তিনি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন। বাঙ্গালী সহপাঠীর কাছে ভারতের রাষ্ট্রপতিও বন্ধুত্বের ঋণে ঋণী।

মহেন্দ্রপ্রসাদের মত লোক খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। দস্তুর মতো বাঙ্গালী ভক্ত। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকারী ছিলেন একজন বাঙ্গালী। ক্ষিতীশ সিংহ। কনট্রাকটার। তাঁর বাড়ীতে প্রতিদিনই মহেন্দ্রপ্রসাদ যেতেন।

মহেন্দ্রবাবু ছিলেন অত্যন্ত স্থূলকায়। প্রত্যহ সকালবেলা তাঁর প্রাতরাশ পোয়াটেক ছোলার ঘুঘনি। এটা তাঁর চাই-ই। নইলে তিনি বাঁচতে পারবেন না। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। প্রশস্ত বড় বড় ভাবব্যঞ্জক চক্ষু। উন্নতনাসা। কিঞ্চিৎ শুভ্র গুম্ফ। সুগঠিত নাকের নীচে। দৃঢ়নিবদ্ধ অধর। গলা অত্যন্ত চওড়া। গাল আর গলা যেন এক হয়ে গেছে। ভূমিহাররা তাঁকে ঠাট্টা করে বলত—ভঁইশ। অর্থাৎ মোষ। তারা খুব যে ভুল বলত তা নয়। দেখতে তিনি প্রায় মহিষের মতই ছিলেন।

বিরাট শরীর। মোষের মতই গায়ের রং। তবে মোষের মতই প্রচুর দুগ্ধ দান করতেও সক্ষম। ব্যাঙ্কের ফিটন গাড়ী চড়েই এদিক ওদিক যাতায়াত করতেন। তাঁকে আমি কখনো রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলতে দেখিনি। সামন্ততন্ত্রের প্রভাব তাঁর ওপর এতই গভীর ছিল। তাঁর পিতা হাথোয়া মহারাজের এস্টেটে চাকরী করতেন। অতএব রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতি হয়ে ধুতি বিসর্জন দিয়ে চুস্ত-পায়জামা আর আচকান পরিধান করলেন। সামন্ততন্ত্রের প্রভাবই। চরকা-কাটা খদ্দর-পরা রাজেন্দ্র প্রসাদ কোথায় অন্তর্হিত হলেন। গভর্ণর-জেনারেল হয়েও ধুতি চাদর ছাড়েননি রাজাগোপাল আচারিয়া। গান্ধীজির বৈবাহিক হয়েও গান্ধী-টুপী কোনদিন পরেন নি তিনি।

মহেন্দ্রপ্রসাদ পরতেন হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কালো খদ্দরের কোট। সাদা খদ্দরের ধুতি। মাথায় সাদা গান্ধী টুপী। তাঁকে লোকে নাম ধরে বড় একটা ডাকত না। ডাকত ম্যানেজার সাহেব বলে। সে সময় ম্যানেজার সাহেব বললে একমাত্র তাঁকেই বোঝাতো। তিনি ছিলেন সর্বঘটের কাঁঠালিকলা। কারুর বিপদে-আপদে, উৎসবে-ব্যসনে, সদা সর্বদা হাজির। ম্যানেজার সাহেব এসে পড়লেই সকলে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচত। আর ভয় নেই। সব অসুবিধেই এবার দূর হবে। হাতে লোকজন ছিলই। মনের ভেতর জনসেবার আদর্শ ছিলই। পরার্থপরতায় মনও ভরপুর। এমন মানুষকে কে অস্বীকার করতে পারে? রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন ওকালতী ছেড়ে দিলেন, তখন তাঁর পরিবারের সমস্ত ভার নিলেন মহেন্দ্রবাবু। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিশ্চিন্ত হয়ে চরকা কাটতে লাগলেন। গান্ধীজির আদেশ পালন করতে লাগলেন। তাঁর ছেলেদের পড়াশুনো মেয়েদের বিয়ে, সব মহেন্দ্র-প্রসাদের ঘাড়ে। এরকম একটা বিরাট স্কন্ধে আরোহণ করতে না পারলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন না, এটা ঠিক।

আমি একদিন আমার বন্ধু রামপরায়ণ রায়ের কাছে গেছি। বিহার ব্যাঙ্কে। সে সেখানকার এ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার। এমন প্রায়ই যেতাম।

গল্প করতে। একদিন এমনি ধারা গেছি। রামপরায়ণ বললে—ওহে তোমাকে আজ ম্যানেজার সাহেব চা খেতে বলেছেন। আশ্চর্য হয়ে বললাম—আমাকে? কেন? সে বললে—আজ তিনি আমায় ডেকে বললেন—আপনার বন্ধু আপনার কাছে প্রায়ই আসেন। আপনি তাঁকে একদিনও চা খেতে বলেন না কেন? আজ তিনি আমার সঙ্গে চা খাবেন। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তিনি আমার বন্ধুর ওপরওয়ালা। আমার বন্ধু আমায় চা খাওয়ায় অথবা না খাওয়ায়, তাঁর কি? এই হল সাধারণ যুক্তি। সারা দুনিয়ায় এই যুক্তিই প্রচলিত। কিন্তু তাহলে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সৃষ্টি করত কে? এই মহত্ত্বই সৃষ্টি করেছে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতিকে। জিনিসটা কিছুই নয়। কিন্তু এই কিছু নয় জিনিসটাই সবকিছু।

ম্যানেজার সাহেবের সুসজ্জিত খাস কামরায় গেলাম। নানাবিধ ফল, মিষ্টি নোনতার সঙ্গে চা খেলাম। ম্যানেজার সাহেব বয়সোচিত গাম্ভীর্য বজায় রেখেও আমায় আপ্যায়িত করতে লাগলেন। তিনি আমার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী। সনটা ছিল ১৯৩৩। এক বছর পরে দোসরা জুন ১৯৩৪ তাঁর মৃত্যু হয়। রামপরায়ণ পরে আমায় বলেছিল—দেখ ভাই, আমি ত কলকাতার ছেলে। কলকাতার মানুষ। অনেক রকম লোকই দেখেছি। কিন্তু আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বলতে পারি, মানুষ হিসেবে মহেন্দ্রপ্রসাদের মত উঁচু মানুষ আমি আর দেখিনি।

এরপর অনেক হিন্দী নাটকে মহেন্দ্রপ্রসাদকে দায়িত্ব নিতে দেখেছি। তিনি আসতেন নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পূর্বে। নিজের ফিটন পাঠিয়ে অভিনেতাদের আনিয়ে নিতেন। ঢালাও হুকুম ছিল, আটটা বাজলেই তিনি ড্রপ তুলে দেবেন। কেউ প্রস্তুত থাক, আর না থাক। কিন্তু এমন কখনই হত না। সকলেই প্রস্তুত থাকত। ঠিক সময়েই নাটক আরম্ভ হত। সকলেরই মুখের কাছে চায়ের কাপ এসে এসে হাজির হত। বেশ বোঝা যেত একটা বিরাট কর্মশক্তিসম্পন্ন জাগ্রত ব্যক্তিত্ব সমস্ত কিছুরই পেছনে রয়েছে। সবকিছু খুঁটিনাটির ওপরেই

নজর রেখেছে। কারুর মেয়ের বিয়ে। তিনি দিবারাত্র সেখানে। কারুর শ্রাদ্ধ। তিনি সবচেয়ে আগে সেখানে। নেপথ্যে থেকে সকলের অলক্ষ্যে সব রকম সাহায্যই করছেন। অর্থ-সাহায্যও তার একটা অঙ্গ। তিনি মারা গেলেন। লোকে রেখে যায় টাকা, তিনি রেখে গেলেন ঋণ।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ এলেন। তিনি তখন নেতা মাত্র। রাষ্ট্রপতি হননি। কিন্তু তাঁর পেছনে পুঁজিপতির দল। একজন কুশলী কর্মীও এলেন। সব বোঝা মাথায় তুলে নিলেন। সব ঋণ শোধ হয়ে গেল। যেন ম্যাজিক। কে টাকা দিলেন, কেউ জানে না। কিন্তু কেউ একজন দিলেন নিশ্চয়ই। নইলে ঋণ শোধ হল কি করে? তিনি একজন পুঁজিপতিও নিশ্চয়ই। নইলে পুঁজিপতির প্রভাব কংগ্রেসে কেন ছিল?

প্রথম যেখানে তাঁবু খাটিয়ে "পরপারে" নাটক অভিনীত হয়েছিল, সেই জায়গায় এখন বিরাট প্রেক্ষাগার। বিরাট নাট্যালয়। নাম—মহেন্দ্র-মন্দির। তাঁর মৃত্যুতিথিতে খুব সভাসমিতি, বক্তৃতা, নাটক ইত্যাদি হয়। দেশ-বিদেশ থেকে গুণী, মানী ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হন। তাঁরা আসেন, দেখেন, ভাষণ দেন। এছাড়া তাঁদের করবার কি আছে। বলেন সেই এক কথা। মহেন্দ্রপ্রসাদ না থাকলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ হত না। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগে—পুরাণো গানের রেকর্ড বাজিয়ে লাভ কি? নতুন গান গাইবার সময় কি এখনো হয়নি? দ্বিতীয় মহেন্দ্রপ্রসাদ আর জন্মালো না কেন?

অর্ধ শতাব্দী ত পার হয়ে গেল। কারণ একই। সিংহ সাহসিকতা নেই। যা মহেন্দ্রবাবুর ছিল। অনুসন্ধিৎসা নেই। যা মহেন্দ্রপ্রসাদের বিশেষত্ব ছিল। অতএব চর্বিতচর্বণ ছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে? তাই চলেছে আজ ১৯৭৭ সালেও।

এমনি এক মৃত্যুতিথিতে রাজেন্দ্রপ্রসাদ এলেন। তিনি তখন রাষ্ট্রপতি। তাঁর মিলিটারী-সেক্রেটারী মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জী। তিনি ইংরেজ

আমলের সব বাহ্যাড়ম্বরই বজায় রেখেছেন। সে ব্যবস্থা ভাইসরয়ের আগমনের ব্যবস্থায় চেয়ে এক তিল কম নয়। বাইরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতি। রাজকীয় সম্বর্ধনা। রাজকীয় আয়োজন। হলের ভেতর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কিন্তু এক শোকাতুর ছোট ভাই। যখন বক্তৃতা করতে উঠে দাঁড়ালেন। আমরা দেখলাম এক শ্রদ্ধা-বিগলিত ছোট ভাইকে। ভক্তি-গদগদ চিত্তে যিনি তাঁর স্বর্গতঃ বড় ভাইকে স্মরণ করছেন। কিন্তু বেশীক্ষণ স্মরণ করতে আর পারলেন না। চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে গেল। ক্রমাগত চোখ মুছতেই লাগলেন। অবশেষে বাক্যহারা হয়ে মর্মাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। আজ তাঁর এই সম্মান। আজ তাঁর বড় ভাইয়ের এই সম্মান। একি উভয়ের বাল্যকালে কেউ কল্পনা করতেও পেরেছিল? সেই কথা স্মরণ করে তাঁর অশ্রু আর বাধা মানল না। অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। সমস্ত সভা বিস্মিতনেত্রে এই দৃশ্য দেখছে। প্রত্যেকের মনে যে সমান প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা বলা যায় না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ অনেকের চক্ষে এক "লালা" ছাড়া আর কিছুই নন। কায়স্থ মাত্র। কায়স্থের চোখে তিনি দেবতা। বিহারে অতি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদেরও ভেতরে দেখেছি এই ভাব বর্তমান। তারা বিহারী নয়। তারা লালা, রাজপুত ভূমিহার অথবা "পিছড়াবর্গ" অর্থাৎ backward class।

এত জাত নিয়ে ছোট ছোট গণ্ডীতে আবদ্ধ জীব আর কোথাও আছে কিনা জানি না। অথচ বাঙ্গালীরা ওদের চক্ষে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, রাজপুত গোয়ালা নয়। তারা বাঙ্গালী একটা স্বতন্ত্র জাত। আমার ছাব্বিশতম পূর্ব পুরুষের উপাধি ওঝা ছিল শুনে ওরা পুলকে গদগদ। কেউ বলে—আপনি ভূমিহার। কেউ বলে—আপনি ব্রাহ্মণ। কেউ বলে —আপনি বাঙ্গালী নন। আমি বলি—রাজা লক্ষ্মণসেনের আমলে পাঁচ-জন কুলীন ব্রাহ্মণকে কনৌজ থেকে আনা হয়েছিল। আমি তাদেরই একজনের বংশধর। ভরদ্বাদ গোত্র। একজন অমনি লাফিয়ে উঠে বললো—আমারও ত ভরদ্বাজ গোত্র। আমিও ত ভূমিহার। আমি

বললাম – অতএব আমিও তাই। তাই হোক। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যাঁর গর্ভে আমি জন্মেছি তিনি আমায় যে ভাষা শিখিয়েছেন সেটা বাঙ্গলা ভাষা। সেই ভাষাতেই আমি বাড়ীতে কথা কই। অতএব আমি বাঙ্গালী। যদিও অন্য ভাষার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই। আমি পৃথিবীর সব ভাষাকেই ভালবাসি। সব ভাষাই শিখতে চাই। তবু আমি এক মুখার্জী। অতএব এক বাঙ্গালী। মুখার্জী কথাটা ইংরেজ আমলের সৃষ্টি। মুখোপাধ্যায় ইংরেজ-জিহ্বায় সহজে উচ্চারিত হবে না। অতএব সংক্ষিপ্ত করা হল, মুখার্জী। ইংরেজী টানও একটু এল। গাংগুলি যে গঙ্গোপাধ্যায়ের অপভ্রংশ মাত্র, তা শুনে ওদের কি ফুর্তি।

এসব কথাবার্তা হচ্ছিল আমাদের বার-লাইব্রেরিতে। যেখানে সকলেই ডাব্‌ল্ গ্রাজুয়েট। কেউ কেউ ট্রিপ্‌ল্ গ্রাজুয়েট। ওদের যখন বোঝালাম ব্যানার্জি, চ্যাটার্জী, বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়রই রূপান্তর, তখন ওরা বিস্মিত হয়ে গেল। পাশের প্রদেশ পশ্চিমবাংলা। তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে এত অজ্ঞতা। শিক্ষিতের ভেতরেও এত অল্প জ্ঞান। এদেশ এক মহাজাতিতে পরিণত হবে কি করে Maeterlink বলেছেন, you cannot learn to love unless you first learn to see. আমরা ভারতবাসীরা পরস্পর পরস্পরকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে কবে যে দেখতে শিখব তাই ভাবি। ঘৃণা-মিশ্রিত কৌতূহল নয়। শ্রদ্ধা-মিশ্রিত কৌতূহল।

আমার বাংলা নাটকে অভিনয়ের সুনাম আমাকে বিহারীমহলেও বেশ পরিচিত করে তুলল। ভগবানবাজারে এক ধনী কায়স্থের গৃহে মহড়ার আয়োজন করা হল। বেশ বড় কম্পাউণ্ড-ঘেরা বাড়ী। বড় হলঘর। সুদৃশ্য কার্পেট বিছানো। সুন্দর চায়ের ব্যবস্থা। দুয়ারে ফিটন গাড়ী। মহড়ার শেষে আমাকে ফিটনে করে বাড়ী পৌঁছিয়ে দেয়। নাটক "চন্দ্রগুপ্ত"। ডি-এল রায়ের নাটকের হিন্দী অনুবাদ। হাফিজ, মুরা। রামচন্দ্র সিং, আলেকজাণ্ডার। আরো অনেকে অন্যান্য পার্টে।

আমি ভাদুড়ী-স্টাইলে চাণক্যের পার্ট করতে লাগলাম। ধরণটাই ওদের খুব নতুন লাগল। ওরা দানীবাবুর ধারাকেই জানত। এ যেন কিছু ব্যতিক্রম। তবে এই নতুন ধারার মহড়া দেখতে অনেকে ভিড় করে আসতে লাগল। এখানে মনে মনে সকলেই অভিনয়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়। তারাও নিচ্ছিল। আমার হিন্দী উচ্চারণে ত্রুটি হচ্ছিল হয়ত, কিন্তু তা ক্ষমালাভ করছিল। আমারও বিশ্বাস ছিল, আমি আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারব। বিন্ধ্যাচল প্রসাদ ছিল, মহারাজ নন্দ। ডাঃ অখৌড়ি ছিল, বাচাল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু অভিনয় হল না। কি একটা কারণে বাধা পড়ে গেল। কোন একটা কিছুর সাহায্য-রজনী হিসেবেই অভিনয়ের আয়োজন। সেটা আর বাস্তবে পরিণত হল না। কিন্তু পরে বন্যার সাহায্য-রজনী হিসেবে আমরা এই অভিনয় বাস্তবে পরিণত করলাম। একজন বাঙ্গালী ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার এসেছিলেন এখানে। নাম—রাজেন ঘোষ। তাঁরই উৎসাহে, তাঁরই প্রযোজনায়, কালীবাড়ীর রঙ্গমঞ্চেই অভিনয় হয়েছিল। বাঙ্গালীরাই হিন্দীতে অভিনয় করেছিল। এক-আধজন বিহারীও ছিল। হিন্দুও ছিল। মুসলমানও ছিল। কালেক্টর সাহেব শ্রী কে-পি-সিনহা, আই সি-এস্, ছিলেন কমিটির প্রেসিডেণ্ট। প্রচুর টাকা উঠেছিল। যেখানে ইনকাম্-ট্যাক্স অফিসার আছেন পেছনে, সেখানে টাকা না ওঠাই আশ্চর্য। তার ওপর মগধের গৌরব নিয়ে কাহিনী। বন্যাত্রাণ উপলক্ষ্য। সকলেরই ভাল লাগল। বড় বড় শেঠদের বাড়ী থেকে রূপোর সিংহাসন এলো। রূপোর আটা-সোটাও এসেছিল। উপযুক্ত ব্যাণ্ডের বাদ্য। চন্দ্রগুপ্তের বিজয়োল্লাসে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন, কলকাতার পেশাদারী থিয়েটরের নকল জাঁকজমককে ম্লান করে দিয়েছিল। পরিচালক ও চাণক্যের ভূমিকায় আমিই ছিলাম। আমার অভিনয়-ধারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বাংলার নিজস্ব অভিনয়-ধারা। পার্শী অভিনয়-ধারা থেকে স্বতন্ত্র। বুদ্ধিদীপ্ত ভাবের অভিনয়। কণ্ঠস্বরের ঔৎকর্ষের প্রতিই একমাত্র

নির্ভরশীল নয়। বলাবাহুল্য সুনাম হল প্রচুর। বাঙ্গালীর অবদান বিহারীরা মাথা পেতে স্বীকার করে নিল।

আমি তখন নিজের শক্তির ওপরই নির্ভর করেছিলাম। সফলতা হল বটে। কিন্তু ভুল করে ভাবলাম এ বুঝি আমারই শক্তির জন্যে হল। আমার নাট্যজ্ঞানই বুঝি আমাকে সফলতার দ্বারে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। তখন বুঝিনি যে আত্মশক্তির ওপর নির্ভর মানেই প্রতিকূলতা অনুভব করা। রাইট হ্যাণ্ড-এর ওপর নির্ভর করা বিলিতী আদর্শ। তৃতীয় একটা বৃহত্তর শক্তির ওপর নির্ভর করতে পারলেই অনুকূল বায়ু বইতে শুরু করবে। ভারতীয় আদর্শ তাই। কিন্তু এই উপসংহারে আসতে অনেক সময় লেগে গেল। জীবনের অনেক মলিন পৃষ্ঠা ওলটাতে হল। অনেক কীটদষ্ট মলিন পৃষ্ঠা। তবু এই উপসংহারে জীবন-শেষে আসতে পারলাম। অনেক অগাধ জলে হাবুডুবু খেয়ে। দেখলাম আমি কিছুই নই। আমার শক্তিও কিছুই নয়। একটা তৃতীয় শক্তি আছে। আমি ও আমার পৃথিবী ছাড়া অন্য এক তৃতীয় শক্তি। তার পরিচয় দেবার জন্যেই এতবড় করে আত্মকাহিনী ফেঁদে বসেছি।

ছিলাম সহায়-সম্বল-হীন, সমাজ পরিত্যক্ত, পরিবার-উপেক্ষিত, এক বাঙ্গালী যুবক। সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্যাও আছে। বিহার মুল্লুকে এসেছি প্র্যাকটিস্ করতে। ধন লুণ্ঠন করতে নয়। আত্ম-আবিষ্কারের সময় পেতে। মাথা নত না করেও, মাথাকে উন্নত রাখতে। ইন্ধন জোগাচ্ছে পি সি রায়ের আদর্শ। শরৎচন্দ্র, শিশিরকুমার, বারীন্দ্রকুমারের দৃষ্টান্ত। আমাকে একটা কিছু হতেই হবে। তারজন্যে সময় চাই। সেই সময়টাতে বায়ু সেবন করে থাকা চলবে না। কিছু আহার্য্যও পাকস্থলীতে যাওয়া চাই। নিয়েছি ওকালতী পেশা। সাহিত্য প্রচেষ্টা যার পাশাপাশি চললেও চলতে পারে। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সব অঙ্গের ভূষণ করেছি। অবজ্ঞা-উপহাস, ব্যঙ্গ-কৌতুক, শ্লেষ-বিদ্রূপ, কটাক্ষ-ভৎর্সনা, প্রত্যহ জমার খাতায় স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে। পাঁকাল মাছের মত পাঁকে থেকেও, পাঁক গায়ে লাগাতে দিচ্ছি না। আমাকে

সাহিত্যিক হতে হবে। সাহিত্য আমার ধর্ম। আমায় ধর্মপালন করতে হবে। স্বধর্মে অবিচলিত থাকতে হবে। এই আমার একমাত্র কাজ। একমাত্র চিন্তা। ভয় পাবো না। পেছনে হটবো না। আত্মসমর্পণ করব না। পরাজয় হলেও লড়ব। জয় হলেও লড়ব। ইহজীবনেও লড়ব। পরজীবনেও লড়ব। এই একটি বিষয়ে আমি স্থির-নিশ্চিত। কৃতসংকল্প। যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। জীবনযুদ্ধ। আমাকে লড়তেই হবে।

বার লাইব্রেরীতে বসে encyclopedia পড়ে চলেছি। জ্ঞান সঞ্চয় করেছি। ছুরি ধার করছি। সুযোগের অপেক্ষা করছি। কিন্তু কাকেই-বা চিনি? কিই-বা জানি? পাশ করেছি পরীক্ষা। আইনের কতকগুলো বই মুখস্ত করে। পরীক্ষা পাশ করা এক জিনিস। টাকা রোজগার করা আর এক জিনিষ। গ্রামবাসী বিহারী মক্কেলদের বিষয় আমি কি জানি? তারা দেখে বার লাইব্রেরীতে আমার মত তিনশো উকিল বসে আছে। কালো কোট আর সাদা প্যাণ্ট পরে। মক্কেলের জন্যে বুভুক্ষু কাজের জন্যে উদ্‌গ্রীব। তাদের গ্রামের উকিলও আছে। তারা অপরিচিত আমার কাছে আসবে কেন? যোগসূত্র কোথায়?

যোগসূত্র আছে। সাহস, পরিশ্রম, সততা। এই হল মানুষের সফল জীবনযাত্রার চিরন্তন পাশপোর্ট। গন্তব্য পথের মোড়ে মোড়ে আমাকে ছাড়পত্র দেখিয়ে যেতে হ'ল। প্রত্যেকেই প্রহরী। সঙ্গীন উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও আমি নিষ্ক্রিয় ছিলাম না। একটা হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা বের করা হয়েছিল। তাতে আমার একটা ছোট গল্প ছিল। যা কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হয়েছিল। একজন প্রবীণ উকিলের সম্বন্ধে লিখেছিলাম তাঁর যশ, অর্থ, মান, খ্যাতির অভাব হয়নি। এমনকি পরকীয়া প্রেমেরও নয়। আর যায় কোথা? ভীষণ প্রতিক্রিয়া শুরু হল। মাসিক পত্রিকাই উঠে গেল। এতদূর পর্যন্ত হল যে

পাটনায় আসন্ন বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে আমাদের ডেলিগেট করে পাঠানোই হল না। আমরাও ছাড়বার পাত্র নয়। পাটনায় গেলাম। সেখানে গিয়ে ডেলিগেট হলাম। ডেলিগেট শিবিরে স্থানও পেলাম। সালটা বোধহয় ১৯৩৭।

অনেক কৃতী বাঙ্গালী এসেছিলেন। সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। সার লালগোপাল মুখার্জী, সার পি, সি রায়, সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি 'ত ছিলেনই, সজনীকান্ত দাসও তাঁর "শনিবারের চিঠির" দলবল নিয়ে এসেছিলেন। মোহিতলালও খুব উত্তেজিতভাবে খুব গরম-গরম ভাষণ দিলেন। পরিমল গোস্বামী কিছু হাল্কা রচনা পড়লেন। বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায় ইত্যাদিও এসেছিলেন। ডেলিগেট-শিবিরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ব্যারিস্টার-সাংবাদিক শচীন বসু। অদ্ভুত করিতকর্মা লোক। প্রত্যেকটি ডেলিগেটের সুখ-সুবিধার দিকে তাঁর জাগ্রত দৃষ্টি। অতি ভোরেও গরম চা সকলের মুখের সামনে। কয়েকদিন পরমানন্দে অতিবাহিত করা গেল। তারাশঙ্কর, নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদিও ছিলেন। চিত্তরঞ্জন-দুহিতা অপর্ণাদেবী কীর্তন গান গেয়ে শোনালেন।

এত কিছু হল কিন্তু পাটনার বাঙ্গালীদের মুকুটহীন সম্রাট পি, আর, দাস অনুপস্থিত। সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ার-ম্যান। অতএব পি, আর, দাস থাকেন কি করে? তখন বড়দিনের ছুটি। তিনি বেড়াতে চলে গেলেন। বিমানচন্দ্র মজুমদার ছিলেন সেক্রেটারী।

বাংলার সেই যুগের সাহিত্যিকদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। এঁরা অধ্যাপক সমাদ্দারের বাড়ীতে ছিলেন। আমি চিরকালের জিজ্ঞাসু। সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে অতি মাত্রায় কৌতূহলী। তাঁদের দেখতে চাই। জানতে চাই। কি তাঁদের বিশেষত্ব বুঝতে চাই। মোহিতলাল যেন গত যুগের জার্মান ক্রিটিক। ক্ষমাহীন।

নির্দয় রূঢ়ভাষী। সমালোচনা করছেন না ত যেন মারতে উঠেছেন। অভিভাষণ পড়ছেন না ত যেন ঝগড়া করছেন কারো সঙ্গে। Sainte Benve-এর কি ছিল? gap and amiable temper. His manner as good as his matter. কিন্তু বাঙ্গালী সমালোচক? হাস্যাস্পদ জীব একটি।

অধ্যাপক সমাদ্দারের বাড়ীতে গেলাম। দেখি বনফুল একটা নতুন লেখা শোনাচ্ছেন সজনীকান্তকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে যাচ্ছেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। সজনীকান্ত শুনে যাচ্ছেন চুপ করে। এই শোনবার ক্ষমতাই সজনীবাবুকে দলপতি করেছে, বুঝতে পারলাম। সকলেই বক্তা। তিনি নীরব শ্রোতা। সকলের বক্তব্যই তিনি শুনে যাচ্ছেন ধৈর্য ধরে। এ জগতে শোনবার লোক বড় কম। কথা বলবার লোকই বেশী। একটানা নালিশ আর বুকভরা উচ্ছ্বাস। এই আমাদের সম্বল। সজনীবাবু দেখলাম নিজের কথা বলতে চান না। কথা বলেন যখন তখনও নিজের কথা নয়, অপরের কথাই বলতে চান। কিন্তু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে এমন একটি কথা বললেন যা তাঁর না বললেও চলত। যেটা আমি জানতাম না। সেই কথার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের কোন সম্বন্ধই নেই। সেই কথা শোনার পর আমাকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়েছিল। আজও আমার সে কথা মনে আছে। কিন্তু আমি কলম দিয়ে সে কথা লিখতে পারি না।

সজনীবাবু ব্রজেনবাবুকে যে রকম কপট সমীহ করে বলতেন আমার গুরু, তাতে মনে হত ওই বিদ্যায় তিনি গুরুর চেয়ে কোন অংশে কম নন। গুরুরও গুরু। বলতেন, এঁর কাছেই আমি সংসার-যাত্রার সমুদয় রহস্য শিখেছি। ব্রজেনবাবু শুনে হাসতেন। এঁদের কথা শুনে কিছুতেই মনে হত না ওদের একজন সাহিত্য-গবেষক ও অপর একজন সাহিত্য-সাধক। সজনীবাবু কবি। কিন্তু এঁর কবিতায় কাব্য আসবে কি করে? গলা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেই ত আর কবিতা হয় না। এঁর কবিতা হৃদয়ে অনুরণন জাগায় না। কারণ ভাব নেই।

পুরানো পুঁথি ঘাটলেই কিছু মহৎ সাহিত্যিক হয়ে যাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক হলেও হতে পারা যায়। বুঝলাম, "শনিবারের চিঠি" বাংলা সাহিত্যকে চিরস্থায়ী কিছু দিয়ে যেতে পারবে না। এর দলপতিকে কিছু অর্থ দিয়ে গেলেও যেতে পারে। অনেকদিন পরে সজনীবাবুর তিনতলার ঘর দেখে, সেই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল। বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই। গালাগালি দিয়ে এদেশে লাল হওয়া যায় বটে। কিন্তু ভলটেয়ার হওয়া যায় না। অ্যারিষ্টোফেনিস হওয়া যায় না। মোলিয়ার হওয়া যায় না। সজনীকান্ত দাস হওয়া যায়। অ্যারিষ্টোফেনিস "ব্যাবিলনস্" নাটক ম্যাজিস্ট্রেটদের ব্যঙ্গ করেছিলেন বলে সাজা পেয়েছিলেন।

যেমন শনিবারের চিঠি, তেমনিই কল্লোল গ্রুপ। সেক্স্ ভাঙ্গিয়ে পেট ভরানো চলে। কিন্তু দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ পাওয়া যায় না। আজ দেখছি বুদ্ধুদের মত দুটো প্রতিষ্ঠানই কোথায় মিলিয়ে গেল। কারণ, তার ভেতর কোন সত্য ছিল না। যা মনকে পরিতৃপ্ত করে, সে জিনিস এদের ভেতর ছিল না। তাই শনিবারের চিঠি রবিবার পর্যন্ত পৌঁছালো না। কল্লোল কলকলিয়েই শেষ হল। বাংলাদেশের পাঠকও তেমনি। বুদ্ধুদকে কল্লোল বলে ভ্রম করল। মহৎ সাহিত্য এদেশে সৃষ্ট হবে কি করে?

হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা-বাতাসের মত সুশীতল বাতাস উঠল। আমার মা এলেন এখানে। দাদার ওখানেই উঠলেন। আমি গেলাম দেখা করতে। একা। মা বিরক্ত হলেন। বললেন—একা কেন? বৌমাকে আন। এখুনি। আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমতা আমতা করে বললাম—আচ্ছা। আচ্ছা। হবে। মা বললেন—হবে নয়। এখুনি হতে হবে। তুই একা এসেছিল্ আমার সঙ্গে দেখা করতে? বৌমাকে সঙ্গে না এনে? ছেলেকে সঙ্গে না এনে? ছিঃ এখুনি যা। আগে নিয়ে আয়। তারপর অন্য কথা।

এই ত তৃতীয় শক্তি। এর সম্বন্ধে আমি ত অবহিত ছিলাম না।

কোথায় কখন্ মাতৃ হৃদয়ে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা পেয়ে বসে আছে তাতো আমি জানি না। আমার জ্ঞান কতটুকু? আমার শক্তি কতটুকু? কেন আমি এই তৃতীয় শক্তির ওপর নির্ভর করতে পারি না? যিনি আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে বসে আছেন। পুত্রবধূ এলো। নাতি এলো। আমার জননী আনন্দে অধীরা হয়ে গেলেন।

জননী ক্ষমা করলে কি হয়। সমাজ তবুও ক্ষমা করল না। সামনে দুর্গাপূজা। অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে। আমাকে পার্ট দেওয়া হবে না। চাঁদা তোলা হচ্ছে। আমার কাছে চাঁদা নেওয়াও হবে না। প্রেসিডেন্টের হুকুম। মহাসমারোহে দুর্গাপূজা হয়ে গেল। হাজার-খানেক লোক তিনদিন ধরে খিচুড়ী খেল। আমি পূজা প্রাঙ্গণে গেলাম না। স্ত্রীকেও যেতে দিলাম না। তিনি পাড়ায় বিহারীদের তৈরী দুর্গাপ্রতিমা দেখেই সন্তুষ্ট হলেন। কোথাও কোনরকম প্রতিবাদ উঠল না। আমিও ভাবতে লাগলাম দুর্গা দুর্গতিনাশিনী নন। মাটির প্রতিমা মাত্র। কেন তিনি হাতের বর্শা দিয়ে বাঙ্গালী সমাজের শক্তিশালী ওই মহিষাসুরের বক্ষ বিদ্ধ করলেন না?

কিছু কথা হয়ত উঠেছিল। তাই পরের বৎসর হেমচন্দ্র মিত্র চাঁদার খাতা দিয়ে আমার কাছে লোক পাঠালেন। লোকটি তাঁর স্তাবক। কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা অক্ষয়চন্দ্র গুপ্তের পুত্র সুধীরচন্দ্র গুপ্ত। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আমি বাইরে বসে আছি, তিনি হঠাৎ এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম। করছেন কি? করছেন কি? আপনি আমার চেয়ে বয়সে কত বড়। তিনি বললেন—তুমি ব্রাহ্মণ। আমি বয়সে বড় হয়েও তোমার পা ধরছি। একবার চল হেমবাবুর বাড়ী। একটু ক্ষমা চেয়ে নাও। সব মিটমাট হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কি অপরাধ করেছি যে ক্ষমা চাইব। সুধীরবাবু বললেন—হেমবাবুকে তুমি ভক্তি কর না। সমস্ত বাঙ্গালী সমাজ করে। হেমবাবুকে অমান্য কোরো না। তিনিই ডেকেছেন। চল।

মেরুদণ্ড সোজা করে বসে রইলাম। ঘাড় উঁচু করে। কিছুতেই ক্ষমা চাইতে রাজী হলাম না। অপরাধ করিইনি। ক্ষমা চাইতে যাবো কিসের জন্যে? কারুর বাড়ী যাবো কিসের জন্যে?

এই ছিলো সেদিনের বিহারের বাঙ্গালী-সমাজ। একঘরে হয়েই রইলাম। আনন্দ, উৎসব, অভিনয় ইত্যাদি সব জিনিস থেকে বঞ্চিত।

জীবনে দুঃখ, কষ্ট, আশা, নিরাশা, হতাশা ব্যর্থতা, আছেই। সেসব হল জীবনের একটা অবিভাজ্য অঙ্গ। কিন্তু সেইটেই শেষ কথা নয়। জীবনে আনন্দও আছে। একটা আদর্শ মেনে চলার তৃপ্তিও আছে। এই সময় বারীন্দ্রকুমারের চিঠি আমার মনে খুব শক্তি আনত। তিনি লিখতেন ধৈর্যচ্যুত হোয়ো না। দেখ না শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম তাই। উতলা হতাম না। ফল ভালই হত।

প্রত্যেক মানুষেরই একটা দেশ আছে। একটা গৃহ আছে। একটা পরিবার আছে। আত্মীয়-স্বজন আছে। সেখানে যেতে তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠেই। সেখানে যেতে বিলম্ব হচ্ছে ভেবে এমনি করেই ছুটতে ইচ্ছে হয়। চল্লিশ বছর আগেকার সেই দুর্বলতা মনে করে হাসিই পাচ্ছে। যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাই। কিন্তু মন শুধু যুক্তি শুনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। যুক্তি কি? মনের মাপ করা নৃত্য। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—Logic is the measured lance of the mind. Nothing else. ঠিক কথা! যুক্তিইত মানুষের সব নয়। আবেগ বলেও একটা বালাই আছে। সে যুক্তিহীন। তারও একটা দাবী আছে। সেটা না মিটলে, দুঃখই হয়।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। বৎসরের পর বৎসর। দেখতে দেখতে আরও দুটি বৎসর কেটে গেল। আমি কোর্টে যাচ্ছি, আসছি। অবসর-সময়ে সাহিত্য করছি। সব দিক দিয়ে কোণঠাসা হয়ে সাহিত্যের দিকেই বেশী করে এগিয়ে যাচ্ছি। পূজো এগিয়ে আসছে। আমার কোথাও আবাহন নেই। কেউ চাঁদা নিতে আসে না। অভিনয় করতে বলে না। পাড়ায় বহুদিনের দুর্গাপূজা হয়। দুর্গাপ্রতিমা

গড়া হয়। বিহারীদের দ্বারাই সব কিছু হয়।

বাঙ্গলা সংস্কৃতি বিহারে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। প্রধানতঃ দুটি পূজোকে আশ্রয় করে। দুর্গা পূজা এবং সরস্বতী পূজা। মাঝে মাঝে কীর্তনও কানে আসে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। অশুদ্ধ উচ্চারণ। কিন্তু কলকাতা থেকে আনা জিনিষ। এখানকার কেউ কেউ ওখানে রোজগার করতে গিয়ে শুনে হয়ত মুগ্ধ হয়েছে। এদেশে আমদানী করেছে। বেশ ভাবোন্মত্ততা আনা যায়, এই কীর্তন আশ্রয় করে। খোলও বাজে। খঞ্জনীও বাজে। ভাবাবেশে সকলে করতালি দেয়। অধিকাংশ লোকের কপালে চন্দনের তিলক। গলায় তুলসীর মালা। আমি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি। কিছুক্ষণ হয়ত দাঁড়িয়ে শুনি। ওরা উৎসাহিত হয়। এ গানের, এ কথার, এ সুরের যে শাশ্বত আবেদন আছে তা কি ওরা বোঝে? ভারতবর্ষ এক ও অবিভক্ত। প্রদেশের সীমানা নির্দিষ্ট করে মনের সীমানা নির্দিষ্ট করা যায় না।

আগে এখানে সরস্বতী পূজো ছিল না। বাঙ্গালীদের স্কুলের বাঙ্গালী শিক্ষক প্রথম আমদানি করলেন। তারপর থেকে লোকেদের মনে লেগে গেল। স্কুলে স্কুলে সরস্বতী পূজো আরম্ভ হয়ে গেল। এমন কি পাড়ায় পাড়ায়। কুমোরদের ঘরের সামনে অগণিত বীণাবাদিনীর শ্বেতশুভ্র মূর্তি। সব রকম মাপের। প্রতি বৎসর মূর্তির সংখ্যা বাড়ছে। ত্রুটিও অবিক্রিত থাকে না। মফঃস্বলের স্কুলেও ছড়াচ্ছে। বিসর্জনের সময় কি শোভাযাত্রা। ট্রাকের মাথায় সরস্বতী। হাস্য-মুখর ছাত্রদের মুখে "সরস্বতী মাইকি জয়" ধ্বনি উঠছে। গগন বিদারী ধ্বনি। মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে। দশদিক প্রকাশিত হচ্ছে। গলা ভেঙ্গে গেছে অনেকের। ভ্রূক্ষেপ নেই।

সরস্বতী পুজো থেকেই এদেশে বসন্ত পঞ্চমী সুরু হয়ে থাকে। ছেলেরা কপালে আবিরের ফোঁটা দিতে সুরু করে। হোলী উৎসবের মাদকতা সুরু হয়ে যায়। আমার মনে আছে, এমনি ধারা একটা মূর্তি বিসর্জনের

শোভাযাত্রার পাশ দিয়ে চলেছি। ট্রাকের ওপর উপবিষ্ট ছাত্রের দল। আমার পরনে সিল্কের পাঞ্জাবী। কোথাও যাচ্ছি বিশেষ কাজেই। একজন ছাত্র হাসতে হাসতেই আমার মাথায় এক মুঠো আবির ঢেলে দিল। জামা রঙ্গীন হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম। ওপরে হাস্যবিকশিত আনন। কৌতুক-পূর্ণ নয়ন। কিছু বলবার যো নেই। উল্টে হাস্য দিয়েই এর প্রত্যুত্তর দিতে হল।

জীবনের শেষে পৌঁছুলেই জীবনের মানে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আজ আমার কাছে আমার জীবনের মানে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আদর্শহীন জীবন, নোঙর-হীন নৌকোর মতই। এদিক ওদিক ভেসে বেড়ায়। লক্ষ্য স্থির থাকে না। মহৎ উদ্দেশ্য থাকে না। আমি জীবনের প্রারম্ভেই কিছু আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলাম। তাই আমার মনে চাঞ্চল্য ছিল না। কর্মে উত্তেজনা ছিল না। শরবৎ তন্ময় হয়ে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছিলাম। কি সে লক্ষ্য? নিজেকে খুঁজে পেতে হবে। নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। বাড়ী বদলালাম ১৯৪১ এ। এ বাড়ীতে আসার দু'বছর আগে থেকেই চলছিল যুদ্ধ। ক্রমাগত দাম বেড়েই চলেছে। থামবার নাম নেই। এছাড়া যুদ্ধের আর কোন প্রতিক্রিয়া আমরা অন্ততঃ দেখতে পেলাম না। ওকালতীর কাজের চেয়ে সাহিত্যের কাজ আমায় টানতে লাগল বেশী। আনন্দ পাই সাহিত্য করেই। গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখেই চলেছি। কে যেন আমায় জোর করে লেখাচ্ছে।

এমন সময় এলো বিয়াল্লিশের আন্দোলন। রেললাইন ওপড়ানো হতে লাগল। পোষ্টাফিস্, থানা, জ্বালানো হতে লাগল। গান্ধীজি গ্রেপ্তার হলেন। নেতারা গ্রেপ্তার হল। নেতৃত্বহীন দেশ যা ইচ্ছে তাই করতে লাগল। অনেকে বলতে লাগলেন—এসব ছেলেমানুষী। কিন্তু প্রত্যেক বড় জিনিষকেই প্রথমটা ছেলেমানুষীই মনে হয়। প্রত্যেক বিরাটকার বটগাছ প্রথমে দু'টি ছোট পাতা মেলেই যাত্রা সুরু করে। হঠাৎ দেশ যেন মেতে উঠল। আমাদের কাছারীর

ভেতরেই আমেরিকান সৈন্যরা আড্ডা গেড়েছে। ঘাঁটি বেঁধেছে। রাইফেল সাজিয়ে রেখেছে। খালি গা। পরনে খাকী হাফ-প্যান্ট। কেবল কলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে। ফর্সা শরীর। কটা চুল। নীল চক্ষু। এরা ইংরেজ নয় আমেরিকান। ইংরেজ হলে খালি গায় থাকত না। ত্রিবর্ণ পতাকা দেখলেই গুলি করে নাবিয়ে দিচ্ছে। মন্ত্রী জগলাল চৌধুরীর ছেলেকে গুলি করে মেরেছে। আমাদের সহকর্মী অ্যাডভোকেট বিশ্বনাথ মিশ্রকে বন্দুক দেখিয়ে এক কোমর জল ঠেলিয়ে, ইঁট বইয়েছে। তার কাহিনী শুনে আমরা মর্মাহত হয়েছি। শুধু অপমান করবার জন্যেই একাজ করা। কোন ক্ষমতা নেই। সে অবস্থায় আদেশ পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মিলিটারী গাড়ীতে ছিলেন বি, রায়, এস-পি। মহেন্দ্র সিং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তারা পুতুল মাত্র, দর্শক শুধু। অমান্য করলে গুলি খেতেই হত। আইন নেই—গবর্ণমেন্ট নেই। আছে শুধু গায়ের জোর। পরাধীনতা কি জিনিস আমরা সেই দিনই বুঝলাম। বিশ্বনাথ মিশ্র ছিল আমাদের প্রত্যেকের মর্য্যাদার প্রতীক। পরাধীন দেশের কোন নাগরিকের কোনো মর্য্যাদা নেই। আমেরিকান সোলজাররা তাদের দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাতে পারে। প্রাণভয়ে ভীত প্রত্যেকটি ভারতীয় প্রত্যেক জঘন্য হুকুম পালন করতে বাধ্য। পাটনা থেকে ডি-আই-জি ট্যানব্রুক এসেছিলেন। সোনপুর স্টেশনে এক অতি সম্ভ্রান্ত বর্ধিষ্ণু গ্রামবাসীকে প্রকাশ্যে বেত দিয়ে চাবকিয়ে ছিলেন। আমরা শুনে যাচ্ছি এই সব অসম্মানের কাহিনী। ভেতরটা জ্বলে জ্বলে উঠছে। অথচ কিছুই করতে পারছি না। ভারতবাসীর স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অসাধারণ অপমানের কাহিনী। অবশেষে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শেষে স্বাধীনতা এল। আসা অবধারিত ছিল। তাই অত্যাচারও পরাকাষ্ঠায় উঠেছিল। অত্যাচার পেয়েই স্বাধীনতা-আন্দোলন আরও জোরদারও হয়েছিল। শুনলাম শহর হাওড়ায় স্থানীয় লোকরা নাকি আটজন আমেরিকান সোলজারকে

আখের ক্ষেতে বর্শাবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। তাদের মৃতদেহ নদীর জলে ভাসিয়েও দিয়েছে। শুনে আমাদের প্রাণে যে কি আনন্দ হয়েছিল তা বলা যায় না। ঠিক হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তি। ওরাই শুধু মারতে জানে না। আমরাও জানি।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনের অপরাধীদের বিচার হচ্ছে প্রকাশ্য বিচারালয়ে নয়। জেলের ভেতরে। জামুয়ার সাহেব ডিস্ট্রিক জাজ। তিনি যাচ্ছেন জেলে বিচার করতে। আমিও আসামী পক্ষ সমর্থন করতে জেলের ভেতর যাচ্ছি। জেরা করছি জেলের ভেতর। যুদ্ধ চলছে। থামবার নাম নেই। আমরা জার্মানদের দিকে। সমস্ত জিনিষেরই মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। তর তর পারা চড়ে যাচ্ছে। জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে। সাইরেন একদিনও এখানে বাজেনি। মাঝে মাঝে বম্‌বার হাওয়াই জাহাজকে মাথার ওপর দিয়ে সশব্দে উড়ে যেতে দেখছি। বড় বড় এরোপ্লেন। এখানে বিদ্রোহীরা দিব্যি আছে। চার ইঞ্জিন। সৈন্য চলাচল হচ্ছে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফ্রন্টে নিয়ে যাচ্ছে। হরনারায়ণ মেহেতা ছিল এমনি বিদ্রোহী। তার মেয়ে স্ত্রী দেখা করতে এসেছিল। কিছু বেদনা পেলাম নিশ্চয়ই তাকে এইভাবে দেখে। অভিনন্দন করলাম বটে সেও শুষ্কহাসি হাসল বটে। কিন্তু সমস্ত জিনিষই অসুন্দর বলে মনে হল।

বার-লাইব্রেরীতে বসে বসেই দেখতে পাচ্ছি অ্যাডভোকেটরা আইনভঙ্গ করছে। যমুনা সিং গরম গরম ভাষণ দিলেন। কাছারীর মধ্যেই। দারোগা পুলিস নিয়ে প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করল। সরকারী উকিল রায়বাহাদুর বৃদ্ধ বিহারী প্রসাদকে ছেলের দল ঘিরে ফেলেছে। তাঁর অফিসেই। চাকরী ছাড়ুন। জেলে যাবেন না সরকারী কেস চালাতে। তিনি মূর্চ্ছা যাবার ভান করছেন। যদিও মূর্চ্ছা যাচ্ছেন না। বীরেশ দত্ত সিং এক লাইন বক্তৃতা করেছেন কি না করেছেন—সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন। আমরা কোর্টে আসা-যাওয়া করছি। উপায় নেই। অর্থ চাই। কিন্তু সবই দেখছি।

সমস্ত দেশে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা। বাঙ্গলা জেগেছে। বিহার জেগেছে। উড়িষ্যা জেগেছে। ভারত জেগেছে। কিন্তু এখানকার বাঙ্গালী সমাজ জাগে নি। যতীন্দ্রনাথ সুর ছাড়া এই আন্দোলনে একটি বাঙ্গালী পুরুষও জেলে যাননি। গেছেন একজন মহিলা— স্বর্ণলতা দেবী। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের অনেক বিবরণ কাগজে বেরিয়েছে। কিন্তু আমরা বার-লাইব্রেরীতে বসে এই আন্দোলনের যতটা স্বচক্ষে দেখলাম, তার যেন তুলনা নেই। এটা যে একটা বিরাট স্বাধীনতা-সংগ্রাম তা যেন তখন বোঝাই যাচ্ছে না। ভাবছি এত সহজে কি ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যাবে? চিরকালের জন্যে? কিন্তু একদিন সত্যিই তারা চলে গেল। চিরকালের জন্যেই। যদিও এই আন্দোলনই তাদের যাওয়ার একমাত্র কারণ নয়। নেতাজীর আই-এন-এ, বোম্বাইয়ে নাবিক-বিদ্রোহ, বিপ্লবীদের রিভলভারের গুলি, ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান, প্রদ্যোৎ বিনয় বাদল দীনেশ সবই আন্দোলনকে বলশালী করে তুলেছিল। দেশ রাহুমুক্ত হল।

১৯৪৩ সালে সুরু হল বাংলায় দুর্ভিক্ষ। রাস্তায় রাস্তায় অস্থিচর্মসার নর-নারী। রাস্তায় মরে পড়ে থাকছে। এ দৃশ্য আমায় চোখে দেখতে হয়নি। ছবিতে দেখেছি। খবরের কাগজে বর্ণনা পড়েছি। লোকমুখে নানা বিচিত্র কাহিনীও শুনতে হয়েছে। পুরানো বিধি-ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছে। নতুন জীবনের আবির্ভাব আসন্ন। এ তারই গর্ভযন্ত্রণা। সাম্প্রদায়িক বিরোধ, অন্নাভাব তারই পূর্বাভাস। দেশ দেখতে দেখতে তিন টুকরো হয়ে গেল।

আমাদের নেতারা মাথা হেঁট বসে রইলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য যেমন করে কৌরব-সভায় নির্বাক নিষ্ক্রিয় হয়ে যাজ্ঞসেনীকে বিবস্ত্রা হতে দেখেছিলেন। সত্যবাদী গান্ধীজি, সত্যকে নিয়ে পরীক্ষা করার মহাগ্রন্থ লিখেছেন। স্বাধীনতা এল কিন্তু হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হল। তিনিও সুবিধাবাদীর পথ অবলম্বন করলেন। গান্ধী নোয়াখালি চলে গেলেন। যেমন একবার সুভাষের সঙ্গে বিরোধের সময় রাজকোট

চলে গিয়েছিলেন। জওহরলাল, কৃপালনী, নোয়াখালি পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। কিন্তু মহাত্মা, মহাত্মাও রইলেন। নেতাও রইলেন। তাঁর কুটীরেই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বসত। দিল্লীর ভঙ্গী কলোনীতে মহাত্মাজী এই প্রহসন ঘটতে দিতেন। তিনি কংগ্রেসের চার আনা সভ্যও নন। কিন্তু কংগ্রেসের উচ্চতম মিটিং তাঁর ঘরে হবার জন্যে স্বহস্তে খদ্দরের চাদর বিছিয়ে দিতেন। এটা তাঁর সত্যের সঙ্গে কি রকম পরীক্ষা? অতএব সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতের মুখে কথামাত্র সার হতে বাধ্য। বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে দেবনাগরী হরফে "সত্যমেব জয়তে।" আর ভণ্ডামী। আমরা ক্রমেই অধিকতর ভণ্ড হয়ে চলেছি। রাজনীতিতে ভণ্ডামী, সাহিত্যে ভণ্ডামী, সমাজে ভণ্ডামী, লেখায় ভণ্ডামী, ভাষায় ভণ্ডামী। চলে গেলাম পুরী।

একদিন একটা ছোট এরোপ্লেন মাথার ওপর দিয়ে ক্রমাগত চক্কর দিচ্ছে। ইঞ্জিনের নিদারুণ কর্ণভেদী শব্দ। আমরা ছাদে উঠে গেছি দেখতে। কি ব্যাপার! চালক ক্রমাগত বাঁই বাঁই করে ঘুরে মরছে। কি যেন খুঁজছে। থৈ পাচ্ছে না। দিশেহারা হয়ে গেছে। এক সময় সোঁ করে সবেগে নীচে নেমে পড়ল। পরের দিন শুনলাম চালক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এরোড্রাম ঠিক করতে না পেরে। এক অ্যামেরিকান সৈন্য। যখন ঠিক করতে পারল তখন ঠিক জায়গায় নামতে পারল না। কিসে যেন ধাক্কা লেগে প্লেন উলটিয়ে গেল। অনেক লোক দেখতে গেল। দেখল এক সুন্দর সুশ্রী তরুণ যুবকের মৃতদেহ। এক বছর আগে সে হয়ত কোন কলেজে পড়েছিল। কোন আমেরিকান মাতাপিতার সন্তান। এখানে মৃত্যু লেখা ছিল। কয়েক দিন ধরে চলল নানারকম প্লেনের আনাগোনা। উচ্চ মিলিটারী অফিসার। দূতাবাসের প্রতিনিধি। যুদ্ধ আমাদের কাছে মাত্র এই একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পেরেছিল। মাঝে মাঝে নিষ্প্রদীপের মহড়া দেওয়া হত, এই পর্যন্ত। হঠাৎ একদিন অ্যাটম্ বম্ ব্যবহৃত হল। অ্যাটম বম্ কি জিনিস? পরমাণুকেও ভাঙ্গা হল?

আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এই ভীষণ আণবিক বোমার কাণ্ড শুনে। হিরোসিমা এবং নাগাসাকি নামক জাপানের দুটো সহর নাকি ধ্বংস হয়ে গেছে। জাপানের দুটো ভাল ভাল সহর। সহস্র সহস্র লোক প্রাণ দিয়েছে। জাপান-সম্রাট মহামহিম হিরোহিটো পদানত হয়েছেন। সন্ধি ভিক্ষা করেছেন। আমেরিকানরা বিশ্ব বিজয়ী হয়েছে। আগে লড়াই হত সৈনিকে সৈনিকে। এখন শান্ত নগরবাসীরাও বাদ গেল না। এই হল আধুনিক যুদ্ধ। এই হল আধুনিক অস্ত্র। মানব-সভ্যতার চরম আবিষ্কার। বিজ্ঞানের সীমাহীন জয়যাত্রা। চক্ষের নিমেষে দুটো সহরকে কোথায় উড়িয়ে দিল। জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করে বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে তা হল আণবিক বোমা। বিজ্ঞান মানুষের হাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে কিন্তু দেবত্ব দেয় নি। আণবিক বোমায় মানবিক আবেদন কিছু নেই। আছে যুদ্ধবাজদের দানবিক আবেদন।

হিটলার ছিল ইহুদীবিদ্বেষী। কিন্তু বিদ্বেষ কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। ধ্বংস করতে পারে শুধু। বিদ্বেষ জার্মানীকে ধ্বংস করল। ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক ছিলেন ইহুদী। শ্রডিংগার ছিলেন ইহুদী। আইনস্টাইন ছিলেন ইহুদী। কিন্তু এই তিনজন ইহুদী না জন্মালে, অ্যাটমবম্ জন্মাতো কি না সন্দেহ। তবু হিটলার ইহুদীদের তাড়াবেনই। কারণ পুঁজিবাদী দেশের শত্রু। অতএব গরীব ইহুদীও দেশের শত্রু। একেই বলে বাঁশ বনে ডোম কানা।

আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) ছিলেন সুইত্সারল্যাণ্ডের নাগরিক। সুইস্ গভর্ণমেণ্ট অফিসে পেটেণ্ট পরীক্ষার কেরাণী। মাঝে মাঝে বিজ্ঞান-চর্চা করতেন। প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হয়ে ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক (১৮৫৮—১৯৪৭) আইনস্টাইনকে বার্লিনে আনেন। কিন্তু আইনস্টাইন সহজে আসতে পারেন নি। কিছু মূল্য দিয়েই আসতে হয়েছিল। স্ত্রী কিছুতেই আসবেন না। অতএব স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতেই হল। এই মূল্য দিতে হল আইনস্টাইনকে।

আইনস্টাইন মারিৎসকে বিবাহ করেছিলেন ১৯০৩ সালে। দুটি পুত্র জন্মে ছিল অ্যালবার্ট আর এডওয়ার্ড। ১৯০৫ সালে, মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সেই তাঁর বিশ্ব-আলোড়নকারী মতবাদ প্রকাশ। থিয়রী অফ রিলেটিভিটি। প্রথমে কেউ আমল দেয় নি। কল্পনাশ্রয়ী বলেই ভেবেছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালে ব্রেজিলের সূর্য্য গ্রহণের সময় দেখা গেল আলোক শিখা, যা সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে আসছে তা সূর্য্যের কাছে এসে আকর্ষণে পড়ে কিছুটা বেঁকে যাচ্ছে। আইনস্টাইন বলেছিলেন, আলোরও ভার আছে। মাধ্যাকর্ষণ তার ওপরেও পড়ে। তাঁর বিজয় দুন্দুভি সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল। ১৯২১ সালে তিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন।

১৮১৩ সালে ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্ক আইনস্টাইনকে বার্লিনে নিয়ে এলেন। ১৯১৪ সালে মারিৎসের সঙ্গে তাঁব বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। পুত্র দুটি জননীর কাছে রইল। সাত বৎসর পরেও নোবেল প্রাইজের সমস্ত টাকা আইনস্টাইন বিবাহ-বিচ্ছিন্ন স্ত্রীকে দিয়ে দিলেন। এরকম দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। বার্লিনে ছিল এক কাকা। সেখানে তিনি খেতে যেতেন। কাকার এক মেয়ে ছিল, এল্‌সা। দুটি মেয়ে নিয়ে সেও বিধবা হয়েছিল। সঙ্গীহীন পুরুষ ও সঙ্গীহীনা নারী পরস্পরকে চিনে নিতে দেরী করল না। ১৯১৭ সালে আইস্টাইন তাকে বিবাহ করেন। তার মেয়ে দুটিকে আইনস্টাইন নিজের মেয়ের মতই যত্নে-আদরে মানুষ করতে লাগলেন। এলসার মত স্ত্রী হয় না। গৃহিনী-সচিব, মিত্র প্রিয়সখী ললিতে কলাবিধৌ: এলসা আইনস্টাইনের সেক্রেটারীও। দরজা খোলা রেখে উলঙ্গ আইনস্টাইন বাথরুমে বিভোর। এলসা দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। চিন্তায় স্নান সারতে ভুলে গেছে। জ্ঞানসাধক জ্ঞান-সাধনায় সম্পূর্ণভাবে ডুবে গেলেন। কুড়ি বৎসরের মধ্যে বার্লিন পৃথিবীর মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গবেষণার স্থান হয়ে উঠল। মাক্স প্ল্যাঙ্ক, লণ্ডনে নিউটনের দ্বিতীয় শতবার্ষিকীতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন। সারা পৃথিবীর

বৈজ্ঞানিক, এই ইহুদীর কাছে শ্রদ্ধায় শির অবনত করলেন।

কিন্তু লেন্স করপোরেল, অ্যাড্‌লফ হিটলার জ্ঞানবিজ্ঞানের জানে কি? ১৯৩৩ সালে ইহুদী বিতাড়ন শুরু হল। আইনস্টাইনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ জমে বরফ হয়ে গেল। আর ব্যাঙ্ক থেকে বাইরে প্রবাহিত হতে পারবে না। তাঁর মস্তকের মূল্য ১০০০ পাউণ্ড ঘোষণা করা হল। আইনস্টাইন শুনে মৃদু হাস্য করে বললেন—আমার মাথার এত দাম? তাতো জানতাম না। তিনি জার্মানী থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত হলেন। জার্মানী বঞ্চিত হল। আমেরিকা লাভ করল। সম্মান দিল বিজ্ঞানীকে। ১৯৪০ সালে আইনস্টাইন আমেরিকান নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন।

১৯৪১ সালে আইনস্টাইন রুজভেল্টকে লিখলেন, জার্মানরা অনেক এগিয়েছে। ওরা হয়ত অ্যাটম্ বোমা তৈরী করতেও পারে। রুজভেল্ট কোষাগার উন্মুক্ত করে দিলেন। তিনজন বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিকল্‌স বোর, এনরিকো ফার্মি ও ওপেন হাইমার লস্ অ্যালাম্‌সে ছদ্মনামে পরমাণু বোমা নির্মাণের গবেষণা সুরু করলেন। সফল হলেন। ১৯৪৫ সালে ১৫ই জুলাই আলাসোপরডো মরুভূমির প্রান্তরে পরীক্ষামূলক ভাবে সর্বপ্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটল। তারপর ৬ই আগষ্ট ১৯৪৫ হিরোশিমায়। ৯ই আগষ্ট নাগাসাকিতে।

হিটলার সন্দেহ করেছিলেন ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্কের পুত্র আরউইন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। কিন্তু বলা হল ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্ক যদি ক্ষমা ভিক্ষা করেন, দণ্ড মার্জনা পেতেও পারে। ম্যাকস্ প্ল্যান ক্ষমা চাইলেন না। আরউইন ফাঁসী গেল। ম্যাকস্ প্ল্যান কেন ক্ষমা চাইলেন না? কারণ তিনি সত্য সাধক। জ্ঞান সাধক সত্য সাধক না হয়ে যায় না। সত্য সাধকের মেরুদণ্ড ইস্পাতেরই হয়ে থাকে। ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্ককে আজ আমরা নমস্কার করি, অথবা হিটলারকে? ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্ক, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আমাদের আদর্শ অথবা হিটলার?

মানুষের নিকৃষ্ট পরিচয়ও পেলাম। ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬। গ্রেট কিলিং

ডে। কলকাতার রাজপথ নররক্তে কলঙ্কিত হল। সুরাওয়ার্দি তখন বাঙ্গালার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লালবাজারের কণ্ট্রোল রুমে দাঁড়িয়ে থেকে নাকি দাঙ্গা চলতে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনে হিন্দুরা মার খেল। তারা প্রস্তুত ছিল না। দু এক দিনের মধ্যেই হিন্দুরা জবাব দিতে লাগল। সে কি উত্তেজনা। ছাতে ছাতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে। পেতল-কাঁসার থালা বাজছে। শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। লোকের মন গড়ে উঠছে। একতা দেখা দিচ্ছে। লোকে চিন্তা করতে শুরু করেছে। এক কথায় জাতি জেগে উঠছে। সমগ্র জাতি। শুধু খদ্দরধারীরা নয়। অথবা রিভলবারধারীরা নয়। সমগ্র জাতি। ১৯৪৬ সাল থেকেই প্রকৃতপক্ষে জাতি-গঠন সুরু হল। হয়ত প্রথমটা ভ্রাতৃবিরোধেই আকার লাভ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তাশক্তিও সক্রিয় হল।

সুদুর ছাপরাতেও উত্তেজনা সংক্রামিত হল। যত্রতত্র এই আলোচনাই চলছে। মুসলমানেরা মুসলিম লীগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। কারণ জিন্নার মুসলিমলীগের ভলাণ্টিয়াররা কিছুদিন পূর্বে শহরে মার্চ করে গেছে। সব উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের। তাদের দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা দেখে মুসলমান উকিলেরা পর্যন্ত গর্বে ফুলে উঠেছে। মুসলিম লীগের স্থানীয় সভাপতি উকিল মনজুর আলি আমায় জিজ্ঞেস করলেন—দেখা হ্যায় চেহারা? কেইসা বুলন্দ হ্যায়? কেইসা টল্ টল্ ফিগার?

বললাম—মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ!

মনজুর আলি চুপ করে রইল।

আমি বললাম—চুপ হ্যায় কেঁও? বোলিয়ে মুসলীম লীগ জিন্দাবাদ।

মনজুর আলি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। খুব সুরসিক ব্যক্তি। আমার প্রতি বিশেষ প্রীতিভাবাপন্ন।

তিনি বললেন—বদমাসী কর রহে হো?

আমিও বললাম—উয়হ ভি মুসলীম লীগকা লোকাল প্রেসিডেণ্টকা সাথ? অব তো হামারা লিয়ে বঁচনা মুসকিল হোগা। আমরা

দুজনেই হেসে উঠে হাত মেলাতাম। হিন্দু-মুসলমানের রসের ক্ষেত্রে একতা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিবাদ।

কলকাতার খবর লোকমুখে এখানে এসেও পৌঁছতে লাগল। খবরের কাগজের পাতায় অনেক কিছুই প্রকাশিত হতে লাগল। লোকে শুনছে, পড়ছে আর উত্তেজিত হচ্ছে। এখানকার মসজিদে মসজিদে স্থানীয় মুসলমানদের সভা হচ্ছে। একটি সুশ্রী মুসলমান হাকিম গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছেন। লোকে বলে সে নাকি দিল্লী থেকে বিশেষ-ভাবে প্রেরিত। লীগের গুপ্ত-এজেন্ট হিসেবে প্রচার-কার্য চালাবার জন্যে। অতি সুন্দর উর্দু উচ্চারণ তার। নাম সাবরী। স্থানীয় সারণ একাদেমী স্কুলে বাৎসরিক সম্মেলন হয়েছিল। হেডমাষ্টার মুসলমান। এস-ডি-ও মুসলমান। সাবরী সাহেবের মুখে সেদিন কোরাণের বয়েৎ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভাষণও দিয়েছিলেন অতি সুন্দর। স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, দীর্ঘকায়, হকিম সাহেব। অতি সুন্দর ব্যক্তিত্ব চলনে, বলনে, চলায়-ফেরায়, পোশাকে-পরিচ্ছদে, আভি-জাত্যের চরম নিদর্শন। মুসলিম সভ্যতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা শহর তোলপাড় হয়ে গেল। "সুরু হো গিয়া। সুরু হো গিয়া" রব উঠল। যে যার ঘরে আশ্রয় নিল। সহর নিস্তব্ধ। পুলিশের জীপ গাড়ী চলছে শুধু। পরদিন শোনা গেল হকিম সাহেব খুন হয়েছেন। তাঁর লাস পড়ে আছে রাস্তায় নর্দমার ধারে। নিজের ডিসপেনসারী থেকে একশো গজ দূরে। হিন্দু যুবকেরা নাকি হকি খেলার ষ্টিক নিয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল। তিনি উর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছিলেন। ছেলেরা পেছনে তাড়া করেছিল। ধরেও ফেলেছিল। তারপর প্রহারের পর প্রহার। অবশেষে তাঁর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হকিম সাহেব যতই 'ইয়া আল্লা' 'ইয়া আল্লা' করছেন, ততই মাথায় হকি ষ্টিক পড়ছে। অবশেষে আল্লাকে ডাকা বন্ধ হল। আল্লার কাছেই তিনি চলে গেলেন।

তারিখটা ছিল ২৫শে অক্টোবর ১৯৪৬। আমার তারিখ মনে রাখবার

কোনই কারণ ছিল না। এসব কথা যে কোনদিন লিখব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ ৫ই জুন, ১৯৭৬। তিরিশ বছর পরে এইসব কথা লিখতে বসেছি। গ্রীষ্মকাল। সকালে কোর্ট হচ্ছে। কোর্ট গেছি। সেখানে আমার এক বিহারী উকিলবাবু আমার সাহিত্য-সাধনার কথা প্রতিদিন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন। নাম জিতেন্দ্রনারায়ণ শর্মা। পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—সাবরীর খুন হবার তারিখ মনে আছে, শর্মা?

তিনি বললেন—না। তবে সাধু বাবুকে জিজ্ঞেস করুন।

সাধু বাবু অ্যাডভোকেট। তিনিও পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন। এখন অন্ধ। অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি। স্মরণশক্তি অসাধারণ। তিনিও আমাদের ঘরেই বসেন। ভূমিহার ব্রাহ্মণ। পুরো নাম, সাধুচরণ পাণ্ডে। বেলা প্রায় দশটা। বললাম—পাঁড়েজী, আপনার স্মরণ শক্তির একটু পরীক্ষা করব?

তিনি বললেন—করুন।

বললাম—হকিম সাবরীকে, কবে মারা হয়েছে, তার তারিখ বলতে পারেন?

তিনি বললেন—তারিখ? দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু মনে করতে দিন। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ২৫শে অক্টোবর '৪৬।

বললাম—তারিখ মনে রাখবার কি কারণ তাও বলুন। 'তাও বলছি' বলে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। যতটা মনে আছে তাঁর ভাষাতেই বলছি। অবশ্যই হিন্দীতে কিন্তু আমি অনুবাদ করে দিচ্ছি। তিনি বলতে লাগলেন।

আমার মনে আছে আমি ২৩শে অক্টোবর ১৯৪৬ দিল্লীতে বিশ্বনাথ মিশিরকে লিখি যে এখানকার পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপ হয়ে চলেছে। তুমি যত শীঘ্র পার চলে এসো। বিশ্বনাথ মিশিরের সঙ্গে যোগাযোগ হল টেলিফোনে। মুখ্যমন্ত্রী আদেশ দিলেন—আপনি এই

মুহূর্তে সরকারী গেজেটে প্রমোশান দিয়ে দিন যে বি, এন, মল্লিককে ডিষ্ট্রীক ম্যাজিষ্ট্রেট করা হল। তিনি এস, পি-ও থাকবেন। ডিষ্ট্রীক ম্যাজিষ্ট্রেটও থাকবেন। তারপর ট্রেজারী অফিসারকে ডেকে বলে দিলেন মল্লিকের সব চেক্ যেন সঙ্গে সঙ্গে পেমেণ্ট করা হয়। স্পেশাল মেসেঞ্জর যেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সরকারী ইস্তাহার নিয়ে উপস্থিত হয়। তবে আমি এখান থেকে নড়ব।

তাই হল। দু দিন পরে অবস্থা আর একটু আয়ত্তে আসার পর তিনি এখান থেকে গেলেন। এই সময় খাঁ আবদুল গফর খাঁ এলেন। সরজমিনে তদারক করতে। তিনিও দশ জনের ওই জড়াজড়ি করে থাকা মৃতদেহ দেখে চোখের জল রোধ করতে পারলেন না। মল্লিক এত ভাল কাজ করেছিলেন যে পরে দিল্লীতে ডাইরেক্টর হয়ে চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের কথাতেই জওহরলাল ওঁকে এই পোষ্টে লাগালেন। উচিত কাজই করলেন।

পাঁড়েজীর কাহিনী শেষ হল। এমন মানবিক আবেদনে পরিপূর্ণ কাহিনী সচরাচর শোনা যায় না। তাছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। বক্তা বর্তমানে সত্তর পার হয়ে গেছেন। যিনি চিরকাল অন্ধ ছিলেন না। তিরিশ বছর আগে চক্ষু বিলক্ষণ সক্রিয় ছিল। ব্যাপারটাই অপারেশনের পর, একটির পর একটি, দুটি চক্ষুই অন্ধ হয়ে গেছে। তথাপি কাজ করে চলেছেন পূর্বের মতই। দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত প্রখরতা লাভ করেছে। কোর্টে কাজ করবার সময় তাঁর তারিখ ইত্যাদি বলে যাবার ক্ষমতা দেখে আমরা অবাক হতাম। তাঁর প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল। ধনের জন্য নয়, জ্ঞানের জন্যে নয়, সহানুভূতিশীল হৃদয়ের জন্যে। অ্যাডভোকেট মানুষ। বক্তৃতা শক্তি অসাধারণ। বর্ণনা শক্তি নির্ভুল। পুঙ্খানুপুঙ্খ। আবেগ সমন্বিত। চমৎকার অবজেকটিভ অ্যানালাইসিস করলেন এখানকার দাঙ্গার প্রথম দিক্কার দিনের।

বেলা বারোটা বেজে গেল। রোদ্দুর প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে

উঠেছে। তবু আমাদের কারও ঘরে ফেরবার কথা মনে হচ্ছে না। সকলেই একটু পরে উঠে দাঁড়ালাম। পাঁড়েজী যেতে যেতে বললেন—লিখুন। এসব লিখুন জিতেনবাবু। ইতিহাস হবে সত্য ইতিহাস। বললাম—চেষ্টা করব। তাঁকে কথা দিয়ে দিলাম। তাই একটু বিস্তৃতভাবেই লিখলাম। আমি ঐতিহাসিক নই। একদিন আমিও থাকব না। পাঁড়েজীও থাকবে না। সেদিন যদিও কারও কৌতূহল হয়, প্রত্যক্ষদর্শীর এই বিবরণ পড়ে হয়ত আনন্দ পেতেও পারেন। সংসারে সব রকম লোকই আছে। মল্লিকও আছেন। মিত্র সাহেবও আছেন। এই সহরেই সাধুচরণ পাণ্ডে ও রামদেও সিংহের মত নির্ভীক পরোপকারী লোকও ছিলেন। ওঁরা দুজনেই ভূমিহার। ভূমিহার মানেই এদেশে কুটকৌশলী কুচক্রী, ধড়িবাজ। তাঁরা হয়ত তাই। স্বার্থ ভালমত বোঝেন। কিন্তু স্বার্থটাই তাঁদের একমাত্র জিনিষ নয়। পদ এবং অর্থই তাঁদের একমাত্র পদার্থ নয়। হৃদয় নামক বস্তুটিও তাঁদের আছে। একটু বেশীমাত্রাতেই আছে। এই সহরেই বি এন মল্লিকের মত দৃঢ়চিত্ত পুলিশ অফিসারও ছিলেন। পাঁচকড়ি বাবুর মত পলায়ন বাদী অফিসারও ছিলেন।

হয়ত বিহার দাঙ্গার বিবরণ অন্যত্র সবিস্তারে লেখা আছে। আমি জানি না। আমি লিখতে বসেছি আমার আধ্যাত্মিক জীবনের আত্মকাহিনী। স্পিরিচুয়েল অটোবায়োগ্রাফি। সেই হিসেবে এই ঘটনার উল্লেখের প্রয়োজন আছে। আমিও হিন্দু। হিন্দুর দুর্বলতা থেকে আমিও যে মুক্ত তা বলতে পারি না। পক্ষপাত-দুষ্ট আমিও। ধর্ম নিয়ে মারামারির দিন গত হয়েছে। ধর্ম নিয়ে অনেক সম্প্রদায় অনেক মাথা ফাটাফাটিও করেছে। ঈশ্বর যেখানে ছিলেন—সেখানেই আছেন। কোন ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন নি। কারণ ধর্মটা বাইরের জিনিস নয়। ভেতরের জিনিস। উপলব্ধির জিনিস। যা মানুষকে ধারণ করে থাকে, সেই তার ধর্ম।

মানুষই সব। ব্যাসদেব বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ভীষ্মের মুখ দিয়ে

বলিয়েছিল 'নহি মনুষ্যাৎ পরতরং কিঞ্চিৎ।' মানুষের চেয়ে বড় কিছুই নেই। সে শিক্ষা আজও আমাদের মজ্জাগত হয়নি। মানুষ হিন্দুও নয়। মানুষ মুসলমানও নয়। মানুষ মানুষ। তার ভাষা কিছু নয়। তার ধর্ম কিছুই নয়। পয়গম্বরপুর আর খোদাইবাগের মুসলমানের দুর্গতির কাহিনী শুনে আজ এতদিন পরেও আমি বেদনা অনুভব করছি। আমি সেই দশজনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দৃশ্য ভাবছি আর আমার ভেতরের নাট্যকার নেচে উঠছে। এ দৃশ্য কি আমি চিত্রিত করতে পারি? না। চিত্রেও নয়। মঞ্চেও নয়। অক্ষরের যাদু দিয়ে হয়ত কিছু ইঙ্গিত দিতে পারি। পাঠক বাকীটা নিজের কল্পনা দিয়ে কল্পনা করে নেবেন।

পয়গম্বরপুর নামটা বৃথা দেওয়া হয়েছে। ওখানে বোধহয় পয়গম্বর ছিল না। যেমন ছিল না খোদাইবাগে কোন খোদা। মানুষের হাতে মানুষের কি ভয়ঙ্কর পরিণাম। যারা এমনভাবে সেদিন প্রাণ দিল তারা কার কি ক্ষতি করেছিল? যারা তাদের এমনভাবে পুড়ে মরতে বাধ্য করল তারা কি লাভ করল? ধর্মের নামে মানুষ কত অধর্মই না করতে পারে। পাঁড়েজী বললেন—১৫০ জন লোকের গায়ে অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার চিহ্ন দেখেছি। ১১৬টা মৃতদেহ দেখার কথা ত বলেইছি। বিহারের এই দুটো মুসলমান প্রধান গ্রামের এই চিত্র। না জানি এমন কত দৃশ্যই ভারতবর্ষের অন্যত্র ঘটেছে। নোয়াখালিতে। পূর্ববঙ্গে। নিশ্চয়ই এমন শত শত দৃষ্টান্ত আছে। সেখানে মুসলমানই হিন্দুকে মেরেছে।

পাঁড়েজী এতদিন পরে অতিরঞ্জিত কাহিনী বলেছেন এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনীই বলেছেন। সব ব্যবসাদারদের সমক্ষেই। কোন প্রেস রিপোর্টারের কাছে নয়। শ্রোতারা প্রত্যেকেই সমর্থন করেছিল মাথা নেড়ে নেড়ে। কারণ তারা সকলেই এ কাহিনীর কথা অল্প-বিস্তর শুনেছে। শর্মাজী আমার যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। বললে হয়ত

অসত্য হবে না যে আমার কোন বাঙ্গালী স্বজাতির এত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নয়। আমি বাঙ্গালী। তিনি বিহারী। এ কথা দুটোর অর্থ কি? আমি বুঝি না। আমরা যখন দু'জনে অবসর সময়ে ফিস্ ফিস্ করে গল্প করি, ঘর শুদ্ধ লোক টিপ্পনি কাটে।

একজন তরুণ অ্যাডভোকেট বলেই বসে শর্মাজী দাদাকো মনোপলিজ কিয়ে হুয়ে হঁয়। আমি এখানে সকলের 'দাদা'। এই আমার পরিচয়। শর্মাজী আমার স্বীকৃতি হচ্ছে না বলে ক্ষুব্ধ। আমি বলি আমি স্বীকৃতি চাই না। আমি চাই সৃষ্টি। আমি কিছু সৃষ্টি করে যেতে চাই। মাদাম কুরী যেমন একদিন রেডিয়াম আবিষ্কার করে গেছে, আমি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সেই রেডিয়াম আবিষ্কার করতে চাই। যা লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকারে লাগবে।

শর্মাজী বলেন—আমি আপনার মত অপটিমিষ্ট নই।

বলি—আমি কি করতে পারি লেখা ছাড়া?

শর্মা বলে—কলকাতা যান। শর্মা প্রেসিডেন্সী কলেজে এককালে পড়েছে। আমার চেয়ে বয়সে ছোট। সে জানে কলকাতায় গুণীদের মূল্য আছে।

আমি বলি আছে। কিন্তু আমার কোন গুণ নেই। তাই হয়ত মূল্য পাচ্ছি না।

সে বলে—চেষ্টা করুন।

বলি—ভেবে দেখব। আগে লেখাটা ত শেষ করি। এখন অঙ্ক কষছি বসে বসে বালুতে জ্যামিতির ফিগার আঁকছি, ইতিমধ্যে যদি আর্কিমিডিসের দশা হয় যমরাজের মত কর্তব্যপরায়ণ কোন সোলজার আমার পিঠে তলোয়ার ঢুকিয়ে দেয় আমি কি করতে পারি? যম-রাজকে ধন্যবাদ দিয়ে বলব—থ্যাঙ্ক ইউ, বলে লেখা বন্ধ করব। তার আগে নয়।

পাঁড়েজীর কাহিনী শোনার পর আমি ও শর্মাজী ফিরছি। শর্মাজী হেসে বললেন - আপকা ম্যাটিরিয়াল মিল গিয়া না কুছ?

বললাম—বেসক্ ! লাখ লাখ শুক্রিয়া।

শর্মাজী খুসীতে গদগদ হয়ে উঠলেন। অতি সুশ্রী ব্যক্তি তিনি। গৌরবর্ণ মুখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। আমি ভাবলাম আমার কথা ভেবে কোন বাঙ্গালী ত শর্মার মত খুসী হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ত দেখি ছিদ্র অন্বেষণে সকলে ব্যস্ত। আমার কোন প্রদেশ নেই, কোন জাত নেই, আমি এক আন্তর্জাতিক মানবদেহধারী জীব মাত্র। প্লেটো মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন—a two legged animal without feathers। আমিও তাই বলি। কেবল আমার মস্তিষ্ক আছে। plato সে কথাটা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। শুধু পালকহীন দ্বিপদ জন্তু নই। চিন্তাশক্তিসম্পন্ন মানুষও একজন চাই।

এইবার নিজের চোখে দেখা কথাও কিছু বলি।

নোয়াখালি, ত্রিপুরা চাঁদপুরের কথা তখন সারা ভারতে ছড়িয়ে গেছে। এখানকার আকাশে বাতাসে তখন প্রচুর উত্তেজনা। পাড়ার কয়েকজন মাতব্বর মিলে একটা মিটিং ডাকল। আমাকে মহল্লার প্রেসিডেণ্ট করে দিল। চুরি ডাকাতির ভয় অত্যন্ত বেশী। পুলিশ অত্যন্ত কম। আমরা পালা করে এক এক দল রাত্রে পাহারা দিতে লাগলাম। সারারাত টর্চ হাতে সারা মহল্লা ঘুরে বেড়ানো। এখানেও রায়ট শুরু হয়ে গেছে। সন্ধ্যের পর কারফিউ কারুর কোথাও বেরুবার যো নেই। আমার বৈঠকখানাতেই আড্ডা জমতে লাগল। চা খাওয়া গল্প ইত্যাদিতে নটা পর্যন্ত কাটানো যেতে লাগল। উত্তেজনা কিন্তু ক্রমশঃ বাড়তেই লাগল। আমার পাড়ায় এক মুসলমান মোক্তার ছিলেন। সৈয়দ মহম্মদ জনিফ। গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদের সরিয়ে নিয়ে এক জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করেছেন। ইয়াসিন খাঁ নামে একজন অ্যাডভোকেটের বাড়ীতেই আশ্রয় স্থান নির্ধারিত হয়েছে। প্রায় পাঁচশো মুসলমান নর-নারী বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী সেখানে গিয়ে একত্রিত হয়েছেন।

একদিন মোক্তার সাহেব এসে বললেন—আমরাও কি বাস্তুভিটে ছেড়ে

চলো যাবো ? ওখানে গেলে ইজ্জত থাকবে কিছু ? পর্দা থাকবে কিছু ?

আমি বললাম—যাবেন না আপনারা ?

তিনি বললেন—কিন্তু এখানে যে কিছু হবে না তার গ্যারান্টি কি ?

বললাম – যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকব, আপনাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। আমার লাসের ওপর দিয়েই হিন্দু দাঙ্গাকারীরা আপনাদের বাড়ী ঢুকতে পারবে। তার পূর্বে নয়।

তিনি বললেন—এতটা জোর দিচ্ছেন ?

বললাম—অবশ্যই দিচ্ছি। আমাকে যখন আপনারা প্রেসিডেন্ট করেছেন, তখন আমারও একটা দায়িত্ব আছে।

তিনি খুসী হয়ে চলে গেলেন। বাড়ী ছাড়লেন না। সামনের একটা বাড়ীতে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকতেন। বিহারী ব্রাহ্মণ। সপরিবারে থাকতেন। তিনি একদিন এসে বললেন আপনার এই বাইরের ঘরটা যদি আমাদের ছেড়ে দেন, আমরা রাত্রে এসে থাকতে পারি। ক'দিন থেকে আমাদের চোখে ঘুম নেই। সন্ধ্যে হলেই মনে হয় মুসলমানেরা উঁকি মারছে। বাইরের ঘর ছেড়ে দিলাম। তাঁরা রাত্রে এসে থাকতে লাগলেন। আমার আলাদা অফিস ঘর ছিল। কোন অসুবিধে হল না।

একদিন দেখি হিন্দু যুবকেরা জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে তৈরী। সামনের একটা মুসলমানের ঘরে আগুন দেবে। বললাম—তোমরা আগুন দিতে পারো। কিন্তু পরে যখন তদন্ত হবে আমি কারও নাম গোপন করব না। তারা বললো—নোয়াখালিতে কি হচ্ছে ? আপনি বাঙ্গালী হয়ে এই কথা বলছেন ? বললাম এখানে এক মুসলমানের বাড়ী পোড়ালে, নোয়াখালির মুসলমান কতটুকু জব্দ হবে ? তারা নিরস্ত হল।

একদিন রাত বারোটায় বিছানায় শুয়ে আছি, হঠাৎ বাইরে মিলিত কণ্ঠের ভীষণ চীৎকার—“আল্লাহো আকবর” শোনা যেতে লাগল। বিছানায় শুয়ে আছে তিনটি শিশু ও স্ত্রী। আমি উঠলাম। প্যাণ্ট

পরলাম। টুপি মাথায় দিলাম।
স্ত্রী বললেন—কোথায় যাচ্ছো ?
বললাম—দাঙ্গাকারীদের আটকাতে।
তিনি বললেন—তুমি কি করে আটকাবে ?
বললাম- দেখি, যতটা পারি।
একটা বেটন হাতে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। আশে-পাশের হিন্দুদের ডাকলাম। কেউ এল না। এক D.I.G সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন—কে তুমি ? জান তোমায় গুলি করতে পারি নিষেধ অমান্য করায় ?
বললাম—I know that but don't you see the Mohamedan are going to attack।
সাহেব বললেন Where are they ?
বললাম—Come with me।
আমি এগিয়ে গেলাম। সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে পেছনে পেছনে আসতে লাগলো। এ পাড়ার মুসলমান নেতা ছিল একজন সিভিল কোর্টের ক্লার্ক। নাম আবদুল রব। তার বাড়ীতে গিয়ে দেখি তিনি খাকী প্যান্ট, খাকী সার্ট পরে দুই হাতে বন্দুক নিয়ে বসে আছেন। পাশে স্তুপাকার bullet। সাহেব বললেন—What is this ?
তিনি বললেন The Hindus are attacking।
সাহেব গর্জে উঠলেন—Where are they ?
তিনি বললেন—They are peeping from the roots.
সাহেব বললেন সঙ্গী ইনস্পেক্টরকে You see Sanyal where ever I go the Hindus say the Mohamedans are attacking. The Mohamedans say Hindus are attacking.
তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন -- Go and sleep soundly. nobody will attack you. অতঃপর নিশ্চিন্ত মনে শুতে গেলাম। পরদিন সকালে আমি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলাম। সকলে ভাবল আমিই বুঝি থানায় গিয়ে সাহেবকে ধরে এনেছি।

ক্রমশঃ আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। কিছুদিন পরে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম ভয়ই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই ভয়কেই মন থেকে উৎপাটিত করে ফেলতে হবে। বহুদিন যে জাতি নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল তার যেন ঘুম ভাঙ্গছে। হাজার বছর ধরে যে জাতি গতানুগতিক পথে চলে এসেছে সে আজ প্রত্যেক জিনিসের কারণ অনুসন্ধান করতে শুরু করেছে। জাতি আত্মস্থ হচ্ছে। নিজের মনকে আবিষ্কার করছে।

একদিন একলা বেড়িয়ে ফিরছি। আপন মনে ভাবছি নাটকের বিষয়বস্তু। হঠাৎ মনে হল নাটকের নায়ক মুসলমান হলে কেমন হয়? বেশ ত যুগোপযোগী হয়ে ওঠে। যে কথা সেই কাজ। নতুনভাবে নাটকটা লিখলাম। সেই বই পরে নাট্যাচার্য দ্বারা মঞ্চস্থ হলো।

ঠিক এই সময় আরো একটি জিনিস হলো। পুরী ব্যাঙ্কে আমার যথাসর্বস্ব রেখেছিলাম। হঠাৎ পুরী ব্যাঙ্ক ফেল করল। আমি নিঃসম্বল হলাম।

আজ বুঝতে পারছি আমার অহং বিনাশ পাবার জন্যে এই পরিস্থিতির আবশ্যকতা ছিল। মানুষ যে কত অসহায় এই বোধ একবার হলে, মানুষ আর একটা শক্তিকে খোঁজে। এতদিন বারীন্দ্রকুমারের third power-এর কথা শুধু মুখেই বলেছি। এইবার সেই তৃতীয় শক্তির ওপর সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে নির্ভর করার সময় এল। আমি আত্মশক্তি ছেড়ে তৃতীয় শক্তির শরণাপন্ন হলাম। মানুষ মরে যায় না। মানুষ বেঁচে থাকে। তার মেরুদণ্ড শক্ত হয়। আঘাত না পেলে বাদ্য বাজে না। জীবন সঙ্গীত অ-গীত থেকে যায়।

দিব্যি অ্যাসিষ্টাণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটারের কাজ করছিলাম। মাঝে মাঝে এক-আধটা সরকারী ব্রিফ পেতাম। কিছু প্রাপ্তিযোগও ঘটত। হঠাৎ একজন ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন উড়িষ্যাবাসী। আচার্য তাঁর নাম। তিনি আমার নামটি প্যানেল থেকে কেটে দিলেন। কোন কারণবশতঃ নয়। এমনিই। এবার নির্বাচনের ভারও তাঁদের হাতে।

সরিয়ে দেবার শক্তিও তাঁদের হাতে। বলবার কিছুই নেই। অ্যাডিশানাল ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট পাঁচকড়ি মিত্র বললেন—আপনার নাম আমি পাঠিয়েছিলাম। সাহেব কেটে দিলেন। আমি কি করব? সত্যিই তিনি কি করবেন? আমি কিন্তু উদাসীন থাকতে পারলাম না। বিলক্ষণ মানসিক বেদনা পেলাম। অপমানিত মনে করলাম নিজেকে। মনে মনে স্থির করলাম যা এত সহজে যায়, তা আর ফিরে পাবার চেষ্টা কোনদিন করব না।

অন্ধকার, নিঝুম, থমথমে রাত্রি। বসে বসে একা ছাদে নিজেকে প্রশ্ন করি—ততঃ কিম্? সূর্য কি আর উঠবে না? ভোরের পাখিরা আর কি কলরব করে উঠবে না? সত্যিই এখন কেবল মনে হয়েছে একটা বিশেষ জায়গার নদীর তীর। সেখানে প্রাণহীন দেহ ভস্মীভূত করা হয়ে থাকে। অবসাদগ্রস্ত মনকে কেবল প্রশ্ন করি সেই অবশ্য গন্তব্যস্থানে যেতে আর বিলম্ব কত? যদি বিফলতাই বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তাহলে অযথা বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি? এবারের মত পালা সাঙ্গ করে দিলেই ত হয়। এই হাড় মাসের পিঞ্জরটা বয়ে নিয়ে বেড়াবার দায় থেকে অব্যাহতি পাই।

কেমন করে সমস্ত কালো মেঘ অপসারিত হল তার কথাই বলব পরবর্তী পর্বে। এই পর্বের কাল ১৯৩২ থেকে ১৯৪৭ পনেরো বৎসর। একটা যুগের চেয়েও বেশী।

কার জীবন সঙ্গীত ?—মানুষের। কে গাইছে ?—মানুষ। কে শুনবে ? —মানুষ। কেন ?—ভুল ভাঙ্গাতে। কিসের ভুল ?—মনের ভুল।

আমার দু'জন বন্ধু—সুধাংশু এবং প্রবোধ, আমার নাটক শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তাদের চেষ্টায় অবশেষে এখানকার মঞ্চে সেই নাটক অভিনীত হল ১৩ই নভেম্বর ১৯৪৭। পুরীতে ১৯৩১ সালে আমার প্রথম নাটক 'তপস্যা' অভিনীত হয়েছিল। ষোলো বছর পরে ছাপরায় আমার দ্বিতীয় নাটক 'ভাবীমানব' মঞ্চে অভিনীত হল। প্রশংসা পেল। দেখলাম, একটা বিষয়ে আমার কিছু বিশেষত্ব আছে। সেখানে আমি অন্যদের থেকে আলাদা। এ গুণ হয়ত আমার জন্মের থেকেই আছে। ভাল। কিন্তু এখানকার বদ্ধ হাওয়ায় ক্রমশঃ দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। এই ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে জীবন শেষ করবার জন্যে আমি জন্মাই নি। কলকাতা আমায় ডাকছে।

কলকাতা। রাজধানী কলকাতা। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি কলকাতা। জ্ঞানী ও গুণীদের পরমতীর্থ কলকাতা। সেখান থেকে দূরে থাকলে কেমন করে কোন সার্থকতা লাভ হবে? কে দেবে আমায় জল, আলো, বাতাস ? অতএব যেতেই হবে।

উঠলাম ইণ্ডিয়া হোটেলে। দৈনিক আট টাকা। থাকা ও খাওয়া। মন্দ কি! আমায় এগিয়ে যেতে হবে। দূরে। আরও দূরে। আত্মবিকাশ ঘটাতে হবে। স্বীকৃতি পেতে হবে। বারীন্দ্রের শিক্ষা ভুলিনি। অরবিন্দের আদর্শ ভুলিনি। তিনি একদিন অন্তরের আদেশ শুনেই বরোদা ছাড়লেন। আমিও তেমনি অন্তরের আদেশেই ছাপরা ছাড়লাম। তবে চিরকালের জন্যে নয়। কিছুকালের জন্যে।

সুন্দর হোটেল। ডবল সিটেড রুম। একটা খাট পাওয়া গেল। শোবার জন্যে। একটা বাথরুম পাওয়া গেল। স্নান করবার জন্যে।

একটা আয়না পাওয়া গেল। মুখ দেখবার জন্যে। আহার্যও পাওয়া গেল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশেই বিরাট গগনস্পর্শী হোটেল। দ্বারে দারোয়ান। আর কি চাই?

আমার বন্ধু প্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায় ছিল কমিউনিষ্ট। সে আমার নাটকে নায়কের পার্টে অভিনয় করেছিল। সে বললে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে যেও। কাজ হবে। উনি নাকি খুব "প্রোগ্রেসিভ" অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। নিজেও দেশপ্রেমিক। আদর্শবাদী। যৌবনে অনুশীলন-সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। খদ্দরধারী। নবনাট্য-আন্দোলনের প্রচণ্ড সমর্থক। নাট্যকার। অভিনেতা। নাটকের মঙ্গল চান। নবীন নাট্যকারদের উৎসাহ দেন। ইত্যাদি। শুনে প্রবল ভরসা পেলাম। অনেক পরিশ্রম করে তাঁর ঠিকানা জোগাড় করলাম। শ্রীরঙ্গমের বুকিং-অফিস থেকে। কাছেই থাকেন। ৭৬/২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। বিরাট পাঁচতলা বাড়ী। ভাড়াটে বাড়ী। ফ্ল্যাট বাড়ী।

তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে কড়া নাড়লাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। চেহারা ভারী সুন্দর। শ্রদ্ধা হয় দেখলে। স্থূলকায়। গোঁফ দাড়ী কামানো মুখ। টকটকে গৌরবর্ণ রং। বড় বড় চোখ। প্রসন্ন দৃষ্টি। ভেতরে এসে বসতে বললেন। গেলাম ভেতরে। বেতের মোড়ায় বসলাম। আমার আগমনের উদ্দেশ্য শুনেই ভ্রু-কুঞ্চিত করলেন। বললেন—তা আমি কি করতে পারি? আমি ত এখন কোন থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত নই। সিনেমা করি-টরি।

বললাম—নাটকখানা একবার পড়েও ত দেখতে পারেন। আপনি নাট্যশিল্পী। স্বয়ং অভিনেতাও। নাট্যকারও। মহর্ষি নাম দ্বারা সম্মানিত নট আপনি। রঙ্গমঞ্চে এর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। মহর্ষি বলতে আগে বোঝাতো রবীন্দ্রনাথের পিতাকে। এখন আপনাকে। একবার চোখ বোলাতে আর কত সময় লাগবে?

এমন স্তুতিবাদের পর তিনি আর কি করতে পারেন? বললেন—

আচ্ছা! আচ্ছা! কৈ দেখি? তিনি রাখলেন নাটক। পরের দিন আসতে বললেন।

পরের দিন যেতেই আর ভেতরে এসে বসতে বললেন না। দরজা থেকেই বিদেয় দিলেন। বললেন—বড্ড রায় বাহাদুর যে! সস্তা রসিকতা!

বুঝলাম, বুর্জোয়াদের প্রতি কটাক্ষপাত করলেই কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া যায়। প্রোগ্রেসিভ হওয়া যায়। কিন্তু ভেতরের ভাব গোপন করে আমিও পুঁজিবাদীদের প্রতি কটাক্ষপাত করে বললাম—দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও ওঁরা আছেন যে এদেশে। লিকুইডেটেড হয়ে যাননি ত এখনও।

নিছক অভিনয়। অভিনেতার সঙ্গেও অভিনয়। তিনি বোধহয় আমার ধূর্তামি বুঝতে পারলেন। বললাম—শুধু রায় বাহাদুরদেরই দেখলেন? আর কিছু দেখলেন না? আর কাউকেও চোখে পড়বার মত মনে হল না?

বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো অনেকেই আছেন বটে। তা আপনি এক কাজ করুন না। প্রভাতের কাছে যান। প্রভাত সিংহ। ও হল রঙমহলের পরিচালক। ওপরেই থাকেন। ফ্ল্যাট নম্বর Y-11-এ। বলবেন, আমি পাঠিয়েছি। যেন ভাল করে নাটকটা দেখে। একজন লোক সামনে দিয়ে যাচ্ছিল ওপরে। তাকে ডেকে বললেন—ওরে! একে নিয়ে যা তো প্রভাতের কাছে।

ভৃত্যের পেছনে পেছনে গেলাম। সে ভৃত্য, কলকাতার ভৃত্য। বাস্তববাদী ভৃত্য। সে মনোরঞ্জনবাবুর আদেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল। যাবার সময় অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে একটা বন্ধ দরজা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, ইংরেজীতে লেখা Y-11। বন্ধ দরজার কড়া নাড়লাম। ভাবলাম আর আমার চিন্তা কি। রঙমহলের পরিচালকের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে গেছি ত? মহর্ষির মত একজন স্বনামধন্য লোকই তাঁর কাছে পাঠাচ্ছেন। এবার আমার কপাল খুলল আর

কি! কিন্তু সেদিন নাট্য-জগতের পরিচালক যারা ছিল, তারা যে কত তুচ্ছ তা জানতাম না। নাট্য-জগতের উন্নতি হবে কি করে? এক একটি ফাঁপা উইটিপি এক একজন।

ভৃত্য দরজা খুলে দিল। আমার পরণে ছিল একটা দামী সার্জের গরম পাঞ্জাবী। পাতলা মিলের আটচল্লিশ ইঞ্চি ধোয়া ধুতি। কোঁচা লুটোচ্ছে মাটিতে। পায়ে মানানসই জুতো। রীতিমত ধনী ব্যক্তির মতই পোষাক পরিচ্ছদ। চেহারার কথা বলতে পারি না। আয়না আমায় ভুল খবর দেয়। হাতে একটা হীরের আংটি। আজকালকার নকল হীরে নয়। খাঁটি জিনিস। কমল হীরে। ভৃত্য আমায় সম্ভ্রান্ত কেউ ভেবেছিল নিশ্চয়। কলকাতার অতি চালাক ভৃত্য যে। কিন্তু আমি যে ভাল বংশের ছেলে হলেও, বর্তমানে ভিখিরীর সামিল তা বুঝতে পারেনি। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করল—আপনারই কি আসবার কথা ছিল?

একি রকম প্রশ্ন? এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। বাংলার বাইরে থাকি। সেখানকার লোকজন সব বোকাসোকা। সাদামাটা। কলকাতার ভৃত্যের মত এত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ভৃত্য সেখানে নেই। এত অন্তরঙ্গ প্রশ্ন ভৃত্যেরা সেখানে করে না। সংক্ষেপে বলে দিলাম—হ্যাঁ। সে বললো —আসুন।

ভেতরে গেলাম। চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। টেবিল চেয়ার আসবাবপত্র ভালই। চামড়া বাঁধানো চেয়ার। স্নিগ্ধ-দর্শন বইয়ের আলমারীও। নামী বইও আছে। আলমারীর মাথায় টেলিফোন। একটু পরে এক কাপ ধূমায়মান চা-ও এসে হাজির হল! বাঃ! উপযুক্ত জায়গায় এসে পড়েছি দেখছি।

প্রভাতবাবু এসে ঢুকলেন। লম্বা, ফর্সা, দীর্ঘকায়, গাল তোবড়ানো, রোগা লোক। পরনে গেঞ্জি। সিল্কের লুঙ্গি। নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আমাকে কিন্তু দেখেই মুখ একেবারে বিকৃত করে উঠলেন। একি! এ আবার কে? চাকর ভুল খবর দিল নাকি? কলকাতার অতি-চালাক

ভৃত্য! ছি ছি ছি! চা টা মাঠে মারা গেল দেখছি। আমি উঠে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে নমস্কার করলাম। আত্মপরিচয় দিলাম। আগমনের উদ্দেশ্য শুনে মুখটা আরো বিকৃত করলেন। তিনি অভিনেতা মানুষ। অভিব্যক্তি দিতে জানেন। চরম অভিব্যক্তি দিলেন বিক্ষোভ, বিতৃষ্ণা, বিরক্তির। আমি যেন কলেরার 'কমা' ব্যাসিলাস। অথবা টিটানসের ব্যাসিলাস 'টিটানি'। সর্দি-কাশির সাইক্রোভাইরাস। অতিরিক্ত ঝাঁঝের সঙ্গে আমার কথাটা ব্যঙ্গ ভরে পুনরুক্তি করলেন—মনোরঞ্জনবাবু পাঠিয়েছেন! কেন? পাঠাবার কি দরকার ছিল? উনি ত নিজেও নাটক দেখতে পারেন। নিজেও ত মালিককে বলতে পারেন। আমার কাছে পাঠাবার কি দরকার?

বিনয় নম্র কণ্ঠে বললাম—কি করে বলব? পাঠিয়েছেন এই পর্যন্ত বলতে পারি। আমরা মফঃস্বলের মানুষ। মফঃস্বল থেকেই আসছি। তাও আবার দরওয়ানদের দেশ থেকে। আমাদের এত বুদ্ধি কোথায়?

তারপর চলল ধ্বস্তাধ্বস্তি। তিনি বসতেও বলবেন না। আমি চলেও যাব না। মাটি কামড়ে পড়ে আছি। যেন আমার জীবনমরণ নির্ভর করছে এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকার ওপর। কেবল বলছি—নাটকটা একবার দয়া করে পড়তে দোষ কি! তিনিও পরিচালকই ত। নাটক পছন্দ না হয়, আমি ত আর জোর করতে যাব না। শুধু একবার দয়া করে পড়ে দেখতে। এইমাত্র অনুরোধ। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। খেতেও বলছেন না। যেতেও বলছেন না। গজরাচ্ছেন শুধু। প্রভাতবাবু ধরে ফেলেছেন মনোরঞ্জনবাবুর চালাকি!

বাংলায় আজ নাটকের এই দশা কেন তা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমার এই অভিজ্ঞতা পড়বার পর যদি দৃশ্য পরিবর্তন হয়, বুঝবো একটা কাজ আমি করে গেলাম অন্ততঃ। কিন্তু দৃশ্য যে পরিবর্তিত হবে না তা জানি। আমার মত ভুক্তভোগী হয়ত অনেকেই। কিন্তু তাঁরা কেউ লিখে রাখা দরকার মনে করেননি। তাঁরা তাঁদের দুঃখ ব্যক্তিগত দুঃখ বলেই মনে করেছেন। আমি আমার ব্যর্থতা জয়-

পরাজয়, সংগ্রাম—জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি বলেই মনে করি। বাংলার নাট্য-জগতকে আশ্রয় করে যদি আমায় আজও থাকতে হত তাহলে হয়ত পুঁজিবাদীদের কাছে মস্তক বিক্রয় করতে হত। নিজের সম্মান ধূলিতে লুটিয়ে দিতে হত। আমার অবিনশ্বর আত্মার সাক্ষাৎ আর পেতাম না। তার পূর্বেই আত্মরক্ষার খাঁচা ছাড়া হয়ে যেতো। এইসব কথাও লিখতে হত না।

প্রভাতবাবু ভাগলপুরের লোক। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পাশ। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। তিনি ভাগলপুরের চম্পানগরের জমিদার মহাশয় অমরনাথ ঘোষকে থিয়েটর-জগতে এনেছিলেন। থিয়েটরের মালিক করেছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি কেন যে এত অভদ্র ব্যবহার করেছিলেন, তার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাইনি। এতো আকাশ-ছোঁয়া ভাব কেন? এত উন্নাসিকতা কেন? অপরকে এত তাচ্ছিল্য করা কেন? নাট্যকারকে এত অশ্রদ্ধা দেখানো কেন? বোধহয় তখন তাঁর পেট কামড়াচ্ছিল। পেট রোগা মানুষই ত।

আমার নাট্যকার-জীবনের ইতিহাস মানেই বঙ্গরঙ্গ-মঞ্চের উত্থান-পতনের ইতিহাস। আমার ব্যক্তিগত জীবন কিছুই নয়। আমার নাট্যকার জীবনই আলোচনার বস্তু। উদ্দেশ্য নিজের জয়ঢাক বাজানো নয়। আঘাত-চিহ্ন দেখানোও নয়। লোককল্যাণ করাই উদ্দেশ্য। নাটকের উন্নতি করা।

অনেক কষ্টে প্রভাতবাবুকে একটু নরম করতে পারলাম। অবশেষে নাটকটা দয়া করে রাখলেন তিনি। চা খেতে বললেন। পরে আসতে বললেন।

সেখান থেকে চলে গেলাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। তিনি আমার বৌদির মাসতুতো দাদা। আমায় দেখেই বললেন—আমি যে এখুনি বেরুচ্ছি। এক মিনিট বসতে পর্যন্ত বললেন না। ধুলো পায়ে

বিদেয় দিলেন। তাঁকে পূর্বে একটা পত্র দিয়েছিলাম। তিনি উত্তরও দিয়েছিলেন। চিঠিটা তুলেই দিচ্ছি ঃ

১/১ এ, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, বাগবাজার

১০. ১. ৪৩

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার নাটক নিয়ে সাহায্য করতে পারলে আমি সত্যিই সুখী হব। কিন্তু এখন দিনকাল দেখছেন? সমস্তই একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া কলকাতার পাঁচটি থিয়েটার ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত পাঁচখানি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছে। সুতরাং এখনো তিন চার মাস বা আরও বেশী অপেক্ষা করতে হবে। অথচ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে নাটক কোথাও বিবেচনাধীন রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। যদি কলকাতা আর বিশেষ বিপদগ্রস্ত না হয়, তবে মাস ছয়েক পরে আমাকে পত্র লিখবেন। আমি আপনাকে নাটক পাঠাতে লিখব।

ইতি আপনাদের

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হায়রে কলকাতা! হায়রে কলকাতার ভদ্রতা! হায়রে সাহিত্যিক এখানকার। দূর থেকে মিষ্টি মিষ্টি চিঠি লেখা কত সহজ। কিন্তু কাছে এলে? ভদ্রতার মুখোসটুকু পর্যন্ত খসে যায়। চিঠিখানার নিহিতার্থ তখন বুঝিনি। এখন বুঝছি পাশ কাটানো ; ঠেলে দেওয়া। ছ' মাসই সই। বাঙ্গালী কেন আজ সারা ভারতের উপহাসাস্পদ, তা খুঁজতে কি বেশী দূর যেতে হবে?

ফিরে এলাম বাগবাজার রোডে। আনন্দ চ্যাটার্জী লেন থেকে। ফুটপাথ দিয়ে চলেছে অবিরল জনস্রোত। সব সেলুনে ছাঁটা চুল। আর লণ্ড্রিতে ধোয়া ধুতি পাঞ্জাবী। কলকাতার সভ্য নাগরিক : এরাই হল চাকুরীজীবী, আরামপ্রিয়, ভাব-প্রবণ, বাঙ্গালী। চলেছে পর্দাহীনা, নির্ভীকা, আধুনিকা মহিলার দলও। চুলে তেল নেই। ঠোঁটে রংমাখা, ভুরুতে কালো পেন্সিল টানা। এত ড্যাবডেবে যে পরিষ্কার দেখা

যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকের মুখেই মেক-আপ। ব্লাউজের নীচে ব্রা। উন্মুক্ত নাভি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই বেশ পরিবর্তন। প্যান্ট প্রাধান্য পেল। বগল-কাটা, চোদ্দ আনা বুক খোলা ব্লাউজ প্রসার লাভ করল। ভাবছি এঁরাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এঁরাই থিয়েটারের দর্শক। এঁদের কাছে পৌঁছাব কি করে? এঁরাও কি এক একজন প্রভাতবাবু? তারাশঙ্করবাবু? তবেই ত গেছি।

হোটেলে ফিরে এলাম। প্রতিকূল! জীবন-নদীর প্রতিটি কূলই প্রতিকূল। বিকেলে গেলাম শ্রীরঙ্গমে। শিশির ভাদুড়ীর সন্ধানে। শুনলাম, তিনি বিশ্রাম করছেন। এখন দেখা হবে না। প্রশ্ন করলাম—কখন দেখা হতে পারে? জবাব পেলাম – কাল সকালে। এখানেও ঠেলে দেওয়া। গেলাম প্রভাতবাবুর কাছে। তিনি আমার নাটকের ওপরই নিজের অভিমত লিখে দিয়েছেন। এ অধিকার তাঁকে কে দিয়েছিল জানি না। কিন্তু কলকাতার থিয়েটরের পরিচালকরা ছিল এমনই স্ফীত মস্তিষ্ক। অভিমতটা কি? হাস্যকর। বাংলা নাটকের আজ এই দুর্দশা কেন তা বোঝা শক্ত নয়। তিনি লিখছেন—নাট্যকার দুঃসাহসী। কিন্তু এই নাটক মঞ্চস্থ করবার মত দুঃসাহস কর্তৃপক্ষের নেই। সমস্যামূলক নাটক—অর্থাকর্ষক হয় না। কর্তৃপক্ষ অনেকবার ঠকেছেন। বাংলায় মুসলমান কেন সংখ্যায় অধিক, তার কারণ একটু ভাবলেই বোঝা যায়। কিন্তু তার প্রতিকার? ইতি প্রভাত সিংহ, পরিচালক রঙমহল। ২৮।১১।৪৮।

প্রতিকার তাঁর কাছে কে চেয়েছিল? রঙ্গমঞ্চের কাজ যে প্রতিকার করা নয়। তা এই স্থূল বুদ্ধি পরিচালককে কে বোঝাবে! সেক্সপীয়ার ওথেলোকে দিয়ে ডেসডিমোনার গলা টিপে হত্যা করানো দেখিয়ে দিলেন বলে কি স্ত্রী হত্যা সংসার থেকে শেষ হয়ে গেছে নাকি! হয়নি। তবু নাটক আজও দেখতে ভাল লাগে পড়তেও ভাল লাগে। স্বামীর প্রশ্ন-সঙ্কুল, আবেশ-বিহ্বল, দ্বন্দ্বময়, রসসমৃদ্ধ, কাব্যময়, ছন্দোময়, প্রকাশভঙ্গীর মহিমার জন্যে।

তাঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাইলাম। কিন্তু তিনি অচল, অটল। কি আর বলব? চলে আসতে হল। বাংলার এক রঙ্গমঞ্চের পরিচালকের কি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী। কত অল্প জ্ঞান নাটক সম্বন্ধে। শিল্পের কাজ রসসৃষ্টি। একটা প্রশ্ন ওঠে ভালই। না ওঠে তাতেও ক্ষতি নেই। হৃদয় দ্বারে ঘা দেওয়া চাই। দর্শকদের চিন্তিত করে তোলা চাই। মুগ্ধ করাটাই আর্ট। দগ্ধ করাটা নয়।

কিন্তু প্রভাতবাবুকে এসব কথা বোঝাবে কে! তিনি আলোচনা করতেই চাইলেন না। আমায় বিদায় করতে চাইলেন শুধু।

আমি আমার নাট্য সাধনার ইতিহাস লিখতে বসিনি। জীবন সাধনার ইতিহাসই লিখতে বসেছি। প্রশ্ন ছিল, নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করব? মানুষের শক্তির ওপর নির্ভর করব? অথবা একটা তৃতীয় শক্তির ওপর নির্ভর করব? যে তৃতীয় শক্তির ধারণা আমার কি, তা সংক্ষেপে গোড়াতেই বলেছি। এই প্রশ্নের উত্তরই সারা জীবন ধরে পেয়ে চলেছি। অতএব এইখানেই প্রভাতবাবুর লেখা, চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি। এই থেকেই বোঝা যাবে মানুষের ওপর নির্ভর করা কত ভুল। মানুষের শক্তি কত সীমাবদ্ধ। জীবন কত সীমিত। মানুষ যদি একটু দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন হতে পারত। মাত্র দু বৎসর পরের চিত্র।

Provat Sinha
Phone B-B 4083

Suite Y 11
Calcutta-6
20. 10 1950

সুহৃদবরেষু,

আপনি আমার ৺বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। এই বোধহয় শেষ প্রণাম—কারণ ১৯৫১য় প্রণাম করবার অবকাশ নাও হতে পারে। আমি দুই মাসের ওপর ভুগছি। আজ এক মাস হল শয্যাগত, একেবারে চলৎ শক্তিহীন। প্রত্যহ জ্বর হয়। নানাবিধ ব্যাধি একসঙ্গে চেপে ধরেছে। সকলেরই মূল ডায়েবিটিস্। এ জীবনে আর কিছু হল না। অনেক বাসনা রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে ছিল, নটনাথ সে

সুযোগ বোধহয় আর দিলেন না। চিকিৎসকের অভাব নেই। চিকিৎসরাই অভাব, মানে injections drugs etc জুটছে না। আজ এক বছর পূর্ণ বেকার। দারুণ অর্থ কষ্ট, সুচিকিৎসার অন্তরায়। যাদের কাছে পাবো, ডাকলেও তারা আসে না। সাহায্য বা ধার দূরে থাক।

আপনার নাটক আমার হাত দিয়ে মঞ্চস্থ হবার সুযোগ এ জীবনে আর বোধহয় হল না। আপনার নাটক মঞ্চস্থ হবেই। আপনি রঙ্গমঞ্চের একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার হবেনই। আর কি!

ইতি

মৃত্যু পথযাত্রী প্রীতিধন্য

প্রভাত

ছাব্বিশ বছর আগেকার চিঠিখানা পড়ে আমার মনে এখন কি হচ্ছে তা অনুমান করা শক্ত নয়। মানুষ কি? মানুষের শক্তি কি? অতি সামান্য।

বেহায়ার মত আবার তারাশঙ্করবাবুর কাছে গেলাম। তিনি দু'খানা অতি সুন্দর চিঠি এবার লিখে দিলেন। আমাকে বাইরে বসিয়ে ওপরে চলে গেলেন। এক কাপ চা এলো। পাঁচ মিনিট দশ মিনিট কাটতে লাগল। কিন্তু না। তারাশঙ্করবাবু অতিশয় ভদ্রলোক। দু'খানা সবুজ খামে-ভরা চিঠি আমার হাতে এনে দিলেন। একখানা মিনার্ভা থিয়েটরের মালিক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর একটা রঙমহলের মালিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।

তারাশঙ্করবাবু সংঘর্ষের ভেতর দিয়েই মানুষ হয়েছেন। তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টাকে পরিবারের কেউই ভালচক্ষে দেখেনি। এ আমি জানি। তিনি অধ্যবসায়ী। পরিশ্রমী। জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী। সোনকুর মেলা দেখতে এসেছিলেন ছাপরা। আমার দাদার তাঁবুতেই অতিথি হয়েছিলেন। যিনি তখন সেখানকার স্বাস্থ্যের জন্যে ব্যবস্থা করছেন। কারণ তিনি ছিলেন ছাপরার ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার। আমি তাঁকে

মেলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলাম। প্রত্যেক জিনিসটিতেই তাঁর কৌতূহল। জানতে চান। সবই জানতে চান। বুঝেছিলাম সাহিত্যিকের যা প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু তা তাঁর আছে। সমস্ত জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। তাঁর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর। তাঁর বাইরেটা কঠোর। তিনি তাঁর মামা দেবীবাবুর মতই অত্যন্ত রাগী। কিন্তু ভেতরটা কোমল দয়ালু। তবে তিনিও ঔপন্যাসিক শরৎবাবুর মত কিছুটা inferiority complex-এ ভুগতেন। কারণ, তাঁর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিল না। তিনি অধ্যাপকদের সঙ্গই পছন্দ করতেন। অধ্যাপকের আচরণ অনুকরণ করতেন। অধ্যাপকের ছাপ সর্বাঙ্গে বহন করতে চাইতেন। কিন্তু সর্বদাই যেন ছাতা হাতে তারের ওপর জিম্‌নাষ্টিক করছেন। কখন পড়ে যান এই ভয়।

আমাকে হেসে হেসেই বললেন—এতেই কাজ হবে আশা করি।

বললাম—এতেও যদি কাজ না হয় বুঝব আমার দুর্ভাগ্য। তিনি খুসী হয়ে অসুন্দর মুখেও সুন্দর হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলেন।

চিঠিতেও মনোরঞ্জনবাবু উঁকি মারছেন। ঠেলে দেওয়া। একটা চিঠি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। কেমন সুন্দরভাবে পাশ কাটিয়েছেন দেখুন।

প্রীতিভাজনেষু,

শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবু, আমার নমস্কার জানবেন।

পত্রবাহক আমার আত্মীয়। ছাপরার উকিল এবং লেখক। ইনি একখানি নাটক রচনা করেছেন। আপনাদের দেখাতে চান। আমি আপনাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। অখ্যাতনামা লেখকের ভাল নাটকের ইতিহাস অনেক আছে। সুতরাং এঁর নাটক ভাল হলে, যদি মঞ্চস্থ করেন, তবে আপনারা এবং লেখক, উভয়েই উপকৃত হবেন। সেই হিসেবেই নাটকখানি একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। আমার সময়াভাব হেতু পড়ে দেখতে পারিনি। আপনারা যদি একবার সহৃদয়তার সঙ্গে পড়ে দেখে, আপনাদের মতামত জানান, তবে বিশেষ অনুগৃহীত হব। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি অনুরোধ করি। লেখক

ছাপরায় থাকেন, তিনি অল্প কিছুদিনের জন্য এখানে থাকবেন। সুতরাং দেখার কাজটা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে শেষ করে মতামত জানালে ভাল হয়। আশা করি আমার ওপর বিরক্ত হবেন না। অখ্যাতনামা একদিন সকলেই থাকে—পরে খ্যাতনামা হয়। নাটকের ক্ষেত্রে অখ্যাতনামা নাট্যকার রঙ্গমঞ্চের গুণগ্রাহীদের সহায়তার ফলেই বিখ্যাত হন। এটুকু আপনাদের কর্তব্য।

ইতি
প্রীতিমুগ্ধ
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বাবুর পত্রখানা সম্পূর্ণ তুলে দিলাম। তিনি পরে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন। অকারণে নয়। শ্রম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য তাঁকে এই উচ্চস্থানে উঠতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু নাটক পাঠাতে লিখেছিলেন কি ইনিই? ভাগ্যিস ছ' মাস পরেও নাটক পাঠাইনি। ইনিও ত পাশ কাটালেন। কিন্তু তখন তা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম ওঁর চিঠির মূল্য বুঝি আছে।

অনেক কষ্টে চণ্ডীচরণবাবুকে খুঁজে পেলাম। ২৭ নম্বর শঙ্কর হালদার লেন। আহিরীটোলা। চণ্ডীচরণবাবু নগ্নদেহে উঠোনে কলতলায় স্নানের উদ্যোগ করছিলেন। এগিয়ে এলেন দরজার কাছে। তারাশঙ্করবাবুর চিঠিখানা ভাল করে পড়লেনও না। বিদ্যুৎ-গতিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানা আমায় ফেরৎ দিয়ে দিলেন। ভাগ্যিস দিলেন। তাই আজও আমার কাছে আছে। বললেন—শুনুন! আমার ভাই মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বয়ংসিদ্ধার লেখক। তাঁর লেখা 'ঝাঁসীর রাণী' এক লাখ টাকা সেল দিয়েছে। তবু আমি কিছু করতে পারব না। আমাদের মঞ্চের নির্দেশক নরেশচন্দ্র মিত্র। তিনি যতক্ষণ নাটক পছন্দ না করছেন, ততক্ষণ কিছুই হবে না। আমি মালিক। কিন্তু আমি যদি নাটক পছন্দ করি পরিচালক নাটকখানা মার খাইয়ে দিয়ে প্রমাণ করে ছাড়বেন যে আমি নাটকের

কিছুই বুঝি না। কাজেই কাজ কি ঝামেলা করার? যেমন চলছে, তেমনি চলুক। আপনি বাড়ী যান এবং সুখে নিদ্রা যান।

অনেক দূর থেকে এসেছি। খরচ-পত্র করে হোটেলে আছি। কাজেই এই হাল্কা কথা শুনে ফিরে যেতে পারি না। একটু চাপ দিতেই অত্যন্ত সুমিষ্ট একটি কথা শুনলাম। বললেন—আপনি ভদ্রলোকের ছেলে এ লাইনে কেন এসেছেন মশায়? এ লাইন ভদ্রলোকের লাইন নয় বুঝলেন?

এরপর আর বাক্য বিনিময় করা বিড়ম্বনা। প্রভাতবাবু বলেছিলেন একটা কথা। অর্থাকর্ষক। নাটককে অর্থাকর্ষক হতেই হবে। নাটক অর্থ আকর্ষণ করার উপলক্ষ্য মাত্র। অর্থাৎ নাট্যশিল্প শিল্প নয়। কলা নয়। ব্যবসা। চণ্ডীচরণবাবু বললেন দুটি কথা। প্রথম মালিক ও পরিচালক একসঙ্গে একদিকে নেত্রপাত করেন না। বিপরীত দিকেই নেত্রপাত করে থাকেন। দ্বিতীয় কথা থিয়েটরের লাইনটা নাকি ভদ্রলোকের লাইন নয়। মাতাল, চরিত্রহীন, চোর, ছ্যাঁচোড়, ঠগ, বদমাইসদের বিচরণ ক্ষেত্র। থিয়েটরের উন্নতি হবে কি করে? একটা জিনিসের উন্নতি হয়েছে শুধু। বিকৃত যৌনক্ষুধা বিকৃত যৌন-পরিতৃপ্তি। প্রভাতবাবুর ফ্ল্যাটে হাজির হলাম। শুনলাম, তিনি রঙমহলের বুকিং-অফিসে। গেলাম সেখানে। তিনি তারাশঙ্করবাবুর চিঠিখানা দেখলেন পড়লেন। মৃদুহাস্য করলেন। অভিনেতা সন্তোষ সিংহ যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন—ওহে সন্তোষ! এই চিঠিখানা শরৎকে দিয়ে দিও ত। তিনি চিঠিখানা নিয়ে স্টেজের ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন—শরৎবাবু যা বলবার আপনাকেই বলবেন। কিন্তু শরৎবাবু প্রভাতবাবুকে কিছুই বললেন না। অর্থাৎ হয়ে গেল ইতি। তারাশঙ্করবাবুর ঐ রকম সযত্নে লেখা দুখানা চিঠির ওই রকম অকালে পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি দেখে ভাবলাম রঙ্গালয়ের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি আর কত দূর?

রঙমহলের প্রাঙ্গণে বসে বসে ভাবছি অতঃপর কি করা যায়? ছাপরায়

ফিরে যাবো? কিন্তু না। এত সহজে হার স্বীকার করব না। চেয়ে চেয়ে প্রভাতবাবুকে দেখছি। গিলে করা সাদা পাঞ্জাবীর ওপর কালো হাতকাটা জওহর জ্যাকেট। পরনে পায়জামা। তিনি বুকিং-অফিসে বসে বসে গল্প করছেন। কলকাতায় লোকেরা শুধু গল্পই করে। কাজ করে না।

দেখি, দূরে মনোরঞ্জনবাবু। এগিয়ে গেলাম। বললাম সব কথা। তিনি শুনলেন। বললেন—আচ্ছা দেখছি বলে শরৎকে। তিনি আমার সামনে রঙমহলের ভেতরে গেলেন। শরৎবাবুকে বলেও এলেন। ফিরে এসে বললেন—যা বলবার বলেছি। অন্ততঃ মিড-উইকে ফেলে পরীক্ষা করে দেখতেও। এখন ওরা যা করেন।

আশ্চর্য এই যে সেদিন রঙমহলের মালিকের এত অহমিকা যে বাইরে দণ্ডায়মান নাট্যকারকে ডেকে একটা কথা পর্যন্ত বলা দরকার মনে করলেন না। লাইসিউমের একচ্ছত্রাধিপতি সার হেনরী আর্ভিংয়ের অহমিকাও চূড়ান্ত ছিল। কিন্তু তাঁর পরিণাম কি হল? মফঃস্বলে গিয়ে থিয়েটর করতে হল। লণ্ডনে তিনি উপস্থিত হলেন। ব্রাডফোর্ডে উপহাসস্পদ হলেন। অবশেষে হোটেলের ভেষ্টিবিউলে মুখ থুবড়ে পড়ে হতাশা-গ্রস্থ নট, মানব লীলা সংবরণ করলেন। শরৎচন্দ্রেরও এই দশা হল। তিনি অভিনয় করতে করতে 'দুয়ো' 'দুয়ো' শুনছেন। তবু অভিনয় করছেন। এতদূর নির্লজ্জ! এ আমার নিজের চোখে দেখা।

অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম শুনেছিলাম। ভবানীপুরের ছেলে। আমার এক বন্ধুর সহপাঠী ছিলেন। পড়াশুনায় খুব ভাল ছিলেন বলে সুখ্যাতি ছিল না। কিন্তু অভিনেতা ভাল। রঙ্গালয়ের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। প্রভাতবাবুকে ধরে অনেক কষ্টে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করলাম।

বাড়ির কলাপসিবল গেট, তালা বন্ধ। ভেতরে একটা টুলে বসে দাড়ীওয়ালা সুসজ্জিত দারোয়ান।

দেখা হল। লোকটির ঠাট-ঠমক আর জাঁক-জমক খুবই আছে। কিন্তু সংস্কৃতির বদলে অপসংস্কৃতির দাস যেন উনি। নইলে আমার সঙ্গে সুসজ্জিত আধুনিক ড্রয়িংরুমে সকাল সাড়ে নটার সময় striped pant আর striped shirt মাত্র পরিধান করে কখন দেখা করতেন না। বিশেষ যখন আমার পরনে টাই আর স্যুট। শিশিরবাবু এ জিনিস ভাবতেই পারতেন না। তিনি বোম্ ভোলানাথ। খালি গা। পরনে লুঙ্গি। পায়ে চটি, হাতে গড়গড়ার নল। এই ন্যূনতম পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হয়েই সব সময় শোভা পেতেন। শোভা তাতে বাড়ত বৈ কমত না।

আর অহীন্দ্রবাবু? sleeping suit পরে visitor-এর সঙ্গে দেখা করতে দ্বিধা করলেন না। একটা dressing gown দিয়ে sleeping dressটা ঢেকে নিলে ক্ষতি কি ছিল! কিন্তু সে জ্ঞান তাঁর থাকলে তবে ত? তিনি যে কি ভুল করছেন, তা তিনি জানেনও না। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন। বললেন নাটক পছন্দ করা আমার কাজ নয়। এটা হল ব্যবসা। মালিক নাটক পছন্দ করবে। লাভ হলে তার হবে। লোকসান হলে তার হবে। ওরা নাটক পছন্দ করার পর, আমি পড়ব। আমার পার্ট পছন্দ করব। তার পূর্বে নয়। নাটক পড়ে শোনানো হলেও শুনবেন না। পড়বেনও না। কোন মতামত প্রকাশ করবেন না। রেখে গেলেও চলবে না। কারণ চাকর ঝাঁট দিয়ে কোথাও ফেলে দিতেও পারে। এতদূর অবমাননাকর কথাও তাঁর মুখে উচ্চারিত হল। অবাক হয়ে গেলাম। অথচ এই অহীন্দ্র চৌধুরীই 'নিজেরে হারায়ে খুজি' বইয়ের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় লিখছেন অতি অদ্ভুত কথা।—'কোথাও কোন নতুন নাটক নেই। সেই পুরাণো নাটকেরই অভিনয় চলছে বলতে গেলে আমরা নাটকের মানুষ। নাটক ভালবাসি—সব সময়েই চেয়ে থাকি নতুন নাট্যকার আর নতুন নাটকের দিকে। কিন্তু আপাততঃ তেমন সম্ভাবনার আভাস কোথাও পাচ্ছি না।'

মানুষের কথায় ও কাজে কি পার্থক্য। তিনি নতুন নাট্যকার ও নাটকের দিকে কি ঔৎসুক্য নিয়ে চেয়ে থাকেন! সেটা অনুমান করার ভার পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

আমি এই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেছি। কিছু পর্যবেক্ষণও করেছি। কিছু শ্রবণও করেছি, কৌতূহল আমার খুব বেশী হয়েছিল। কারণ শিশিরবাবুর সঙ্গে কেউ কেউ তাঁর নামটাও উল্লেখ করতেন। এমন কি বলাই হত 'শিশির-অহীন্দ্রর' যুগ। তাঁর নামটার সঙ্গে শিশিরবাবুর নামটাও যুক্ত করে যদি যুগটাকে উল্লেখ করা হয়, তাহলে তার চেয়ে অসত্য আর কিছু হতেই পারে না। তিনি অভিনয় করেই অর্থশালী হয়েছেন। কিন্তু এক নাট্যকারের নাটকের পাণ্ডুলিপি তাঁর ভৃত্য ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিতেও পারে, একথা বলার প্রবৃত্তি তাঁর হল কি করে, তাই ভাবি। কতদূর অশিক্ষিত অপরিশুদ্ধ তাঁর চিত্ত।

তাঁর বাড়ীর ড্রয়িংরুমে একটা প্রকাণ্ড বাঘের ছাল মেঝেতে পাতা দেখেছিলাম। প্রভাতবাবু বলেছিলেন, ওটা 'রঙ মহলের' সম্পত্তিই ছিল। অহীনদার কিছু প্রাপ্য বাকী ছিল। অতএব সচ্ছন্দে ওটা তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে রেখে দিতে ড্রাইভারকে বললেন। সে আদেশ কার্যে পরিণত হতেও দেরী হল না। ইনি শিল্পী নন। ব্যবসাদার। আর্ট করেন না। ব্যবসা করেন। সফল ব্যবসায়ী একজন। বিফল শিল্পী একজন। অভিনয়, রামা শ্যামা যদুও করছে। যুগস্রষ্টা হতে হলে সত্যদ্রষ্টা হতে হয়। হৃদয়-বৃত্তে বিত্তশালী হতে হয়। মহাকালের সামনে দাঁড়াতে গেলে সর্বত্যাগী হতে হয়। এই আধুনিক rat-race to get the mostest at the quickest, এতে যোগ দিলে তা হওয়া যায় না।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল বিত্তের কি পরিণতি হল। তাঁর একমাত্র পুত্র ভানু তা নিতে অস্বীকার করল। সে আমেরিকায় থাকে। ভাল রোজগার করে। পিতার প্রস্তাবের উত্তরে লিখে পাঠালো পিতামাতার ব্যবহৃত অঙ্গুরীয় ব্যতীত তার আর কোন জিনিসই চাই

না। অহীন্দ্রবাবু দেবনারায়ণ গুপ্তের কাছে এই কথা বলেন আর হাউ হাউ করে কাঁদেন। বলেন—দেবনারায়ণ, সারাজীবন ধরে এত কষ্ট করে এত অর্থ কার জন্যে সঞ্চয় করলাম ? ছেলে বলছে আংটি ছাড়া আর কিছুই চাই না। অশীতিপর বৃদ্ধ বলেন আর কাঁদেন। কাঁদেন আর বলেন। তবু প্রাণ ধরে রঙ্গমঞ্চের জন্যে কিছু দিয়ে যেতে পারলেন না। কারণ, রঙ্গমঞ্চকে ভালবাসতে পারলেন না। নাটক ভালবাসতে পারলেন না। যদিও লিখলেন তার বিপরীত কথাই। রঙ্গমঞ্চকে উপভোগ করলেন। কিন্তু মর্যাদা দিতে পারলেন না। দেবনারায়ণ বাবু নিজে আমায় একথা বলেছেন।

দিতে পেরেছিলেন একজন শিল্পী। তাই, নিঃস্ব-কপর্দকহীন, অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এক ইঞ্চি জমিও কোথাও রেখে যেতে পারেন নি। একটা ইঁটও কোথাও তুলে যেতে পারেন নি। কোন ব্যাঙ্কের খাতায় জমার ঘরে একটা কাণাকড়িও জমা লেখা নেই।

কিন্তু ইতিহাসের খাতায় ? একটিমাত্র হিসেব লেখা আছে। অমরত্বের হিসেব। কাল বহু চেষ্টা করেও সে লেখা মুছে দিতে পারবে না। মৃত্যুরও মরণ আছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সেটা প্রমাণ করে গেলেন।

নিত্য-নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যে প্রভাতবাবুর ফ্ল্যাটে হাজিরা দিয়ে যেতে লাগলাম। তিনি 'রঙমহলে' রিজিয়া দেখবার ব্যবস্থা করে দিলেন। "রিজিয়া" দেখছি। অহীন্দ্র চৌধুরী "বক্তিয়ার"। মালিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বীরেন্দ্র-সিংহ"। সন্তোষ সিংহ 'পথিক'। সন্তোষ সিংহের অভিনয়ই যা কিছু ভাল লাগল। অহীন্দ্র চৌধুরীর চেহারা ভাল। গঠন ভাল। লম্বা একহারা শরীর। টিকোলো নাক। বড় বড় চোখ। ফোলা ফোলা গাল। তিনি ঢুকতেই দুদিক থেকে আর্ক ল্যাম্পের ফোকাস্ পড়ছে। অর্থাৎ তিনি যে মূল্যবান শিল্পী তা বোঝা যাচ্ছে। মালিক তাঁকে অনেক মূল্য দিয়ে ভাড়া করে থাকতে পারেন ! কিন্তু দর্শক তাঁকে কোন মূল্যই দিচ্ছে না। তাঁর

অভিনয় স্বতঃস্ফূর্ত নয়। চেষ্টাকৃত। তিনি রোমান্ গ্লাডিয়েটরদের মত একটা অদ্ভুত পোষাক পরেছিলেন। তাঁর অভিনয় অত্যন্ত জড়ত্বপূর্ণ। তিনি ক্রমাগত gimmick সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। চোখে পড়তে চাচ্ছেন। আত্মভোলা, আত্মমগ্ন, শিল্পী তিনি নন। অতি সচেতন শিল্পী। আলোর সাহায্যে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চাচ্ছেন। catch আর contrivanceএ ভরা তাঁর অভিনয়। আমি নিজে অভিনেতা। আমার মনে তাঁর অভিনয় কোন রেখাপাত করতে পারল না। "সাহাজাদী! সম্রাট নন্দিনী! মৃত্যু ভয় দেখাও কাহারে? জান নাকি তাতার বালক মাতৃবক্ষ হতে ধেয়ে যায়, সিংহশিশু সনে করি যারে মল্লরণ!' মৃত্যুভয় কি দেখাও তারে। আজ এতদিন পরেও কথাগুলো আমার মুখস্থ আছে। সেদিনও ছিল। অতএব আমি যে আবেগ, যে অঙ্গভঙ্গী, যে মৌখিক অভিব্যক্তি, যে আত্মমর্যাদা জ্ঞান, যে বীরত্বের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, প্রত্যাশা করেছিলাম, তা দেখতে না পেয়ে ক্ষুন্ন হচ্ছিলাম। এই প্রৌঢ় অভিনেতার কাছে যৌবনের উচ্ছ্বাস আশা করাও অনুচিত। কিন্তু তাঁর যে বাজারমূল্য আছে। সন্থ পূর্ব বাংলা থেকে পালিয়ে-আসা সে সময়ের দর্শকের কাছে তাঁর নামের যে box-office attraction আছে। glamour আছে। ব্যবসাদার মালিক তা কাজে লাগাতে ব্যস্ত। কলালক্ষ্মী লজ্জায় অবনত শির হলেও, অর্থলক্ষ্মী প্রসন্ন হাসি হাসতেও পারেন। এই হয়ত ছিল মালিকের প্রত্যাশা।

নাটকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ পার্ট ছিল 'ঘাতক'। হত্যার বর্ণনা করানো হয়েছে তাকে দিয়ে। বর্ণনা দিচ্ছে রিজিয়ার কাছে। সম্রাজ্ঞী পরম পরিতোষ সহকারে তা শুনছেন। কিন্তু আমি বিস্মিত নেত্রে দেখলাম ঘাতকের তলওয়ার দিয়ে তখনও টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়ছে। কি বীভৎস! এই কলকাতার থিয়েটার? ছিঃ।

প্রভাতবাবুর ব্যবস্থায় স্টারে "গঙ্গাবতরণ" দেখতে গেলাম। দেখি স্টেজ জুড়ে বিরাট এক অমলধবল মাটির শিব। শেষদৃশ্যে গঙ্গা আকাশ

থেকে নামছেন। শিব তাঁকে মস্তকে ধারণ করছেন। হোস্ পাইপ দিয়ে জলের ফোয়ারা ছোটানো হচ্ছে। আর দর্শক গদগদ হয়ে করতালি দিচ্ছে। এই কলকাতার থিয়েটার? হাস্যকর।

নাট্যাচার্যের "শ্রীরঙ্গমে" যাচ্ছি। আর ক্রমাগত বিতাড়িত হচ্ছি। এখন দেখা হবে না। এখন তিনি রিহার্স্যাল দেওয়াচ্ছেন। এখন তিনি বিশ্রাম করছেন, ইত্যাদি। মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে। সব বলছি তাঁকে। শুনে তিনি দুঃখিত হচ্ছেন। সবশেষে একটি কথা বললেন। যার মূল্য আছে বলে মনে হল।

বললেন আপনি যে রকম নাটক লিখেছেন তা মঞ্চস্থ করতে একমাত্র শিশিরবাবুই পারেন। আর কেউ নয়। ইঙ্গিতটা বুঝলাম।

কিন্তু শিশিরবাবুর দেখা পাওয়াই যে দুষ্কর। হিমালয়ের মত এত উঁচু তাঁর আসন যে সেখানে পৌঁছানোই মুস্কিল। সব শেষে তৃতীয়বার যখন শ্রীরঙ্গমের বুকিং অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তখন একটু রুদ্র মূর্তি ধরতেই হল। বললাম—লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করারও একটা পন্থা আছে। দেখা হবে। অথবা হবে না। আপনারা কি লাটসাহেবের চেয়েও বড় নাকি? আঘাত না খেলে বাদ্য বাজে না। বাদ্য বাজল। এর পর দ্বার উন্মুক্ত হল।

শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তিনি তখন মঞ্চের ওপর "সিরাজদ্দৌল্লার" রিহার্সাল দেওয়াচ্ছিলেন। আমাকে তিনদিন ফিরে যেতে হয়েছে শুনে দুঃখিত হলেন। ছোট ভাইকে ডেকে আনিয়ে অতি আস্তে আস্তে কোমল কণ্ঠে এই কয়েকটি কথা বললেন—হৃষি! লোক আটকাতে বলেছি বলে কি এঁর মত লোককেও আটকাতে বলেছি? কতদূর থেকে আসছেন। তিনদিন থেকে ফিরে যাচ্ছেন। ওরই মধ্যে একটু বুদ্ধি খাটাতে হয় তো।

যুগস্রষ্টা কি গাছে ফলে? অথবা আকাশ থেকে নেমে আসে? যুগস্রষ্টা মাটি থেকেই উৎপন্ন হয়। তাঁকে হৃদয়বিত্তে বিত্তশালী হতে হয়। শিক্ষার মূল্য এখনও আছে। কৃষ্টি-সংস্কৃতির মূল্য এখনও

আছে। অতি মৃদুস্বরে বলা অল্প কয়েকটি কথাতেও, ভেতরের আভিজাত্য ফুটে ওঠে। শতসহস্র জাঁকজমক আর বুকে নিজ নামের আদ্যাক্ষর লেখা দরওয়ানও তা দিতে পারে না।

শিশিরবাবু পরের দিন আমায় নাটক নিয়ে আসতে বললেন। নিয়ে গেলাম। বললেন—সাতদিন পরে আসতে। বললাম অত ছুটি নেই। বললেন সাতদিন পূর্বে আমিও নাটক পড়ে উঠতে পারব না। অতএব নাটক নিয়ে চলে আসতে হল। যেখান থেকে বেরিয়েছিলাম সেইখানেই। অর্থাৎ ছাপরা। সেখানে একজন উৎসুক হয়ে বসেছিলেন। সব শুনে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বললেন—টাকাগুলোই নষ্ট হল।

প্রতিকূল। জীবন-নদীর প্রতিটি কূলই প্রতিকূল। এর হাত থেকে নিস্তার কোথায়? শিশিরকুমার। অহীন্দ্র চৌধুরী, তারাশঙ্কর, চণ্ডীচরণ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত সিংহ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কেউ কিছুই করতে পারলেন না।

রঙ্গমঞ্চের দিক থেকে আবার আদালত-মঞ্চের দিকে মুখ ফেরালাম। একটা শেকড় থাকা চাই। নইলে গাছ বাঁচবে কি করে? অতএব নিত্য নিয়মিতভাবে প্রতিদিন কালো কোট, সাদা প্যাণ্ট পরে, মক্কেল অন্বেষণে কোর্টে যেতে লাগলাম। বার-লাইব্রেরীর তিনশো উকিলের একজন হয়ে দিনগত পাপক্ষয় করতে লাগলাম। কলকাতা অসহযোগী। ছাপরা অমনোযোগী। আমি যাব কোথায়? করব কি? এর চেয়ে প্রতিকূল অবস্থা মানব জীবনে আর কি হতে পারে?

কিন্তু কলকাতা আবার আমায় টানছে। আমার আত্মাটা মুক্তি পায় সেখানে গেলেই। এখানকার কাজ যেন আমার আত্মার কাজ নয়? অতএব আর একবার কোমর বাঁধলাম। গৃহিণীর সামনে আশার রঙীন তুলি দিয়ে অনেক মনোহর চিত্র আঁকলাম। অবশেষে যাওয়ার ছাড়পত্র পেলাম। আশা। আশা। আশা নিয়েই ত জীবন। আশা ছলনাময়ী? উপায় নেই। আশাটুকুও না থাকলে থাকবে

আর কি ?

আবার কলকাতা। সেই হাস্য মুখরিত, সেই দুঃখ প্রপীড়িত। সেই চির-উদাসীন কলকাতা। আবার সেই ইণ্ডিয়া হোটেল। সেই ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে সই করা। টাকা দেওয়া। তারপর প্রভাতবাবুর ফ্ল্যাট। সেই কড়া নাড়া। প্রভাতবাবু পশ্চিমের লোক। আমিও পশ্চিমের লোক। অতএব মৌখিক ভদ্রতার ত্রুটি হল না। চাও খেলাম। প্রভাতবাবু বললেন—আপনার কমিক হাত ভাল। একটা কমিক লিখুন না।

বললাম—কমিডিও আছে। কাল এনে দেব।

শিশিরবাবুর থিয়েটারে গেলাম। এবার আর বাধা পেলাম না। দরওয়ান সরাসরি ওপরে নিয়ে গেল। যেখানে শিশিরবাবুর বসবার ঘর। সেইটেই শোবার ঘরও। তিনি নাটক দিতে বললেন। দিলাম। পরের দিন আসতে বললেন। পরেরদিন গেলাম। বললেন—দুঃখিত। পড়তে পারিনি। কাল আসুন।

পরের দিন গেলাম। সেদিনও দুঃখিত। পড়তে পারেন নি। কাল আসুন। তারপরের দিনও তাই।

বললাম পড়তে আপনি কোনদিনই সময় করে উঠতে পারবেন না। কি করে পারবেন? অজস্র কাজ। অতএব নিজে আপনি পড়তে পারবেন না। দয়া করে যদি অনুমতি দেন, পড়ে শোনাতে পারি।

শিশিরবাবু বললেন—কখন সময় দিই, তাই ত ভাবছি।

বললাম—যখন হোক। যতটুকু সময় হোক। রাত বারটা হলেও আপত্তি নেই। পাঁচ মিনিট হলেও আপত্তি নেই। আমি এতদূর থেকে এসেছি, আর আপনি এইটুকু পর্যন্ত করবেন না?

অবশেষে তিনি সময় দিলেন। বিকেল চারটে থেকে চারটে বিশ পর্যন্ত। তথাস্তু।

একটু আগেই গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি তখনও বিছানায় শুয়ে। ভৃত্য পদসেবা করছে। আমাকে দেখেই বললেন—দশ মিনিট আগেই

এসেছেন দেখছি। শিশিরবাবু উঠলেন। বললেন—বসুন। ভৃত্যকে চা দিতে বললেন। বাথরুমে গেলেন। মুখহাত ধুয়ে এসে সোফায় বসলেন। বললেন—হ্যাঁ। এইবার পড়ুন।

আমি পড়তে আরম্ভ করলাম। দৃশ্য বর্ণনা শুরু করলাম। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন এই! এই! এইজন্যেই আমি বলি নাট্যকারের থিয়েটারের ভেতরের দিককার জ্ঞান থাকা চাই।

বললাম—কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?

শিশিরবাবু বললেন—আচ্ছা! আচ্ছা!

আবার পড়তে লাগলাম। খুবই তাড়াতাড়ি। কারণ বিশ মিনিটে খানিকটা শোনাতে হবে ত? যাতে মনের মধ্যে একটু ঔৎসুক্য সৃজিত হয়। এভাবে কি নাটক পড়ে শোনানো যায়? কিন্তু উপায় কি!

প্রতিকূল। জীবন-নদীর প্রতিটি কূলই প্রতিকূল। একটু পরে শিশিরবাবু বললেন—অত তাড়াতাড়ি পড়ছেন কেন? একটু রসিয়ে রসিয়ে পড়ুন।

বললাম—কুড়ি মিনিট মাত্র সময় যে! একটা সিন অন্ততঃ শোনাতে না পারলে।

শিশিরবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—সময় বাড়তেও পারে।

অতঃপর ধীরে ধীরে পড়তে লাগলাম। রসিয়ে রসিয়ে।

চারটে কুড়ি হল। একজন ভদ্রলোক এলেন। শিশিরবাবু তাঁকে দেখে বললেন—আসুন। বসুন। একটু অপেক্ষা করুন। ইনি একটা নাটক লিখেছেন। শুনছি। তারপর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আর কতক্ষণ লাগবে সিনটা শেষ হতে?

বললাম—দশ মিনিট।

শিশিরবাবু বললেন—বেশ পড়ুন।

ভদ্রলোক বসলেন। আবার পড়া শুরু করলাম। দশ মিনিট খুব ধৈর্য ধরে শুনলেন। দৃশ্য শেষ হল। বললেন—আচ্ছা, আজ এই

পর্বন্তই থাক। রেখে যান। আমি পড়ে নেব। সাতদিন পরে আসুন। বললাম—কিন্তু আমার ছুটি যে অল্প। চলে যেতে হবে। একদিন পরেই।

শিশিরবাবু বললেন—আচ্ছা, তাহলে যান। নাটকটা থাক। আমি মন দিলাম নাটকটাতে। এইটুকুই শুধু বলতে পারি। মন দিলাম। হ্যাঁ। মন দিলাম।

স্বস্থানে ফিরে এলাম। একজন উৎসুক হয়ে বসেছিলেন। তিনি যখন শুনলেন—মন দিলাম এইটুকুই মাত্র বলেছেন, তখন বলে উঠলেন—আহা! মন দিলেন। ভারী তফাৎ হল। মনটা আর একটু বেশি করে দিলে কি ক্ষতি হত? আর একটু তাড়াতাড়ি। এইটুকু শুনতে এত খরচ করে যাওয়া?

জবাব দিলাম না। এর জবাব কি আছে। বাংলাদেশের গৃহিণীরা অত্যন্ত বাস্তববাদী। তাঁরা স্বামীর হৃদয়ের আকিঞ্চন কতটুকু বোঝেন? কতটুকু বোঝবার চেষ্টা করেন। যা আমার কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত, তা ওঁর কাছে অর্থাগমের উপায় মাত্র। আমি কি করব। কেন সাহিত্যিক হয়ে জন্মেছি! সাহিত্যিকের মনের ব্যথা কে বুঝবে। বাইরের জগতেও প্রতিকূলতা। ঘরের ভেতরেও প্রতিকূলতা। আমি কি করব। কোনটা বেশি নিদারুণ?

আবার কোর্টে যাওয়া। অর্থ উপার্জনের চেষ্টা। সবই গন্ডময়। কিন্তু করতেই হবে। কুইনিনের মত তেতো। কিন্তু খেতেই হবে। এসব কাজ করতে কি ভাল লাগে? তবু মনকে প্রবোধ দিই—দ্বিজেন্দ্রলাল, দীনবন্ধু ত এই রকম অপ্রিয় কাজও করেছেন। নাটকও লিখেছেন।

হোলির ছুটি হল। কলকাতা এলাম। ইণ্ডিয়া হোটেলেই উঠেছি। শ্রীরঙ্গমে গেলাম। দোতালায় উঠলাম। শিশিরবাবুর ঘরে তখন হৃষিবাবু। পুত্র অশোকবাবু। ভ্রাতা ভবানীবাবু। শিশিরবাবু আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বলে উঠলেন একি! একি! আজ রাস্তায় বেরিয়েছ কেন?

বললাম—তাতে কি হয়েছে। বছরের একটা দিন ত। ছুটিও ত কম।

শিশিরবাবু খুসী হলেন। হাসলেন। তাঁর বৃদ্ধ শরীরে যৌবন প্রকাশ পেল। অতীতের স্মৃতি হয়ত মনে পড়ল। বললেন—তা যা বলেছ। বছরের একটা দিনই ত। বোসো। বোসো। ওকে চা দে। হ্যাঁ শোন তুমি যেভাবে বই শেষ করেছ, সেভাবে নাটক শেষ হয় না। ওই যে লোকটি মেয়ের বাপ, তার ওপর তুমি সদয় নও, যেভাবে তুমি ওকে introduce করেছো তাতেই বোঝা যাচ্ছে, তাকে শেষ পর্যন্ত—মানে বইটাকে ট্রাজেডীতেই নিয়ে যেতে হবে। এখন ত বোসো চা-টা খাও। গল্প-সল্প কর। কি বল!

বললাম—ওটার কথা ছেড়ে দিন। আর একটা বই এনেছি। শুনবেন?

শিশিরবাবু বললেন—শুনবো। কাল সকালে।

পরের দিন সকালে বই নিয়ে উপস্থিত হলাম। আদ্দেক শুনলেন! বললেন—হ্যাঁ dialogue ভাল। female charaters গুলো original! তারপর দিন সমস্তটা শুনলেন। বললেন—হ্যাঁ ভালই।

বললাম—হওয়া সম্বন্ধে?

বললেন—হওয়া সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারি না।

বললাম—আর একখানা বই আছে। শুনবেন?

বললেন—ক'খানা লিখেছো?

বললাম—সে খবরে আপনার কাজ কি! শুনবেন কিনা বলুন?

হেসেই বললেন—বলি প্রাকৃটিস-ট্রাকৃটিস কিছু আছে না নেই?

আমিও হেসে বললাম—সে প্রশ্নও সমান 'অবান্তর। নাটক শুনবেন কিনা তাই বলুন।

বললেন—শুনবো। কাল সকালে। সমস্ত সকালটা আমি তোমার জন্যে ফ্রী রাখব।

খুসী হয়ে চলে এলাম। পরদিন সমস্ত নাটকটা শুনলেন।, পড়তে

পড়তে আমি ক্লান্ত। কারণ রীতিমত action দিয়ে দিয়ে পড়তে হচ্ছে। কিন্তু তিনি মোটেই ক্লান্ত নন। দিব্যি বসে বসে শুনছেন। প্রথমটা একটু এগিয়ে এসে শুনতে লাগলেন। তারপর এলিয়ে পড়ে শুনতে লাগলেন। একটু পরে সোফার হাতায় মাথা গুঁজে শুনতে লাগলেন। আবেগ দিয়ে পড়তে পড়তে আমারও মনে আবেগ স্তূপীকৃত হতে লাগল। এই নাটক ছাপরায় অভিনীত হয়েছে। সবই প্রায় আমার মুখস্থ। আমারই জীবন থেকে উৎসারিত নাটক। আমার জীবন-মন্থনকরা ধন এই নাটক। চামড়াটা অন্য লোকেদের। নামগুলো অন্য লোকেদের। কিন্তু আবেগ, অভিমান, বিয়োগ ব্যথা, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, সব আমারই। আমিই পড়ছি। আমারই কাহিনী।

শিশিরবাবুর মত এমন দরদী শ্রোতা আমি আর দেখিনি। এমন নাট্য-বোদ্ধাও আমি আর দেখিনি। ফলে যা হবার তাই হল। তাঁর সামনে আমি যেন আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলাম না। আত্মপ্রকাশ করে ফেললাম। একেবারে নগ্নমূর্তিতে। যৎ সামান্য আবরণটুকুও আর থাকল না। আমি আর পড়তে পারলাম না। আবেগের বাষ্প গলায় জমতে জমতে অবশেষে গলাকে রুদ্ধ করে দিল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। আর একজন শ্রোতাও ছিলেন। নাট্যকার সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত। শুভ্র কেশ। শুভ্র শুম্ফ। শুভ্র পোষাক পরিচ্ছদ। পায়ের জুতোটি পর্যন্ত সাদা। দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথই যেন।

শিশিরকুমার শতাধিক নাটক প্রযোজনা করেছেন। শতাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। শতাধিক ভূমিকার অভিনয় গৌরবে গৌরবান্বিত। কিন্তু বোধহয় এরকম অপূর্ব নাট্যাভিনয় তিনি পূর্বে দেখেননি। এক বিহ্বল দর্শক তিনি এখন। চুপ করে বসে বসে আমাকে শুধু দেখতে লাগলেন। একটি কথাও বললেন না। একটি সান্ত্বনার বাক্যও উচ্চারণ করলেন না। নাটক পড়া বন্ধ করতেও বললেন না। আমি বিষম লজ্জায় পড়ে গেলাম। এমন কাণ্ড আমার জীবনে পূর্বে কখন

হয়নি। এই লাইনগুলো কতবার কত লোকের সামনে কত আবেগ দিয়েই ত পড়েছি। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েনি ত কখনও। এ দাবী শ্রোতার।

আমি অনেক সময়ে ভেবেছি এই নাট্য বিশারদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি? আমার মনে হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তি নাটক শোনবার শক্তি। শুনতে শুনতে কল্পনার আগুনে দাউ দাউ করে যেন জ্বলে ওঠেন। অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারী এই মানুষটি। নাটক শোনেন না ত! যেন গোগ্রাসে গেলেন। অজগর সাপ যেমন পার্বত্য মুষিককে মুখ ব্যাদান করে গলাধঃকরণ করে, তিনি যেন তেমনি দানবীয় শক্তিতে নাট্যকারের রচিত সমস্ত আবেগকে গিলতে থাকেন। এক একটি দৃশ্য শেষ হয়েছে। তিনি বলেছেন শুধু একটি মাত্র কথা। next scene। তাঁর যেন আর তর সইছে না। সমস্ত নাটকটা এক নিঃশ্বাসে না শুনলে তিনি যেন স্থির থাকতে পারছেন না। উন্মুখ। সব রকম বাজে কথাবার্তা বন্ধ। নাটকের চরিত্র, পরিস্থিতি, উৎকণ্ঠা, পরিণাম, আঙ্গিক, অভিনয়, দৃশ্য পরিকল্পনা সব যেন তাঁর মানসলোকে ঘটে চলেছে। তখন তিনি অজ্ঞাতসারে এই নাটকের প্রযোজক, পরিচালক অভিনেতাও হয়ে পড়েছেন।

কয়েক মিনিট পরে আমি নিজেকে সামলে নিতে পারলাম। কেবল বলতে লাগলাম I do'nt know what has happened to me! ridiculous! extremely ridiculous! শিশিরবাবু একটি কথাও বলছেন না। সমর্থনও করছেন না। প্রতিবাদও করছেন না। হিমালয়ের মত স্থির, অচল, অটল হয়ে বসে আছেন। একটু পরে বললেন— সামলেছো ত? এইবার পড়। আচ্ছা থাক দেখি। বাকীটুকু আমি পড়ে নিতে পারব। দৃশ্য বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে। না?

হ্যাঁ বলে আমি পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি শেষ অংশটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। ততক্ষণে আমি সম্পূর্ণ সংবৃত হয়ে উঠেছি। তিনি বললেন এবার পড়। আবার পড়া চলল।

নাটক শেষ হল। শিশিরবাবুর প্রথম কথা—বৃজলাল। চা আন। আর সঙ্গেও কিছু দিস্। আমার দিকে চেয়ে বললেন—তুমি ক্লান্ত। বুঝতে পারছি। কিন্তু ইচ্ছে করেই চা দিতে বলিনি। ব্যাঘাত হত। শিশিরবাবুর তখন দুটি ভৃত্য। বৃজলাল এবং রামভরোস। রামভরোস গরম গরম ঘিয়ে ভাজা চিড়ে দিয়ে গেল। শিশিরবাবু আর একটা প্লেট আনতে বললো। সত্যেনবাবুকে তার থেকে কিছু চামচে করে তুলে দিলেন। আমাকে ঠাট্টা করে বললেন—বিশুদ্ধ ঘৃত। স্নেহময় পদার্থ নয়। এসো খাও।

আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলাম এটা কি রকম ব্যাপার হচ্ছে? ঘরে কি আর প্লেট নেই? কিন্তু অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ারই অপর নাম সংস্কৃতি। অতএব কম্পিত হস্ত অগ্রসর করে দিলাম। এক প্লেট থেকে শিশিরবাবুর সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম এই মানুষটি কিছুদিন আগে পর্যন্ত কত দূরের মানুষ ছিলেন। আর আজ? যোগসূত্র কি? নাটক। সাহিত্য। বৎসর ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এক হতে পারি। ধনী দরিদ্র, বড় ছোট, বৃদ্ধ যুবা। যেমন আমি আর শিশিরবাবু হয়েছি। শিশিরবাবু সত্যেনবাবুর সঙ্গে এক হতে পারলেন না কেন? এ রহস্য আজও আমার অজ্ঞাত। আমি শুধু মানবমনের ইতিহাস দিতে বসেছি। আমারও। অপরেরও। বোধহয় এই একমাত্র সাহিত্য পদ-বাচ্য। অপর সমস্তই অবান্তর। শুধু মনের নয়। আত্মারও। সামাজিক ইতিহাস। মানসিক ইতিহাস। আত্মিক ইতিহাস।

শিশিরবাবু সত্যেনবাবুর নাটক অভিনয় করেছেন। ইনি সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাতি। এখনও হয়ত আশা করেন শিশিরবাবু তাঁর নাটক করতেও পারেন। ইনি ভাল অভিনেতা। দস্যু নাটকে রাসবিহারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নিত্য বেলা দশটার সময় তিনি আসেন। চা খান। ভৃত্যকে বলা আছে, চা পানের পর তাঁকে দুটি সিগারেট দিয়ে যেতে। এইবার বৃজলাল তাঁর সামনে দুটি সিগারেট

এবং দেশলাই রেখে গেল। তিনি নীরবে ধূমপান করতে লাগলেন। আমার দিকে সকৌতূহল দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। কে এই নবীন নাট্যকার? এখানে একে প্রবেশাধিকার কে দিল? সকলেই জানে শিশিরবাবু ভাল নাটক শ্রোতা নন! মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আমাকে বলেছিলেন – আরে মশাই! শিশিরবাবু হলেন একজন গেঁতো লোক, মহা গেঁতোলোক। তুলসী লাহিড়ী ওঁর বন্ধু? তবু তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' শোনাতে নাকি সময় পুরো একটি বৎসর লেগেছিল। এক নাগাড়ে শুনতেই চান না কোন নাটকই। এত অসহিষ্ণু। এত ছটফটে। এত অস্থির।

সত্যেনবাবু নিশ্চয় ভাবছিলেন ব্যাপারখানা কি! শিশিরবাবু যে অত্যধিক আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আমার মন তখন সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান। শুধু নাটক শুনে আর চিড়ে ভাজা খাইয়েই ইনি বিদায় দেবেন নাকি? কলকাতার লোকদের ত চেনা দায়, বাংলার বাইরে থেকে। বাঙ্গালীর এক শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের সামনে বসে আছি। নাট্য-জগতের যিনি মুকুটহীন সম্রাট। তাঁর মূল ধরে নাড়া দিতে পেরেছি কিনা জানি না। বহুদূরে অবস্থিত একটি গৃহ-প্রাঙ্গণে, একটি উৎসুক মুখ মনে পড়ছে। ফিরে গিয়ে তার কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব কি? অথবা শুনবো টাকাগুলো মিছিমিছি নষ্ট হল! কিম্বা মন দিলেন।

একটু পরে শিশিরবাবুর ছোট ভাই হৃষিবাবু এলেন। শিশিরবাবু তাঁকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। দশ মিনিট পরে এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন। নিভৃতে বললেন—তোমার বই আমি করব। এখন কাউকে বলো না। যেমন গল্প করছিলে করগে।

আমি চলে এলাম। সত্যেন্দ্রবাবুর সঙ্গে যেমন গল্প করছিলাম, তেমনি করে গেলাম। যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু আমার মনের ভেতর তখন যে কি চলছিল তার খবর কে রাখে! তবু মানুষের মন সন্দেহ-বাতিক। প্রভাতবাবু বলেছিলেন শিশিরবাবু নাকি একটি

তক্ষক সাপ। আপনিও চৌকাট পার হবেন, অমনি আপনার সব কথা ভুলে যাবেন। ওঁকে বিশ্বাস আছে? মানুষ মানুষের সম্বন্ধে কত শীঘ্র মত দিয়ে ফেলে হয়ত প্রভাতবাবু কোন কারণে ক্ষুব্ধ। হয়ত আমেরিকায় বেলারাণীর সঙ্গে শিশিরবাবু ভাল ব্যবহার করেন নি। বেলা 'রঙমহলে' কাজ করে। তাঁর বান্ধবী। এক সঙ্গে থাকে। তিনি অবিবাহিত। অতএব বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশে তাঁর বিলম্ব হয় না। এইটুকু বোঝেন না, যে বাইরের থেকে এসেছে, যে ভাগ্যান্বেষী যুবক, তার ওপরে এই কথাগুলির প্রতিক্রিয়া কি? তক্ষক সাপ। ওরে বাবা! সেখানে নাটকের কি সম্ভাবনা?

এইসব ভাবছি এমন সময় শিশিরবাবু এসে বললেন—কাল সকাল সাতটায় আমি তোমার হোটেলে আসছি। কি নাম বললে যেন। ইণ্ডিয়া হোটেল। বেশ জানি! গেছি আমি সেখানে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশে। না? আগে ক্যালকাটা হোটেল ছিল। জানি।

উঠলাম।

পাঁচ মাস পরে ১০ই আগস্ট ১৯৪৯ নাট্যাচার্য আমার নাটক মঞ্চস্থ করলেন। সাহিত্য জগতে কলরব উঠল। কেন নাট্যাচার্য বাইরের একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের বই মঞ্চস্থ করলেন? কলকাতায় কি নাট্যকার ছিল না? এর জবাব নাট্যাচার্য আমায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন তারাশঙ্কর, অচিন্ত্য, প্রেমেন, বুদ্ধদেব প্রভৃতি নাট্যকার নয়। হাতে একটা অবৈতনিক মঞ্চ পেয়ে নাট্যালয়ের ভেতর দিককার জ্ঞানও অর্জিত হয়েছে। নিজে অভিনেতা হওয়ার দরুণ, অভিনেতা কি চায়, তাও নাকি অবগত আছি। হতে পারে। জানি না। কিন্তু বঙ্গরঙ্গালয়ে যে নাট্যকারের অভাব আছে, তা আজ স্পষ্ট। যাত্রা থিয়েটরকে কোণঠাসা করেছে। প্রধান কারণ নাট্যকারের অভাব। দ্বিতীয় কারণ, মঞ্চ প্রযোজকরা চাকচিক্যের মোহে মুগ্ধ। নাট্যাচার্যের মত নাট্য বোদ্ধা কেউ নেই। তৃতীয় কারণ তাপস সেন পরশুরাম রূপে

অবতীর্ণ হয়েছেন নাট্য জগতে। তিনি নাটকহীন করেছেন বাংলা রঙ্গমঞ্চকে। আলোর খেলা দেখিয়ে। তার অবধারিত ফল আজ আমরা পাচ্ছি। আজ দেশে নাটক নেই। নাট্যকাররাও যাত্রার পালা লিখছেন। একদিকে রেডিও নাটক। একদিকে টেলিভিসান। আর একদিকে মহাসমারোহে অভিনীত যাত্রা। যাত্রাকেও আজ থিয়েটার হতে হয়েছে। বাংলায় বোদ্ধা দর্শকেরও একান্ত অভাব। সকলে সহজেই চোখের জল ফেলতে চায়। মোটা তুলিতে আঁকা ছবি দেখতে চায়। এখানে সত্যিকারের নাট্যকারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রঙ্গমঞ্চ মুমূর্ষু। রীরংসা প্রবৃত্তিকে উস্‌কানি দিচ্ছে শুধু।

শিশিরবাবু আমার ভাবী মানবের নাম দিলেন পরিচয়। বিজ্ঞাপন দিলেন বড় সুন্দর। তাঁর কল্পনা শক্তির উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। লিখলেন পরিচয় জাতির, যুগের, সমাজের, ব্যক্তির। এত অল্প কথায় এত ব্যাপক ভাব যে প্রকাশ করা যায় তা আমার জানা ছিল না। কি বিরাট ছিল তাঁর মনের ঐশ্চর্য তাই সময়ে সময়ে অবাক হয়ে ভাবি। তাঁর অবর্তমানে আজ কি দেখছি বঙ্গরঙ্গাঙ্গণে। গণ্ডুব জলে সফরী ফর ফর করছে। এরাও নিজেকে বৃক্ষ বলে ঘোষণা করছে। কিন্তু নিজেকে বৃক্ষ বললেই কি সত্যিই বৃক্ষ হয়ে যাওয়া যায়—উচ্চতা চাই। বিস্তৃতি চাই। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছায়া ফেলা চাই। আজ বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয় দেখি আর মনে মনে হাসি। মনের ত্বক ভেদ করতে পারছে না। কোন চরিত্রের সঙ্গেই যেন একাত্মতা অনুভব করতে পারছি না। না আছে চরিত্রের নির্মিতি, না আছে পরিচিতি। না আছে তার স্বভাব সুন্দর বিকাশ। কাম্য পরিণতি। কি দেখব বসে বসে? অর্জুনের বৃহন্নলাবেশ?

মনোরঞ্জনবাবু 'পরিচয়' দেখলেন। বললেন—আপনার মুন্সীয়ানা আছে বটে। কেবল ভয় হচ্ছিল এই বুঝি বিপদ ঘটে। কিন্তু আপনি দিব্যি উতরিয়ে দিলেন।

প্রথম অভিনয়ের দিন সকালে তারাশঙ্করবাবুর বাড়ী গেলাম। তাঁকে

উদ্বোধন রজনীতে দর্শক হিসেবে দেখতে পাওয়া সৌভাগ্য বলেই মনে করেছিলাম। আশা করেছিলাম আমার নাটকের প্রথম উৎসাহদাতা আমায় প্রথম রজনীতেও উৎসাহই দেবেন। তাঁর দু'খানা চিঠির কথা আমি ভুলিনি। কিন্তু তিনি আসতে স্বীকৃত হলেনই না। নেমন্তন্নপত্র গ্রহণও করলেন না। এমনকি আমাকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। তিনি তখন টালার নবনির্মিত অট্টালিকায়। নবনির্মিত মানসিকতায় মট্ মট্ করছেন। মিষ্টতা বা শিষ্টতা কিছুরই পরিচয় দিতে পারলেন না। হিংসা তারাশঙ্করবাবুর স্বভাবের একটা দুর্বলতা ছিল। তাঁর চরিত্রের দ্বিতীয় দুর্বলতা অহঙ্কার। এ দুটো জিনিসই শিল্পীজনোচিত নয়। মনে ব্যথা পেলাম। কিন্তু তিনি অসাধরণ জেদী। আমার সহস্র অনুনয় বিনয় বৃথা হল। বালু যতই পেসা যাক, রস বেরুবে কি! তিনি তখন বালুর মত শুষ্ক। রসহীন। মুখ গোমড়া করে, তাঁর ডেস্কের ওপর লেখাটার দিকেই চেয়ে রইলেন। ঘাড় তুললেন না পর্যন্ত। এত অনমনীয় ঘাড়। এত দুর্দমনীয় অহঙ্কার। এত প্রচণ্ড আত্মশ্লাঘা।

মানুষের লেখার সঙ্গে তাঁর জীবনের সম্বন্ধ কত কম। তারাশঙ্করবাবু নাট্যকার। নাটকের বোদ্ধা। রঙ্গমঞ্চের সমালোচক। মঙ্গলাকাঙ্খী। তিনি লিখছেন—'কালকের সমাজের সঙ্গে আজকের সমাজের মিল নেই। কালকের জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে আজকের জীবন জিজ্ঞাসার অনেক তফাৎ। আমাদের নাটকে এই পরিবর্তন রূপায়িত হচ্ছে না। সাধারণতঃ যেসব সমস্যা নিয়ে আমাদের রঙ্গালয়ের নাটকগুলি গড়ে ওঠে, ওগুলো অত্যন্ত ব্যক্তিগত ছোট সমস্যা। ওগুলোর সঙ্গে মাটির কোন যোগ নেই। তাই জনমানসের সঙ্গেও ওদের কোন সম্পর্ক নেই। নতুন কালের নতুন নাটক এখনও লেখা হয়নি।'

অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য। নিপুণ চিকিৎসকের মত ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান করেছেন। আমার দুর্ভাগ্য যে এমন সুচিকিৎসককে আমার রোগ কোথায় তা দেখিয়ে দেবার সুযোগ দিতে পারলাম না। অথচ

ত্রুটি আমার দিক থেকে ছিল না। আমি এর চেয়ে বেশি আর কি করতে পারতাম?

শিশিরবাবুর দেওয়া প্রাচীর পত্র নিশ্চয় তাঁর চোখে পড়েছিল। কৌতূহলও হল না কেন তাই ভাবি। জাতির, যুগের, সমাজের, ব্যক্তির পরিচয় বলে যে নাটককে নাট্যাচার্য কলকাতার নাট্য-বোদ্ধাদের সামনে তুলে দিতে দ্বিধা করলেন না, সেই নাটকের নাট্যকার প্রথম অভিনয়ের রজনীতে নেমন্তন্ন করতে গিয়ে মামুলী বসবারও একটা অনুরোধ পেলেন না। এটা কি নাটকের মঙ্গল যিনি চান তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায়?

প্রভাতবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তিনি গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন বলি কিছু দেবে-টেবে? না নতুন নাট্যকার বলে ইয়ে করবে?

বললাম—নম্বরী নোট দিয়ে ত শুরু করেছেন। একটা লেখাপড়াও হয়েছে। বলেছেন—তোমাকে যা দিলাম শরৎবাবুকেও তা দিইনি।

প্রভাতবাবু চক্ষু কপালে তুলে বললেন—বলেন কি! আপনার প্রতি এত সদয় কেন?

বললাম—ঈশ্বর জানেন। আপনারা ত হলেন না। উনি ত তবু করলেন নাটক।

প্রভাতবাবু শ্লেষের সঙ্গে বললেন—শরৎ এখন আঙুল কামড়াচ্ছে। তা এখন আঙুল কামড়ালে কি হবে? বললামও তাই। বললাম—তোমার কাছে ত পাঠিয়েছিলাম, শরৎ। তুমি আগ্রহ দেখালে না। কি করব?

প্রভাতবাবু অজ্ঞাতসারে একটা মন্ত্রবাক্য উচ্চারণ করে ফেললেন। আগ্রহ দেখালে না। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ছিল এই ব্যাধি। ছিল কেন, এখনও আছে। আগ্রহ নেই। কোন বিষয়েই আগ্রহ নেই। একটা বিষয়ে শুধু আছে। রাতারাতি বড়লোক হওয়া। পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট-এর মেরুদণ্ড ভাঙা কুপ্রথার ফল এখনো বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। সবাই জমিদার। ক্ষুদ্রতম সংস্করণ হলেও জমিদার।

আমাদের প্রথম ও প্রধান শত্রু আলস্য। কর্ম-বিমুখতা, দ্বিতীয়, পরশ্রীকাতরতা। অমুক কেন দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে আঁচাচ্ছে। আমার তাতেই বুক জ্বলছে। তৃতীয় বিশ্বনিন্দুক জাত আমরা। পরের প্রশংসা করতে গেলে আমাদের বুক ফেটে যায়। প্রাণ থাকতে কারুর প্রশংসা করতে পারি না। বুক যেন চড়চড় করে দু'খানা হয়ে যায়। প্রভাতবাবু সে যুগের বাঙ্গালীর প্রতিনিধি। শিক্ষিত। উচ্চবংশীয়। কলাপ্রেমিক, অভিনেতা, থিয়েটর ভক্ত। থিয়েটরকে জীবিকা করেছেন। কিন্তু উদ্যমহীন। লুঙ্গি পরে চেয়ারে উঁচু হয়ে বসে থিয়েটরের বিজ্ঞাপনের খসড়া লিখেছেন। আমি দেখতাম আর অবাক হতাম। আমি দিল্লী এক্সপ্রেসে হাওড়া পৌছে, বাসে চড়ে ইণ্ডিয়া হোটেলে পৌছে দুটি বিস্কুট ও এক কাপ চা ব্রেক ফাষ্ট করে, স্যুট পরে, জুতো বুরুস করে, তাঁর ফ্ল্যাটে কড়া নাড়ছি। তিনি তখনও বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছেন। ইনি বাংলা রঙ্গমঞ্চের একজন পরিচালক। কোন পথে রঙ্গমঞ্চকে পরিচালনা করে নিয়ে যাবেন, তা বোঝা শক্ত নয়। অথচ ইচ্ছে করলে তিনি কিনা করতে পারতেন। সর্ব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন। একটি মাত্র অগুণ ছিল। শ্রমবিমুখতা আলস্যপ্রিয়তা আয়েসী।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখলাম এই কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিটি আতিথেয়তার অ-আ ক-খ পর্যন্ত শেখেননি।

পৃথিবীতে অহীনবাবুরাও আছেন। ভানুরাও আছে। নবোদিত ভানু। আমাদের ঘরে ঘরে যেন এই রকম 'ভানুরা' উদিত হয়। আহা !. সেদিন কি আমি দেখে যেতে পারব ?

প্রভাতবাবুকে কর্ম-বিমুখ কেন বলছি ! তাঁকে একখানা 'কমিডি' দিয়েছিলাম। তিনি সেটা পড়ে লিখেছিলেন। কমিডি ভাল। বিরাট একটা ফাঁক হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। লিখলাম—সেটা বোজান। আপনারা বিশেষজ্ঞ, পরিচালক। কিন্তু তিনি কিছুতেই সময় করে উঠতে পারলেন না। বড্ড ব্যস্ত। এক মিনিটও সময়

নেই। কি করবেন?

এইজন্তেই তাঁর ওপর আমার এত অভিমান। এ শুধু জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের অভিমান। তিনি যদি একটু সাবলম্বী হতেন। একটু কম পরনির্ভর হতেন। তাঁর উপাধি ছিল সিংহ। তিনি যদি একটু উদ্যোগী পুরুষসিংহ হতে পারতেন, বাংলা নাট্য জগতের ইতিহাস হয়ত আজ অন্য রূপ হতে পারত। কোন নাট্যকারের প্রথম নাটক সফল হয়েছে? কোন শিল্পী জীবনে ব্যর্থতাকে বরণ করেন নি?

বাংলা রঙ্গমঞ্চে পেশায় সবই ছিল। ছিল না শুধু পরিশ্রম। উদ্যোগ। অনলস কর্ম। শিল্পী সকলেই। বোদ্ধা সকলেই। হৃদয়বান সকলেই। কিন্তু অলস সকলেই। একি শুধু নিন্দাবাদ? না না। আমার আয়ুর সূর্য ডুবু-ডুবু। শীঘ্রই তমিস্রার মধ্যে ডুবে যাব।

এ পর্যন্ত সবই অনুকূল বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আকাশ ভেঙ্গে যশও হল না। ভাণ্ডার ভরে অর্থও এলো না। এমন কি নাটকের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারার কোন আশাও দেখতে পেলাম না। বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা আমার নাটকে অভিনয় করেছেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ মঞ্চে আমার নাটক অভিনীত হল। কলকাতার তখনকার মেয়র নির্মলচন্দ্র চন্দ্র বললেন—"ষোড়শীর" পর এই একটা নাটক দেখলাম। আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আমার নিজের অবস্থার কি উন্নতি হল? কিছুই না। আমি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রইলাম।

শিশিরবাবু আমার দ্বিতীয় নাটক মঞ্চস্থ করতে পারলেন না। রিহার্সালে ফেললেন। নামকরণ করলেন "এক অধ্যায়।" কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ হতে পারল না। তাঁর মঞ্চে তিনি আর হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখতে পারলেন না। নির্বাপিত হয়ে গেল তাঁর নটনাথের পূজা। এর কারণ কি? তিনি শেষ দৃশ্য আর তৈরি করতে পারলেন না। আমার তৈরী শেষ দৃশ্যে খুঁত বের করতে লাগলেন। গতর খাটালেন না। গেঁতো লোক ত!

ছুটি ভৃত্য আছে পদসেবার জন্যে। তাঁর পদসেবা চলতে লাগল। কিন্তু সে চরণযুগল আর মঞ্চে পাদচারণা করতে পারল না। গরমের দিনেও শিশিরবাবুকে বিশাল পালঙ্কে লেপ গায়ে দিয়ে শুতে দেখেছি। গায়ে লেপ। মাথার ওপরে পাখা। শ্রমবিমুখ অলস বাঙ্গালীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আত্মতৃপ্ত অলস বাঙ্গালীর জ্বলন্ত উদাহরণ। বার বার শুধু এই কথাই জানাচ্ছে প্রতিভা থাকলেই হয় না। শ্রম চাই। শ্রম। প্রভাতবাবু ফাঁক বোজাতে পারলেন না। শিশিরবাবু শেষ দৃশ্য তৈরী করতে পারলেন না। কে এর জন্যে দায়ী? ওঁদের আরামপ্রিয়তা।

আমি বাংলার বাইরে থাকি। দেখে-শুনে আমি অবাক। এরা বোমা ছুঁড়তে পারে। হাসতে হাসতে ফাঁসী যেতেও পারে। কিন্তু দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা নেই। –কল্পনাবিলাসী জেলিফিসের মত মেরুদণ্ডহীন, একটা জাতি।

যা হবার তাই হল। শিশিরবাবুর থিয়েটর উঠে গেল। কেউ বাঁচাতে এলো না। কারণ তিনি যে একদিন সফল হয়েছিলেন। মহাপাপ করেছিলেন। সফলতার চেয়ে বড় পাপ আর কি হতে পারে?

বিন্দুমাত্র সোরগোল না তুলে কত নিঃশব্দে শিশিরবাবুর থিয়েটর একদিন উঠে গেল। তার ফল আজও আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে। মঞ্চাধ্যক্ষরা জানেন আমি এমন নাট্যকার যে শুধু নাটক লিখতেই জানি। কিন্তু সে নাটক অর্থকরী হবে কিনা তা জানি না। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হই। আমি নাটক লিখতেই জানি। ব্যবসা করতে জানি না। সরস্বতী ও লক্ষ্মীর চির-বিবাদ। মঞ্চাধ্যক্ষরা নাটক নিংড়ে অর্থ বের করছেন। নাটক দিয়ে নয়। নাটক উপলক্ষ্য করে উলঙ্গ জঙ্ঘা দেখিয়ে। অর্বাচীন দর্শক, তাই হাঁ করে দেখছে। মঞ্চাধ্যক্ষ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলছেন—জানেন মশাই! প্রথম ছ' সারির দশ টাকার টিকিট বিশ টাকায় ব্ল্যাক হচ্ছে। আমিও তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ

মিলিয়ে বলি—তাই নাকি!

বাঃ! তবে আর ভাবনা কি। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে। শিশিরবাবু যদি এ দৃশ্য দেখে যেতেন। মালিক আরো খুশি হয়ে বলেন—তাই ত আপনাকে বলছি, শিশির যুগ শেষ হয়েছে। আমরা নাটক চাই না। একটা নাট্যভাষা চাই। যার সঙ্গে ছুটো নাচ-গান আলোটালো দিয়ে, ছুটো পয়সা পেতে পারি।

সত্যিই শিশির-যুগ শেষ হয়েছে। নাটকের যুগও শেষ হয়েছে। যাত্রার যুগ সুরু হয়েছে। যাত্রাও আর যাত্রা নেই। মাত্রা হারিয়েছে। অনুকরণ করছে। কাকে? একটা মৃতদেহকে! ছুটো মৃতদেহ এইবার জড়াজড়ি করে পাশাপাশি পড়ে থাকবে। যাত্রা এবং থিয়েটর। চলবে সিনেমা। টেলিভিসন। নাটক অদৃশ্য হবে। থিয়েটর অবলুপ্ত হবে। হোক ক্ষতি কি। ব্যবসাদারদের ব্যবসা চললেই হল।

এর জন্যে দায়ী কে? এর জন্যে দায়ী দর্শক। দর্শক যদি বলে যথার্থ নাটক চাই। যথার্থ নাটক তৈরী হবে। মৌলিক নাটক তৈরি হবে। উপন্যাসকে নাট্য রূপায়িত করা নয়। বাংলা নাটক চাই। অনুবাদ করা নয়। মাটি থেকে উদ্ভূত। মাটির গন্ধে ভরপুর। রাষ্ট্রের কর্ণধাররা যদি বলেন—জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে সিনেমা উপন্যাস। নাটক তাদের একটু বলবান করে তুলুক। বলিষ্ঠ নাটক রচিত হবেই।

অতঃপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। ওকালতীতে মন দিলাম। দিতে বাধ্য হলাম। শিশিরবাবুর থিয়েটর উঠে গেল। বার হাজার টাকা ভাড়া বাকী ছিল। আদালতে তাঁর হার হল। তাঁর বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়ে গেল। বাড়ী ছাড়তেই হবে! তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। ছাপরা থেকে ছুটে গেলাম। তিনি আমার দিকে শুধু ক্যাল্ ক্যাল্ করে চেয়ে রইলেন।

ছুই নির্বাক শিল্পী মাথা অবনত করে দাঁড়িয়ে রইল। শিশিরবাবু

যেন ঝড়ে পড়ে-যাওয়া বট গাছ। বজ্রে ঝলসে-যাওয়া তাল গাছ। দেহে অতি বিশ্রী একটা সবুজ র‍্যাপার। কোমরে আমারই দেওয়া একটা সিল্কের চেক-কাটা লুঙ্গি। পায়ে চটি। থতমত খেয়ে গেছেন যেন সব দেখে শুনে। আমারও মুখে কোন কথা জোগাল না। সান্ত্বনার একটা বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারলাম না। এ-যেন অবধারিত ছিল। এ-যেন হতই। তাঁর চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। ছোট ছোট চোখ। কিন্তু যেন মৃতের চোখ। ভাবলেশহীন। উত্তাপহীন। ভাষাহীন। স্তব্ধ এক অসহায় বৃদ্ধ শিল্পী। চল্লিশ বৎসর নাট্য-সরস্বতীর উপাসনা করার পর এই পুরস্কার! নাট্যশালা থেকে কে যেন গলায় হাত দিয়ে তাঁকে দূর করে দিচ্ছে। যে রঙ্গমঞ্চে তিনি ষোল বছর ধরে এক নাগাড়ে অভিনয় করে এসেছেন। তাঁর সেই অতি পরিচিত মঞ্চ থেকে। এই মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে তাঁকে কত বিচিত্র ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছি। সাহানশা বাদশা নাদির শাহ, সাহজাহাঁ অওরংজেব, জাহান্দার শা, ইত্যাদির ভূমিকায় দেখেছি। আজ মঞ্চের নেপথ্যে অন্য এক ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখছি।

দেখছি এ তাঁর অভিনয় নয়। এ তাঁর জীবন। এ নাট্য তাঁর জীবন-নাট্য। এ ভূমিকা হল শিশির ভাদুড়ীর ভূমিকা। একদিন শিশির ভাদুড়ীর জীবনও নাট্যালয়ে অভিনীত হবে। মর্মান্তিক এই শেষ দৃশ্য হয়ত রূপ পাবে। মঞ্চত্যাগের পূর্ব মুহূর্তের ভূমিকা। দেশের কোন নামী ব্যক্তিকে দেখিনি সেদিন। যদিও তিনদিন তাঁর অতিথি ছিলাম। কেউ একবার উঁকি মারতেও আসেন নি।

সেদিন সত্যিই বাংলার রঙ্গমঞ্চের গৌরব নাট্যাচার্যকে অনাথ-অনাথই মনে হচ্ছিল। পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ। কেউ কোথাও নেই। একা সমস্ত যন্ত্রণা বহন করছেন। ভাইরা আছে বটে। কিন্তু তারা কি করবে?- পুত্র আছে বটে। কিন্তু কবে কোন পুত্র অসফল পিতাকে ভক্তি করেছে? সহানুভূতি দেখিয়েছে? সকলেই মনে মনে গজরাচ্ছে

শুধু। পালঙ্কে শোওয়া পিতাকে ভৃত্যেরা পদসেবা করছে, এই দৃশ্য দেখতেই ভাল লাগে। বাড়ী যাবার সময় বুকিং অফিস থেকে রজত মুদ্রা নিয়ে বাড়ী যেতেও ভালই লাগে। এর ব্যতিক্রম হলে ভাল লাগে না। বুকিং অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। আর এই পিতাকে ভক্তি করতে ইচ্ছে হয় কখনো? পিতা নাকি স্বর্গ, পিতা নাকি ধর্ম, পিতা নাকি পরম তপঃ। কিন্তু কলিকালে তা কি আর আছে? দরিদ্র পিতাকে লাঞ্ছনা করলে ভগবানও বিচলিত হন না। অশোকবাবু শিশিরবাবুর দিকে ভাল করে তাকাচ্ছেনও না। তবু এখনও আশা আছে। যতদিন শ্বাস। ততদিন আশ। এই লোকটা মঞ্চে রঙ মেখে, দুটো কথা বলতে পারলেই পকেটে কিছু পদার্থ আসবে। নতুবা এই লোকটার মূল্য আর কি আছে?

ভবানীবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কি রকম লাগছে? খুব খারাপ নিশ্চয়ই।

বললেন—খারাপ আর কি! এই নিয়ে চারবার হল। গা সওয়া হয়ে গেছে।

এই হলো শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পরিবার। সহানুভূতি নেই। ক্রোধ আছে। ব্যঙ্গ আছে। আছে অভিমান। আমি দেখছি। শুধুই দেখছি। তিনদিন ক্রমাগত আমার সঙ্গে নাটক আর নাট্য-আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্য কথা নয়। তাঁর সাধের শ্রীরঙ্গমের সামনের দিক তখন ভাঙ্গা হচ্ছে। পেছনের দোতলায় আমরা কখন দাঁড়িয়ে আছি। কখন বসে আছি। চা খাচ্ছি। শিশিরকুমার চুরুট খেয়ে যাচ্ছেন। অনবরত কথা বলে যাচ্ছেন।

বললেন—জিতেন, তোমার যা কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে সব জিজ্ঞেস করে নাও। আর সময় হবে না। সুযোগও হবে না। যথাসাধ্য উত্তর দিয়ে যাবো। তোমার কাছে আর কিছু গোপন করব না। আমি সত্যিই তোমাকে কিছুই দিতে পারলাম না। ধন, যশ, মান, কিছুই নয়। আমার কাছে এসে তুমি ঠকলে। কিছুই

লাভ করতে পারলে না। আমার কাছে না টিকে থাকলেই হয়ত তোমার ভাল হত।

আমি মাথা নীচু করে সব শুনে যাচ্ছি। জবাব দিচ্ছি না। এসব কথার কি জবাব আছে? আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ খেদোক্তি শুধু।

শিশিরবাবু হেসে বলছেন বিশ্রাম! হ্যাঁ, এইবার বিশ্রামই হবে চিরবিশ্রাম। না। বিশ্রাম নেই। তুমি প্রশ্ন কর। আমি উত্তর দিয়ে যাব। এছাড়া আমি আর তোমায় কি দিয়ে যেতে পারি। এইসব আলোচনা করেই যাহোক কিছু আত্মমর্যাদা এখনো বজায় রাখতে পারছি। নইলে মর্যাদা আর রইল কোথায়?

তারপর ছাপরায় গিয়ে স্থির হয়ে আসনে বসো। লেখ নাটক। লেখ ইতিহাস। লেখ বঙ্গরঙ্গমঞ্চের গৌরবের কথা। লেখ বঙ্গরঙ্গমঞ্চের দুর্দশার কথাও। নাটকের অভিনয়ের জন্যে ভেব না। ভাল নাটক হলে একদিন অভিনয় হবেই।

শিশিরবাবু হাসছেন ঠিকই হাসি। মর্মছেঁড়া। কিন্তু কি সুন্দর। কিসের অভিব্যক্তি দিচ্ছেন তিনি? কোন ভূমিকায় অভিনয় করছেন তিনি? শিশির ভাদুড়ীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন তিনি। এক হতাশাজর্জর, জীবন-পরাভূতের ভূমিকা। জয় হোক অভিনেতা শিশির ভাদুড়ীর। মানুষ শিশির ভাদুড়ীর জয় নাই হোক। আমি ভাগ্যবান? আমি যে এই জীবন্ত নাটক দেখতে পাচ্ছি। এ আমার অসীম সৌভাগ্য।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম দুজনেই। শিশিরবাবু গম্ভীর হয়ে কালো কালো, মোটা মোটা, সিগার ধ্বংস করে যাচ্ছেন শুধু। আর আমি স্মৃতির ভাণ্ডারে সমস্তই গুছিয়ে রাখছি। সময়ই জীবন। সময় একদিন এর মূল্য দেবে। যখন আমিও থাকব না। শিশিরবাবুও থাকবেন না। তখন থাকবে কি? বর্ণমালা। বর্ণেশ্বরী। বর্ণ জননী! ভাষা।

শিশিরবাবু বাক্‌দেবতা এবং বিদ্যাদেবতা উভয়েরই কৃপাপাত্র। উভয়েই

এঁকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেছেন। বিদ্যাদেবতা বিদ্যাদান করেছেন বাক্‌দেবতা বাকশক্তি দান করেছেন। শিশিরবাবু সুকণ্ঠ, সুবক্তা তিনি কথা বলতেও জানেন। কথা বলবার বিষয়বস্তু তাঁর ভাণ্ডারে আছে। বাক্‌দেবতা তাঁকে বাকশক্তির প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিয়েছেন। ভরাট গলায় তিনি অধীত বিদ্যার শত সহস্র পরিচয় দিয়ে চলেছেন। সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যাচ্ছেন। আনন্দে মাঝে মাঝে উল্লসিতও হয়ে উঠছেন। বিদ্যাই মানুষের যথার্থ শক্তি। বিদ্যাই মানুষকে যথার্থ মুক্তি এনে দেয়। এই মুহূর্তে শিশিরবাবুর একমাত্র অবলম্বন বিদ্যা। তিনি তার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন।

আমার একমাত্র অবলম্বন জ্ঞাতুং-ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা। তাই করে চলছি। লোকটাকে বাঁচতে দিতে হবে ত? নীচে হাতুড়ী দিয়ে ঘর ভাঙ্গা অবিশ্রাম চলেছে। শিশিরবাবু সেই শব্দ চাপা দেবার জন্যে কণ্ঠস্বর অতি উচ্চে তুলে ধরছেন। আমি পাশে বসে। অত না চেঁচালেও আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু শিশিরবাবু যেন লোহার হাতুড়ী দিয়ে তোলা সব বীভৎস আওয়াজ চাপতে চাচ্ছেন। শুনতে আর পাচ্ছেন না যেন। তাঁর শত সহস্র রজনীর, শত শত ভূমিকার, অসাধারণ অভিনয়ের সশব্দ করতালি দেওয়া দর্শকের একজনও কোথাও কাছে পিঠে নেই। সবাই ছেড়েছে। সবাই। শিশিরবাবু শিল্পী। অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ শিল্পী। অতিশয় অভিমানী।

তাঁর সমস্ত মান-অভিমান শুধু জননীর চরণেই পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। তাঁর ব্যথা জানাবার স্থান আর কোথাও ছিল না। তিনি পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সকলের বড়দা। থিয়েটার জগতের চল্লিশ বছরের একচ্ছত্র বড়দা। একাকী। বড়দা বললে সে সময় আর কাউকেই বোঝাতো না। থিয়েটার জগতের বড়দা। শিল্পী, অভিনেতা, কর্মী, ভৃত্য, দরওয়ান, সকলেরই বড়দা। অথবা বড়বাবু। মেয়েদের বাবা। যাদের তিনি কন্যার মতই স্নেহ করতেন। তাঁর মাও যে-সে মা ছিলেন না। কুইন ভিক্টোরিয়ার মতই দেখতে। যেম যমজ বোন। তেমনি

ভরাট শরীর। তেমনি সুগৌর বর্ণ। সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি যেন। তিনি বড় ছেলের চোখের জল মুছিয়ে দিতেন।

শিশিরবাবু বলতেন জানো জিতেন, আজ পর্যন্ত মায়ের অমতে কোন কাজ করি নি। সেই সর্ব দুঃখ হরা মা তাঁর আর নেই। কার কাছে দুঃখ নিবেদন করবেন? ছোট ভাইয়ের কাছে? পুত্রের কাছে? মর্য্যাদায় বাধে।

মাঝে মাঝে বলতেন—আমার বয়সটা এখন চলে যাবারই বয়স। আর্ভিং এই বয়সেই গিয়েছিল। গিরিশ ঘোষও। (১৮৪৪—১৯১২)। তবে আর্ভিং এর শেষ দশা যেন আমাকে না পায়। মানে মানে যেন সরে পড়তে পারি। অনেক ভাল করেছো শ্যামা, আর ভালোতে কাজ নেই। এবার ভালোয় ভালোয় বিদেয় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই। হ্যাঁ, আলোয় আলোয় যেন যেতে পারি।

তিনি পকেটেই সিগার রাখতেন বাইরে গেলে। একটা সিগার চাপ পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। ধরাতে গিয়ে দেখেন মাঝখানটা ভাঙ্গা। আমি সেই ঘরে বসেছিলাম। আমায় দেখিয়ে বললেন—দেখছো? কি করি এটাকে?

বললাম—অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। বাকী অর্ধেকটা না হয়—।

শিশিরবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—না undignified হবে। জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। সেই dignity সম্বন্ধে অতি সচেতন ব্যক্তিটির dignity আজ থাকছে কোথায়? চারদিক থেকে জল ঢুকছে। তিনি রোধ করতে পারছেন না কিছুতেই। শেষকালে ভেসেই গেলেন। জাহাজ ডুবল। ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে রইলেন ডেকে। মেরুদণ্ড সোজা করে। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ডুবলেন। অমর্য্যাদার জীবনযাপন করতে পারেন না তিনি।

আমায় একদিন বলেছিলেন, জানো জিতেন, একটা কাজ যদি করতে পারি, তাহলে আমার পয়সার অভাব থাকে না।

বললাম—কি কাজ?

বললেন—যদি বড়লোকের ছেলেদের একটু স্টেজের ভেতর আসতে দিতে পারি। মেয়েদের সঙ্গে একটু ফষ্টিনষ্টি করে দিতে পারি।

বলেছিলাম—বেশ ত! দিন না। ক্ষতি কি!

শিশিরবাবু গুলি-খাওয়া বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন—কি বলছ কি!

স্টেজের পবিত্রতা তিনি রক্ষা করলেন। কিন্তু স্টেজ তাঁর পবিত্রতা রক্ষা করল না। কারণ, তিনি ক'টি দোলানোও দেখাতে পারলেন না। বড় লোকের ছেলেদের ভেতরে আসতেও দিতে পারলেন না। সেক্সের ওপর ফোকাস ফেলতেও পারলেন না।

শিশিরবাবু কথা বলে যাচ্ছেন। আমি শুনে যাচ্ছি। এ ছাড়া আর করবার কি আছে? তর্ক-বিতর্কের সময় এটা নয়। চুপ করে শোনবারই সময়! শোনাটাও একটা আর্ট।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তখন বুঝতে পারতাম না কে ঠিক আর কে বেঠিক। লিখে যাচ্ছি এইজন্যে যে একদিন মহাকালই এর বিচার করবে। তবে এও ঠিক যে শিশিরবাবুর কথায় যথেষ্ট সত্য ছিল।

শিশিরবাবু আমার সব পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিলেন। খুব যত্নের সঙ্গেই রেখেছিলেন তিনি। পাণ্ডুলিপি নিয়ে এবার আমি কি করব? আবার মনে মনে একটা অহঙ্কার ছিল, নাট্যাচার্যের জীবদ্দশায় আমার নাটক অন্য কোন মঞ্চে অভিনীত হবে না। তিনি বেঁচে থাকতে অন্য রঙ্গমঞ্চে যাই নি।

শিশিরবাবু বলেছিলেন—ভাল নাটক লিখতে চেষ্টা কর। ভাল নাটক লেখা হলে অভিনয় একদিন হবেই। আজ পর্যন্ত দেখেছ কি, ভাল নাটক লেখা হয়েছে, অথচ অভিনীত হয়নি? দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' আমি ষোল বছর পরে অভিনয় করলাম। কাজেই মঞ্চস্থ হোক অথবা না হোক, লিখে যাও।

আজও আমার শিশিরবাবুর উপদেশ জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে জ্বলছে। তাঁর উৎসাহবর্ধক বাণী এখনও যেন কানে শুনছি। তাই

আমি অধীর হইনা। ধৈর্য এবং স্থৈর্য আমার জীবনের মূলমন্ত্র। প্রফুল্ল বদনে, প্রসন্নচিত্তে, সমস্তই সহ্য করব। এই আমার অভিপ্রায়। আমি হতাশ হই না।

শ্রীরঙ্গমের বুকিং অফিসের সামনের ঘরে আমার কিছু অবিক্রীত ছাপা বই রক্ষিত ছিল। শিশিরবাবু নিয়ে যেতে বললেন। তিনিই বইগুলো ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিছু বই তাঁর কাছে রইল।

শিশিরবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবার দৃশ্য আমার চিরকাল মনে থাকবে। নাট্যাচার্য এবং শ্রীরঙ্গম আজ দুই-ই অতীত। কিন্তু একজন সেদিন জীবিত ছিলেন। যদিও নামে মাত্রই জীবিত ছিলেন। দেহে মাত্র, মনে নয়। প্রাণ পূর্বেই দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। শ্রীরঙ্গম থেকে উৎক্ষিপ্ত শিশিরকুমার আর শিশিরকুমার ছিলেন না। গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যের উত্তাপে গোলাপের পাপড়ির ওপর নৃত্যরত শিশিরবিন্দু কখন শুষ্ক হয়ে উঠেছিল। কখন লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হয়েও গিয়েছিল। কেউ সেদিন এই শিল্পীর মনের ব্যথা বুঝতে এগিয়ে আসেনি। আমায় স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে থিয়েটরের পেছনে, থিয়েটরের মোটর আর অপেক্ষা করে নি। ভৃত্য ব্রজলাল ও রামভরোসকে আগেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শিশিরবাবু দোতালায় তাঁর ষোল বছর ধরে ব্যবহার করা সোফায় বসেই রইলেন। যে সোফা তাঁরই মত পুরাতন, মলিন ও জীর্ণ। যে সোফা সঙ্গে নিয়ে যাবার অধিকারও আর তাঁর নেই। আগের মত নীচে নেমে এসে আমায় বিদায় জানানো দূরে থাক, সোফা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারলেন না পর্যন্ত। যে নাট্যকার আট বছর আগে তাঁর কাছে অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন, তাকে ভিখারীর মত শূন্য হাতে বিদায় দিতে হচ্ছে। এর যাতনা যে কি মর্মান্তিক, তা অনুমান করা আমার পক্ষে শক্ত ছিল না। আনত-মস্তকে পাণ্ডুলিপিগুলি নিয়ে, নীচে অপেক্ষমান ট্যাকসিতে গিয়ে উঠলাম। হাওড়া স্টেশন কখন পৌছলাম জানি না। কখন্ ট্রেনে

চড়ে বসলাম তাও জানি না। শিশিরবাবু এবং শ্রীরঙ্গম, সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কেবল ভাবছি শিশিরবাবুর কথা। শিশির-বাবুর চিঠিটা তখনও পকেটে আছে। যে চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছিলাম কলকাতায়। বারে বারে সেই চিঠিটাই পড়ছি। আর হাসছি। শিশিরবাবুর ভুল দেখে। স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে বসে আছেন। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি। পাঠক বুঝতে পারবেন তাঁর মনের অবস্থা কি হয়েছিল সে সময়।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ফোন বি, বি ১৪২৩

শ্রীরঙ্গম

কলিকাতা-৬

মঙ্গলবার ১৭।১।৫৫

জিতেন,

চিঠির উত্তর দিতে বড় দেরী হল। প্রতিকূল ভাগ্য বড়ই ব্যস্ত আমি ২৭শে জানুয়ারি এই বাড়ী ছেড়ে যাব। একটা বাড়ী ভাড়া দু' একদিনের মধ্যে হয়ে যাবে আশা করি।

তুমি বড় দিনের ছুটিতে এসে তোমার বইগুলি নিয়ে যেও। ২৭শে জানুয়ারী সকালে তোমাকে প্রত্যাশা করি। তার আগে আসতে পারলে ভালই হয়। ২৩শে নেতাজী জন্ম দিবসে আমার শেষ অভিনয়।

স্নেহাশীষ

দাদা

শিশিরবাবু জানুয়ারী মাসে বড় দিনের স্বপ্ন দেখছেন। বড়দিন যে এসেছে এবং চলে গেছে তা তাঁর অনুভব হয়নি। সাল লিখছেন ১৯৫৫। কিন্তু ১৯৫৫ যে শেষ হয়ে ১৯৫৬ সাল আরম্ভ হয়ে গেছে, সে খেয়ালও নেই। এত বিচলিত তখন তার মস্তিষ্ক। কিন্তু অনেক কিছু বিস্মৃত হলেও শাশ্বত যে কয়েকটা জিনিস আছে তা বিস্মৃত হন নি। যে বিশ্বাস করে নিজের পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে

তুলে দিয়ে গেছে, তাকে তা স্বহস্তে ফিরিয়ে দিয়ে তবেই তাঁর নিষ্কৃতি। নতুবা বিবেক তাঁকে নিরন্তর দংশন করতে থাকবে। যদি তিনি নাই ফিরিয়ে দিতেন, তাঁর কি ক্ষতি হত? তাঁর ত সমস্তই গেল। দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ সবই। যদি তার সঙ্গে কয়েক দিস্তা হাতের লেখা কাগজও যেত, কি ক্ষতি হত। কিন্তু হাতের লেখা ত শুধু কাগজে লেখা একজনের হস্তাক্ষর নয় সে যে লেখকের হৃদয়। সেই হৃদয়েরও যে সাক্ষাৎ চাই। নিজের কালো কালো করে কাটা হৃদয়ও যে তার সামনে তুলে ধরা চাই। থাকবে হয়ত শুধু নীরবতা।

এখন আমার পরিচয় এক ঐতিহাসিকের। এক প্রত্যক্ষদর্শীর। আমি লিখে যাব। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে পর্যন্ত লিখে যাব। নাট্যকার মৃত। নাট্যকারের ভস্মের ভেতর থেকে নতুন স্রষ্টা বেরুচ্ছে। ঐতিহাসিক। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস যে লিখছে।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে শ্রীরঙ্গমে ভোরবেলা এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। ২৭শে জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলা শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলাম। ২৭ জানুয়ারী ভোরবেলা এমন একটা দৃশ্য দেখলাম যে, কিছুতেই ভোলা যায় না। শিল্পীদের কপালে কেন যে এত দুঃখ লেখা থাকে, ঈশ্বর জানেন শুধু। অমরত্বের এই কি শুল্ক? অমর হতে গেলে দিতেই হবে এই শুল্ক? নতুবা অমর হওয়া যাবে না? কি ভয়ংকর।

আগের মত এক ঘরে আমি আর শিশিরবাবু শুয়ে তিনি বিরাট পালঙ্কে। তাঁর অভ্যস্ত বিছানায়। আমি এক পাশে ছোট একটা সদ্য আনা খাটে। যতবার ঘুম ভেঙ্গেছে, দেখেছি শিশিরবাবু এপাশ আর ওপাশ করছেন। আগের মত মাথার কাছে রিডিংল্যাম্প জেলে, আমার দিকে সেড্ দিয়ে, বইয়ের সাগরে নিমগ্ন হননি। আর মনঃসংযোগ করে পড়বার ক্ষমতাও নেই। শুধু ছটফট করার ক্ষমতাই আছে। বোধহয় সারারাত ঘুমোননি। শুধু এপাশ আর ওপাশ

করেছেন। তখন কাক ডাকা ভোর। সূর্য তখনও ওঠেনি। পুব আকাশ তখনো রাঙ্গা হয়ে ওঠেনি।

হঠাৎ একটা আর্ত বুকফাটা কণ্ঠস্বরের গোঁঙানি শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভোরবেলাকার ঘুম গভীরই হয়ে থাকে। বিশেষ শীতকালের ভোর। কিন্তু আওয়াজ অতি নিকটে। অতি বীভৎস। অতি বিশ্রী। চেয়ে দেখি ঘরে ত আর কেউ নেই। আমি খাটে শুয়ে। আর এক পাশে পালঙ্কে শিশিরবাবু। ছটফট করছেন। উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে কেবল মাথা ঘসছেন। কেবল অস্ফুটস্বরে কাতরাচ্ছেন— মা-মা-মা। আমি এতদূর বিস্মিত ও বিহ্বল, আমার ঘুম যে ভেঙ্গে গেছে তা জানতে দিতেও পারিনি। তিনিও জানতে পারেন নি তাঁর ঘরে আর কেউ আছে। একজন যে ঘুমোচ্ছিল সে শব্দ শুনে জেগে উঠেছে। কিন্তু জানাচ্ছে না কিছুই। শুধু চোখ বড় বড় করে দেখে যাচ্ছে সবই। শুনে যাচ্ছে সবকিছুই। আমি জানতাম শিশিরবাবু অতিশয় মাতৃভক্ত। ঈশ্বর মানতেন না। কিন্তু মাতৃদেবীকে ঈশ্বরের ওপরে স্থান দিতেন। শিশিরবাবু মাথা ঘসছেন নাক রগড়াচ্ছেন বালিশে। আর ভগ্নস্বরে প্রার্থনা জানাচ্ছেন মাতৃদেবীর অভয় চরণে মা! মা! রক্ষে কর মা। আর যে পারিনে মা। মা-মা-মা! রক্ষা কর মা। রক্ষা কর। রক্ষা কর। মা! মা!

নিঃশ্বাস চেপে, পায়ের শব্দ না করে, নিঃশব্দে উঠে বাইরে চলে গেলাম। কাছেই দোতালার ছোট ছাদ। ধীরে ধীরে পায়চারী করতে লাগলাম। ওপরে মুখ তুলে চাইলাম। আকাশ তেমনি নীরব। তারাগুলি তেমনিই মূক। তেমনিই ঝিক ঝিক করছে। পৃথিবীর কোথাও যে কেউ মর্মান্তিক দুঃখে বুক ফাটা অসহায় ক্রন্দন করছে, তা জানেও না। জানতে চায় না। আমি শুধু ভাবছি একি দেখলাম? একি শুনলাম? এ দৃশ্য আমায় কেন দেখতে হল? এ কণ্ঠস্বর আমায় কেন শুনতে হল? এ তো শিশিরবাবুর অভিনয় নয়। এ তো শিশিরবাবু স্বয়ং। নাট্যাচার্য ক্রন্দন করছেন! এও কি সম্ভব? পাঁচ

বছরের বালকের মত ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করছেন? এই শিশির ভাদুড়ীকে কলকাতার লোক জানে কি! চির উন্নত-শির কেন এমন করে বালিসে লোটাচ্ছে? বীরদেরও দুর্বল মুহূর্ত থাকে। এই হল শিশিরবাবুর দুর্বলতম মুহূর্ত। যাকে চিরকাল দেখে আসছি পর্বতের মত অটল, সাগরের মত প্রশান্ত, তিনি একাকী নিজের ঘরে, নিঃসঙ্গ শয্যায়, মুখ রগড়ে রগড়ে একি ছেলেমানুষের মত ক্রন্দন করছেন?

শিশিরবাবু shy, timidই শুধু নন। ভীষণ sentimental! তাঁর বাইরেটা রুক্ষ। ভেতরটা অত্যন্ত কোমল। আমাকে যখন তিনি জোর করে তাঁর অতিথি করলেন, তখন বললেন—আমার ঘরে যদি তোমার খাটটা ফেলিয়ে দিই, তোমার আপত্তি আছে কি?

বললাম—মানে আপত্তি আর কি? তবে আপনারও ত কিছু privacy আছে। চব্বিশ ঘণ্টা কেউ এক ঘরে থাকলে।

শিশিরবাবু বললেন—ছোট ভাইয়ের কাছে আবার privacy কি? তবে তোমার যদি প্রাইভেসী থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। সিগারেট খাও যদি, খেতে পার, আমার সামনেও। চল্লিশ পার হয়েছো তো!

বলেছিলাম—না না সে জন্যে নয়। বেশ! আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমার আপত্তির কি কারণ আছে?

শিশিরবাবু বললেন—এক ঘরে না থাকলে, মনের সব কথা বলা যায় না তো। মুড আসে না তো সব সময়। যখন আসে তখন যদি থাকো দুটো কথা বলতে পারি। রাত বারোটায় তাঁকে কথায় পেতো। পায়চারী করছেন ঘরের ভেতর আর কথা বলছেন। হাতে সিগার। কত অন্তরঙ্গ কথাই না বলতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনটে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। frailty, sense of worthlessness, আর lonliness. শিশিরবাবু ছিলেন যাকে বলে সত্যিকারের lonely। নিঃসঙ্গ পথিক। একাকী জীবন পথ পরিক্রমা করে চলেছেন। একাকী। অত্যন্ত একাকী। স্ত্রী নেই, সবেধন নীলমণি পুত্রটিও কাছে থাকে না। প্রহরের পর প্রহর অতিক্রম করে। তিনি কথা বলার লোক খুঁজে পান না।

মর্মান্তিক মর্মপীড়ায় মথিত হতে থাকেন।

ছাদে পায়চারী করছি আর ভাবছি কেন নাট্যাচার্য একটু আবরণ রাখলেন না। এটুকু প্রাইভেসী রাখলে যে ভাল হত। আমাকে এই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখতে হত না। আমি কেন এই দৃশ্য দেখলাম?

সকাল হল। চা খেলাম। টোস্ট খেলাম। ডিম খেলাম। যেন কিছুই হয়নি। যেমন প্রত্যহই খেয়ে থাকি। কিন্তু শিশিরবাবুকে যে একটু নতুন রূপে দেখতে লাগলাম তাতে সন্দেহ নেই। ইনি এত দুর্বল? শুধু কাঠিন্যের মুখোস পরে থাকেন? তিনি সবল কোনখানটাই নন। তিনি ছেলেমানুষের মতই দুর্বল। আত্মিক-শক্তির বিহনে তিনি যথার্থ শক্তির অধিকারী হবেন কি করে? তিনি অজ্ঞান মানব। অজ্ঞানতা মানেই দুর্বলতা। অসহায়তা। একমাত্র আত্মিক শক্তিই এ দুর্বলতা জয় করতে পারে।

এক বৎসর পর। ২৩শে সেপ্টেম্বর। ১৯৫৭। শিশিরবাবু লিখলেন—

২৭৮ বি. টি. রোড
কলিকাতা-৩৬

জিতেন,

তোমার চিঠি পেয়ে খুসী হলাম। আমি এই ঠিকানায় আছি এবং অনেকদিন থাকব। কোলকাতায় এসে যদি দেখা করতে পারো, বড় আনন্দ হবে। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। আশা করি সর্বাঙ্গীন কুশল। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীব নিও।

ইতি—
তোমার দাদা

১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৭ সকাল নটায় সময় বরাহনগরে শিশিরবাবুর ভাড়াটে বাড়ীতে এলাম। পুরাণো লালচে রঙের দোতালা বাড়ী। ঠিক বড় রাস্তার ওপরেই। নীচে বসে রইলাম। শিশিরবাবু দোতালায়। তাঁকে খবর দেওয়া হল। একটু পরে ডাক এলো। গেলাম। ছোট

ঘর। পুরানো আসবাবপত্র দিয়ে ঠাসা। এক পাশে পালঙ্ক। বিছানার চাদর ময়লা। এক পাশে শিশিরবাবু। বসে আছেন চেয়ারে। গায়ে একটা গেঞ্জি। পরণে একটা লুঙ্গি। চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। এ ঘরের সবই মলিন। শিশিরবাবুর গায়ের রংটাই শুধু উজ্জ্বল। এখনো ধব ধব করছে। প্রণাম করলাম।

আমাকে গ্রহণ করলেন স্নেহের সঙ্গেই।

আজও দেখলাম, গরম গরম খাঁটি ঘিয়ে ভাজা নিমকি এলো চায়ের সঙ্গে। একদিন যেমন শ্রীরঙ্গমে চিড়ে ভাজা এসেছিল। কিন্তু আর সেই কলকণ্ঠের পরিহাস নেই—"বিশুদ্ধ ঘৃত স্নেহময় পদার্থ নয়।" সমস্ত সরসতা, যেন কোথায় অন্তর্হিত। মানুষটা চলে গেছে। তার দেহটা পড়ে আছে, তবু সে দেহ পশুরাজেরই দেহ। এখনও কেশর ফুলিয়েই আছে, সাহজাহাঁ আজও সাহজাহাঁ, বন্দী হলেও হৃত সাম্রাজ্য হলেও, নিস্তেজ হলেও তাজমহলের স্রষ্টা তাজমহলেরই স্রষ্টা। বৃদ্ধ হলেও, শক্তিহীন হলেও, অর্থহীন হলেও ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক হয়ত অন্য মূল্যায়ণ করবে, কিন্তু কবি-সম্রাট একদিন তাকে সম্রাট কবি বলে সম্বোধন করবেই। শিশিরকুমার এক অসফল ব্যবসায়ী। কিন্তু এক সফল শিল্পী। সে আসন থেকে কেউ তাঁকে কোনদিন নামাতে পারবে না।

নানা কথা হতে লাগল। শিশিরবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে অবশেষে বললেন—তোমার কথাই ঠিক মনে হচ্ছে জিতেন।

কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম—কেন? কোন্ হেতু?

বিষণ্ণ অথচ প্রসন্ন হাসি হেসে শিশিরবাবু বললেন—নইলে এ কি করে সম্ভব যে আমি শিশির ভাদুড়ীর কাজ চাচ্ছি, অথচ কাজ পাচ্ছি না? কার্যক্ষম আছি তবুও? এই জিনিসটা যে জীবনে কখনো ঘটবে, তা ভাবতে পারিনি।

জিজ্ঞেস করলাম—কাজ চেয়েও কাজ পাচ্ছেন না কেন?

শিশিরবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—কলকাতায় চারশো টাকা কলকাতার

বাইরে ছয়শো টাকা। এই রেট রেখেছি। এই টাকাটা কেউ দিতে পারছে না বোধ হয়। নইলে কাজ পাচ্ছি না কেন?

প্রশ্ন করলাম—রেট কমান না কেন?

তাঁর মুখের সেই বিস্ময় আমি ভুলব না? যেন বক্ষের পিঞ্জরে গুলি প্রবেশ করেছে। গুলি খাওয়া চিতাবাঘের মত লম্ফ দিয়ে উঠলেন। বলে উঠলেন—কি বলছ কি? আমার একটা মর্যাদা নেই।

এর জবাব আমার কাছে ছিল না।

শিশিরবাবুর সব গেছে। কিন্তু মর্যাদাবোধ যায়নি। লৌকিকতাবোধ যায়নি। মধ্যবিত্তের যা পাগলামী। বিশুদ্ধ ঘিয়ে ভাজা নিমকি খাওয়ানোর মত অবস্থা এখন তাঁর নয়। কিন্তু মধ্যবিত্তের পাগলামীই লৌকিকতা। যেমন পুঁজিবাদীদের পাগলামী যুদ্ধ। তিনি কি করবেন? তিনি অভিজাতের মনস্তত্ত্ব নিয়ে জন্মে নিম্নমধ্যবিত্তের অন্ধকূপে নিমজ্জিত। কিন্তু কিছুতেই পুরাতন অভ্যাস ছাড়তে পারছেন না। এদের মেরুদণ্ড ইস্পাতের। এদের আমরা বুঝতে পারব না। আমরা মেরুদণ্ডহীন, আদর্শহীন, সুবিধাবাদী। আমরা জলের স্রোতে ভেসে চলি। স্রোতের বিরুদ্ধে যাবার শক্তি নেই। সাহস নেই।

আমি শিশিরবাবুকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। অতীতের একটা ভগ্নস্তূপ। কিন্তু পূর্ব গরিমা বিস্মৃত নন। কোণারক দেখতে গিয়েছিলাম একদিন তাঁর সঙ্গে। দেখলাম তিনিও এক অতীতের কোণারক মন্দির। তেমনই এক শিল্পের ভগ্নস্তূপ। একদিনকার নাট্যমন্দিরের রচয়িতা, আজ মঞ্চহীন, গৌরবহীন। অতীতের স্মৃতি মাত্র। যার সব গেছে, শুধু মর্যাদাজ্ঞান যায়নি।

আমি কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না। যুগ-চরিত্রকে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা। তিনি এক যুগ-প্রতিভু, মননশীল ব্যক্তি। তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা ও যুগজিজ্ঞাসা এক। বাঙ্গালীর ভয়াবহ নিষ্ক্রিয় পলায়নী মনোবৃত্তি তাঁর ভেতরেও দেখতে পেলাম। তিনি হারবার মুখে ক্যাপ্টেনের ইনিংস দেখাতে পারলেন না। জীবন-ক্রিকেট খেলায়

তিনি পরাজিত হলেন। তিনি যা হতে পারতেন তা হলেন না। বাঙ্গালীর হাতে কাঁদুনীর ভূমিকা শেষ হতে জানে না। অর্ধেন্দুকুমারের বসতবাড়ী বিক্রয় হয়ে গেল। মৃত্যু হল আশ্রয়দাতার গৃহে। বাঙ্গালী নাট্যশালাকে এখনও প্রমোদভবন বলে দেখছে। জাতীয় সংস্কৃতির মন্দির বলে কল্পনা করে না। নাট্যশালা প্রমোদকুঞ্জ নয়। নাট্য-জগতের ঈশ্বর দর্শককে আড়ম্বর আর বাগাড়ম্বর দিয়ে ভোলাবার দিন চলে গেছে। গ্রীস একদিন নাট্যশালাকে মন্দিরের মর্যাদা দিয়েছিল। তাই গ্রীক নাটক আজও গ্রীসের গর্ব।

শিশিরবাবু একদিন নিজেই লিখেছিলেন "আজ চাই জীবনে বিশ্বাসী, সংগ্রামে বিশ্বাসী, নায়ক নিয়ে লেখা, নতুন নাটক। যোগেশের মত একটুতেই ভেঙ্গে পড়ে, সুদিনে জমিদার সরকারের দেড়শত টাকা মাইনে পেয়েও পিতা কন্যার মৃত্যু কামনা করে, এমন সংসারের মুখ নৈরাশ্যবাদী নায়কের প্রয়োজন আজ নেই। সংগ্রাম করে যে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাকেই এ যুগে নাটকের নায়করূপে চিত্রিত করতে হবে। লেখা কত সহজ। কাজে পরিণত করা কত কঠিন। নাটক সম্বন্ধে লেখা কথাগুলো কি নাট্যালয় সম্বন্ধেও প্রযোজ্য নয়?

অনেক আশা নিয়েই শিশিরবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। নিরাশ হলাম। তাঁর কাছে আসবার আগে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের দোকানে গিয়েছিলাম। আমার 'পরিচয়' বই বিক্রীর হিসেব শিশিরবাবুর নামেই ছিল। সরোজবাবু হিসেব দেখে, কর্মচারীর মারফৎ বললেন সব শিশিরবাবুর লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেছেন।

শিশিরবাবুকে বললাম সেই কথা। তিনি স্বীকার করলেন। ভাবলেশহীন মুখ। সাদা পাথরের মত রক্তশূন্য। ঢোঁক গিলে বললেন—হ্যাঁ, লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়েছিলাম। কি করব? খেয়েছি।

খেয়েছেন! বলছেন কি তিনি? একি কথা তাঁর মুখ থেকে শোনবার

দুর্ভাগ্য আমার হল ? না-না। এতো নেমে যাবেন না শিশিরবাবু। এত নেমে যাবেন না ! কিন্তু অধঃপতন যখন হয় তখন পথটা সাপের পিঠের মত নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। রোধ করা যেন কিছুতেই যায় না। শেষ ধাপ পর্যন্ত গড়িয়ে যেতেই হয়। খেয়েছেন ! স্থূল খাদ্যের এত অভাব হয়েছিল তাঁর ?

আবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। এ কথা যে কোনদিন তাঁর মুখ থেকে আমায় শুনতে হবে, তা আমার অতি বড় দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিনি। যখন তাঁর অতিথি হতাম—বড়দিনের ছুটিতে দশদিন পর্যন্ত থাকতে হয়েছিল তখন রাত্রে খাবার সময় থালায় লুচি দেখে বলেছিলাম—লুচির দরকার কি ? আমি ত রুটিই খেয়ে থাকি।

শিশিরবাবু বললেন—অতিথিকে লুচি ছাড়া আর কিছু দিতে নেই।

এ বিদ্যা তিনি কার কাছে শিখেছিলেন ? তাঁর ভিক্টোরিয়ার মত দেখতে জননীর কাছে। তাই তাঁর তখনও ভিক্টোরীয়ান মানস। বিশুদ্ধ ঘৃতই খাবেন। স্নেহময় পদার্থ নয়। জননীর শেখানো বিদ্যা তিনি জীবনের শেষ দিনেও ভুলতে পারলেন না। আভিজাত্য কথাটার মানে কি ? শুধু কি জন্মের আভিজাত্য ? রুচির আভিজাত্য কি আভিজাত্য নয় ? তাঁর ভাগনে তপনবাবু বলেছিলেন—জানেন, দিদিমার মত মানুষ হয় না। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে, আমাদের বাইরে যাবার উপায় ছিল না। তিনি বলবেন—হ্যাঁ এস। হাতে ছোট এলাচ, লবঙ্গ বা মশলা কিছু দেবেন। আমরা চিবুতে চিবুতে বেরুব। এ ছাড়া আমরা আর কিছু কল্পনাই করতে পারতাম না।

সেই পরিবারের ছেলের মুখে আজ একি কথা শুনছি !

আজ শিশিরবাবুর বিষয় লিখতে গিয়ে আমার এইসব কথাই মনে পড়ছে। শিশিরবাবুকে প্রভাত সূর্যরূপেও দেখলাম। শিশিরবাবুকে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রদীপ্ত প্রতিভায় মধ্য গগনে জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বলতেও দেখলাম। অস্তগামী সূর্যের মত আশাহীন, আনন্দহীন, অবসাদগ্রস্ত, শিশিরকুমারকেও দেখলাম। অবশেষে রাজ্যচ্যুত, সাম্রাজ্যচ্যুত রঙ্গ-

মঞ্চের একদিনকার সম্রাটকেও দেখলাম। তারপর একদিন খবরের কাগজে পড়লাম তিনি জীবননদীর ওপারেই চলে গেছেন। আজ ভাবতে বসি মানুষের জীবনটা সত্যিই কি! মানুষের জীবনে বিশ্বাসের মৃত্যুর চেয়ে বড় মৃত্যু আর কিছুই নেই। মানুষের জীবন মানে বিশ্বাস। কিন্তু বিশ্বাস স্থাপন করব কার ওপর? নিজের ওপর কখনই নয়। শিশিরবাবুর জীবনের উদাহরণ দেখে এই শিক্ষা লাভই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষালাভ।

শিশিরবাবুর বরাহনগরের বাসা থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় নিলাম। কিছু বই তাঁর কাছে অবিক্রীত পড়েছিল। তাও নিলাম। আড়াইশোখানা বই ওঁর কাছে ছিল। কিন্তু নিতে গিয়ে দেখি দেড়শখানা আছে। তথাস্তু। যাবার সময় কোন রকম প্রশ্ন করতে প্রবৃত্তি হল না। সমস্ত কিছুই শোভনতার সঙ্গে শেষ করতে আমি কৃতসংকল্প। মুখের একটি পেশীও নড়ল না। গুরুদাসবাবুর দোকানে একটা চিঠি দিয়ে দিলেন শিশিরবাবু। পকেটে পুরে নিলাম চিঠিটা। শিশিরবাবু দোতালা থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন। এই চিঠিটা লিখে দিতে। লিখে দেবার পর গম্ভীর মুখে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। যা পূর্বে তিনি কখনও করেন নি। আমি ভাবতে লাগলাম এর কারণ কি? একি নিবেদিতার কাছে বিবেকানন্দের আধখানা রুটি পাঠিয়ে দেবার মত? শিশিরবাবু কি বুঝতে পেরেছিলেন এই শেষ সাক্ষাৎ! সম্ভব।

সত্যিই সেই শেষ সাক্ষাৎ। তারপর তাঁকে আর চর্মচক্ষে দেখিনি। মর্মনেত্রে প্রতিনিয়তই যদিও দেখি।

যেদিন শিশিরবাবু প্রথম আমার হাতে ছাপানো বই তুলে দিয়ে বলেছিলেন আজ থেকে তুমি নাট্যকার হলে। কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে আমি সেদিন তাঁকে প্রণামও করেছিলাম। এক নাট্যকার অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিল এক নাট্যাচার্যকে। আজ সেই নাট্যাচার্যও সেই নাট্যকার সমান অসহায়। কেউ কিছুই করতে পারল না।

কেউ কিছুই করতে পারেও না।

বোধহয় এই জ্ঞানটা পাবার জন্যেই নাট্যাচার্যের বাসা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে হয়েছিল। মানুষ কত অসহায়। মানুষ কত অকিঞ্চিৎকর। আমার সঙ্গে শিশিরবাবুর সম্পর্কের এই শেষ দৃশ্যটি বোধহয় সবচেয়ে করুণ।

ঈশ্বর কথাটা নিয়ে আমরা অনেক পিং পিং খেলেছি। তবু হদিস পাইনি। এইবার যেন পেলাম স্থূলরূপে। হঠাৎ এলো একটি ছাতা। ভৃত্য বয়ে এনেছে একটি ছাতা। পেছন ফিরে দেখলাম, শিশির ভ্রাতা ভবানীকুমার দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে হাসলাম। তিনিও হাস্য করলেন। কেউ কোন কথা বলল না। কিন্তু অনেক কথাই বলা হয়ে গেল শুধু নীরবতার মধ্য দিয়েই।

ভবানীবাবু একদিন আমার নাটকে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চিরকুমার, অকলঙ্ক চরিত্র, এই যুবকটির সঙ্গে আমার বিলক্ষণ হৃদ্যতা জন্মে গিয়েছিল। যেমন সুঅভিনীত হয়েছিল তাঁর মহম্মদ আলীর ভূমিকা, তেমনি সুন্দর অভিনয় করলেন বি, টি, রোডের ধারে। এই শেষ দৃশ্যের ভূমিকায়। একজন দাতা, অন্যজন গ্রহীতা। উপলক্ষ্য একটি ছাতা। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দুজনেই নিঃশ্বাস গোপন করলেন। বিধাতা নিঃশব্দে মুচকে একটু হাসলেন।

বাস এসে গেল। ভৃত্যের সাহায্যে বই কখানা তুলে নিলাম বাসে। আমারই মত হতভাগ্য বই ক'খানা। ছাতাটা অপেক্ষমান ভৃত্যের হাতে ফেরৎ দিলাম। বাস ছাড়ল! চেয়ে দেখলাম ভবানীবাবু এক পুরাতন বিবর্ণ অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, চির নবীন এক নতুন পথিকের মতই। সে পথ মানবতার পথ। আর্ট নয়, কালচার নয়, অর্থ নয়, সম্মান, স্বীকৃতি, পারিতোষিক, পুরস্কার নয়, এমন কি মঞ্চের নাটকও নয়। এই না চিরকালের শাশ্বত নাটক। জীবন্ত নাটক। মানবতার স্পর্শে উজ্জ্বল। তাই আজ বিশ বৎসর পরেও ভবানীবাবুর সেই দাঁড়িয়ে থাকা ভুলতে পারিনি। বাস চলতে আরম্ভ

করল। যতক্ষণ বাস চলতে আরম্ভ করল, তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। যতক্ষণ আমি তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম, তিনি হাসতেই থাকলেন। ব্যর্থতার হাসি। সব দিক দিয়েই তিনি ব্যর্থ। জীবনেও ব্যর্থ। পরমায়ুতেও ব্যর্থ। তাঁর টি. বি. হয়েছিল। মাস তিনেক পরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিতও হলেন।

বাস থেকে নামলাম একেবারে ডি, এম, লাইব্রেরীর সামনে। ৪২ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। মালিক গোপালবাবু মুখ টিপে হেসে বইগুলি রাখতে স্বীকৃত হলেন। শিশিরবাবুর স্নেহধন্য নাট্যকারের দুর্দশা দেখে হয়ত মনে মনে খুশীই হলেন। কারণ, তিনি শিশিরবাবুর প্রতি সদয় ছিলেন না। শিশরবাবুও বলেছিলেন—ডি, এম লাইব্রেরীর ওই লোকটির সম্বন্ধে আমার সীমপ্যাথী একটু ইম্‌পারফেক্ট। গোপালবাবু কমিশন কিন্তু ছাড়লেন না। এক পয়সা কম হলে চলবে না। চল্লিশ পারসেণ্ট চাই। আমার তখন মনের অবস্থা কথা-কাটাকাটি করবার মত নয়। তাতেই রাজী হলাম। বইগুলি তাঁর জিম্মায় রেখে একটা রসিদ নিয়ে, ফুটপাথে নামলাম।—আঃ বাঁচলাম।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। আবার ওকালতীতে মন দিলাম। দিতে বাধ্য হলাম। I.P.T.Aর President হয়েছিলাম। "পরিচয়" হিন্দীতে অনূদিত হল। কবি কনৈহেয়াজী করলেন! টিকিট করে I.P.T.Aর সাহায্যে অভিনয়ও হল। বই ছাপালাম নিজের খরচে। আমার কাজ আমি নিঃশব্দে করে যাচ্ছি। সাহিত্য সাধনাও।

ভবানীবাবুর মৃত্যুতে শোক জানিয়ে শিশিরবাবুকে একটা চিঠি দিলাম। এই রকম জবাব এল :—

278 B. T. Road
Calcutta-36
6. 3. 58

জিতেন,

তোমার চিঠি সময় মত পেয়েছি। জীবনের প্রান্তে

এসে নানাদিক থেকে আঘাত পাচ্ছি। তবে এই আঘাতটা একটু বেশী তীব্র হয়েছে।

ইতি

দাদা

'পদ্মভূষণ' প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে একটা চিঠি দিলাম। তিনি জবাবে তার উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না। এত তুচ্ছ তাঁর কাছে এই 'পদ্মভূষণ' লাভ ও তৎক্ষণাৎ পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান। কলালক্ষ্মী যাঁকে শ্রেষ্ঠ ভূষণে ভূষিত করেছেন, তাঁর আর পদ্মের দ্বারা ভূষিত হবার কি প্রয়োজন আছে? নাট্যাচার্য শিশিরকুমার চিরদিন নাট্যাচার্য শিশিরকুমারই থাকবেন। 'পদ্মভূষণ' স্বীকার করায় তাঁর মর্যাদা বাড়ত না। শিশিরবাবুর আমাকে লেখা শেষ চিঠি। তাও তুলে দিচ্ছি।

278 B. T. Road
Calcutta-36
21. 3. 59

জিতেন,

তোমার চিঠি পেয়েছি। অত্যন্ত অসুস্থ তাই উত্তর দিতে দেরী হল। তোমাকে চিরদিনই স্নেহের সঙ্গে স্মরণ করি। তবে তোমার কার্যকলাপ বড়ই inconsequential। তার জন্যে মাঝে মাঝে ব্যথা পাই।

তোমার মঙ্গল হোক। আশা করি তুমি ও তোমার পরিবারের সকলে ভাল আছো।

পত্র লিখলে খুসীই হবো।

ইতি

চিরকল্যাণকামী

দাদা

আমার সেই চিরকল্যাণকামী দাদা আর নেই। সত্যিই আমার কাজকর্ম বড় inconsequential। তাই আমি জীবনে করার মত

কিছুই করতে পারলাম না। তাঁকে পত্র লিখলে খুসী হতেন লিখেছেন। কিন্তু কোথায় তাঁকে পত্র দেবো কোন ঠিকানায়? রেডিওর মারফৎ খবর পেলাম ৩০শে জুন ১৯৫৯ রাত্রে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

জয় হোক মৃত্যুর। সক্রেটিস্ বলছেন—মৃত্যুই জীবনের ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ। কর্মহীন জীবন নরকতুল্য। শিশিরকুমারের মৃত্যু তাঁকে সুন্দরতর করে তুলল। সমস্ত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অবমাননার হাত থেকে মুক্তি দিল। তিনি যেন বাঁচলেন। দেশও যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। তাঁকে নিয়ে কি যে করবে, তা যেন বুঝে উঠতে পারছিল না'। তারাশঙ্কর তাঁর শোকসভায় সভাপতিত্ব করতে করতেও তাঁকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিতে ছাড়েন নি। তিনি নাকি অসংযমী। অপদার্থ।

খবরের কাগজে দেখলাম বড় বড় অক্ষরে ছাপা নাট্যাধিনায়কের পরলোক গমন। তাঁকে নাটাচার্য বলেই জানতাম। এখন নতুন নামকরণ দেখলাম। কথাটা বোধহয় রবীন্দ্রনাথই প্রথমে ব্যবহার করে ছিলেন। এতদিনে প্রচার হয়নি কথাটার। এইবার প্রচার শুরু হল। জীবদ্দশায় বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নাট্যাধিনায়ককে একটা পোড়ো বাড়ীতে একা একা বসে বসে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাসই ফেলতে হয়েছিল। এখন দেখছি তাঁর জন্য জনসাধারণের ব্যথা উথলে উঠেছে। সত্যই glory is the sunlight of the dead। মঞ্চহারা শিশিরকুমার জীবনের শেষ তিন বৎসর, অন্ধকারেই আবৃত ছিলেন। এইবার সম্মান, স্বীকৃতি, মর্যাদার সূর্যালোক প্রকাশিত হল। অগৌরবের মধ্যে মৃত শিশিরকুমার, মৃত্যুর সুশীতল সলিল স্পর্শে যেন সমস্ত গ্লানি অতিক্রম করে ধৌত হয়ে উঠলেন। খবরের কাগজে তাঁর অন্তিম শয্যার চিত্রও দেখলাম। নির্মীলিত নাটাচার্য। দু'পাশে রজনীগন্ধার স্তবক। সবই ঠিক আছে। চোখের সামনের চশমাটি শুধু নেই। তার পরিচিত কালোফ্রেমের চশমা। মুখ বন্ধ। কলকলস্রোতে ভাষা আর নির্গত হচ্ছে না। মনঃপীড়ায় অভিভূত হয়ে গেলাম। কিন্তু কি করতে পারি? কালের

গতি আটকিয়ে রাখতে পারি কি? যা অবশ্যম্ভাবী তা হবেই। দেখছি নাট্যাচার্য শুয়ে আছেন চুপ করে। সব কথা শেষ। সব আক্ষেপ, অনুযোগ, অভিযোগ, শেষ। সব কাজও শেষ। জাতীয় নাট্যশালা গড়ার স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেল। আজও সে স্বপ্ন আকার নিল না।

একদিন "লবে"র কণ্ঠস্বর শুনে রামরূপী শিশিরকুমার "কার কণ্ঠস্বর। ওরে! কার? কার? কার কণ্ঠস্বর!" বলে নেপথ্যে থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন। আমরা আর শিশির ভাদুড়ীর সেই কণ্ঠস্বর শুনে "কার কণ্ঠস্বর" বলে চেঁচিয়ে উঠব না। তাঁর কণ্ঠস্বর হঠাৎ শুনলে চমকিয়ে ওঠার মতই ছিল। ঈশ্বর তাঁকে কণ্ঠস্বর দিয়েছিলেন। ওরকম কণ্ঠস্বর বাঙ্গালীর কণ্ঠে পূর্বে শুনিনি। পরেও শুনিনি। ভবিষ্যতেও বোধহয় শুনব না। সেই অসামান্য কণ্ঠস্বর এবার চিরকালের জন্যে নীরব হল। সেই অসামান্য laryux ভস্মে পরিণত হয়ে গেল। অতি ক্ষণস্থায়ী laryux। কালের অতি বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে তার কতটুকু স্থান? কিছুই নয়।

নাট্যাচার্যের পালা সাঙ্গ হল। তিনি চলে গেলেন। মনে পড়তে লাগল সাতাশ বছর আগে তিনি যখন পুরীতে এসেছিলেন। স্টেশনে গিয়ে আমরা তাঁর গলায় মালা পরিয়ে ছিলাম। এখন তাঁর মৃতদেহকে জনসাধারণ মালা পরাচ্ছে। সেই উন্নত মস্তক আজ শয্যাশায়ী, প্রাণহীন। নিমীলিত চক্ষু। সব প্রশ্নের ওপারে। সব নিন্দা-খ্যাতির পরপারে। মনে পড়তে লাগল নাট্যমন্দিরের "সীতা" অভিনয়। পঁয়ত্রিশ বছর আগে। রামের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়। মনে পড়তে লাগল "শেষ রক্ষার" চন্দ্রবাবু, "ষোড়শীর" জীবানন্দ। অজস্র ঐতিহাসিক চরিত্রের অভিনয়। নাদিরশাহ, সাহ্‌জাহাঁ, আলমগীর, জাহান্দার শা, চাণক্য। সব ভূমিকা শেষ।

এখন শিশিরকুমারের ভূমিকায় অন্তিম দৃশ্যের অভিনয় করছেন তিনি। আর নিমচাঁদের ফচ্‌কেমী মাতলামী নয়। যোগেশের সেই "সাজানো

বাগান শুকিয়ে গেল” বলে ঔদাসীন্য দেখানো নেই। এখন তিনি সত্যিই অসহায়। সকলের বোঝামাত্র। এতদিন যিনি তিনটে পরিবারের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আজ তিনি নিজেই বোঝা হয়ে পড়েছেন। হৃদস্পন্দনহীন মৃতদেহ। যিনি ছিলেন নাট্যজগতের focile princeps, যিনি ছিলেন Dayen of his profession, তিনি এখন সকলের কৃপার পাত্র। কোনরকম আড়ম্বর না করে তাঁর দেহ বরাহনগরের মহাশ্মশানে ভস্মীভূত করা হল। যেখানে পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়ে গেছে ঠাকুর রামকৃষ্ণের, স্বামী বিবেকানন্দের, নটভৈরব গিরিশচন্দ্রের। তাঁর এইরকমই নির্দেশ ছিল। পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতেই মিলিয়ে যায়। থাকে শুধু স্মৃতি, কীর্তি, শিল্প রচনা, আর্ট। লেখা। তিনি যদি বেশ কিছু লিখে যেতে পারতেন।

মনটা ভারী হয়ে গেল। সারাদিন ভারী হয়েই রইল। প্রভাতে বেড়াতে বেরুলাম। তখনো সূর্যোদয় হয়নি। আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। একটু পরে সূর্য উঠল। নবীন সূর্য টকটকে লাল। নির্ভুল গোলাকার। যেন কিছুই হয়নি। প্রতিদিনের মত আর একটি নতুন দিন শুরু হল। এই সূর্য প্রতিদিন উঠছে। প্রতিদিন উঠবে। যতদিন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে পৃথিবী, ততদিন উঠবে। তারপর একদিন এমন দিনও আসতে পারে যেদিন সূর্যও নিভে যাবে। তারপর কি থাকবে? থাকবে এক মহাশূন্য। নিঃসীম অন্ধকার। ভারতের ঋষি ধ্যাননেত্রে তা অবলোকন করেছিলেন। বলছেন --

> ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকং
> নেমাঃ বিদ্যুতোভান্তি, কুতোঽয়মগ্নি ;

তাহলে আছে কি সেখানে?

> ত্বমেবভান্তং, অনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা, সর্বমিদং বিভাতি।

ত্বং-টা কি? তস্যটা কার? একেই আমি বলি Third Power। মানবজীবনের চিরসত্যটা কি? ত্যাগ। আদর্শ। শিশিকুমারের জীবন

আদর্শবাদীর জীবনই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ আদর্শবাদী। তিনি বেঁচে থাকলেন না। কেই বা থাকে? কিন্তু তাঁর আদর্শ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কি সে আদর্শ? নাট্যকারের উন্নয়ন। রঙ্গমঞ্চের ঔৎকর্ষ। তিনি জীবনে খুঁজেছিলেন সফলতা। আংশিক সফলতা পেলো। কিন্তু চির সফলতা পেলেন না। চির সফলতা কি? শান্তি। সে জিনিস তাঁর অপ্রাপ্তই রয়ে গেল। তিনি আজীবন অশান্তির অনলেই দগ্ধ হলেন। একদিন একুশ বৎসর বয়সে যে জীবনসঙ্গিনী তাঁর সঙ্গে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধা হলেন, তিনি puerperal insanityতে এক বৎসরের শিশু অশোককে রেখেই আত্মহত্যা করলেন। তখন সাতাশ বছর মাত্র বয়স শিশিরকুমারের। জীবনের উষালগ্নে তাঁর স্ত্রী, উষা, আগ্রার রায়বাহাদুরের দুহিতা, তাঁর সুখের নীড় ভেঙ্গে দিলেন। সে নীড় তিনি আর বাঁধতে পারলেন না। সতীহারা দেবাদিদেবের মত উন্মত্ত হয়ে তাণ্ডবনৃত্য করতে লাগলেন। কোন বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে অতীতের স্মৃতিচিহ্নকে কেটে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। তিনি অ্যালকোহলকে পরিত্যাগ করতে পারলেন। অশান্তিকে ছাড়িয়ে উঠতে পারলেন না। এক পথভ্রান্ত পথিক। এক অনুশোচনাময় জীবন। এক কাণ্ডারীহীন তরী। এক ধর্মহীন জীবন।

আমি একদিন কথাচ্ছলে শিশিরবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—গীতা পড়েছেন কি?

তিনি অম্লানবদনে বলেছিলেন—না পড়িনি।

গলায় অনুতাপের সুর বিন্দুমাত্র ছিল না। এমন কি যেন ঠিক কাজই করেছি, এই ভাবটাই প্রচ্ছন্ন ছিল। বলতে চাচ্ছিলেন যেন—আমি ইংরিজী সাহিত্যের অধ্যাপক। স্পিনোজা, প্লেটো, নীৎসে, সোপেন-হাওয়ার পড়েছি। Decartes, Herbart Spencer, John Stuart Mill পড়েছি। Shakespeare Milton, Browning, Wordsworth পড়েছি। আমি তোমার গীতার ধার ধারতে গেলাম কি দুঃখে? কিন্তু তাঁর চেয়েও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের

আরো বেশী পণ্ডিত শ্রীঅরবিন্দ, গীতা গীতা করে প্রাণ বের করে দিলেন কেন? জেলে বসেও গীতা আর উপনিষদ পড়ছেন। অত বড় সাহেব যদি অত বড় গীতাভক্ত হতে পারলেন, তাহলে শিশির ভাছড়ীর হতে কি বাধা ছিল? এমার্সন অথবা থোরো, গীতা গীতা করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন কেন? আজ শিশিরকুমার ও শ্রীঅরবিন্দের শেষ জীবন যখন দেখি, তখন কি অদ্ভুত পার্থক্য দেখতে পাই। একজন শান্ত সমাহিতচিত্তে ধরাধাম ত্যাগ করছেন। আর একজন বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেন। কণ্ঠে শুধু শ্লেষ, বিদ্রূপ, আর অসহযোগের বাণী। শ্রমবিমুখতার চূড়ান্ত। অথচ দুজনেই প্রায় সমান প্রতিভাশালী। একজনের ছিল আত্মসাধনার দ্বারা আত্মপরিচয় লাভ। আর একজনের ছিল সন্দেহ আর অবিশ্বাস। তীব্র জ্বালা।

এই দুটো জীবন দেখেও আমি যদি বুঝতে না পারি সত্য কোথায়, তাহলে বৃথা আমি সত্য অন্বেষণ করছি। সত্য কোন বইয়ের পৃষ্ঠায় লুকোনো নেই। সত্য রয়েছে আত্মোপলব্ধির চেষ্টায়। কে আমি? কি চাই আমি? কিসে আমার সার্থকতা? প্রথমে তার সম্বন্ধে দ্বিধাহীন হওয়া। তারপর অবিচলিত নিষ্ঠায় সেই পথে অগ্রসর হওয়া। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। অন্য কোন গতি নেই।

আমার জীবনে শিশির ভাছড়ীর মৃত্যুরও প্রয়োজন ছিল। নইলে আমি চোখ মেলে চারদিক চেয়ে দেখতে পারতাম না। একটা মানুষের ওপর নির্ভর করা যে কত বড় ভুল, তা যেন আমি ভাল করে বুঝতে পারলাম। সংসার বিধাতা যেন আমায় বলছেন—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে। কিন্তু কোথায় সেই স্থান? তমসাচ্ছন্ন মন বলছে শিশির বিহীন কলকাতা অন্ধকার হয়ে গেল যে। জাগ্রত মন বলছে, তাই বলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল কি?

চারটে রাস্তা আছে পার্কে পৌঁছবার। একটা যদি বন্ধ হয়েই যায়, তিনটে খোলা আছে। চেষ্টা করে দেখতে হবে। অন্যান্য পথও।

কিন্তু পথের সন্ধান কে দেবে? তৃতীয় শক্তি। আমি ছাড়া আর একটা বড় শক্তি। সেই শক্তিরই পরিচয় পেলাম। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম আমার শক্তিই বুঝি সব। সে ভুল ভেঙ্গে পড়তে বেশী দেরী হল না।

শিশিরবাবুর মৃত্যুর পর তিনটি জ্ঞান আমার লাভ হল। প্রথম, শিশির ভাদুড়ী সর্বশক্তিমান নন। দ্বিতীয়, বাংলাদেশই ভারতবর্ষ নয়। তৃতীয়, ইংরেজ তার ঘটি-বাটী নিয়ে সরে পড়েছে সত্যিই।

শিশিরকুমারের মৃত্যু আমার জীবনে প্রয়োজনীয় ছিল। যেমন প্রয়োজন ছিল, রামকৃষ্ণের মৃত্যু বিবেকানন্দের জীবনে। আমি স্বাধীনভাবে নিজের পথে চলবার সুযোগ পেলাম। কিভাবে তাই বলছি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আমার নাটক "এক অধ্যায়" রেডিয়োতে প্রচারিত করেছিলেন। আমি বাধ্য হয়ে সম্মত হয়েছিলাম। কারণ এছাড়া আর অন্য গতি ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কলকাতায় প্রচারিত হবার পর "এক অধ্যায়", অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে প্রচারিত হবার জন্যে মনোনীত হল। কে করল আমি জানি না। কিন্তু এটাকে কোন অদৃশ্য শক্তি দ্বারা আমাকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত বলেই আমি মনে করলাম। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ ছাড়িয়েও যেতে হবে। রাজধানীতে।

দিল্লীতে অল-ইণ্ডিয়া-রেডিয়োর ডিরেক্টর-জেনারেল তখন ছিলেন জে-সি-মাথুর, আই-সি-এস। তিনি নামী হিন্দী সাহিত্যিক। নাট্যকারও। Ministry of Information & Broadcasting-এর Publications Divisions-এর Indian Drama Section-এ ১৯৫৭ সালের নভেম্বর সংখ্যায় "হিন্দী ড্রামা এবং থিয়েটর" নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমার 'পরিচয়' নাটক হিন্দীতে অনূদিত হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন কবি কষ্টেয়াজী। তিনি মাথুর সাহেবকে এক কপি উপহারও দিয়েছিলেন। তিনি পড়েছিলেন তাঁর ভাল লেগেছিল। আমায় একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—আপনি

ছাপরার মত একটা ছোট জায়গায় থেকে ওরকম নাটক লিখতে পারলেন কি করে? "এক অধ্যায়" বত্রিশটা রেডিও স্টেশন থেকে তেরোটা ভাষায় অনূদিত হয়ে একসঙ্গে প্রচারিত হল। কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করলাম। দিল্লীতে ড্রামা সেমিনারে নিমন্ত্রিত হলাম। দিল্লী গেলাম। পনেরো দিন রইলাম।

এখান থেকে অ্যাড্‌ভোকেট বন্ধু বিশ্বনাথ মিশ্র চিঠি দিলেন। দিল্লীর এম. পি, কুলন সিং-এর কাছে। তাঁর ওখানেই রইলাম। খাওয়া-দাওয়া ক্যান্টিন অথবা রেস্তোরাঁয় করতে লাগলাম। প্রত্যেক দিন পার্লামেণ্ট স্ট্রীটে 'আকাশবাণী' ভবনে যেতে হত। একটা নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সামনে তৈরী হত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ড্রামা প্রোডিউসাররা এসেছিলেন। সকলের সামনে নাটকের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা হত, আমি হিন্দী বলতে পারতাম। ইংরিজী বলতে পারতাম। আমার নাটক কলকাতার পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। নাট্যাচার্য অভিনয় করেছেন। অতএব আমার মর্যাদা কিছু ছিলই। নাট্যালোচনায় আমি পূর্ণমাত্রায় অংশগ্রহণও করতাম।

একদিন B. S. Anand লেকচার দিলেন। একদিন P. L. Despande। B. S. Anand একটি ভাল কথা বললেন—Tragedy, enormous। Melodrama, Sickens। আর একটা কথাও বললেন - শ্রোতারা অন্ধ। অতএব blinbness necessiater clear characters & clear story। no sub plot। আর একটা কথাও বললেন—। রেডিও নাটক হবে Portrayal of a short aspect of life। চরিত্র সংখ্যাও কম হওয়া চাই। আলো এবং পোষাকের ঝঞ্ঝাট নেই। আছে Wisdom of space & time। দেশপাণ্ডে বললেন—Technique is that, there is no technique. Script suggests technique. We are entertainers first. Our business is to please the

listner. আর একটা কথাও বললেন—Music is the greatest aid to create atmosphere. It is also the greatest factor to mar the effect. এমন কি "no music is better than wrong music." ২৪।৮।৬০ তারিখে Dr Menon লেকচার দিলেন। তিনি কেবল Val Gielgud আর B. B. C. Play কপচালেন।

আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু রেডিও স্টেশন নয়, নেতাদেরও দর্শন। শুরু করলাম নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। গুণীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। কিন্তু কোথাও তৃপ্তি পেলাম না। এঁরাই স্বাধীন ভারতের কর্ণধার। এঁরা তরী চালাতে পারবেন বলে মনে হল না। সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অপরের দিকে তাকাবার সময় কারো নেই। ইচ্ছাও নেই। শিক্ষাও নেই।

পার্লামেন্টে গেলাম। অনেক কষ্টে প্রবেশ করতে সমর্থ হলাম। অতিরিক্ত রকম কড়াকড়ি। এতটা না হলেই চলে। এত লোকজন চাপরাশী পেয়াদা আছে কিসের জন্যে? গিজ্ গিজ্ করছে শুধু প্রহরী, পাহারা, আর সিকউরিটি পুলিশ। উর্দি পরা, অথবা ছদ্মবেশ। নেহেরুজীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখবার ইচ্ছে ছিল। দেখি, ইনি সিংহাসন পেয়ে রাজার মত আচরণ করেন কিনা।

দেখলাম, অনুকরণ মাত্রই সার। ইংরেজদের মনে-প্রাণে অনুকরণ করে চলেছেন। পরেছেন কিন্তু দেশী পোষাক। সেটা ওঁর ছদ্মবেশ। ভারতীয় মনোবৃত্তি ওঁর মোটেই নেই। যদিও ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, ঐতিহ্য, ভূগোল, সম্বন্ধে লেখেন। বলেন আরও বেশী। নিজেকে সোস্যালিষ্ট বলেন। কিন্তু সমাজতন্ত্র ওঁর ত্রিসীমানায় নেই। পুরোপুরি "জার" একটি। সুন্দর-শোভিত জার। ময়ুরের পোষাক পরা বায়স। গ্লাডষ্টোন্‌কে নকল করে দুই হাতে ফাইল নিজে বয়ে নিয়ে গট্ গট্ করে হলে ঢুকছেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দেশের জন্য ওঁর কোন চিন্তা নেই। নিজের গদীটি বজায় থাকলেই হল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা

থাকলেই হল।

ক্যাবিনেট মিনিষ্টার কেশকারকে দেখলাম। Information and Broadcasting-এর মন্ত্রী। তাঁকে হিন্দী 'পরিচয়' উপহার দিলাম। তাঁর সঙ্গে পার্লামেণ্ট ভবনে ছবি তোলালাম। কিন্তু বৃথা হল। তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়া শব্দ পেলাম না। কোন রকম উৎসাহও নয়। কেন যে তাঁকে মন্ত্রী করা হল তা আমার বোধগম্য হল না।

ছ'নম্বর ইয়র্ক প্লেসে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী হুয়ায়ুন কবীরের বাড়ীতে গেলাম। তিনি বাঙ্গালী। কলকাতায় অধ্যাপক ছিলেন। তাঁকে বাংলা 'পরিচয়' উপহার দিলাম। তিনি মুসলমান। হিন্দু মেয়ে শান্তিদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই আশা করেছিলাম। কারণ 'পরিচয়' নাটকটা হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্নকে ভিত্তি করেই লেখা। কিন্তু কোন লাভই হল না। ইনি নাকি সংস্কৃতির মন্ত্রী। এঁর কি গুণ ছিল জানি না। আমি কোন গুণেরই পরিচয় পেলাম না।

লোকসভার সদস্য এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, অতুল্য ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলাম। তাঁর বিরাট শরীর। মুখে বিরাট সিগার। সালটা ছিল ১৯৬০। তখন আসামে ভাষা নিয়ে দাঙ্গা চলছে। বিহারে আমাদের প্রতিও অবাঙ্গালীদের প্রচণ্ড ক্ষোভ। কলকাতায় বিহারীদের সঙ্গে নাকি বাঙ্গালীরা অসদাচরণ করেছিল। সে সম্বন্ধে সামান্য আশঙ্কা জানাতেই অতুল্যবাবু একেবারেই হেসে উড়িয়ে দিলেন! বললেন—কিছুই হবে না। আপনাদের কিছুই ভাবতে হবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যান।

তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হল ইনি রাজনীতি-বিশারদ মোটেই নন। অন্য কিছু বিশারদ হলেও হতে পারেন। এমন কি কথাবার্তায় সংযমও নেই। শালীনতাও নেই। এঁকে কেউ যেন পথ থেকে তুলে এনে রাজগদীতে বসিয়ে দিয়েছে। দ্বারপাল করলেই হয়ত বেশী ভাল হত।

নিরাশ হয়ে তাঁর বাড়ী ১৯ নম্বর ক্যানিং লেন ছেড়ে ১১ নম্বরে ঢুকলাম। রামধারী সিং-এর বাড়ী। রাষ্ট্র কবি। "দিন কর"। পার্লামেণ্টের

মনোনীত সভ্য। তাঁর বাড়ীতে গেলাম। সুন্দর চেহারা। দীর্ঘকায়। গৌরবর্ণ। বড় বড় চোখ। ছিলেন ডিষ্টিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার। হয়েছেন রাষ্ট্র কবি। দিল্লীর মসনদে সসম্মানে সমাসীন। ভাবলাম, শিল্পীর কাছে হবেই।

তাঁকে হিন্দী 'পরিচয়' উপহার দিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! তাঁর মুখে-চোখে কোন ভাবানুভূতি নেই।

তিনি ভাল বাংলা জানেন। তখন খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন বই অনুবাদ করছিলেন। তিনি পরে "উর্বশী" লিখে "জ্ঞানপীঠ" পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রেরণা কোথায় তা বোঝা শক্ত নয়।

ভাবলুম, বাঙ্গালী লেখক যে ভারতীয় হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে সেটা বাঙ্গালীদের কাছ থেকে না হোক, অবাঙ্গালী শিল্পীর কাছ থেকে হয়ত উৎসাহ পাবে। কিন্তু তাঁর সময় নেই। রবীন্দ্র কাব্য অনুবাদে ব্যস্ত। তিনি বিহারী। ভূমিহার। অবশ্য ঝুলন সিং ও বিশ্বনাথ মিশিরও তাই। ভূমিহার রাষ্ট্রকবি হলেও হয়ত একটু চারদিক চেয়ে দেখবে আশা করেছিলাম। কিন্তু নিরাশ হলাম। অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় নিলাম।

কলকাতায় এক কমরেড দেখেছিলাম, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। দিল্লীতে আর এক কমরেড দেখলাম। হীরেন মুখার্জী। তাঁকে বাংলা 'পরিচয়' উপহার দিলাম। তিনি মার্জ্জিতরুচি। স্থিতধী। বুদ্ধিজীবি। প্রাক্তন অধ্যাপক। আমার বিচিত্র-জীবন-সংঘর্ষের কথা বললাম। ভাবলাম, তাঁর লাল রক্ত বুঝি নেচে উঠবে। কিন্তু তিনিও যেন পত্রপাঠ বিদায় করতে পারলে বাঁচেন। তবে পরোপকার করা নিশ্চয় তাঁর সহজাত-প্রবৃত্তি। আমার উপকার না করলে তাঁর প্রাণ শান্তি পাচ্ছিল না। ইনি আমায় শেঠ গোবিন্দদাসের দরজা দেখিয়ে দিলেন। যেমন কলকাতায় মনোরঞ্জন বাবু প্রভাত সিংহের দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। মুখে মনোরঞ্জনবাবুরই ভাষা। হুবহু এক। বললেন—বলবেন আমি আপনাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছি। তিনি হিন্দীর প্রেমে গদগদ।

আপনিও দেখছি হিন্দীভক্ত। আপনাদের মিলবে ভাল। আপনার ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থা তিনিই আমার চেয়ে ভাল নির্ধারিত করে দিতে পারবেন, আশাকরি। বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে শুদ্ধ উচ্চারণে কথাগুলি উদ্‌গার করলেন তিনি। অক্‌স্‌ফোর্ডের Bodylean লাইব্রেরীতে বসে বসে অনেক বই পড়েছেন? ভুল ছিল না একটুও।

গেলাম শেঠ গোবিন্দদাসের বাড়ী। তেত্রিশ নম্বর ফিরোজ শা রোড। ইনি ধনী লোক। বড় কম্পাউণ্ড ঘেরা বাড়ীতে থাকেন। সাক্ষাৎ পেলাম। শ্যামবর্ণ, স্থূলকায় ব্যক্তি। আমি "পরিচয়" হিন্দী করিয়েছি শুনে আনন্দিত হলেন। নিজের লেখা খান পাঁচ হিন্দী নাটক উপহারও দিলেন। বললেন—বাংলায় অনুবাদ করে দিন। খরচের জন্যে ভাবনা নেই। সে চিন্তা আমার।

পুলকিত হয়ে উঠবার ভাব অভিনয় করে মানে মানে বিদায় নিলাম। সর্বনাশ! সাংঘাতিক জায়গায় এসে পড়েছি। কমরেড চমৎকার জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে নিজের কাজে লাগাতে চায়। গেছি। মাইকেলের ইংরিজী-ইংরিজী করতে করতে যা অবস্থা হয়েছিল, আমারও হিন্দী-হিন্দী করতে করতে তাই অবস্থা হল।

জাতীয় কবি দেখা হয়েই গিয়েছিল। বাকী ছিল জাতীয় নাট্যকার। তিনিও রাজ্য সভার মনোনীত সভ্য। মামা বরেরকর। তাঁরও বাড়ী গেলাম। ১৯১ South Avenue। তাঁকেও আমার বই উপহার দিলাম। তিনি খুব খুসী হলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়। বাঙ্গালীর প্রতি সবিশেষ প্রীতিভাবাপন্ন। বৃদ্ধ লোক। আমার কথা ধৈর্য্য ধরে শুনলেন। পত্র পাঠ বিদায় করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন না। এমন কি এক কাপ চা খাওয়ালেন পর্যন্ত। কারণও ছিল। আমি দিল্লী যাচ্ছি শুনে অন্নদাশঙ্কর রায় এঁর কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি নাট্যকার। আর একজন নাট্যকারকে যদি সাহায্য করতে পারেন। তিনি চিঠি দেখলেন। পড়লেন। হাসলেন। কিছু করার কথা তিনি ভাবতে পর্যন্ত পারলেন না।

বলা ত দূরের কথা। সবই দিল্লীর লাড্ডু। যেমন মোগল আমলে ছিল, আজও তেমনিই আছে। যে খেয়েছে সেও পস্তিয়েছে, যে না খেয়েছে, সেও তেমনিই পস্তিয়েছে।

একজন মহিলা কমরেডও দেখলাম—রেণু চক্রবর্তী। লোকসভার সভ্য। বিধানচন্দ্র রায়ের ভাইঝি। কলকাতা থেকে নির্বাচিতা। তিনি অতিরিক্ত ব্যস্ত। লোকজন আসছেই তাঁর ২১৫ নম্বর নর্থ অ্যাভিনিউ-এর বাসায়। আমি বাইরের ঘরে বসে রইলাম। ভেতরের ঘরে তিনি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গোপনীয় কথা বলছেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্বামী আমায় এক কাপ চা এনে দিলেন। দিল্লীতে এম পির বাড়ীতে বসে চা খেতে পাওয়া অপরিসীম সৌভাগ্য। সে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বুঝলাম সাহেবরা চলে গেলে কি হয়. এখন মোসাহেবদের রাজত্ব চলছে। একথা আজ আমার স্বীকার করতে ভয় নেই যে সাহেবরা উৎকৃষ্টতর জীব ছিল; মোসাহেবী করে মন্ত্রীত্ব লাভ হতে পারে। এমন কি সেণ্ট্রাল ক্যাবিনেটেরও মন্ত্রীত্ব। কিন্তু দেশের তাতে কি এলো গেলো। রেণু চক্রবর্তীর চোয়ালের হাড়টা বিধানবাবুর মতই চওড়া। কিন্তু তিনি নির্বাক শ্রোতার ভূমিকা অভিনয় করে গেলেন মাত্র।

একমাত্র পার্থক্য দেখলাম কমরেড এস্ এম্ ব্যানার্জীকে। তিনিও পার্লামেন্টের মেম্বার। দর্শক হিসেবেও পার্লামেন্টে ঢোকা এত গণ্ডগোলের ব্যাপার যে ঘাম ছুটে যায় শরীর থেকে। দরজায় ঢুকেও বাধা। বাধার পর বাধা। তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে পাঠককে উত্যক্ত করতে চাই না। ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝতে পারবো। এমনি এক বাধা প্রাপ্ত হয়ে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এস্ এম্ ব্যানার্জী এসে উদ্ধার করলেন। গায়ে পড়ে এগিয়ে এলেন। কার্ডে লিখে দিলেন তিনিই আমাকে recommend করছেন। তিনি যদি আমার বিপদ দেখে গম্ভীরভাবে পাশ কাটিয়েই চলে যেতেন, আমি কিছু মনে করতাম না। দিল্লীর দস্তুরই এই। রাজকীয় গাম্ভীর্য

যত্র তত্র। কিন্তু দেখলাম এস্ এম্ ব্যানার্জী মানুষ হিসেবে সকলের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি মানুষ বটেন।

এখানে যদি আমি একজন বাঙ্গালী সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করার কথা লিখি অপ্রাসঙ্গিক হবে কি? হয়ত হবে। তবু ১৬এ ফিরোজ শা রোডে চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের দরজায় করাঘাত না করে থাকতে পারলাম না। তিনি অতি সুশ্রী ভদ্রলোক। যৎপরোনাস্তি পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর ভাব দেখে মনে হল তিনি বলতে চাচ্ছেন, তাঁর কাছে আমি বোধহয় পথ ভুলেই এসে পড়েছি।

শুধু চুনো পুঁটি নন, বাঘ সিংহীদের সঙ্গেও দেখা করেছি। রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জওহরলাল নেহরু। একজন প্রধান মন্ত্রী। আর একজন রাষ্ট্রপতি। ১৯৬০ সালে এঁরাই ছিলেন ভারত-ভাগ্য-বিধাতা। অতএব এঁদের কথা একটু বিস্তৃত ভাবেই বলা দরকার।

আমাদের সহর থেকে পার্লামেণ্ট সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজেন্দ্র সিং। পি-এস্-পির প্রতিনিধি। তরুণ যুবক। দীর্ঘকায়। একহারা শরীর। জাতে রাজপুত। ইকনমিক্সে এম এ পাশ। মুখে কালো গোঁফ দাড়ী। নম্র বিনয়ী যুবক। অধুনা মৃত। তাঁকে ধরলাম। নেহেরুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে। তার প্রতিক্রিয়া দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দিল্লীতে প্রথমটা সকলেই ঠাণ্ডা জল ছিটোয়। Cold water throw করে। কারণ, দিল্লীতে সকলেই যায় স্বার্থের জন্মে।

রাজেন্দ্র সিং যে পার্লামেণ্টের সভ্য, সেই পার্লামেণ্টের লীডার নেহেরুজী। নেহেরুর কাছে ইনি দূরের মানুষ নন। প্রত্যহ-দৃষ্ট লোক একজন। কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাব শুনেই একেবারে আঁতকে উঠলেন। সত্রাসে বললেন—দাদা! যদি বলেন ত ভগবানের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারি। কিন্তু নেহেরুজীর সঙ্গে নয়। অসম্ভব। মাপ করবেন।

কেনরে বাবা? এত অসম্ভব কেন? বাধা কোনখানটায়? রুষ

স্বাধীন হবার পর ত দলে দলে লোক আসত লেনিনের কাছে। তিনি ছিলেন, যাকে বলে, অবারিত দ্বার, কিন্তু নেহেরুজী ত জনসাধারণের কাছ থেকে শক্তি পান নি। পেয়েছেন মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে। গান্ধীচালিত, শক্তি পান, জনসাধারণের কাছ থেকে। সে শুধু নামেই। জনসাধারণের তখন গান্ধীজির প্রতি অটুট বিশ্বাস।

রাজেন্দ্র সিংকে কৌতূহলী হয়ে বললাম—কেন? কেন? এমন কি ব্যাপার যে তিনি ভগবানের চেয়েও দুর্লভ-দর্শন? এমন কি শক্ত কাজ তাঁকে বলা, যা আপনার মত শক্তিধরের পক্ষেও অসম্ভব?

তিনি বললেন, তাঁর এক মিনিটও সময় নেই।

বললাম—মন্ত্রীদের সময় কবে থাকে? তাঁরা ত হলেন Busy without business। তবু তাঁকে সময় করে নিতেই হবে। নইলে প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন কেন? আর তোমাকেও দেখা করিয়েই দিতে হবে। নইলে তোমাকে আমরা ভোট দিয়েছি কেন? পারব না বলবার জন্যে? আচ্ছা, দেশে ফিরে গিয়ে সেই কথাই বলে বেড়াবো। বলব—লঙ্কায় যে যায়, সেই রাবণ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বার আর ভোট পাবার আশা কোরো না।

রাজেন্দ্র সিং আমাকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। বললে—আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে।

চেষ্টা সফল হল, যদিও নেহেরুজী প্রথমটা উড়িয়েই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—বাঙ্গালী নাট্যকার? তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? কেস্কারের কাছে যাক। কবীরের কাছে যাক। রাধাকৃষ্ণণের কাছে যাক। আমার কাছে কেন?

রাজেন্দ্র সিং বললে—সে আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চায়।

নেহেরুজী ক্রমাগত মাথা নাড়ছেন। অবশেষে যখন শুনলেন, শিশির ভাদুড়ী-এর নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, তখন রাজী হলেন। শিশির ভাদুড়ী? যে 'পদ্মভূষণ' প্রত্যাখ্যান করেছে। কি মুস্কিল! বাঙ্গালীরা বড় অদ্ভুত জাত দেখছি। পদ্মশ্রী নয়। পদ্মভূষণ তাও প্রত্যাখ্যান?

দিন ঠিক হল। সকাল নটা। আমি সোৎসাহে দাড়ী কামাচ্ছি। আজ আমার কি শুভ দিন। রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে? বাপরে! ইতিহাস রচিত হবে আমার জীবনে। প্রধানমন্ত্রী বুকে তুলে নেবেন একেবারে। আমার গুণ দেখে। এম-পি ঝুলন-সিংহের ২৭ নম্বর নর্থ অ্যাভিনিউ-এর বাসায়। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ঝুলন সিং ফোন ধরলেন। তিনি ছাপরার উকিল। গোপাল গঞ্জ মহকুমা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এক মাত্র পুত্রের মৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি বিমর্ষ। গৌরবর্ণ। মধ্যবয়সী। বললেন আমায় লক্ষ্য করে—দাদা! আপনার ফোন। ফোন করছেন রাজেন্দ্র সিং। ফোন ধরলাম। ওপার থেকে রাজেন্দ্র সিংহের গলা। বলছেন—দাদা Interview cancelled। নেহেরুজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ফোন করে জেনে জানালেন যে দেখা হতে পারে না। প্রাইমমিনিষ্টার ভীষণ ব্যস্ত। বিদেশী কেউ আসুন। হোমড়া-চোমড়া। ইত্যাদি।

অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। এই ভারতের প্রধান মন্ত্রী? কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না! এঁর হাতে ভারতের কি উন্নতি হবে? রাজেন্দ্র সিং সান্ত্বনা দিয়ে বললে—আসুন আমার ওখানে বিকেলে। কথা হবে।

বিকেলে গেলাম তাঁর বাড়ী। ৯৪ নম্বর সাউথ অ্যাভিনিউ। কথা তাকে আবার চেষ্টা করতে বললাম। সে কারণ জিজ্ঞেস করল। এত আগ্রহ আমার কেন? বললাম—আমি সাহিত্যিক। সাহিত্যিকের কৌতূহল, তোমরা বুঝবে না।

রাজেন্দ্র সিং দাড়ী চুলকোতে লাগল। সে আমাকে ভক্তিটক্তি করে। বললে-- আচ্ছা দেখব।

বললাম—দেখব নয়। করতে হবে।

আর বেশী কপচাতে হল না। রাজেন্দ্র সিং চা খাইয়ে বিদেয় দিল। আমেরিকার দালালের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। আমেরিকা থেকে ঘুরেও এসেছিল। আমার সামনেই আমেরিকার কোন প্রেয়সীর

সঙ্গে টেলিফোনে কথাও বলেছিল। হায় রাজেন্দ্র সিং। কত শীঘ্র তুমি বিকিয়ে গেলে। কত যৎসামান্য মূল্যে!

লোকসভার সভ্যদের দিল্লীতে অসম্ভব ক্ষমতা। ট্রেজারী বেঞ্চের প্রথম সীট নেহেরুজীর। একটু উঠে গিয়ে কথা বললেই হল। তার ওপর রাজেন্দ্র সিং কংগ্রেসের বিরুদ্ধ পার্টির মেম্বর। তাকে হাতে রাখাই রাজনৈতিক বুদ্ধি। ক্ষমতাবানকে তুষ্ট রাখা। রাজী হলেন। দিন ঠিক হল। রাজেন্দ্র সিং বললে—আমার এখানে চলে আসবেন। কিছু আগেই। এখান থেকেই যাওয়া যাবে। আমার স্ত্রীও যাবেন সঙ্গে। বলেছি পণ্ডিতজীকে সে কথা।

প্রধান মন্ত্রী থাকেন ত্রিমূর্তি ভবনে। রাজেন্দ্র সিংহের বাড়ীর খুব কাছেই। নির্দিষ্ট দিনে সকাল বেলা ধুতি, চাদর, চপ্পল, পাঞ্জাবী পরে রাজেন্দ্র সিংএর বাড়ী গেলাম। রাজেন্দ্র সিং গোল মার্কেট থেকে গোপাল চিত্র কুটিরের ফোটোগ্রাফারকেও আনিয়েছেন। সেও এসেছে টিপ্‌টপ সেজেগুজে। গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে। পাঞ্জাবী যুবক। সুশ্রী দেখতে। নাম Rode। একটু পরেই বেরুলাম। পায়ে হেঁটেই ওটুকু পথ অতিক্রম করলাম। সামনে ত্রিমূর্তি ভবন। আগে Commander-in-chief থাকতেন। এখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। ত্রিমূর্তি ভবনের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। প্রকাণ্ড গেট। গেটের পাশে reception room। সেখানে receptionist বসে আছে। তিনি আমাদের তিনজনকে যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু রোড্‌-কে নয়। তাঁর কাছে মাত্র তিনজনের নাম এসেছে। রাজেন্দ্র সিং, মিসেস্ রাজেন্দ্র সিং এবং জে, এন্ মুখার্জি। বাস্। আর কারও নয়। অতএব তিনি যেতে দেন কি করে? রাজেন্দ্র সিং যতই বলে, আমি লোকসভার সভ্য। পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমার পার্লামেন্টের লবীতে কথা হয়েছে। তিনি Cameraman-কে নিয়ে আসতে বলেছেন, receptionist ততই ঘাড় নাড়ে। বলে আমি নিরুপায় হুকুম ছাড়া আমি কাজ করতে পারি না। চারজনের হুকুম নেই।

কি করে চারজনকে যেতে দিতে পারি বলুন ?

রাজেন্দ্র সিং বেকায়দায় পড়ল। একপাশে ছাপরার ভোটদাতা। আর একপাশে স্ত্রী। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রাজনৈতিক কর্মীদের একটা মস্ত বড় গুণ! ধৈর্য হারালে চলবে না। হারকে হার বলে স্বীকার করে নিলেও চলবে না। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়। তিন থাকতে নয়। Genial fraud-দের এই তিনটি জিনিস বিসর্জন দিতে হয়।

আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি রাজেন্দ্র সিংহের কালো গোঁফ আর কালো দাড়ীর মধ্যে সাদা সাদা দাঁত। ঠোঁট কামড়ে কামড়ে লাল করে দিচ্ছে। একটু পরে সে গম্ভীর গলায় বললো—দিনতো ফোনটা। Receptionist ফোন এগিয়ে দিল। রাজেন্দ্র সিং বললে—পণ্ডিতজীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিন। দিল্লীতে পার্লামেন্টের সভ্যদের ভীষণ খাতির। ফোনে যোগাযোগ করে দিল receptionist। রাজেন্দ্র সিং কথা বললো প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে। তিনি ঐ বাড়ীতেই থাকেন। তিনি বললেন—এটা হল নিরাপত্তার প্রশ্ন। আমার অধিকারে সে জিনিসটা নয়। আপনি মিলিটারী সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলুন।

মিলিটারী সেক্রেটারীও ত্রিমূর্তিভবনে থাকেন। রাজেন্দ্র সিং বললে—মিলিটারী সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে দিন। দিল্লীতে পার্লামেন্টের সভ্যদের গলায় এক অদ্ভুত সুর। এই সুর রাজেন্দ্র সিং এর গলায় ছাপরায় কখন শুনিনি। Power এমনিই জিনিস। এই সুর শুনলে তাকে অমান্য করতে সকলেই ভয় পায়। কি জানি কি ঝঞ্ঝাট হয় শেষে। Receptionist মিলিটারী সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে দিলে। তিনি সব শুনে বললেন, ফোটোগ্রাফারের গ্যারান্টি হবে কে ?

রাজেন্দ্র সিং বললে—আমি হব।

তবু মিলিটারী সেক্রেটারী ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তখন রাজেন্দ্র সিং শেষ অস্ত্র ত্যাগ করলেন। বললেন—আপনি নিজে গিয়ে

পণ্ডিতজীকে একটু জিজ্ঞেস করুন না। দেখুননা, তিনি কি বলেন। অতএব প্রধানমন্ত্রী কথাটা শুনলেন। তাঁর মনে পড়ল বটে। বললেন —হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা ফোটোগ্রাফার আসুক না।

এবার Receptionist হুকুম পেল। বললে—যাইয়ে। চার আদমী। গেটে দণ্ডায়মান বন্দুকধারী সান্ত্রীকে চেঁচিয়ে বলে দিলেন—যানে দিজিয়ে। চার আদমী। বিরাট লোহার গেট। সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে গেল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলাম। গেট বন্ধ হয়ে গেল। লাল সুরকীর পথ। একটু ঘুরে গেছে। দূরের গাড়ী বারান্দার নীচে পর্যন্ত। চারদিকে সজ্জিত বাগান। সাদা পাগড়ীতে চকচকে কুল্লা পরা, লম্বা লম্বা, সাদা পাগড়ী পরা চাপরাসীর দল। এদিক ওদিক আসা যাওয়া করছে। হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বটে। অতিরিক্ত মর্যাদাসম্পন্ন। দারিদ্র্যের ক্রন্দন এত উচ্চ স্থানে পৌঁছানো সম্ভব কিনা জানিনা।

আমি আর মিসেস সিং পাশাপাশি চলতে লাগলাম। কারণ, এই হল বিলিতী এটিকেট। আর আমরা ত বিলিতী এটিকেটের প্রধানতম পাণ্ডার বাড়ীতেই ঢুকছি। পেছনে রাজেন্দ্র সিং আর ফোটোগ্রাফার রোড। মিসেস সিং-এর পায়ে হাইহিল জুতো। যা পরে তিনি চলতে খুব অভ্যস্তা নন বোঝা গেল। হবেনই বা কি করে? কৌমার্যকালে বিহারের কোন গ্রাম্য পরিবারের গ্রাম্য মেয়েই ছিলেন। তিনি কি কোনদিন স্বপ্নেও ভেবেছিলেন দিল্লীতে ভূতপূর্ব Commander-in-chief-এর বাড়ীর গেটে তাঁকে ঢুকতে হবে? অবশেষে আমরা গাড়ীবারান্দায় এসে পৌঁছলাম। তিন চারটে সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙ্গে বারান্দায় উঠলাম।

বারান্দায় সারি সারি চেয়ার পাতা। আমরা তিনজন বসলাম। কিন্তু যেই cameraman বসতে গেল, অমনি বাধা পেল। একজন সাদা ফুলপ্যাণ্ট সাদা বুশ সার্ট পরা ভদ্রলোক আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে নির্দেশ দিলেন। এই পোশাক পরা লোকের এখানে অভাব

নেই। বোধ হয় plain dress-এ কোন Security officer। Cameraman, গলায় যার camera ঝোলানো, সে কি না চেয়ারে বসবে। প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে এ বেয়াদপিত অসহ্য। তাছাড়া হয়ত এই রকম হুকুমনামা কোথাও লিখিত আছে। ইংরেজ-আমলে যেটা ছিল চালু, সেটা আজও চালু হয়ে আছে। স্বাধীনতা অর্জনের এক যুগ পরেও।

বেচারা ক্যামেরাম্যান রাজেন্দ্র সিংহের মুখের দিকে তাকালো। প্রজা-সোস্যালিষ্ট-পার্টির আগুন-বরণ লোকসভার প্রতিনিধি রাজেন্দ্র সিংহের রাজনীতির পরীক্ষা হয়ে গেল। তিনি ফেল করলেন। কিছুই বলতে সাহস করলেন না। তিনি প্রজাও নন। সোস্যালিষ্টও নন। অধিকাংশ রাজনৈতিক লোকের মত তিনি সুবিধেবাদী। তাঁর পার্টি একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা। অতএব রোভ বেচারা ম্লান মুখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েই রইল।

একটু পরে একজন সাদা পোষাক পরা ব্যক্তি এসে একটা খাতা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এইতে আপনার এখানকার ঠিকানা অর্থাৎ Local address, Permanent address, নাম ধাম, ocupation, সব লিখুন। রাজেন্দ্র সিং আমার হয়ে লিখতে গেল। বাধা পেল। রাজপুরুষ বললেন—ওঁকেই লিখতে দিন। নিজের হাতে। পণ্ডিতজী ওঁর হাতের লেখা Study করবেন। আমি মনে মনে হাসলাম। পণ্ডিতজী handwriting expert হলেন কবে থেকে? তিনি, scientist-politician-writer। Science congress-এ preside করেন। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমীরও president। তিনি না জানেন কি? তিনি সর্ব্বজ্ঞ। এখন দেখছি তিনি handwritingও বোঝেন! psychologistও বটেন। ভারী ত পনেরো মিনিটের সাক্ষাৎ। তার জন্যে এত? এযে শূন্যগর্ভ কুম্ভ।

একটু পরে আর একজন কর্মচারী এসে বললেন—চলিয়ে। তাঁরও একই পোষাক। আমি ভাবলাম, এইবার পণ্ডিতজীর মুখোমুখি

হব বুঝি। চাদরটা ঠিক করে নিলাম। কিন্তু কাকস্যপরিবেদনা। এ যে শূন্য ঘর। মেঝেতে খুব পুরু গালচে পাতা। সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। ফোটাগ্রাফার বসতে গেল শূন্য চেয়ারে। আবার বাধা পেল। সে বেচারা চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। এক পাশে। ঘাড় নীচু করে। আমরা বসে আছি ত বসেই আছি। একটু পরে একজন প্রৌঢ় শিখ মিলিটারী ড্রেসে এসে দাঁড়ালো। বুঝলাম, ইনিই মিলিটারী-সেক্রেটারী। বুক ভরা মেডেল। মুখ ভরা গোঁফ দাড়ী। মাথায় বিরাট পাগড়ী। আর একটা জিনিষও বুঝলাম। পণ্ডিতজীর একটু দেখানে-পণাও আছে। নইলে বাড়ীতে এত মেডেল পরা কেন? তিনি আমাদের সামনে এসে গম্ভীরভাবে শুধু পায়চারীই করছেন। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছেন আমাদের। একটা এম. পি. এসেছে সস্ত্রীক। তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। কোন রকম অভিবাদন অথবা কুশল প্রশ্ন কোন পক্ষ থেকেই হল না। প্রায় দশ মিনিট ধরে এই প্রহসন চলল। একটু পরে তিনি চলে গেলেন।

আবার একজন কর্মচারী এসে বললেন চলিয়ে। একই পোষাক পরে আমরা ভাবলাম এই বার হয়ত দুঃখের রজনী প্রভাত হবে। দেবদর্শন হবে। কিন্তু কোথায় কি? একটা লম্বাঘরে এলাম। সেখানে একটা ছোট গোল টেবিল ঘিরে চারটে করে চেয়ার। ফোটোগ্রাফারকে আগের মত দাঁড়িয়ে থাকবার নির্দেশ দেওয়া হল। স্বাধীন ভারত-বর্ষের প্রধান মন্ত্রীর ঘরে একজন স্বাধীন ভোটদাতা নাগরিকের চেয়ারে বসবার অধিকার নেই। কারণ, সে যে আলোক চিত্রকর! অতএব Menial শ্রেণীর।

ফোটোগ্রাফারের চমৎকার চেহারা। চমৎকার পোষাক। প্যান্টকোটই। সবই ছিমছাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু না তবুও না। চেয়ার খালি থাকলেও তাতে সে বসবার যোগ্য নয়। এ নিয়ম যে কতটা অপমানজনক তা যেন কেউ বুঝতে চাচ্ছে না।

আমি ঘরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। দেওয়ালে টাঙ্গানো

বড় বড় ছবি। দামী gilted frame এ বাঁধানো। সব ইংরেজদের। কেউ ভূতপূর্ব কমাণ্ডার-ইন-চীফ। কেউ ভূতপূর্ব viceroy&governor general। ভারতীয় নেতাদের কোন ছবি কোথাও নেই। ভাবলাম, ইংরেজরা যাবার সময় এইগুলো নিয়ে গেল না কেন? প্রধান মন্ত্রী এখানে আসবার সময় এইগুলো মিউজিয়ামে সসম্মানে সুরক্ষিত রাখবার ব্যবস্থা করলেন না কেন? মোতিলালের, মহাত্মা গান্ধীর অথবা আর কোন নেতার কোন ছবি কোথাও নেই। কেবল দেখলাম, দরজার একপাশে এক কোনে একটা ছোট ছবি রয়েছে। ঘর থেকে বাইরে যাবার সময় চোখে পড়ে। ঠাওর করে দেখলাম সেটা একটা মহিলার ছবি। কাছে গিয়ে দেখলাম ওটা স্বরূপরাণীর ছবি। পণ্ডিতজীর জননী। বাঁচা গেল। প্রতিদিন পার্লামেন্টে যাবার সময় জননীকে দর্শন করে পণ্ডিতজী বেরোন। পণ্ডিতজীর জননীর প্রতি দুর্বলতা আছে তা বুঝতে পারলাম। পণ্ডিতজী ভাবপ্রবণ। আর্টিষ্টিক। Revolutionaryর মনোবৃত্তি তাঁর নয়। সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন। বুদ্ধিজীবী।

আমরা বসে আছি চুপ করে। সামনে তিনটে টেবিলে আরো তিনজন বসে তারাও পণ্ডিতজীর সাক্ষাৎ প্রার্থী। মিলিটারী সেক্রেটারী, প্রাইভেট সেক্রেটারী, আর্দালী চাপরাসী, পিওন, সিকিউরিটি অফিসার, অ্যাসিস্টান্ট ইত্যাদি সব যেন কি না কি করছে। চুপ করে বসে আছে আর তিনজন লোকও। পনেরো মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ সকলেই যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। কি ব্যাপার! রাজেন্দ্র সিং আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিস ফিস করে বলল—পণ্ডিতজী আয়েহেঁ।

আমি চারদিকে চেয়ে দেখলাম। ঘরে পণ্ডিতজীকে দেখতে পেলাম না। অবশেষে দেখি, অনেক দূরে একটা Corridor-এর শেষে তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের সকলের Physiognomy study করছেন বোধ হয়। মনে মনে কার সঙ্গে কি ভাবে কথা

বলবেন তাই যেন ভেবে নিচ্ছেন। তাঁর পরণে আগাগোড়া সাদা পোষাক। একটা সাদা পাঞ্জাবীর ওপর সাদা জোয়াহির জ্যাকেট। সাদা চুস্ত্ পায়জামা। মাথায় সাদা গান্ধীটুপি। পায়ে কাবলী স্যাণ্ডেল।

আমাদের ঘরের বাঁ দিকের টেবলে যিনি বসেছিলেন সব চেয়ে সামনে, তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। যিনি বসেছিলেন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দুই হাত একত্র করে প্রণামও করলেন। নেহেরুজী বসলেন। পায়ের ওপর পা তুলে। একটা হাত গালে রেখে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। ঠিক যেন এক ইংরেজ। হাবভাব, বসবার ভঙ্গী সব ইংরিজী ধরণের। ভদ্রলোক ছিলেন লোকসভার সভ্য। আসামের প্রতিনিধি। তখন আসামে ভাষা নিয়ে দাঙ্গা চলছিল। বাঙ্গলা ভাষা নিয়ে। ভদ্রলোক ইংরিজীতে বললেন—We dont want the Bengalees to leave Assam।

পণ্ডিতজী আরো এক মিনিট তার বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বলে উঠলেন—yes! yes! That will do।

বক্তা আরো কিছু বলতে চাইলেন। পণ্ডিতজী উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত তিক্তস্বরে বলে উঠলেন—That will do, I say that will do। I have heard you enough। ভদ্রলোক আর কথাটি না বলে চলে গেলেন।

পণ্ডিতজী পরবর্তী লোকটির কাছে গেলেন। তিনি আচকান, গান্ধীটুপী ও চুস্ত পায়জামা পরেছিলেন। পণ্ডিতজী তাঁর কাছে আসতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন—পণ্ডিতজী! মুঝো ইস্ কমিটিমে কেঁও রখ্খে হ্যাঁয়? ম্যাঁয়নে তো আপসে পহলেহি কহ্ দিয়া থা—। আমি সমস্তই শুনতে পেলাম। ভাবলাম এ কি রকম interview? সকলেই ত সকলের সব কথা শুনতে পাচ্ছে। গোপন ত কিছুই নেই। কিন্তু আমার ভুল ভাঙ্গতে দেরী হল না।

বুঝতে পারলাম গোপন করার মত কথাও আছে জগতে। পণ্ডিতজী

ভদ্রলোকের কোমর ধরে বাইরের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানে দু'মিনিট তাঁদের কি কথা হল তাঁরাই জানেন। হয়ত তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন কমিটিতে তাঁকে রাখার উদ্দেশ্য কি? সেটা সকলের সামনে বলবার মত জিনিষ হয়তো নয়। তাই আড়ালেই সে কথা বলা হল। রাজনীতি হল রাজনীতি। সর্বদেশে সর্বকালে সমান। খদ্দর পরে, মাথায় গান্ধীটুপী পরেও দেখলাম বেশ রাজনীতি করা যায়।

অতঃপর পণ্ডিতজী আমাদের কাছে এলেন। আমরা তিনজনেই উঠে দাঁড়ালাম। নমস্কার ও প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ও হল। আমি তাঁকে আমার হিন্দী নাটক "পরিচয়" উপহার দিলাম। তিনি পাতা উলটিয়ে দেখে যেতে লাগলেন। তাঁর প্রথম উক্তিটিই কর্ণে প্রবেশ করল। ভুরু তুলে ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে বললেন—আপ্ এম্ এস্ সি্ হ্যঁায়? অ্যাডভোকেট ভি হ্যঁায়? ফির নাটককার ভি হ্যঁায়?

কথাটা প্রশংসার সুরে বলা হলে হত প্রশংসা। কিন্তু বলা হল কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের সুরে। উন্নাসিকতা। হাই-ব্রাউইজ্ম্! এক লেখকের কাছ থেকে আর এক লেখকের প্রতি ঔদাসীন্য প্রত্যাশা করে থাকতেও পারি, ব্যঙ্গ কখনই নয়। ভেতরের আবেগ অবদমিত রেখে আমিও বললাম—It takes a long time, even to discover ones own self! Is it not?

ঘরশুদ্ধ সকলেই চাঞ্চল্য অনুভব করল। পণ্ডিতজী রেগেছেন। এবার কি হয় কে জানে। আমি তখন একটা কথা পাড়লাম। বললাম —তাঁর শ্যালক কৈলাসনাথ কওল আমার সহপাঠী ছিল। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতজী জল। কে বলবে এক মিনিট পূর্বে তিনি রেগে কাঁঠাল-প্রমাণ। এখন এক মিনিটে শুকিয়ে আমসী। আস্তে আস্তে সংযত কণ্ঠে ভদ্রভাবে বলতে লাগলেন—I see! I see! আপনি কৈলাসের ক্লাশফ্রেণ্ড। বলুন, কি চাই?

বললাম—বলেইছিত। তবে এখন উপস্থিত আপনার কয়েকটা ফোটো চাই।

সরকারের কাজেই দিল্লী এসেছিলাম। এক পয়সা পারিশ্রমিক না নিয়ে। এমন কি নিজের পেশার ক্ষতি করেও। ভারতের প্রধান-মন্ত্রীর কাছ থেকে ভারতের জাতীয় নাট্যকার কি পেল। কিছুই না। এমন কি ভবিষ্যতে বার বার চিঠি লেখার কোন জবাবও পেল না।

এর পর গেলাম প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ পণ্ডিতজীর ঠিক উল্টো। এতটুকু দেখানেপণা নেই। আমার কাছে একটা হলদে চিঠি এসেছিল আগেই। আপনার সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট অমুক তারিখে অমুক সময়ে দেখা করে আনন্দ পাবেন। অবশ্য আমার প্রার্থনার ফলেই এই চিঠি এসেছিল। গেলাম নির্দিষ্ট দিনে। নির্দিষ্ট সময়ে। রাষ্ট্রপতি ভবনের বিরাট কম্পাউণ্ড। বিরাট গেট। সেখানে অর্ধ ডজন সান্ত্রী সদাই পাহারায় নিযুক্ত।

গেটে পাহারারত প্রহরীকে দেখালাম হলদে চিঠিখানা। তিনি দেখে বললেন—যাইয়ে! উয়হ সান্ত্রীকা পাশ। গেটের ভেতরের দিকে দূরে দণ্ডায়মান আর এক প্রহরীর কাছে যেতে নির্দেশ দিলেন। ধীর পদক্ষেপে তার কাছে অগ্রসর হলাম। আমি তখন রাষ্ট্রপতি ভবনের ভেতরে। একটু উত্তেজনা যে হচ্ছে না এমন কথা বলতে পারি না। একদিন এখানে কারা ছিল? ভাইসরয় এবং গভর্ণর জেনেরালরা। প্রহরী আমার হাতের খামখানা পড়ে নিয়ে দূরে দণ্ডায়মান আর এক প্রহরীর কাছে যেতে নির্দেশ দিল। একই ভাষায়। একই ভাবে। একটার পর একটা করিডর পার হচ্ছি। এদিকে বেঁকছি। ওদিকে বেঁকছি। জনমানবশূন্য রাষ্ট্রপতিভবন। বাইরে বাবুর ঝাঁক-জমক। ভেতরটা যে এত শূন্য তা কে জানত? অবশেষে এলাম রাষ্ট্রপতির প্রাইভেট সেক্রেটারীর খাস কামরায়। বিশ্বনাথ ভর্মা। রাজেন্দ্র প্রসাদের জ্ঞাত ভাই। বিহারের লোক। সেক্রেটেরিয়াট টেবিল। মাথার ওপর বনবন্ করে পাখা ঘুরছে। টেবলের ওপর টেবল ল্যাম্প জ্বলছে। অথচ লোক ভেতরে কেউ নেই। বেলা এগারটা। দিনের বেলা। কিন্তু আলো জ্বলছে। রাষ্ট্রপতিভবনের ভেতরের

কামরায় দিনের বেলায় আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। মুক্ত আলো বাতাস আসা-যাওয়া করে না। গুমোট ভেতরটা।
বসে আছি ত বসেই আছি। কেউ আসছে না। দেখতে দেখতে আমার Interview-এর সময় এগিয়ে আসতে লাগল।
দ্বারে পাহারারত প্রহরীকে বললাম—আমাকে মিলিটারী সেক্রেটারীর কাছে নিয়ে যেতে পারো? আগের দিন মানে নেহেরুজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এই মিলিটারী সেক্রেটারীর মূল্য বুঝেছিলাম। Security measures নাকি এঁদের হাতে। Interview-ও।
প্রহরী মাথা নেড়ে বললে—ইয়হ ম্যাঁয় করসকতা।
বললাম—কর সকতা ত মেহেরবাণী করকে কিজিয়ে।
সে বললে—চলিয়ে।
উঠলাম। তার পেছনে পেছনে এদিক ওদিক করে অবশেষে একটা বড় ঘরে দেখতে পেলাম স্বনামধন্য মিলিটারী সেক্রেটারীকে। এক প্রৌঢ়, দাড়ী গোঁফ শোভিত শিখ। তবে তাঁর বুকে মেডেলের বাহার নেই। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও নেহেরুর মধ্যে, মানসিকতার যথেষ্ট তারতম্য আছে।
মিলিটারী সেক্রেটারী বিনয়ী। আমার কার্ড দেখেই বললে—Please Sit down! yes! it is all right। I will take you to the Prisident in a minute। বলে উঠে গেলেন। বোধ হয় রাষ্ট্রপতির কাছেই গেলেন। একটু পরে এসে বললেন—Time হো গিয়া হ্যায়। অব চলিয়ে।
উঠলাম। তাঁর পেছনে পেছনে দুরু দুরু বক্ষে চললাম। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ। হলেনই বা তিনি আমার পরিচিত, দেখা লোকই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতির রাজকীয় মর্যাদা। ইংরেজ সমস্ত জাঁকজমকই রেখে গেছে। মিলিটারী-সেক্রেটারী একটা বন্ধ ঘরের স্প্রিং দেওয়া দরজা টেনে খুললেন। আমি ঢুকলাম। অতি বৃহৎ লম্বা ঘর। দেখি দূরে এক কোণে বসে আছেন সাদা গান্ধীটুপী

মাথায় আমাদের সেই কৃষ্ণবর্ণ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এখন ছিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। গাল দুটি বেশ পুরুষ্টু। ইনিই বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন গান্ধীজি। সুভাষবাবুকে লক্ষ্য করে। বম্বেতে।

মিলিটারী সেক্রেটারী মেরদণ্ড সোজা করে মাপা মাপা পা ফেলে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। পায়ের নীচে পুরু কার্পেট। আমার পায়ে চপ্পল। পরনে ধুতী পাঞ্জাবী। গলায় চাদর। উত্তর প্রান্ত দোদুল্যমান। কার্পেটের ওপর আর একটা সুদৃশ্য কার্পেট। তারপর সোফাসেট। টেবিল, কাঁচ লাগানো। রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে attention হয়ে তিনি আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্টের কাছে present করলেন। যেমন তিনি করেছেন ইংরেজ বড়লাটদের সামনে অজস্র দর্শন প্রার্থীদের। পুরানো অভ্যাস আজও ভুলে যাননি। কারণ, ভুলে যেতে দেওয়া হয়নি। নির্দেশই আছে।

মিলিটারী-সেক্রেটারী যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য ও অভিজাত্যের সঙ্গে বললেন—

J, N, mukerjee Advocate, chapra।

আমি ভোজপুরী ভাষায় ভোজপুরী উচ্চারণে ভোজপুরী রাজেনবাবুকে সম্বোধন করে বললাম—হম্ ছপরাসে আইলবানি সরকার।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ পুলকিত বিস্ময়ে তাকালেন। তাঁর মাতৃভাষা বলে এ ব্যক্তি কে রে বাবা! হয়ত নাড়ীর টান। হয়ত আঁতুড় ঘরের গন্ধ। তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে উঠলেন আও। আও।

আমি এগিয়ে গেলাম। তিনি একটা চওড়া সোফার এক কোণে বসেছিলেন। একেবারে নিজের পাশের স্থানটি দেখিয়ে বললেন—

বৈঠো। হিয়া বৈঠো।

আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু আমার সব দ্বিধাসঙ্কোচ দূর করে হাতে ধরে জোর করে নিজের পাশে বসিয়ে দিলেন।

হাঁ, নেহেরুজীর সঙ্গে আকাশ পাতাল প্রভেদ বটে। নিজস্ব ব্যক্তিত্ব কিছু আছে বটে এই ব্যক্তির। একেবারে গান্ধীজীর ধামাধরা নন। ইনি একজন অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক। এঁর স্মরণশক্তি অসাধারণ। ছাপরায় একটা মিটিংএ দেখেছিলাম। ইংরিজীতে লেখা resolution একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর হুবহু উগ্‌লে দিলেন। একটা কমা সেমিকোলনের ভুল হল না। আট-দশ লাইনের প্রস্তাব। সেই দিনই বুঝেছিলাম ইনি বঙ্গসন্তানদের রণে পরাজয় করেছিলেন কিসের জোরে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দেখেছিলাম একদিন সম্পূর্ণ অন্যভাবে তখন তিনি ছিলেন কংগ্রেসনেতা মাত্র। আজ প্রেসিডেন্ট অব ইণ্ডিয়া। জন্মেছিলেন ১৮৮৪ সালের শেষ দিনটিতে। ৩১ শে ডিসেম্বর। অন্তিম নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন—২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩। আজন্মের হেঁপো রুগী প্রায় আশী বছরের কাছাকাছি পৌছতে পেরেছিলেন। তাঁকে দেখে বিশ্বাস হল যে সত্যিই ভারতবর্ষে, ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। রাজেন্দ্রবাবুকে একদিন দেখেছি ছাপরায়। এই জেলার জিরাদেঈ গ্রামে একদিন জন্মেছিলেন তিনি। আসতেন তাঁর বড় ভাই মহেন্দ্র প্রসাদের কাছে। যিনি ছিলেন বেহার ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। থাকতেন Bank-এর ওপরেই। দোতালায়। আমার বন্ধু রামপরায়ণ রায় ছিলেন ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার। এক বাড়ীতে সেও থাকত। উভয় ভ্রাতাকে দেখবার সুযোগ তার প্রতিদিনই হত। অতি ঘনিষ্ঠভাবেই দেখার সুযোগ হত। তারই মুখে শুনেছি রাজেন্দ্রবাবুকে রাগতে কেউ কখন দেখেনি আজ পর্য্যন্ত।

আমি আমার হিন্দী অনুদিত বই 'পরিচয়' তাঁকে উপহার দিলাম। তিনি খুব খুশী হলেন। জিজ্ঞেস করলেন কি চাই আমি তাঁর কাছে? সাক্ষাৎ চেয়েছি কেন?

বললাম—ওকালতীতে মানসিক শান্তি পাইনা। দেশের সেবা করতে চাই। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। নাট্যাচার্য ত আমার নাটক মঞ্চস্থ

করেইছেন। রেডিয়ো ত আমাকে অখিলভারতীয় প্রোগ্রাম দিয়েইছে। আলবাত প্রমাণ চাই যোগ্যতার।

রাজেন্দ্রবাবু কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললেন আমাকে তোমার নাটক অভিনয় করে দেখাও না?

এ কি কথা রাষ্ট্রপতির মুখে? আমি কি নাট্যপ্রযোজক? নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজকের পার্থক্য কি তিনি বোঝেন না? অত বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রবাবু বললেন—১৫ই আগষ্ট কিম্বা ২৬শে জানুয়ারী। সমস্ত খরচ গভর্ণমেণ্টের। ফার্ষ্ট ক্লাসে আসা যাওয়া করবে। তালবাটোরা গার্ডেনে থাকতেও পারবে। সমস্ত দল বল নিয়ে। হল্টিং পাবে। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবো। কেমন। কি বলছ?

বিপদে পড়লাম। এ আবার কি সুরু হল? আমি এসব করতে যাব কি? এর নানা ঝঞ্ঝাট আছে। মেয়েদের জোগাড় করা আছে। তাদের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব আছে। আমার কাজকর্ম সব মাথায় উঠবে। অতএব আমি সবিনয়ে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম।

রাষ্ট্রপতি ভবনের ইতিহাসে এ বোধ হয় অশ্রুতপূর্ব ঘটনা। রাষ্ট্রপতির প্রাইভেট-সেক্রেটারী পর্যন্ত স্তম্ভিত। আমাকে ঠোঁট উলটিয়ে ধমকের সুরেই বলে ফেললেন—You are refusing the Presidents offer?

বললাম—I am! because that is not my line।

কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু আমায় সমর্থন করলেন। বললেন—ঠিক বলেছে। ও হল অ্যাড্‌ভোকেট। এসব করবে কি? সেক্রেটারী আর কিছু বলতে সাহস করল না।

বাঁচা গেল। একটু পরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাব রাখলেন। বললেন—কুতুব দেখেছ?

বললাম—না।

বললেন—বল ত গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিই।

এবারেও মাথা হেঁট করে প্রত্যাখ্যান করলাম। গাড়ী মানেই ত রোলস্-রয়েস্। তকমা-আঁটা লিভারি-পরা ড্রাইভার। বকশিষই দিতে হবে পাঁচ টাকা। ময়ুর-পুচ্ছ-ধারী হয়ে লাভ কি। আবার ত দাঁড়কাকেই পরিণত হতে হবে।

বারীন্দ্রকুমারের শিক্ষা আমাকে অন্ততঃ একটা জিনিস শিখিয়েছিল। মূল্যহীনের পেছনে দৌড়িও না। রাষ্ট্রপতিভবনের গাড়ীতে বেরুতে পারলে নিশ্চয় একটা গল্প করার মত জিনিস হয়। কিন্তু আমি লেখক। আমার লেখক-সত্তা এত অল্পে সন্তুষ্ট হতে চাইল না।

রাজেন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করলেন পার্লামেণ্ট দেখেছি কি না?

বললাম—দেখেছি।

বললেন—হীরেন্দ্রর ত আচ্ছা ভাষণ দে রহা থা। শুনা হ্যয়?

বললাম—জী হাঁ। শুনা হ্যয়।

ইতিমধ্যে রাজেন্দ্র সিং এসে পড়েছিল। সে এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এইবার একটা প্রস্তাব করলো। বললে—বাবুজী! আমার মেয়ের বিয়ে আসছে। আপনাকে যেতে হবে। সোনপুর।

আশ্চর্য হয়ে শুনলাম রাজেন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করছেন—কোথায়? কবে? কার সঙ্গে? কত খরচ পড়ছে? ইত্যাদি। একেবারে পিতার মত। বাবুজী মানে পিতা। তিনি পিতার মতই প্রশ্ন করতে লাগলেন। সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গেই প্রশ্ন করতে লাগলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন—আচ্ছা। আগে দিন ঠিক হোক। দেখা যাবে। রাজেন্দ্র সিং কৃতজ্ঞতায় একেবারে গলে পড়তে লাগল।

এই ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। যাবতীয় সদগুণে অন্তর ভরপুর। যাকে যা বলতে হয়, তাকে তা বলেন। যার যত কথা থাকে, সব মনোযোগ দিয়েই শোনেন। আমায় শেষকালে বললেন—আমার আর কোন প্রার্থনা আছে কিনা? বললাম—please relieve me from the drudgery of the courts।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটু হাসলেন। বিদায় মুহূর্ত আসন্ন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ

একটু মুখ তুলে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এক মিনিট পরেই সরকারী ফোটোগ্রাফার এসে উপস্থিত হল।

রাষ্ট্রপতি ভবনের বিরাট গেট থেকে বেরিয়ে এলাম। ছাপরায় ফিরেও এলাম। কিছুদিন পরে একটা প্যাকেট এলো দিল্লী থেকে। রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুসারে পাঠাচ্ছেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। খুলে দেখি তার মধ্যে রয়েছে তাঁর সঙ্গে তোলা ফটোর দুখানা কপি।

ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে ভারতের নাট্যকারের কি এইটুকু মাত্রই প্রত্যাশা ছিল? তিনি আমার নাট্যকার-সত্তার বিকাশের কোন প্রস্তাবই করেন নি। নাট্যকার কখনো নাট্যপ্রদর্শক হতে পারে না। সে সব পারে, শুধু স্বধর্মচ্যুত হতে পারে না। কুতুব দেখা? সে তো ছেলেমানুষকেই করা যেতে পারে।

পরে তাঁকে চিঠিও দিয়েছিলাম। তাঁর প্রাইভেট-সেক্রেটারী জবাব দিয়েছিলেন; কিন্তু কাজের কথা কিছুই নয়।

মানুষের কাছে কিছুই প্রত্যাশা দরকার নেই। অতএব আমায় অন্য পথের সন্ধান করতে হল। সেই চেষ্টা আজও করে চলেছি।

ভারতের সংস্কৃতি-মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে দেখা করেছি। পত্র-ব্যবহারও করেছি। তিনি মিষ্টি মিষ্টি পত্র ব্যবহার করেই কর্তব্য শেষ করেছেন। ভারতের সংবাদ-মন্ত্রী কেসকারের সঙ্গে দেখা করেছি। ভারতের রাষ্ট্রকবি "দিনকরের" সঙ্গে দেখা করেছি। লোকসভার মনোনীত সভ্য নাট্যকার মামাবরেরকারের সঙ্গে দেখা করেছি। হিন্দীর অন্ধভক্ত শেঠ গোবিন্দদাসের সঙ্গে দেখা করেছি। কিন্তু কি পেয়েছি? কিছুই না। সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ দেখেছেন। অথবা যতদূর সম্ভব শালীনতার সঙ্গে আমায় সহ্য করেছেন। আমাকে শিল্পের পথে অগ্রসর হবার জন্যে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেন নি। ভারত স্বাধীন হওয়াতে ভারতের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শিল্পীর কোন লাভই হয়নি। খোসামুদেরা পদ ও অর্থ লাভ করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের শিল্প-সৃষ্টি ব্যাহত হয়েছে, নিঃসন্দেহ।

দিল্লী থেকে ফিরে পাটনা রেডিও স্টেশন থেকে কয়েকটা রেডিও-নাটক প্রসারিত করালাম। বসে বসে শুনতাম। ভালই লাগত। সৃষ্টিই ত? যে ভাষাতেই হোক। সৃষ্টি-সৃষ্টিই। "হিমাচল-প্রদেশের" "হিম-প্রস্থ" পত্রিকায় কয়েকটা লেখা দিলাম। হিন্দী নাটক দিলাম। রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটা প্রবন্ধও দিলাম।

কলকাতার "সিনেমা-জগৎ" পত্রিকায় একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ "শিশিরকুমার ভাদুড়ী" নাম দিয়ে বেরুতে লাগল। রবি বসু তখন ঐ পত্রিকায় ছিলেন। তিনিই আগ্রহ করে ছাপাচ্ছিলেন। তিনি এ পত্রিকা ছেড়ে 'দেশ' পত্রিকায় চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ বেরুনোও শেষ হয়ে গেল। সিনেমা পত্রিকাও নাট্যাচার্য সম্বন্ধে পূর্ণ রচনা প্রকাশ করতে অসমর্থ। এদের শিল্পজ্ঞান অথবা শিল্প-প্রীতি আছে বলে কি করে মনে করব?!

"উল্টোরথ" মাসিক পত্রিকায় একটা নাটক-প্রতিযোগিতার খবর পড়লাম। আমার মন তখন এতদূর তমসাবৃত যে "এক অধ্যায়" নাটকটা পাঠিয়ে দিলাম। ওই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেলাম। 'সিনেমা জগতে' ছাপাও হল। কিন্তু নারী-চরিত্র অত্যধিক থাকায়, কোন অ্যামেচার ক্লাবও তা চিমটে দিয়ে ছুঁলো না। অভিনেত্রীদের পয়সা দিতে হয় যে! স্ত্রী শিক্ষার পীঠস্থান কলকাতায় অবৈতনিক কলেজ-ছাত্রীও পাওয়া যায় না অ্যামেচার স্টেজে! এত উন্মত্ত এখানকার অ্যামেচার-স্টেজ। ছাপরায় যা সম্ভব, কলকাতায় তা সম্ভব হয় না!!

কলকাতা রেডিও স্টেশন থেকে কয়েকটা বাংলা রেডিও-নাটকও প্রসারিত হল। "লীনা", "তপস্যা" ইত্যাদি। পাটনা রেডিও স্টেশন থেকে "প্রতিষ্ঠা", "পরীক্ষা", "লীনা", "মমতা কা বন্ধন", "জীবন কা মাঙ্গ", "মজাক", "সবহিসে উপর" ইত্যাদি হিন্দী নাটকও প্রসারিত হল। বোম্বাইয়ের "বিবিধ ভারতী" থেকেও "এক অধ্যায়" প্রসারিত হল। ভাবতে লাগলাম শেষে রেডিও নাটক লিখে লিখেই কি আমার

জীবন শেষ হবে? অসম্ভব।

কলকাতার কয়েকটা থিয়েটারে নাটক চালাবার চেষ্টা করলাম। সর্বত্রই ব্যর্থ হলাম।

দক্ষিণেশ্বর সরকার ও তাঁর ভ্রাতা রাসবিহারী সরকার "শ্রীরঙ্গম" নাম নিশ্চিহ্ন করে তার জায়গায় "বিশ্বরূপার" প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁরা আমাকে নিজেদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। আমার নাটক দুই ভাই মন দিয়ে খানিকটা শুনলেনও। কিন্তু তাঁরা ত আর শ্রীরঙ্গমের শিশিরকুমার নন। বিশ্বরূপার সরকার ভ্রাতাদ্বয়। ঠিকেদার। হোটেল-পরিচালক। ব্যবসাদার। তাঁরা "বিশ্বরূপা-নাট্য-উন্নয়ন-পরিকল্পনা" করতে পারেন। সেটা নাটকের উন্নয়ন কতদূর করেছে, ঈশ্বর জানেন। তাঁদের কিছু প্রচার-কার্য চালিয়েছে সন্দেহ নেই। আমাকে দিয়ে তাতে একদিন বক্তৃতাও দিইয়ে নিলেন। কিন্তু আমার নাটক মঞ্চস্থ করবার কোন লক্ষণ তাঁরা দেখালেন না। ওখানে চাকরী করবার প্রস্তাবও করলেন। যা আমি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু আমার অপরাধ এই যে আমি নাট্যমঞ্চকে কেবল প্রমোদ-মঞ্চ মনে করি না। একটা আদর্শও প্রচার করি নাটকের মাধ্যমে।

আমি তাঁদের প্রত্যাখ্যান মেনে নিই। তবু তাঁদের মতানুযায়ী ফরমায়েসী নাটক লিখতে পারি না। অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও। অনুরোধের নমুনাটাও দিই। নইলে ত বিশ্বাস করবেন না আপনারা। একটা চিঠি তুলে দিচ্ছি।

Biswaroopa
Leading Indian Cultural Theatre Centre
2A, Raja Rajkissen Street, Calcutta-6

My dear Sri Mukerjee,

I write this letter to you after a considerable lapse of time but at a moment when you are mostly

needed with your drama, for our next production, after Lagna, on the same bussiness terms, as with Shri Bidhayak Bhattacharya.

You are required to give a fortnight of your precious time, to compose a drama with story supplied by me. I can arrange everything for your comfortable all found stay in Calcutta for the purpose,

Yours Sincerely
Dakineswar Sarkar

p. s. Your views stating how quickly you may come over, per telegram, will be very much appreciated.

খামে Venus-De-Milo-র অনাবৃত বক্ষ-মূর্তির সঙ্গে বিজ্ঞাপন :—

Bidhayak's New Drama
LAGNA
in
Theatrescope
(First time in the world)
invention & Direction
by
Rasbehari Sarkar

বাংলা রঙ্গমঞ্চ আর নেই। বাংলা নাটক আর নেই। আছে First time in the world—Theatrescope. Teatrescope কথাটার মানে কি? Theatre কথাটার উৎপত্তি quick Thea থেকে। Thea কথাটার মানে দৃশ্য। a place of seeing। গ্রীক Bios মানে a mode of life। গ্রীক skopes মানে to look at। এই হল bioscope কথাটার উৎস। অর্থাৎ জীবন্ত দৃশ্য। তুথ ভাল

জিনিস। জলও ভাল জিনিস। কিন্তু ওই দুটো জিনিসকে যদি আধা-আধি ভাগ করে মেশানো যায়, তাহলে কি উপাদেয় জিনিস দাঁড়ায় তা আপনারা সকলেই জানেন। Theatrescope কথাটা দাঁড়িয়েছে তাই। শেষ পর্য্যন্ত অর্দ্ধনগ্ন নারীদেহ মাত্র অবলম্বন। এর invention করেই ত রাসবিহারীবাবু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রমোদক রূপে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের দ্বারা প্রশংসাপত্রে সম্মানিত হয়েছেন।

আমি চুনোপুঁটি। এঁরা রুই-কাতলা। অতএব আমিও বললাম—নমস্কার যুগলভ্রাতা। তোমাদের অনুরোধ রাখতে পারলাম না। দর্জি-নাট্যকার হতে পারি না।

শোভা সেনের সঙ্গে আলাপ হল। উৎপল দত্ত উপস্থিত ছিলেন বাড়ীতে। তথাপি দেখা করলেন না। পাশের ঘরে বিছানায় শুয়ে সিগার ফুঁকতে লাগলেন। শোভা সেন "ফেরারী ফৌজ" দেখতে অনুরোধ করলেন। দেখলাম। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিস সেজে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দেশসেবকের ওপর অত্যাচার করাটাই শুধু মনে আছে। একে বলে—স্টেজ হরর্‌। যখন নাটক থাকে না নাটকে, তখন এইসব আমদানী করতে হয়। জিভ কেটে ফেলা। চোখ বন্ধ করে ফেলা ইত্যাদি। অয়দিপউস-এও তাই। বিল্বমঙ্গলেও তাই। উৎপল দত্তর নাটকেও তাই।

বিশ্বরূপায় "সেতু" দেখলাম। এতো পি, সি, সরকারের যাদু। বৈজ্ঞানিক যাদু। যন্ত্র-যুগের আধিপত্য কলার ক্ষেত্রে বিস্তৃত হতে দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম।

ষ্টার থিয়েটরে ছবি বিশ্বাস অভিনীত "ডাক-বাংলো" দেখলাম। ছবি বাবুর সুন্দর চেহারা, আর আভিজাত্য পূর্ণ আচরণই শুধু মনে রইল। রঙমহলে জহর রায় অভিনীত "কথা কও" দেখলাম। ভাঁড় ভদ্রলোক হয়েছেন দেখে আশ্চর্য হলাম। ভাঁড়ের চেয়ে বড় ক্রিটিক কে? সেই রাজগদী ছেড়ে জহর রায় ধরার ধুলিতে নেমে এসেছেন। পারবেন কেন?

তারাশঙ্করের "কবি" দেখলাম। মেলোড্রামা মাত্র। গ্রীক melos কথাটার মানে গান। গ্রীক alphabetএর delta, row, alpha ও mew, মিলে হয়েছে dram। ইংরাজীতে তাই থেকে হয়েছে drama। যার মানে action। বাংলায় ওর প্রতিশব্দ নেই। একশো বছর আগে ম্যাঞ্চেষ্টারের ইংলিশ লিটারেচারের অধ্যাপক Prof, A, W, Word এই রকম একটা চেষ্টা করেছিলেন।

"কবি" ঠিক তাই। মেলোড্রামা।

কোথাও নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারলাম না। কোন মঞ্চাধ্যক্ষের সঙ্গেও নয়। সকলেই আল্‌তো আল্‌তো ভাবে কথা কয়। বুঝলাম শিশিরবাবুর সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-জগত থেকে নাট্য-সরস্বতী বিদায় নিয়েছেন।

সত্যি সত্যিই নাটক লেখা ছেড়ে দিলাম। ছোট গল্প ইত্যাদি লিখতে লাগলাম। "পরিচয়" ইংরিজীতে তর্জমা করলাম। আমেরিকায় এলিজাবেথ মুখার্জী ওটা পরিমার্জ্জিত করে দিল। তার স্বামী আমার আত্মীয়। আজও সেখানে তেমনিই আছে। ওর কোন সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না।

আমাদের যোগেশচন্দ্র শর্মা "পরিচয়" আসামী ভাষায় তর্জমা করেছিলেন। তখন বাংলা ভাষা নিয়ে দাঙ্গা চলছে আসামে। কৌতুহলী হয়ে চিঠি দিলাম। তাঁর উত্তর অতি সুখপাঠ্য। ঐতিহাসিক মূল্যে মূল্যবান। তাই তুলে দিচ্ছি :—

Jogesh ch. Sharma B, L, Advocate
Commissioner, Nowgong Municipal Board

My dear Shri Mukherjee,

Your P, C, of 6-8-60 was duly to hand. I have kept everything ready for printing the book I shall have to do it at any cost.

Though I am ashamed of writing to you adout the truth of the recent happenings in Assam, still I must do it to remove your suspicion & doubt. In my humble opinion the movement cannot be called a language agitation ; though language agitation runs parallel to it. Since the last Budget Session in April, declaration of Assamese as State Language was demanded by all parties in Assam. The A, P, C, C adopted a resolution in support of declaration with phased introduction in the Non-Assamese speaking areas. The Chief Minister announced that a bill will be introduced in the autumn session. As a mark of protest some Khasis & Bengali boys in June last, took out a procession at Shillong, shouting slogans as Assamese language as donkey's language. This has been followed by some stabbing cases on Assamese, which compelled the Assamese families to leave Shillong. Some took shelter in Assembly hostel. On July 4th. a student of Cotton College Hostel was shot dead by police & six hostellers sustained injuries. The site was shown to Sri Menon, Sri Nehru, Sri Reddi. They were all boarders of the hostel at Gauhati. Sri P, L, Shome, I, A, S, was the Deputy Commissioner of Gauhati. A news got wide currency that Shri Shome, a Bengali, got the boy killed. On 6th July a mourning day was observed by holding silent procession & hartal. The day dawned without any incident. We at Nowgong could not imagine that such an agitation will take place till 10 P, M. Before the procession could move out, cases of Arsont loot took place. Inadequate police force could hardly meet the situation. Our police

people had no previous experience of similiar happenings in Assam, so they, were at a fix. Wild rumours spread through out the district about horrors commited elsewhere Infuriated mob took law into their own hands. Extensive damage was caused to houses& properties. A few lost their lives. Contribution of a section of Calcutta Press to this, is lamentably disgraceful. Military had to be called in all districts to assist the police force. Curfew, sec 144, had to be promulgated everywhere. Still military are there.

Peculiarly enough sanity came back soon for reasons which I cannot express in this letter. Now people are very much repentant. The plight of the people baffles description.

It is all on a sudden uprise. It is all lotted in the forehead of Assam that never knew even a communal clash, People are busy now in rehabilitating the distressed. They constructed houses with local material, invited the Bengali friends to there original village. It is a sight to see. If you come once you can see what a peculiar land. It is a complex land, where very simple people resides, it is a rich land where very poor people lives. We hope that you will not misunderstand us. This is all about Assam today.

Affectionately yours
Jagesh Chandra

নাট্যজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে ক্রমশঃ এক আইন ব্যবসায়ীতেই পরিণত হতে লাগলাম। কিন্তু আত্মাবুভুক্ষু থেকে যেতে লাগল। যন্ত্রমানবে পরিণত হতে লাগলাম ধীরে ধীরে। প্রতিকূল। জীবন-

নদীর প্রতিটি কূলেই প্রতিকূলতা। দেখতে দেখতে পঁয়ষট্টি বৎসরে উপনীত হলাম। পঁয়ষট্টি বৎসর। বাঙ্গালীর জীবন স্বল্পায়ু। আমার কত অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হল। কিন্তু বৃথা নয়। বৃথা নয়। জগতে কোন জিনিষই বৃথা নয়।

চোখে কম দেখতে লাগলাম। এক ডাক্তার বন্ধু বললে, আপনার চোখে ক্যাটারাক্ট সুরু হয়েছে। বিহারী ডাক্তার। কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়া। চমৎকার বাংলা বলে। ইংরিজীতে কবিতা লেখে। ডাঃ রামচন্দ্র শর্মা।

শরীরের দৌর্ব্বল্য, অনুভব করতে লাগলাম। চুলে পাক ধরতে আরম্ভ করল। দাঁত পড়তে আরম্ভ করেইছিল। একটি একটি করে প্রত্যেকটি দাঁত তুলিয়ে ফেললাম।

আমি এক অস্বাভাবিক মানুষে পরিণত হলাম অবশেষে। জগতের অনেক সুন্দর জিনিষ দেখতে পাইনা। অসুন্দর জিনিষের দিকেই আগ্রহ বেশী। প্রেম নেই। প্রেমের অভিনয় আছে। নারী এখনও হাতছানি দেয়। ভাবি ওদের কাছেই বুঝি আছে, জীবনের সমস্ত রহস্য। সাহিত্যের শাশ্বত সত্য। লেখনী রমণীরমণের চিত্র আঁকতে অসাধারণ ক্ষিপ্র। ভাবি আমার সাহিত্যিক সত্তার একি অস্বাভাবিক পরিণতি !

আমার ঐকান্তিক প্রার্থনার একটি সুফল ফলল। আমি আস্তে আস্তে অক্টোপাসের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে লাগলাম। এর জন্যে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।

থিয়েটরকে মনপ্রাণ থেকে বর্জন করেছি। অভিমান ? হবে।

একদিন সন্ধ্যার পর বাগবাজারের ফুটপাথে বেড়াচ্ছি। ছেলে, ছেলের বৌ, বেশী দূরে যেতে বারণ করেছে। কিন্তু কে যেন বিধান-সরণীর দিকে টেনে নিয়ে গেল। কে যেন পাঁচ মাথার মোড় পার করিয়ে দিল। অন্যমনস্কভাবে এক পা এক পা করে এগুতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি কখন স্টার থিয়েটরের সামনের ফুটপাথে এসে পড়েছি।

কি অদম্য কৌতূহল যে হল তা বলে বোঝাতে পারব না। রাস্তা পার হলাম। থিয়েটরের সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। সেই বুকিং-অফিস। 'মঞ্জুরী' নাটক হচ্ছে। দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালক। নামটা চেনা চেনা মনে হতে লাগল। ভেতরের দিকে যেতে লাগলাম। একটা চোখে কোন রকমে কাজ চালাচ্ছি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হোঁচট খেলাম।

গেলাম ওপরে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ছোট ঘর। দরজা বন্ধ। ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। সেই চেনা মুখ। সেই স্নিগ্ধ হাসি। সেই রং। সেই দেবনারায়ণ বাবু। সেই কালো চুল মাথায়। সেই যুবকের মত চেহারা। সেই মিষ্টি কোমল মার্জিত কণ্ঠ। বললেন—আসুন। নমস্কার। দেখুন! আপনারই নাম পড়ছিলাম। এমন সময় দরওয়ান এসে আপনারই লেখা slip দিল।

অবাক হয়ে বললাম—আমার নাম? কোথায় পড়ছিলেন?

দেবনারায়ণবাবু মধুর হাসি হাসলেন।—এই দেখুন! বলে ছাপানো একটা রচনা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। ওঁরই লেখা। প্রবন্ধের নাম—বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অর্দ্ধ-শতাব্দী। বললো—এই দেখুন! চল্লিশ দশকের নাট্যকারদের মধ্যে রয়েছে আপনার নাম। এই দেখুন! বিশ্বাস হচ্ছে না?

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সত্যিই আমার নাম। ছাপার অক্ষরে। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে? বললাম—আমি ত নাটক লেখা ছেড়েই দিয়েছি। আমার নাম আর কেন?

দেবনারায়ণবাবু হেসে বললেন—আপনি ছাড়তে পারেন আমাদের। কিন্তু আমরা ছাড়তে পারি না আপনাকে। বুঝলেন?

এটা ওটা সেটা কথা বলে, চলে এলাম। আসতে আসতে ভাবতে লাগলাম—একি অদ্ভুত কাণ্ড! এসেছি চোখ কাটাতে। রক্তে চিনির আধিক্য। অতএব বিলম্ব হচ্ছে অপারেশনের। এমন সময় একি অদ্ভুত কথা কানে এলো। 'আপনি ছাড়লেও আমরা ছাড়তে পারি

না।' এই হল ভাব-প্রবণ বাংলাদেশ।

সালটা ছিল ১৯৭২। সেই বছর বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের বয়স একশো বছর পূর্ণ হল। শতবার্ষিকী সমারোহে অনুষ্ঠিত হবে। একটা স্মারক-সংখ্যাও বেরুবে। আমাকে দেবনারায়ণবাবু অনুরোধ করলেন একটা লেখা দিতে। শিশিরকুমার সম্বন্ধে। বাড়ী ফিরে এলাম। পরদিন দিয়ে এলাম দেবনারায়ণবাবুকে। তাঁর ঘরে সে সময় ছিলেন রণজিৎমল কাঙ্কারিয়া। ষ্টারের নতুন মালিক। দেবনারায়ণবাবু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন—ছাপরার অ্যাডভোকেট। অ্যাসিষ্টাণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটর। কিন্তু আমি যে নাট্যকার সে কথাটা বললেন না। কাঙ্কারিয়া স্থূলকায় মাড়বার-তনয়। বাংলা বলেন ভাঙ্গা। ভাঙ্গা। তিনি পাঁচখানা প্রথম শ্রেণীর পাস দিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"মঞ্জুরী" দেখলাম। আশাপূর্ণাদেবীর কাহিনী। দেবনারায়ণবাবু নাট্যরূপ দিয়েছেন। মনে হল দেবনারায়ণবাবুর সমস্ত পরিশ্রমটাই ব্যর্থ হয়েছে বিস্তর। আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে সুন্দর। কিন্তু নাটকে নাটকত্ব নেই। ঘটনা আছে। কিন্তু ঘটনা ত নাটক নয়। ইভেণ্ট, এ্যাকশন নয়। আমরা গল্প শুনতে রঙ্গমঞ্চে যাই না। নাটক দেখতে যাই। নরনারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব। দেখলাম যেখানে নাটকের সৃষ্টি হয়েছে, সেইখানেই নাটক শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এর পূর্বের সবকিছুই নিছক ঘটনা। কাহিনীর আবর্জনা। নাটকের বড় ভূমিকা। কিন্তু নাটক নয়। গল্প। স্বামীর মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাবার ক্ষমতা নাট্যকারের নেই। ঔপন্যাসিকেরও নেই। অতএব নাটক চলবে কি করে? চললও না।

আমার জামাতা তাপসবাবাজীবন একদিন এসে বললে—চলুন বাবা। থিয়েটার দেখতে যাই। "তিন পয়সার পালা"। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনা। ব্রেখটের নাটক। আজকাল ব্রেখট ব্রেখট করে বাংলাদেশ পাগল হয়ে উঠেছে।

বললাম—নাটক দেখতে মানা যে! চোখেও ভাল দেখি না। কি করব গিয়ে?

জামাতা অনুযোগের সুরে বললে—টিকিট তিনটে এনেছি যে।

অগত্যা যেতেই হল। জামাতাকে অসন্তুষ্ট করতে পারি না। সঙ্গে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ জামাতা।

তিনজনে বসে বসে নাটক দেখছি। ভাল লাগছে না। ছেলেখেলা মনে হচ্ছে। দর্শকদের মন ভোলাবার চেষ্টা শুধু। ছলে বলে কৌশলে, যেমন করে হোক দর্শকদের খুসী করতেই হবে। অজিতেশবাবু নাচলেন পর্যন্ত। কি নাচ? নন-ইনস্ক্রীপ্ট। তবু এক প্রকার দেহ দোলানো ত বটে। সঙ্গে বাজনা বাজছে। সঙ্গিনীও নাচছে। নর-নারীর যুগল নৃত্য। উপযুক্ত বাদ্য সহযোগে। আর কি চাই? অবাক কাণ্ড! ভাবলাম যুদ্ধোত্তর ছিন্ন-ভিন্ন জার্মানীতে যা চলে, ভারতে স্বাধীনোত্তর যুগে তা কেমন করে চলবে? দুই দেশের দুই রকম প্রশ্ন। সার্বজনীন আবেদন কিছুই নেই। একটু রক্তিমাভা উঁকি মারছে মনে হল। সমাজবাদী জার্মানীর নাটকে উঁকি মারবেই। কিন্তু ভারত উঁকি মারছে না। এক পাঁজা ভিখিরী আর কুষ্ঠ রুগী জোগাড় করলেও না। এখানে স্বাধীনোত্তর যুগের গঠন প্রয়াস কোথায়? এতে প্যাঁচ আছে নানারকম। শেষটাতো যাতাকাণ্ড। রীতিমত হাস্যকর। সত্যিই ঘিনঘিনে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। সঙ বেরুলো। চৈত্র মাসের সঙের মত। শঙ্কর-পার্বতীর নাচ-নাচানো হল। ব্রেখটের নাটকে, শঙ্কর-পার্বতী? ভাগ্যিস ব্রেখট ষোল বছর আগে মরেছিল।

শিশিরবাবু যে বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে ভারতীয় চরিত্র দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছিলেন? সে মঞ্চ কোথায় গেল? সে সত্য-দৃষ্টি কোথায় গেল? সেই যথার্থ আবেগ? এখানে ত দেখছি সব মিথ্যা দিয়ে ভরা। নাটকের চরিত্রগুলো দেশেরও নয়। দশেরও নয়। ঘরেরও নয়। ঘাটেরও নয়। ধোবার কুকুর। এ দিয়ে কদিন লোকের মন ভোলানো যেতে পারে? অজিতেশ অথবা রুদ্রপ্রসাদকে আমি বড় অভিনেতা

বলতে পারি কখনো ? রয়েছে শুধু অনুকরণ-স্পৃহা। বিদেশী নাটকের আড়ালে আত্মদুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা। দাস-মনোভাব অত্যন্ত প্রবল। এখনো এদের সামনে ভারত-আত্মার সচেতনতা উপলব্ধি হয়নি। অন্ধ অনুকরণ চলেছে মাত্র। অস্ট্রিয়ার মুদ্রা গ্রসচেন। ১০০ গ্রসচেনে এক শিলিং। এক শিলিং-এ ১০০ সেন্ট। মরিশাসে ১০০ সেন্ট-এ এক রুপী। সেই হিসেবে ড্রাইগ্রোচেন অপেরা "তিন পয়সার পালা" হতে পারে। কিন্তু তাতে শঙ্কর-পার্বতীর নাচ অপ্রাসঙ্গিক। জোর করে ঢোকানো। নামটাও 'তিন নয়া পয়সার পালা' বললে আরো ঠিক হত। পয়সা নয়। নয়া পয়সা।

নাটক শেষ হল। এবার বাড়ী ফিরে আসবার কথা। হঠাৎ আমার পুরাণো রক্ত নেচে উঠল। রংমাখা পোষাক-পরা অজিতেশ নয়। আসল অজিতেশকে দেখতে চাই। বর্তমান বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কর্ণধারদের ভাল করে দেখতে চাই। চিনতে চাই। কথা বলতে চাই। এদের লক্ষ্য কি ? কেবল অর্থোপার্জন ? অথবা নাট্য-সরস্বতীর সেবাও ? দেখতে হবে।

সাক্ষাৎ প্রার্থী হলাম। আহ্বান এলো "রঙ্গণায়" অভিনয় হচ্ছিল। দোতালায় অজিতেশবাবুর ড্রেসিংরুম। অজিতেশবাবু মেক-আপ তুলছিলেন। আমায় প্রণাম করলেন। অবাক হয়ে গেলাম। বাংলারঙ্গমঞ্চের হয়ত সবই গেছে। কিন্তু একটা ঐতিহ্য এখনো আছে। রামকৃষ্ণ আশীর্বাদ পুত ঐতিহ্য। গিরিশ ঘোষ অনুসৃত ঐতিহ্য।

একথা সে কথার পর জিজ্ঞেস করলাম—বাংলার নাটকের ভবিষ্যৎ কি ? বিদেশী নাটক করুন। কিন্তু বাংলা নাটকও এক-আধটা করুন।

বললেন—তেমন নাটক কোথায় ?

লজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, নিজের "এক অধ্যায়" নাটকের কথা। শিশিরবাবু পছন্দ করেছিলেন। রিহার্স্যাল দিইয়েছিলেন। মঞ্চস্থ করতে পারেন নি তাঁর থিয়েটর উঠে গেল বলে।

তিনি বললেন—জানি না ত ?

অজিতেশবাবুর অতি সুশ্রী চেহারা। গৌরবর্ণ রং। দীর্ঘকায়। কিন্তু মনে হল যে পথ তিনি নিয়েছেন সে পথ বীরের পথ নয়। অনুকরণ করে কেউ বড় হতে পারে না। মেকি জিনিস কখনো খাঁটি হতে পারে না। শিশিরবাবু কখনো বিদেশী নাটক অনুবাদ করে অভিনয় করেননি। রবীন্দ্রনাথের মত তাঁরও মত ছিল "আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসী।"

অজিতেশবাবু কিন্তু যথার্থ ভদ্র ব্যক্তি। বললেন—নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র দেখেছেন?

বললাম—বই পড়েছি। ইংরিজী অনুবাদ। পিরাণ্ডেলো নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে। চল্লিশ বছর পরে তার আবেদন কি ফিকে হয়ে যায় নি?

তিনি বললেন—দেখুন আমাদের প্রযোজনা। আপনার ভাল লাগবে নিশ্চয়ই। যখন খুশি আসবেন। বুকিং অফিসে নামটা বলবেন। তাহলেই হবে। বলবেন, আমি আসতে বলেছি।

বললাম চোখে ভাল দেখতে পাই না। অপারেশন করাতে এসেছি। একা আসতে পারব না।

বললেন, সেকি কথা! একা আসবেন কেন? যতজন ইচ্ছে সঙ্গে আনবেন।

'এক অধ্যায়' পড়ে দেখতে চান কিনা জিজ্ঞেস করলাম।

বললেন, চাই। বুকিং অফিসে দিয়ে যাবেন।

কয়েক দিন পরে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র' দেখতে গেলাম। সঙ্গে মেয়ে ছিল। হাস্যকর দিকটা ভালই লাগতে লাগল। কিন্তু যেখানে অজিতেশবাবু একটি নাবালিকা সৎ কন্যার প্রতি জৈবিক ভালবাসার কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন, সেখানে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। নাট্যাচার্য নেই। কে এইসব নিবারণ করবে? বাংলার দর্শক নিশ্চয় যৌনক্ষুধায় কাতর। বাসি পচা দুর্গন্ধ খাদ্যও খেতে পারে। বিদেশী হোটেল থেকে আনা হলেই হল। কুকুরের সংগে হলেও চলবে।

এমন মর্মান্তিক দেহের ক্ষুধা।

সবচেয়ে খারাপ মনে হল নাটকের শেষটা। একটা চরিত্র মঞ্চ থেকে নেমে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। প্রেক্ষাগারের মধ্য দিয়ে। কিন্তু চমৎকারিত্ব এলো কই? বোঝাই গেল না যে নাটক শেষ হয়েছে। নাটকের অগ্রগতিও যেমন পূর্বাভাস প্রদত্ত হওয়া চাই, নাটকের পরিণতিও তেমনি পূর্বসূচিত ইঙ্গিত অনুসারেই শেষ হওয়া চাই। তবে সার্থক পরিণতির আনন্দে মন পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে। অনুমানের ওপর নাটকের শেষ ছেড়ে দিলে বাঞ্ছনীয় উল্লাস মনে জাগে না। অপরিতৃপ্তির অসোয়াস্তি যেন বিঁধতে থাকে মনে। সবই প্রত্যক্ষ, প্রকট ও গোচরীভূত হওয়া চাই। উপন্যাসে যা চলে, নাটকে তা চলে না।

'নাট্যকারের সন্ধানে' নাটকে চমক আছে। নাটকীয়তা আছে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্তভাবে বীরংসাও আছে। দর্শক তাই দেখতে আসে। কিন্তু পিতা-পুত্রী পাশাপাশি বসে দেখতে দেখতে যৎকিঞ্চিৎ অসোয়াস্তি অনুভব করে। সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। গাউন-পরা মেয়েদের নিয়ে এসব নাটক মঞ্চে চললেও চলতে পারে। শাড়ী-পরা মেয়ে নিয়ে এসব দেখাতে গেলে লক্ষ্য একটু ভ্রষ্ট হয়ই। এ কখন বেশিদিন চলতে পারে না। চোখের সামনে এর মৃত্যুও দেখতে পেলাম। আজ এই নাটক আর হয় না কেন? 'তিন পয়সার পালা' আর হয় না কেন?

'নাট্যকারের সন্ধানে' বুদ্ধির দরজায় সুড়সুড়ি দেয়। হৃদয়ের দরজায় ঘা দেয় না। প্রাণকে রসায়িত করে তোলে না। চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করে না। ফটকা-ফাটানোটা ফটকা ফাটানো হয়েই রয়ে যায়। কারুর প্রাণ গেল বলে মনে হয় না। আগাগোড়া ছেলেখেলা বলে মনে হয়। এই কি নাটক? এই দেখে বাংলার দর্শক পরিতৃপ্ত? কদাপি নয়। অন্য জিনিস চাই।

কি সে জিনিস?

ঈশ্বর জানেন শুধু।

কিন্তু পরাণুকরণ কখনই নয়। ভারতের আত্মাকে খুঁজে বের করতে হবে। এমন কি একটু চড়া সুরে হলেও চলবে। যেমন চলেছে যাত্রায়।

'সিঁদুর দিও না মুছে', 'সংসার গেল যে ভেসে', 'ঘর দিও না ভেঙে', 'স্বামীর কোলে মৃত্যু'। এইসব পালার মধ্যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত কোথায়? নামে তো সব বলে দেওয়া হচ্ছে। দর্শকের কল্পনার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কতটুকু? মোটা তুলি। গাঢ় রং। তবু সেও ভাল। তার মধ্যে দেশের মানুষ আছে। দেশের কথা আছে।

কয়েক দিন পরে গেলাম 'রঙ্গনার' বুকিং অফিসে 'এক অধ্যায়' নাটক দিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু কেউ নিল না। কাউণ্টারে বসে থাকা ছেলেটি বলল আমরা অন্য দল। নান্দীকার' দল নই। আমরা আপনার বই রাখতে পারব না। বাঁচা গেল। ফিরে এলাম। 'এক অধ্যায়ে'র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কিছু করবার রইল না। ভাবলাম এইভাবে পাণ্ডুলিপি নিয়ে বালখিল্য সম্প্রদায়ের দ্বারস্থ হওয়া উচিত হচ্ছে কি? উচিত হচ্ছে না। তবু করছি।

কাছেই 'বিশ্বরূপা'। একদিন সেখানে শিশিরবাবু সিংহের মত বিরাজ করছিলেন। কেশরী বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলেও কেশরীত্ব হারায় না। শিশিরবাবুও হারান নি। কিন্তু লক্ষ্মী অকরুণা। সরস্বতীর সেবককে করুণা দেখালেন না। সব প্রায় সেই। সেই নাট্যালয়। আজ আমি এখানকার কেউ নই। অথচ একদিন ছিলাম এখানকার এক সম্মানিত নাট্যকার। এই হল চলমান জীবন। প্রবহমান জলস্রোত। সময়। সময়। সময়ের মত সাহানসা সম্রাট আর কেউ নেই।

রাসবিহারী সরকার এখন বিশ্বরূপার কর্তা। অফিস সাজিয়ে বসে আছেন। দরজায় পরমেশ্বর নামে এক প্রতিহারী। মাঝে মাঝে ডাকছেন পরমেশ্বর পরমেশ্বর করে। বেয়ারা আসছে। হুকুম শুনছে। চলে যাচ্ছে। সেজেছেন যেন অফিসের বড় সাহেব। করছেন তো থিয়েটার। দরজায় রেখেছেন পাহারা। আমি ঢুকতে গিয়ে বাধা

পেলাম। পরমেশ্বর আটকালো।

বললে—একটু অপেক্ষা করুন।

কি নাম আপনার?

বললাম, সব প্রহসন মনে হল। কিন্তু উপায় নেই। এ প্রহসনের হাত থেকে রক্ষা নেই। খানিক পরে ডাক এলো। গেলাম। রাসবিহারীবাবুর সঙ্গে পরিচয় ছিলই। একটু ঠোঁট টিপে হেসে বললেন কি ব্যাপার? আসুন। বসুন।

বললাম, ব্যাপার কিছুই নয়। এমনি এসেছি।

রাসবিহারীবাবু মার্জিত-রুচি ভদ্রলোক। কথা বলতে জানেন।

জিজ্ঞেস করলেন কলকাতায় কেন?

বললাম অস্ত্রোপচার করাতে। হাতে প্রচুর সময়। ভাবলাম—রাসবিহারীবাবু ভদ্রতার অবতার। বললেন, নিশ্চয়! 'চৌরঙ্গী' দেখেছেন?

বললাম—না।

তিনি বললেন, তাহলে দেখুন।

বললাম, আমরা দেখে আর কি করব? আমাদের যুগ ত গত।

তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন, তা যা বলেছেন। আপনারা ছিলেন শিশিরযুগের নাট্যকার। আর শিশিরযুগ ত এখন গত। আমরা এখন নাটক চাই না। একটা নাট্য ভাবনা চাই। যা অবলম্বন করে আমরা নাচ গান, দৃশ্য, আলো-টালো ফেলে দেখাতে পারি।

আমিও সায় দিয়ে বললাম—অবশ্য। অবশ্য। সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থাগমের ব্যবস্থাও করতে পারি। নয় কি?

তিনি লজ্জিত হলেন না। হেসেই বললেন—নিশ্চয়। এটা ত আমাদের।

সঙ্গে সঙ্গে পাদপূরণ করে দিলাম—বিজনেস।

তিনিও বললেন—হ্যাঁ। দান-খয়রাত করতে ত আর বসিনি। বিজনেস করতেই বসেছি। এই দেখুন না শেফালীকে তিন হাজার

করে প্রতিমাসে দিই। প্লাস ট্যাক্সি ভাড়া দশ টাকা। তবু লাভ থাকে। এই দেখুন না একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছি 'যুগান্তরে'। সাতাশশো টাকা লাগল। তাতেও ক্ষতি হয়নি। যে টাকাটা ঢালছি, সে টাকাটা ফিরিয়ে দিলেন দর্শক। তা দেখুন না আমাদের নাটক একদিন। কেমন লাগল বলবেন। আপনার ভাল লেগেছে জানলে আমরাও খুশি হব। আজ একলাই দেখুন। বিচারকের দৃষ্টিতে দেখুন। আর একদিন পরিবারের সকলকে দেখাবেন। কেমন?

রাজী হলাম। বসেই রইলাম।

তিনি বললেন থিয়েটর শেষে কিন্তু আমার সঙ্গে একটু কথা বলে যাবেন।

রাসবিহারীবাবু সফল ব্যবসায়ী। ব্যবহার কুশল ভদ্রলোক। দেবতাদের ভক্ত। সাধু-সন্ন্যাসীরও ভক্ত। মা-কালীরও ভক্ত। তাঁর টেবিলের বাঁ পাশে দেওয়ালের গায়ে সাধু-সন্তদের ছবি। একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে এল। একটা নতুন জিনিস দেখলাম। রাসবিহারীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। প্রণাম করলেন মূর্তিদের। ধূপ জেলে দিলেন তাঁদের সামনে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। সত্যিই ভক্ত মানুষ। ওঁর এই পরিচয় জানতাম না। বললাম আপনি ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাসী নাকি?

তিনি বললেন নিশ্চয়। মাই ত সব চালাচ্ছেন। আমি কে? কিছুই নই।

বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। বাংলা থিয়েটরের প্রাণশক্তি এখনো এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর। গিরিশ ঘোষের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। মা-ই সব করছেন। শিশিরবাবুর মুখে এ রকম ধারা কথা কখনও শুনিনি। তাঁর দেবদ্বিজে ভক্তি কখন দেখিনি।

'চৌরঙ্গী' দেখলাম। দেখতে দেখতে ভাবলাম থিয়েটর আজ ব্যবসায়ীর হাতে এসে কোথায় নেমে পড়েছে। যেন-তেন প্রকারেণ

অর্থ চাই। শিশিরবাবু এই অনাচার আটকিয়ে রেখেছিলেন। আমাকে একদিন গর্জে উঠে বলেছিলেন—থিয়েটরটাকে ব্রথেল বানাতে চাই না। তিনি অসফল ব্যবসায়ী। তিনি ভেসে গেলেন। তবু নারীর অনাচ্ছাদিত দেহ দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন নি। এ তো রীতিমত নগ্ন-নৃত্য। প্রকৃতির সাজে সজ্জিতা। একদিন ওঁর দাদা দক্ষিণেশ্বরবাবু মঞ্চে ট্রেনের চাকার আওয়াজ শুনিয়ে বাজীমাৎ করেছিলেন। মঞ্চের পি-সি-সরকার হয়েছিলেন। আর একদিন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারীর উলঙ্গ জংঘা আর অনাবৃত পৃষ্ঠ দেখিয়ে বাজীমাৎ করলেন। নিরাবরণ নাভি আর বিলিতি বাদ্যের সঙ্গে দোদুল্যমান কটি দেখিয়েই দর্শকাকর্ষণে সমর্থ হলেন। অর্থাকর্ষণেও সমর্থ হলেন। নাট্য-সরস্বতী লজ্জায় অধোবদন হলেন কিন্তু যুগল-ভ্রাতা মস্তক উন্নত করেই বেড়াতে লাগলেন। কোথায় কোন্ মফঃস্বলের অনুষ্ঠানে। বাইরে গিয়ে নাট্যশাখার সভাপতিত্বও করে এলেন। আর যায় কোথায়? নাট্য-বিশেষজ্ঞ হয়ে গেলেন।

কাগজে দেখেছিলাম সন্তোষকুমার ঘোষ "রবীন্দ্র পুরস্কার" পেয়েছেন। তিনি আমার পূর্ব-পরিচিত। তাঁর পিতা ছাপরায় থাকতেন। তাঁর মামা ছাপরায় ডাক্তারী করতেন। ডাঃ মনোমোহন বোস। ভাবলাম একবার দেখি তাঁর সঙ্গে দেখা করে। কোন আলোক যদি তাঁর কাছ থেকে পাই। সুতারকিন স্ট্রিটে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ওপরে ডেকে পাঠালেন। শিশিরবাবুর চিঠি পড়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমায় তাঁর ভবানীপুরের বাসায় দেখা করতে বললেন। দেনা ব্যাঙ্কের ওপরে। গেলাম একদিন। খুব সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন। একটা উপন্যাস তাঁকে দিয়ে এলাম। তিনি কোন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়ে দেবেন বললেন।

তাঁর বাসাতেই দেখা হল চিত্তরঞ্জন ঘোষের সঙ্গে। যাদবপুর কলেজের অধ্যাপক। অতি সুশ্রী চেহারা। অতি অমায়িক মানুষ। তাঁকে শিশিরবাবুর লেখা ১২৫ খানা চিঠির কথা বলাতে রীতিমত অবাক

হলেন। আমার ঠিকানা চাইলেন। বললেন—একদিন আসবেন আমার বাগবাজারের বাসায়। শিশিরবাবুর আসল চিঠিগুলি দেখবেন।

তিনি একদিন এলেনও। চিঠি দেখালাম। কয়েকটি চিঠি প্রকাশ করতে চাইলেন "বহুরূপী" পত্রিকায়। যার সম্পাদনার ভার সেসময় তাঁর হাতে। কয়েকটা চিঠি কপি করে দিলাম। দু'খানা অরিজিনল চিঠিও দিলাম। ফটোষ্টাট কপি করাবার জন্য।

তিনি একদিন এসে কয়েকটা পাস দিয়ে গেলেন। অ্যাকাডেমীতে "বহুরূপীর" অভিনয় হচ্ছে। নাটক "টেরোডেক্‌টাইল"। কৌতূহল হল। গেলাম দেখতে। দেখে কিন্তু খুসী হতে পারলাম না। একি নাটক? এতো জগাখিচুড়ী। কয়েকটা নাটকের সংমিশ্রণ।

অভিনয়ের শেষে দোতলার গ্রীনরুমে গেলাম। শম্ভু মিত্রের সঙ্গে দেখা হল। তিনিও আমার পরিচিত। অনেক দিন পরে দেখা। বিশ বৎসরের ওপর। তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে বললাম— তাঁকে আমি অভিনেত্রী হিসেবেই দেখতে চাই। নির্দেশিকা হিসেবে নয়। ওই নাটকের নির্দেশিকা তিনিই। তিনি হাসলেন। স্বামীকে বললেন—শুনছ? ইনি বলছেন আমাকে নির্দেশিকা দেখতে চান না। অভিনেত্রীই দেখতে চান। শম্ভু মিত্রও শুনে হাসলেন। ওঁদের কন্যা শাঁওলীর অভিনয়ও দেখলাম। তিনি মায়ের কাছ থেকে ভাল শিক্ষাই পেয়েছেন। জননীর অভিনয়ের ধারাই অনুসরণ করছেন। থিয়েটারের সেট, কম্পোজিশন ইত্যাদি ভাল। ফ্রিজ অ্যাকটিং দেখলাম। শম্ভু মিত্রের "বিভাব" দেখলাম। খুব সচেতন শিল্পী। তিনি শম্ভু মিত্রের পার্ট'ই করছিলেন। অতএব মার্জনীয়। "টেরোডেক্‌টাইল" নাটকে ম্যাজিসিয়ানের পার্ট করছিলেন। সে অভিনয় খুব উচ্চাঙ্গের বলে মনে হল না। তিনি "রবীন্দ্র ভারতী"র "শিশিরকুমার ভাদুড়ী" অধ্যাপক। হয়ত তাঁর ছাত্ররাও দর্শক ছিলেন। মনে হল সে সম্বন্ধে যেন খুবই সচেতন তিনি। তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় দেখেছিলাম "সেতু" নাটকে।

দক্ষিণেশ্বরবাবু দেখিয়েছিলেন। ভেতরে নিয়ে গিয়ে তৃপ্তি মিত্র ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা যেন কালের গতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারছেন না। নইলে এরকম নাটক পছন্দ করেন কেন? টেরোডেক্‌টাইল? ফসিলের নাম। নামের ইঙ্গিত কি?

একদিন বসে আছি স্টার থিয়েটরে। দেবনারায়ণবাবুর ঘরে। কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হল। "রূপমঞ্চ" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি আমার খবরাখবর জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। বললাম সব। অজিতেশবাবু আমাকে নাটক বুকিং অফিসে দিয়ে যেতে বলেছিলেন শুনে এত জোরে হেসে উঠেছিলেন, যে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বললেন—শিশিরবাবু যাঁর নাটকে স্বয়ং অভিনয় করেছিলেন, তাঁকে বুকিং অফিসে নাটক দিয়ে আসতে বলেছেন শুনে হাস্য সম্বরণ করতে নাকি পারেন নি। এতে হাসবার কি কারণ আছে জিজ্ঞেস করাতে বললেন—আপনাকে আরও একটু সম্মান দেখানো ওঁদের উচিত ছিল।

তিনি একদিন তাঁর অফিসে যেতে বললেন।

একদিন গেলাম। তিনি আমার নাম ধাম, শিক্ষা দীক্ষা, বংশ পরিচয় ইত্যাদি সব লিখে নিলেন। আমায় দিয়ে সই পর্যন্ত করিয়ে নিলেন। বললেন—আপনার জীবনী-প্রকাশ করব। থিয়েটরের মালিকরা নাট্যকারদের প্রচার করেন না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরই প্রচার করেন। সাংবাদিকের কাজ নাট্যকারদের প্রচার করা।

তাঁর সঙ্গে নানা কথা হল। কোথায় কোথায় গেলাম। কি কি থিয়েটর দেখলাম, ইত্যাদি। কিছু কিছু টিপ্পনীও দিয়ে যেতে লাগলাম সঙ্গে সঙ্গে। তিনি বললেন—আপনি এসব লিখে ফেলছেন না কেন? বললাম—লিখে কি হবে? কে ছাপাবে?

তিনি বললেন—যদি, যদি, যুক্তি-সঙ্গত লেখা হয়, আমি ছাপাবো। আপনি লিখে দিন না। বর্তমান থিয়েটর সম্বন্ধে আপনার

মতামত।

বললাম—আচ্ছা।

কিছুদিন পরে একটা লেখা নিয়ে এলাম। আর একজন ভদ্রলোকও ছিলেন। বললেন—পড়ুন। ইনি একজন অধ্যাপক। ইনিও শুনুন

পড়লাম। কালীশবাবু বললেন—ভাল হয়েছে। ছাপাবো।

অধ্যাপক মহাশয় বললেন—এই রকম লেখা লিখতে কলকাতায় কেউ সাহস করবে না।

বললাম—আমি কলকাতার নই। তাই বোধহয় সাহস করেছি। কথাগুলো কি অসত্য?

ভদ্রলোক বললেন—না ঠিকই লিখেছেন।

বললাম—এই ১৯৭২ সালে যখন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সগৌরবে সম্পন্ন করতে চলেছে। তখন বাংলার মৌলিক নাট্যকাররা কোথায়? যদি বলি পেশাদার রঙ্গমঞ্চ বাংলা মৌলিক নাটকের নাট্যকারদের হত্যা করেছে, কিছু অন্যায় বলি কি? বর্ত্তমান বৎসরে একটাও মৌলিক নাটক কলকাতায় কোন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে কি? সবই ত অনুবাদ। কিম্বা উপন্যাস থেকে নাট্যরূপ। ট্রেনের হুস্ খুস্ শব্দ। আর জলের খল্‌বল আওয়াজ নিয়ে ত অনেক দিন কাটল। আর কাটছে না কেন? মনে হচ্ছে থিয়েটর সিনেমার কাছে হার স্বীকার করেছে। সিনেমার অনুকরণ করে চলেছে।

কালীশবাবু এবং অধ্যাপক মহোদয় উভয়েই স্বীকার করলেন তা। লেখা দিয়ে চলে এলাম। লেখাটা কিছুদিন পরে "রূপমঞ্চে" প্রকাশিত হল। নাম দিয়েছেন কালীশবাবু নিজেই। "আমার নাট্য-সাধনা।" লেখক—নাট্যকার জিতেন মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশের সময় লেখাটা ভালই লেগেছিল। আজ সেই লেখাটা পড়ে লজ্জায় মাথা নীচু করছি। ইতিমধ্যে আমার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। সেই লেখক আর নেই। অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

সজনীকান্তের পুত্র রঞ্জনের কাছে গেছি। তিনি বললেন—আপনি একটা কাজ অন্ততঃ করে যান। আমরা শুনেছি শিশিরকুমার যুগ-স্রষ্টা। কিন্তু কেন যে যুগস্রষ্টা তা জানি না। আপনি এই জিনিষটি আমাদের বুঝিয়ে দিন।

বললাম—আচ্ছা। ভেবে দেখব।

তাকে একটা প্রবন্ধ দিয়ে এলাম। তিনি খুব যত্ন করে নিলেন। চা খাওয়ালেন। তেতালায় নিয়ে গেলেন। দেখলাম, সজনীবাবু উত্তরাধিকারীদের জন্য ভাল ব্যবস্থাই করে গেছেন। সে লেখা কিন্তু আজও ছাপা হল না।

প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি থাকেন মাণিকতলার মোড়ে। একটা তেতালা বাড়ীর তিন তলায়। দরজায় বিদ্যুৎ-ঘন্টি টিপলাম। একটি সুশ্রী মেয়ে দরজা খুলে দিল। বললে—বাবা অসুস্থ। নাম বললাম। খবর দিতেও বললাম। একটু পরে এসে বললে—আসুন। বারান্দা পার হয়ে ভেতরে গেলাম। মন্মথ বাবু বিছানায় শুয়ে আছেন। দীর্ঘ দেহ। বড় বড় চোখ। ভাব-প্রবণ মুখ। বললেন—দেখছেন ত হার্ট-অ্যাটাক-এর রুগী। নড়াচড়া বারণ। কথা বলাও বারণ। তবে আপনি এসেছেন। আমার সৌভাগ্য। বসুন।

নানা কথা হল। আমার কাছে শিশিরবাবুর চিঠিগুলো ছিল। তার কি ব্যবস্থা করা যায় জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন—অনুপকুমার দাস শিশির-স্মৃতি-রক্ষা-কমিটির সেক্রেটারী। তার সঙ্গে দেখা করুন। আর দেখুন, আর একটি কাজ করুন। শিশিরবাবুর সম্বন্ধে প্রামাণ্য পুস্তক লিখে যান। তিনি আপনার নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। তাঁকে আপনি খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে লিখুন।

বললাম—কি হবে? তিনি ত গত। কে আর তাঁকে জানতে চায়? তিনি অবসলিট হয়ে গেছেন।

মন্মথবাবু বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন—শিশিরবাবু ? না, না। মোটেই নয়। কি বলছেন কি। He is very much alive। লোকে তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহী। খুব জানতে চায় এখনো। আপনি লিখুন। publisher নিশ্চয় পাবেন। আমি বলব দু' একজনকে। আমি এখানকার সব সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোর হয় প্রেসিডেন্ট কিম্বা ভাইস্-প্রেসিডেন্ট। কলকাতার nerve centre-এ রয়েছি। আমি জানি। শিশিরবাবু মোটেই obsolete হয়ে যাননি নাটক লিখছেন। লিখুন। ভাল কথা। কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখে যান। এইটেকেই top-priority দিন।

বললাম—আচ্ছা ভেবে দেখব। চলে এলাম। এঁর সঙ্গে একটা নৈকট্য অনুভব করলাম। আমরা দুজনেই শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী। মন্মথবাবুকে দেখে মনে হল ইংরাজ রাজত্বের এক ব্যর্থ-ব্যক্তিত্ব পুরুষ। আশা করেছিলেন অনেক। কিন্তু আশানুরূপ সফল হতে পারলেন না।

আর একটি ব্যর্থ-ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিজীবির কাছে গেলাম। ইনি সুবক্তা। সুলেখক। সুঅভিনেতা। আবৃত্তিকার। সুরসিক। শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীদের একজন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল রেডিও মানে বীরেন ভদ্র। বীরেন ভদ্র মানে রেডিও। দশ বৎসর পূর্বে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। 'এক অধ্যায়' রেডিও থেকে প্রচারিত করেছিলেন।

পুরাণো সাবেক কালের তিনতলা বাড়ী। ৭ নম্বর রামধন মিত্র লেন। সিঁড়ির পর একটা পুরাণো লোহার বেঞ্চ। তাতেই বসলাম। বীরেনবাবু এলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগলেন।

কতক্ষণ আর দাঁড়ানো যায়। বীরেনবাবু কিন্তু বসেননি। বসলেই বিপদ। অনেকক্ষণ ধরে গল্প চলবে। দেরী হয়ে যাবে। কি এমন মহা কাজে তিনি ব্যস্ত জানি না। কিন্তু ব্যবহারটা যেন ভি, আই, পি-দের মতই। মহামূল্যবান সময় যেন বৃথা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে।

বীরেনবাবু নগ্নদেহ। শুভ্রকান্তি। পরণে নীল রঙের লুঙ্গি। রংয়ের বৈপরীত্যের জন্য গৌরবর্ণ আরো খুলেছে। সত্তরের ওপর বয়স। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন অন্তর ভেদ করে।

সহাস্যবদনে বললাম—নমস্কার।

বীরেনবাবু সজোরে এক টিপ নস্যি নিয়ে আরক্ত মুখে নাকিস্বরে মুখ বেঁকিয়ে বললেন—নমস্কার!

ইনি বাংলার একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমার সঙ্গে কথা বলা শেষ করলেন। আমার অত্যন্ত খারাপ লাগল। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। এই হল পশ্চিম বাংলা। এই হল কলকাতা।

রেডিও স্টেশনে গেলাম। তেরো চোদ্দ বছর আগে খুবই যাতায়াত ছিল। গেটে সেই বন্দুকধারী পাহারা। বিরাট অট্টালিকা। সবই সরকারী ব্যাপার। লাল ফিতের দৌরাত্ম্য। সাহিত্য এখানে রাজার আসনে বসে। স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। কিন্তু মনে শ্রদ্ধা জাগে না। চমক লাগে। শিশির ভাদুড়ীর বাসা বাড়ীতে গেছি। পলস্তারা খসে পড়ছে। কিন্তু মন ভরে ওঠে। একটা শিল্পীর সাক্ষাৎ পেলাম। নারকেলের বাইরেটা শুকনো। কিন্তু ভেতরে সুস্বাদু জল। সুমিষ্ট খাদ্য। শ্রীরঙ্গমের পেছনের দোতালা বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় মন ভরে উঠত আনন্দে। একটা শিল্পীর কাছে যাচ্ছি। রেডিও স্টেশনে বন্দুকধারীর পর বন্দুকধারী। দরজায় দরজায় পাহারা। যেন জেলখানা। সরস্বতী এখানে বন্দিনী। খুব চকচক ঝকঝক করছে চারদিক। জৌলুস, কিন্তু শিল্পের জৌলুস নয়। রাংতায় মোড়া সবটাই। তাই বাইরেটা জমকালো। ভেতরটা ফাঁপা।

পুরাণো সিঁড়ি বেয়ে আর এক বন্দুকধারীর দৃষ্টি উপেক্ষা করে, ওপরে গেলাম। লম্বা করিডর। ঘরের পর ঘর। প্রত্যেক ঘরের সামনে কাষ্ঠ ফলকে লেখা প্রত্যেকের নাম। ইংরিজীতেই লেখা দেখলাম সেই পরিচিত ঘর। বীরেন ভদ্র যেখানে বসতেন একদিন। মৃত্যুঞ্জয়

বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন যেখানে বসতেন। বাণীকুমারও। দীর্ঘ লম্বা বারান্দা পার হয়ে এসেছি। সুবেশ যুবক, সুবেশ যুবতীরা আশ-পাশ দিয়ে সবেগে আসা-যাওয়া করছে। প্রত্যেকের মুখই আশায় আনন্দে উজ্জ্বল।

ঘরে ঢুকলাম। এক কোণে একটা টেবিলের ধারে দুজন বসেছিলেন। প্রশ্ন করলাম—বি, বাসু কে? একজন গোল মুখ, ফর্সা চেহারার। বেঁটে-সেঁটে ভদ্রলোক বললেন—আমিই। পরণে সাদা সুতির হাওয়াই সার্ট। সাদা ফুল প্যান্ট। বছর চল্লিশ বয়স হবে। নামটা বলতেই বাসু সাহেব সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে বসতে বললেন। তারপর হাস্যমুখে বলতে লাগলেন—বাঃ, আপনাকে আমি খুব জানি। আপনার এক অধ্যায়—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলতে হবে না। বসুন। তারপর কি মনে করে? হেসে বললাম—এই আপনাদের দেখতে-টেখতে আর কি।

তাঁর পাশে বসেছিলেন যে যুবকটি তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন—ইনিও নাট্যকার। নাম—জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়।

নমস্কার বিনিময় হল। তিনি বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ জানি বৈকি। পরিচয়ের নাট্যকার আপনি। শিশিরবাবু আপনার নাটক প্লে করেছেন। বাঃ! সোজা কথা হল? বল কি?

বাসু সাহেব হাসি-খুসি, মাজাঘসা, মার্জিত রুচি ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলেন—নাটক লেখেন-টেখেন না সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বসে আছেন? মক্কেল আর ব্রীফ নিয়েই ব্যস্ত আছেন। দিন না একটা নাটক।

পরে দেবো, বলে বিদায় নিলাম। মনটা খুসিতে ভরে উঠল। বি বাসুর কথায় মনে পড়ল আমার বাড়িতে একটা নাটকের অভিনয়ের কথা। 'ঝরা ফুল' আমার লেখা। ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ অভিনয় হয়েছিল। আমার বাড়িতে ছিল একটা বড় হল। তরুণ রায়ের থিয়েটার সেণ্টরের হলের চেয়ে ছোট নয়। অভিনয় করেছিল কলেজের শিক্ষিকা, মেয়েস্কুলের শিক্ষিকা ইত্যাদি। মেয়েরা যখন একে একে মেকআপ নিয়ে হাজির হতে লাগল, হাজার পাওয়ারের বাতিতে যখন তাদের

রূপ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মনে হল পেশাদারী মঞ্চের অভিনেত্রীদের চেয়ে কিছু কম ভালো নয়। দুদিন পরে দিয়ে এলাম সেই নাটকটাই।

একদিন বিবেকানন্দ রোডে 'উল্টোরথ' অফিসে এসে হাজির হলাম। সামনে বসেছিলেন একজন ভদ্রলোক। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—রামকৃষ্ণবাবু আছেন? তিনি বললেন তাঁর সঙ্গেই ত কথা বলছেন।

নিজের দৃষ্টিশক্তির দুর্দশার কথা বললাম। প্রণব বিশ্বাস ও রবি বসুর কথা জিজ্ঞেস করলাম। শুনলাম—প্রণব বিশ্বাস 'প্রসাদ' কাগজে। রবি বসু 'দেশ' কাগজে। একথা সেকথার পর রামকৃষ্ণবাবু বললেন—নাটক লিখুন। নাটক লিখুন, জিতেনবাবু। নাটক লেখবার লোক বড় কম। আপনি নাটক লেখা ছাড়বেন না। নাটক লিখুন।

এই একটি মাত্র লোক আমায় নাটক লিখতে বললেন। অত বড় কলকাতায় একটি মাত্র লোক। একজন অন্ততঃ আছেন যিনি নাটক ভালবাসেন। নাটক চান। আর সকলে শুধু পয়সা চান।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন "প্রসাদ" অফিসে গেলাম। প্রণব বিশ্বাস দেখাশুনা করেন। তিনি একটা উপন্যাস নিলেন। নাম "উর্বশী"। আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। সেটা আজও প্রকাশিত হল না।

তিন নম্বর রায় বাগান লেনে রবি বসুর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে শিশিরবাবুর সম্বন্ধে একটা লেখা দিলাম। তিনি বললেন—একটা তরুণ দল নতুন পত্রিকা করছে। সেটাতে প্রকাশ করিয়ে দেবো। তাঁকে একটা ছোট উপন্যাস দিলাম। নাম "অপ্সরা"। বললেন—ব্যবস্থা করবেন প্রকাশের।

কলকাতা থেকে ফিরে আসবার অনেকদিন পরে হঠাৎ আমার জামাতা আমার কাছে এক খণ্ড শারদীয় "করবী" পাঠিয়ে দিলেন। তিনি পাটনা স্টেশনের বুক স্টল থেকে সেটা কিনেছেন। পড়ে দেখি আমার একটা লেখা রয়েছে তাতে। শিশিরবাবুর সম্বন্ধে। এই লেখাটাই আমি রবিবাবুকে দিয়ে এসেছিলাম। সম্পাদককে চিঠি দিলাম। কোন জবাব পেলাম না। রবি বসুকে চিঠি দিলাম। জবাব পেলাম না।

১৯৬২ সালে গোরক্ষপুরে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। নাট্য-শাখায় আমায় ভাষণ দিতে হয়েছিল। ভাষণ শুনে প্রীত হয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। পত্র ব্যবহারও চলেছিল। তিনি ছাপরায় আমার অতিথি হয়েছিলেন। যাবার সময় শিশিরবাবুর ওপর আমার একটা বইও নিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ দেখি শারদীয় "দর্পণ" পত্রিকায় "শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার" বলে আমার একটা প্রবন্ধ মাত্র বেরিয়েছে। সমস্ত লেখাটার কি হল জানি না।

হঠাৎ সেই কথা মনে হওয়াতে 'দর্পণ' অফিস আবিষ্কার করলাম। তাঁর সম্পাদক হীরেন্দ্রকুমার বসুর সঙ্গেও দেখা হল। কিন্তু তিনি পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিতে পারলেন না। এদিক-ওদিক হয়ে গেছে নাকি। সত্যিই অধোবদন হয়ে গেলাম। কত আশা করে দু'শো পাতার পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলাম পার্থবাবুকে। তার এই দশা হল? শেষ কয়েকটি পাতা ছাপা হল মাত্র? বাকী সব পাতা অতল জলে তলিয়ে গেল?

হীরেনবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হল শিশিরবাবুর সম্বন্ধে। বললেন— তাঁর মৃত্যুর পর এমন অর্থ নাকি ছিল না যে দাহ করা হয়। অভিনেত্রী প্রভার কন্যা কেতকী ইত্যাদি কয়েকজন অভিনেত্রী মিলে নাকি চাঁদা করে এই কাজ করেছেন। বড্ড খারাপ লাগল শুনে। এত দূর হয়েছিল? মানুষের অর্থনৈতিক বিপর্যয় যখন হয়, তখন তা যে কতদূর নীচে নামিয়ে আনবে তা কেউ বলতে পারে না। ভাবলাম, একবার কেতকীকে না জিজ্ঞেস করে কোন উপসংহারে আসব না।

সুযোগ এল। প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে "বারবধূ"র বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেড়াতে গেলাম সেখানে। গ্রীনরুমের দিকে অগ্রসর হলাম। কেতকীকে খবর পাঠালাম। তখন প্লে করছে। অপেক্ষা করলাম। প্লের শেষে ভেতরে গেলাম। কেতকীর ড্রেসিংরুমে। কেতকী পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। এখানকার অভিনেত্রীরা কাউকে সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করে না। এটা বঙ্গরঙ্গমঞ্চের একটা বিশেষত্ব। দিল্লীতে রেডিও স্টেশনে এ ঐতিহ্য নেই। ঠাকুর

রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ পূত রঙ্গমঞ্চের এই ঐতিহ্য যদি নষ্ট হয়, অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করলাম শিশিরবাবুর আন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার কথা। যা শুনেছিলাম তাও বললাম। শুনে কেতকী দুই কানে আঙুল দিয়ে বলে উঠল—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এসব কথা শুনলেও পাপ। কে বলেছে আপনাকে এই কথা। বললাম।

কেতকী আবার ছি ছি করে উঠল। বলে উঠল—আমি কোথাকার কে? আমি চাঁদা তুলতে যাব তাঁর সংকারের জন্যে? তাঁর কি লোকের অভাব ছিল? ছেলে ভাইপো ছিল না? আমি শ্মশানে গিয়েছিলাম ঠিক। রজনীগন্ধার তোড়া দিয়েছিলাম ঠিক। কিন্তু আর কিছু? ছি ছি ছি। তিনি ত আমার জ্যাঠামশাই ছিলেন। তারাকুমারবাবু আমার বাবা ছিলেন ত? আমার শোক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ছি ছি ছি। এসব কথা শুনলেও পাপ হয়।

কেতকী হঠাৎ বললে—"বারবধূ" দেখেছেন?

বললাম—না।

বললে—দেখবেন?

বললাম—আপত্তি কি? তোমার অভিনয়। দেখতে চাইবো না? তোমার মার অভিনয় কত দেখেছি। তুমি তখন কতটুকু জন্মাওনি বোধ হয়? না।

কেতকী লজ্জিত হয়ে বললে—না। জন্মাইনি।

আমি গৌরবর্ণা মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে তারাকুমার শিশিরকুমারের সাদৃশ্য খুঁজতে লাগলাম। আমি তার জন্ম রহস্য জানতাম না।

দেখলাম থিয়েটর। থিয়েটর শেষে ভেতরেও গেলাম। পরিচালক অসীম চক্রবর্তীও ছিলেন। কেতকী জিজ্ঞেস করলে—কি রকম দেখলেন?

বললাম—ভাল।

জিজ্ঞেস করলে অশ্লীল কিনা?

বললাম—এটুকু না থাকলে নাটক কি? তবে নাটককে অশ্লীল বলা

যেতে পারে না। কারণ উদ্দেশ্য সামাজিক মঙ্গল।
বললে—আপনার মতামত লিখে দিতে পারেন কি?
বললাম—নিশ্চয়।
সে একটা মোটা খাতা এগিয়ে দিলে। বললে—লিখে দিন এইতে আপনার মতামত।
লিখে দিলাম তখুনি। রাত দশটায় থিয়েটরের ভেতরে বসে এই কয়েকটা কথা লিখলাম—বারবধূ দেখলাম। এই নাটককে যারা অশ্লীল বলে তারা শ্লীল অশ্লীল কথা দুটোর মানে বোঝে না। আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে এ নাটক প্রত্যেক স্বামী ও প্রত্যেক স্ত্রীর দেখা উচিত।
দুজনেই আমার কথা শুনে তৃপ্ত হলেন। আমার হাতে দুখানা পোস্টকার্ড দিয়ে বললেন আপনি আমাদের আরও কিছু লিখে জানাবেন। শুনলাম ব্রাহ্মরা প্রতাপ মেমোরিয়ালের landlord। তারা ওদের চলে যেতে বলছে, lease renew করতে চাচ্ছে না। আমি একটা চিঠিতে লিখলাম একদা এক ব্রাহ্ম নেতা স্টার থিয়েটর কোথায় প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—জানি না। তারপর ফিরে এসে বলেছিলেন—জানি কিন্তু বলব না। এই রকম অতিরিক্ত নীতিবাগীশ হওয়ায় ফল কি হল। তাঁর পুত্র এক অভিনেত্রীকে বিবাহ করল। কে জানে হয়ত অতীত আবার বর্তমান হতে চলেছে। দ্বিতীয় পত্রে লিখলাম—ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষ যখন পাবলিক থিয়েটরকে হল ভাড়া দেন তখন কি তাঁরা ভেবেছিলেন—ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যরা সেখানে চোখ বুজে সানাইয়ের পোঁ ধরবেন। অসীমবাবুকে বললাম—যদি কর্তৃপক্ষ আপনাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে আমায় সাক্ষী মানবেন।
রঙমহলের হেমন্ত ব্যানার্জীর সঙ্গে পরিচয় ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁদের নতুন বাড়িতে। ২ নম্বর রামকৃষ্ণ রোড। একদিন গেলাম। নাটকের কথা বললাম। কোন কথায় না বলতে এঁরা জানেন না। 'এক অধ্যায়' সিনেমা জগতে ছাপা হয়েছিল। এক

কপি ছিল। পড়তে দিলাম। তিনি আগ্রহ সহকারে নিলেন। দুদিন পরে আসতে বললেন। দু'দিন পরে গেলাম। তিনি মুখটা কাঁচুমাচু করে বইটা ফেরৎ দিলেন এই বলে যে এতে যথেষ্ট হিউমার নেই। বাংলাদেশের লোকরা নাকি হাসতে ভুলে গেছে। সব রামগরুড়ের ছানা হয়ে গেছে। তিনি মঞ্চ থেকে হাস্যরস পরিবেশন করতে চান শুধু। বললেন—সুবর্ণ গোলক দেখেছেন।

বললাম—না।

বললেন—দেখুন। হিউমার কাকে বলে বুঝুন।

দেখতে গেলাম। আমার কনিষ্ঠা কন্যা সঙ্গে ছিল। সে তো হেসে গড়াগড়ি। বলছে—বাপরে বাপ। পেটে ব্যথা ধরে গেল। তুমি এই রকম একটা নাটক লেখো না কেন বাবা ?

বাবা বেচারা বললে—আমার এত ক্ষমতা কোথায় ?

আমার কন্যা ও মঞ্চ মালিকের মতের মিল দেখে অবাক হলাম। এই হয়ত বাংলার শতকরা নিরান্নব্বইজন দর্শকেরও মত। আমি ভাবতে লাগলাম বঙ্কিমের একটা ছোট গল্প সুবর্ণ-গোলক। একশোবছর পরে তাই নাটক হিসেবে দেখানো হচ্ছে। বাংলার দর্শক এখনও তৈরী হয় নি। তারা যথার্থ নাটক এখনও দেখতে চায় না। শিশুসুলভ বাচালতাই দেখতে চায়। কাতুকুতু দেওয়া হাসি।

শিশির স্মৃতিরক্ষা কমিটির সেক্রেটারী অনুপকুমার দাসের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি তখন কাশী বিশ্বনাথমঞ্চে 'মল্লিকা' নাটকে অভিনয় করছেন। জিজ্ঞেস করলাম শিশির-স্মৃতি-রক্ষার কি ব্যবস্থা করছেন ? তিনি আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন এখনো কিছু ব্যবস্থা করতে পারিনি। তবে শ্মশানে তাঁর একটা Plaster of paris-এর মূর্তি রাখবার ব্যবস্থা করছি।

হেসে বললাম—কেন ? তার ওপর কাক বসে হাগবে। এই জন্যে ? অনুপকুমার ঘাড় নীচু করে রইলেন। কিছু বললেন না। বললাম—আমাকে তিনি সওয়াশো খানা চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলো কোথাও

রাখবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

তিনি শুষ্ক কণ্ঠে বললেন—বেশ। দেবো। দেখব। চেষ্টা করব। কিন্তু তাঁর আগ্রহ দেখে দিতে ইচ্ছে হল না। বললেন—দেখবেন আমাদের নাটক ?

বললাম দেখব।

বললেন—বেশ। পরের শনিবারে আসবেন।

পরের শনিবারে গেলাম। আশ্চর্য! তিনি ছিলেন না। কোন ব্যবস্থাও করেন নি। নাট্যকার বীরু মুখোপাধ্যায় অতি সজ্জনব্যক্তি। তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন। শিশির-স্মৃতি-রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছেন দেখে নিশ্চিন্ত হলাম! আর ভয় নেই। শিশির-স্মৃতি রক্ষিত হবেই।

বীরু মুখোপাধ্যায় তাপস সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁর যা কিছু জ্ঞান সেটা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর। কলার ওপর নয়। তিনি শিল্পী নন। টেক্‌নিশিয়ান। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আর শিল্প জ্ঞান, এক জিনিস নয়। খুব সম্ভব তিনি inferiority complex-এ ভোগেন। আর বীরুবাবু নাট্যকারের সম্মান করতে জানেন। প্রথম অঙ্কের পরই এসে উপস্থিত। জিজ্ঞেস করলেন কেমন দেখছেন।

বললাম ভাল।

বললেন, শুধু এইটুকু ? আর কিছু নয় ?

বললাম, আছে। this book will run।

বললেন—এখনও ত সবটা দেখেন নি। এর মধ্যে কি করে—

বললাম—এইটুকু ক্ষমতাবোধ হয় নাট্যাচার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে হয়েছে। আশ্চর্য! বইটা বেশ চললও।

বসে বসে প্লে দেখছি হঠাৎ একটা নকলী চমক দেখতে পেলাম। আলোর কেরামতি। একটা মেয়েকে মোটরের ভেতর গুণ্ডা আক্রমণ করেছে। আলোছায়ার সাহায্যে এই ঘটনা মঞ্চে প্রতিফলিত হচ্ছে পর্দার ওপর। অর্থাৎ দস্তুর মত সিনেমা। নাটক বিদায় নিয়েছে।

বুঝলাম, সিনেমার কাছে মঞ্চের এই হল হার। লড়াই, না-লড়েই হার। যেমন পলাশীর যুদ্ধ। বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা ঘটানো হার। মীরজাফর এক্ষেত্রে তাপসচন্দ্র। আছেন থিয়েটরে কিন্তু পক্ষপাত সিনেমার প্রতিই। সোজাসুজি সিনেমায় ঢুকছেন না কেন তিনি? এতো যদি আলোর জ্ঞান। সেখানে তাঁর স্থান নেই।

সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যা ছিল। সে গদগদ হয়ে বলতে লাগল—বাবা। তুমি ত কিছু দেখলে না তাপস সেন কি কাণ্ড করেছে। একটা গুণ্ডা গয়না কেড়ে নিচ্ছে। সাবিত্রীর গা থেকে। সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তুমি ভাল দেখতে পাচ্ছো না। তাই বুঝতে পারছো না। অদ্ভুত। অপূর্ব। তাপস সেন একটা যাদুকর। ম্যাজিসিয়ান।

আমি হাসলাম। মুখে কিছু বললাম না। মনে মনে বললাম—স্টেজে এই কাণ্ডটা কি না দেখালেই নয়? এক লাইন ডায়লগ দিয়ে কি বলা যেতো না। নাট্যাভিনয় আর ম্যাজিক এক জিনিস নয়। কোনটা নাটকের বিষয়বস্তু, কোনটা সিনেমার বিষয়বস্তু, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাপসবাবুর নেই। অবশ্য তিনিই লিখছেন—আমি কি করব? পরিচালক বলেন এই সিনে আপনি একটা কিছু করুন। নইলে নাটক আমি ধরে রাখতে পারব না। অগত্যা মাথায় হাতুড়ী মেড়ে একটা কিছু করতেই হয়। নানাপ্রকার চালাকির সাহায্য নিতে হয়।' তাঁর যুক্তি হয়ত অকাট্য। কিন্তু শিল্পীজনোচিত নয়। তাপসবাবু artist নন। craftsman। আর্ট ও ক্রাফ্টে তফাৎ আছেই। আমি তাঁর জয়গান করতে পারি না।

অবশেষে ট্রপিকাল স্কুল অব মেডিসিনের ডায়াবেটিক ওয়ার্ডে এক মাস ধরে যাওয়া শেষ হল। বাঁচলাম।

পুত্র কাছ-পিঠের একটা clinic থেকে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিল। প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। অতএব এম্. এন্. চ্যাটার্জীর হাসপাতালের গেটে প্রবেশ করলাম। তাঁরা report দেখলেন। বললেন—হ্যাঁ

এবার ভর্তি হতে পারি।

কাল অপারেশন হবে। কি হবে জানি না। ভয় হচ্ছে না, তা নয়। এত বিধি-নিষেধের কথা শুনছি যে ভয়ে আরো কাঁপছি। অপারেশনের পর একটুও নড়তে পারব না। পাশ ফিরতে পারব না। হাঁচতে-কাশতে পারব না। চোখে হাত দিয়ে ফেলেছি, কি গেছি।

জেলে একা বসে বসে ভাবতে ভাবতে শ্রীঅরবিন্দের আত্মোপলব্ধি হয়েছিল। আমারও হল। বুঝলাম—আমি লেখক। নাট্যকার। এছাড়া আর আমি কিছুই নই। অতএব কলম ধরলাম। পাশেই রাখা ছিল কাগজ কলম। পুত্র দিয়ে গিয়েছিল। বিছানায় উঁচু হয়ে বসে লিখতে আরম্ভ করলাম। ডাক্তার রাউণ্ডে এসে আমায় দেখে বললেন—কি করছেন? বললাম—Just scriffling।—Oh! scriffling! Thats all right! বলে হেসে ডাক্তার চলে গেলেন। সারাদিনই লিখে চললাম। কাল অপারেশন। আজ আমি নাটক লিখছি। আমি আজও ভেবে অবাক হই, কি করে একটা পুরো নাটক লিখে ফেললাম একদিনেই। এই আমার সত্যকার ক্ষমতা। এই আমার সত্যকার আমি। লেখক। নাট্যকার।

চক্ষু হল রত্ন। আমার সেই রত্নের ওপর ছুরি বসবে।

স্থূলবদনা, গম্ভীর আননা, সিস্টার কাছে এলেন। অতিরিক্ত গম্ভীর গলায় বললেন—একটা ইন্‌জেক্‌সন্‌ দিচ্ছি। বলে প্যাঁট করে ছুঁচ বসিয়ে দিলেন। চোখের ঠিক নীচেই। ব্যথা লাগল।

একটু পরে হঠাৎ একটা তেজী আলো চোখের ওপর এসে পড়ল। বুঝতে পারলাম সুরু হচ্ছে নাটক।

ডাঃ সাহা আর একটা injection আমার চোখের ওপর দিকে দিয়ে দিলেন। তারপর দুই ডাক্তার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে মাথা নীচু করে, কি যেন দেখতে লাগলেন। একটা কিছু কাজও যেন করতে লাগলেন। খুব সম্ভব ছুরি বসিয়েছেন এইবার। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি

না। তখনও শুধু ভয়ই পাচ্ছি। ভয় দূর করবার চেষ্টা করছি। চরম মুহূর্ত আগত।

হঠাৎ মানসনেত্রে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ছবি ভেসে উঠল। আমার পিতামাতার গুরুদেব। বাড়িতে তাঁর ছবি সদা সর্বদাই চোখে পড়ে। বিপদে পড়লে জননী কেবল তাঁকে উদ্দেশ্য করেই "জয় গুরু, জয় গুরু" বলে ডেকেছেন। দেখতে দেখতে সব বিপদ কেটেও গেছে। সেই মুখ আমার আজন্মের ভক্তির পাত্র। বিশ্বাসের পাত্র। নির্ভয়ের পাত্র। হঠাৎ জনক জননীর ছবিও মানসনেত্রে ফুটে উঠল। কেন উঠল তা জানি না। বোধ হয় একেই বলা হয় সংস্কার। বিপদের সময় নিজের পিতামাতাকেই মনে পড়ে।

হঠাৎ ডাঃ মুখার্জী বললেন—একটু রয়ে গেল যে!

ডাঃ সাহা বললেন—ঠিক করে দিচ্ছি।

অতঃপর ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন সিস্টার।

চোখ অপারেশন করতে এসে একটা কথা ভাল করে বুঝতে পারলাম। যখন চরম বিপদের সময় এসেছে বলে মনে হবে, তখন একটা কিছুর ওপর নির্ভর করতেই হবে। সে পিতামাতাই হোন অথবা পিতামাতার গুরুদেবই হোন। এর হাত থেকে নিস্তার নেই। অন্ততঃ আমার ছিল না। আজন্মের সংস্কারের হাত থেকে নিস্তার কোথায়? ধর্ম কাকে বলে? একেই, সাধারণ করে রাখে বিপদের মুহূর্তে। আগে ইষ্টমন্ত্রই হোক, ইষ্ট দেবতাই হোক। যাহোক একটা কিছু। যা আমি নই। যা আমার শক্তি নয়। তাকেই আমি বলি তৃতীয় শক্তি। Third power।

পুত্র এলো। সকলকে বকশিষ দিল। প্রসন্ন মনে ট্যাক্সিতে গিয়ে বসলাম। কলকাতায় সে সময় ট্যাক্সি পাওয়া কি যন্ত্রণা।

গাড়ি ছাড়ল। আমার পাশে পুত্র ও পুত্রবধূ। রাস্তার আলো ভালো চিনতেই পারছি না। একটা চোখ বাঁধা। এই কি আমার সেই

আমি? এই কি সেই কলকাতা? অদ্ভুত মনে হচ্ছে। এ যেন অন্য কলকাতার ভেতর দিয়ে চলেছি। মাণিকতলা যেন চিনতে পারছি না। শ্যামবাজার যেন নেই। গাড়ি থামল। বুঝলাম গন্তব্যস্থলে এসে পড়েছি। বাগবাজার। আস্তে আস্তে নামলাম। বাড়ি ঢুকলাম।

একদিন বেতার-জগতে দেখলাম আমার নাটক 'ঝরা ফুল' ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৫ সন্ধ্যায় অভিনীত হবে। ঔৎসুক্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগাম। অবশেষে ২৫শে ডিসেম্বর এলো। চোখে তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। নাটক শুনছি। নিজের লেখা। ভাল লাগছে।
চশমা নেবার জন্যে অপেক্ষা করছি। আস্তে আস্তে বাড়ির নীচে নামতে লাগলাম। বৃদ্ধের ক্ষিপ্রতা দেখে লোকে অবাক হতে লাগল। একি রকমধারা বৃদ্ধ? কি চায় এ?
গেলাম 'শনিবারের চিঠি'র অফিসে। 'ঝরা ফুল' নাটক দিয়ে এলাম রঞ্জনকে। 'প্রসাদ' অফিসে খবর নিতে গেলাম। আমার 'শিশির কুমার কঙ্কা ও প্রভা' ছাপানো হয়েছে।
একমাস পরে চশমা পেলাম। পরে দেখলাম। দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এ এক নবীন অভিজ্ঞতা।
আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঠিকই বলেছিলেন। নতুন দৃষ্টি পাবে। পেলামও। একটা তৃতীয় শক্তি আছে। রোগও সেই দেয়। আরোগ্যও সেইই করে। ছাপরায় ফিরে আসবার দিন ঠিক হল। একদিন হাওড়া স্টেশনে এসে চড়ে বসলাম ট্রেনে। জীবন এগিয়ে যায়। ট্রেন, জাহাজ, মোটর, রিকৃশা ইত্যাদি কত কি যানবাহনে চড়লাম। গঙ্গা পার হলাম। সেই পুরাতন গঙ্গা। কি সুন্দর লাগছে এখন। সেই প্রবাহিত জলস্রোত। জীবনও ত প্রবাহিত জলস্রোতই। জাহাজের ডেকে কিছুক্ষণের জন্যে আশ্রয় নিয়েছি। কিছুক্ষণের জন্যে যেমন হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলাম। একটু পরে পালেজা ঘাটে নামব। আর একটু পরে ছাপরা। আর একটু পরে পরিচিত গৃহ। গৃহ প্রাঙ্গণ।

গৃহের অভ্যন্তর। শেষে আপন শয্যা। এই ত জীবন।

যদি কালস্রোতে আমার জীবনতরী নির্বিঘ্নে ভেসে যেতে পারে তাহলে জীবন-জাহাজে এই দৃশ্য একটা চালকের উপস্থিতি ভেবে নিলে ভুল হবে কোথায়? আমার জীবনতরীর একটা চালক আছে। সেই সব পরিচালনা করে নিয়ে চলেছে। আমরা তাকে দেখতে পাই না। বুঝতে চেষ্টা করি না। কিন্তু তাই বলে সেকি নেই? সে আছে। সক্রিয়ভাবেই আছে। আমার অতি সীমিত কূপমণ্ডুক জ্ঞানই আমাকে বুঝতে দিচ্ছে না। আমার অজ্ঞতাই আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে। মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি। মাৎসর্যপূর্ণ হৃদয়। অহঙ্কারে স্ফীত মস্তিষ্ক।

এই লেখার কি ভবিষ্যৎ আমি জানি না। জানতে চাইও না। জানি শুধু এইটুকু। আমায় লিখতে হবে। আমার নতুন দৃষ্টি, সাহিত্যের মাধ্যমে, জনচিত্তের দ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। লেখক হিসেবে তাহলেই আমার কর্তব্য শেষ হবে। সেই কর্তব্যই ত করে চলেছি। এবার তাহলে বিদায় দিন। চতুর্থ পর্বে এবং পঞ্চম পর্বে আবার কিছু নিজের কথা বলব। অনেক কথা আপনাদের কর্ণপীড়া ঘটিয়েছি। এবার অনুমতি দিন, চুপ করি।